



শিশু-ভারতী

সংযোজনী খণ্ড

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

• সম্পাদিত •

প্রকাশক :

ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাবলিকেশন্স) প্রাঃ লিঃ
॥ এলাহাবাদ ॥



শিশু-ভারতী
সংযোজনী খন্ড

প্রকাশক:
ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাব্লিকেসন্স)
প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ

প্রথম সংস্করণ
১৩৭০
১—৪০০ পৃষ্ঠা
রঙ্গীন চিত্র
ভারত রাষ্ট্রনেতাগণের চিত্র
একবর্ণ চিত্র
লেখক-পরিচিতি

প্রাপ্তিস্থান:
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২-১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৯৩এ, ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

মূল্য— ১৩৲ টাকা

নিবেদন

আমাদের 'শিশুভারতীর' এই খন্ড প্রকাশের মূলে যে ইতিহাস আছে, তাহা বলিতেছি। বিষয়টি নূতন—শিশুসাহিত্যের ইতিহাস যাকে বলা যায় A history of children's literature: অনেকদিন হইতেই ছিল, সেই বাসনা। সেই বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমি বহু বৎসর পূর্বে প্রথম হইতে দশম খন্ড পর্যন্ত ছোটদের বিশ্বকোষ প্রতি খন্ড ১—৪০০ শত পৃষ্ঠা হিসাবে মোট ৪০০০ চারিহাজার পৃষ্ঠার একবর্ণ, দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র শোভিত 'শিশুভারতী' প্রকাশ করি। এই বিরাট গ্রন্থ নিশ্চয় দেশবাসীর আদরণীয় এবং কিশোর-কিশোরীদের শিশু ও বালক-বালিকাদের চিত্তহারী। এমন পাঠাগার নাই, কি এমন বিদ্যালয় বিরল, যেখানে 'শিশু-ভারতী' স্থান পায় নাই। ইহা লোকের ঘরে ঘরে কত না আনন্দ ও জ্ঞান বিতরণ করিয়াছে ও করিতেছে। সে গুলিতে সন্নিবেশিত ছিল, বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধসমূহ, বিচিত্র জীবজন্তু পূর্ণ বিশাল জগতের কথা; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা পূর্ণ সৌরজগতের কথা,—এক কথায় জ্ঞান সংবলিত যাবতীয় বিষয়ই সে গুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সহজ সরল ভাষায় অতি মনোরমভাবে বিশেষজ্ঞ লেখকগণ, বৈজ্ঞানিকগণ, অধ্যাপকগণ নিজ নিজ বিষয়ে সরস প্রাঞ্জল এবং সরলভাষায় চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে লিখিত প্রবন্ধদ্বারা বাঙ্গলার তথা, ভারতের বালক বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শুধু নয়—বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যেও জ্ঞান বিকাশের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশে 'শিশু-ভারতীর' অবদান সকলে স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে নিম্নের উদ্ধৃতি অনুধাবন যোগ্য: UNESCO—Science Memoranda by The Indian Science Congress Association—"special reference should be made to "SISU-BHARATI"—Children's Encyclopaedia, edited by Jogendra Nath Gupta, and completed in 10 volumes. There is a magnificent and unique endeavour in this country, and about one hundred scientists have co-operated in preparing the science articles and notes, almost every branch of science has been covered." এই উদ্ধৃতাংশ হইতে শিশু-ভারতী বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানোন্মেষের কি সুদূর প্রসারী পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহা সর্ব্বজন স্বীকৃত।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস ও সুন্দর ভাবে শিশু-বালক-বালিকারা যাহাতে বুঝিতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহাদের কোন অসুবিধা না হয়, সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যেমন দশম খন্ডে (complete in ten volumes) সমাপ্ত—শিশু-ভারতী সর্ব্বজন মনোরঞ্জন করিয়াছিল তেমনি এই খন্ডেও নিখিল ব্রহ্মান্ডের ও বর্ত্তমান জগতের যাবতীয় বিষয় স্থান পাওয়াতে আশা করা যায় যথোচিত সমাদর লাভ করিবে। ইংরাজীতে Encyclopaedia Britannica-তে যেমন সংযোজনী খন্ড প্রকাশিত হয় তেমনি এই শিশু-ভারতী সংযোজনী স্বয়ংসম্পূর্ণ খন্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রদেশে যেমন বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ গুণবান ব্যক্তিগণ সম্পাদককে নানা নব নব বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেন, যাহার ফলে সম্পাদক উপকৃত হন, তেমনি আমিও আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালার মনীষীগণ সর্ব্ববিষয়েই আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এই খন্ড পূর্ব্ব প্রকাশিত দশ খন্ড হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে সম্পাদিত। ইহাতে ভারতে যে নবীনতর স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে তাহার অবতারণা করা হইয়াছে—প্রবন্ধ ও বিবিধ বিষয় সমূহের মাধ্যমে।

এই খণ্ডের আর একটি বৈশিষ্ট এই যে, ইহাতে লেখক-পরিচিতি, ও নির্ঘন্ট (Index) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

শিশু-ভারতীর বর্ত্তমান খন্ড প্রকাশ করেন, এলাহাবাদ ও কলিকাতার সুবিখ্যাত ইন্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। এই প্রকাশনা সংস্থাই পূর্ব্বতন 'শিশু-ভারতী' সমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হরিপ্রসন্ন ঘোষ ও তাঁহার অনুজগণের এ—বিষয়ে সহৃদয়তা ও সহযোগিতা প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ। শিশু-ভারতীর প্রকাশের প্রথম প্রচার হইতে তিনি ছিলেন আমার একজন সহায়ক, বর্ত্তমান শিশু-ভারতী সংযোজিনী খণ্ড প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার কথা মনে পড়ে, তিনি ছিলেন আমার একজন স্নেহভাজন বন্ধু, এ গ্রন্থ প্রকাশসম্বন্ধেও তাঁহার কতনা উৎসাহ ছিল, কিন্তু বিধাতার বিধান অখন্ডনীয়, দুঃখের বিষয় তিনি প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থমধ্যে জীবজন্তুর চিত্র, মহাকাশ ও নীহারিকা, রাজস্থান, কাশ্মীর ও অন্যান্য যে-সব সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সকল বিষয়ে প্রামাণ্য চিত্র আবিষ্কারকগণের চিত্রগুলি সংযোজিত হইয়াছে,—যেমন শ্রীদেবেশ দাশ, আই-সি-এস, ডাঃ শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পাট, চা, প্রভৃতির লেখকগণ বইতে সন্নিবিষ্ট আলোকচিত্র পাঠাইয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ভারতের শিল্পকলা শীর্ষক প্রবন্ধের বুদ্ধমূর্ত্তি মহেঞ্জোদারের রাজপথ স্নানাগার, শীলমোহর, নর্ত্তকী, ধ্যানী মনুষ্যমূর্ত্তি, মুক্তেশ্বর মন্দিরের আলোকচিত্র প্রভৃতি পাইয়াছি, ভারতপুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে। বিশ্বপরিচয়ের দেশ-বিদেশের চিত্র, প্রত্যেক দেশের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। শান্তিনিকেতন হইতে অনেক দুর্লভ চিত্র চিঠি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি অধ্যাপক, কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌমিত্রশঙ্কর দাশ গুপ্তর নিকট হইতে, সেজন্য আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। আমার প্রিয়তম সুহৃৎ খ্যাতিমান শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদারও নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

চন্দ্র, সূর্য্য, রকেট, অ্যাটমবোম, প্রভৃতির ও হিমাদ্রি শিখরের চিত্রাদি—প্রাপ্তি বিষয়ে ইউ, এস, এস, আর, ইউ, এস, আই, এস, ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস চিত্রাদি পাঠাইয়া সহযোগিতা করিয়া আমাকে ঋণী করিয়াছে।

উপসংহারে আরো দুই জনের সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে মনে করি। একজন জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক সুলেখক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরেকজন আদিবাসীদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, সুসাহিত্যিক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র।

আশাকরি বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের শিশু, বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীগণ 'শিশু-ভারতী'তে সন্নিবেশিত প্রবন্ধাবলী হইতে নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইবেন, তাহাদের নবীন হৃদয়ে অংকুরিত হইবে দেশপ্রেমের বীজ। স্বাধীন দেশের মানুষ, ভারতের মানুষ, বাঙ্গলার মানুষ আমরা, সর্ব্বদা স্মরণ করিব ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা। যদি শিশু-ভারতী পাঠে শিশু বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকা ভারতের গৌরবময় অতীতের ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে সচেতন হয়, তবেই আমার প্রচেষ্টা সফল হইবে। আমার দ্বিতীয় পুত্র শিশু-সাহিত্যিক শ্রীমান সুধাংশু গুপ্ত আমার সংযোজিনী খন্ড প্রকাশে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

চম্পক-কুটির
বসুনগর, মধ্যমগ্রাম
২৪ পরগণা

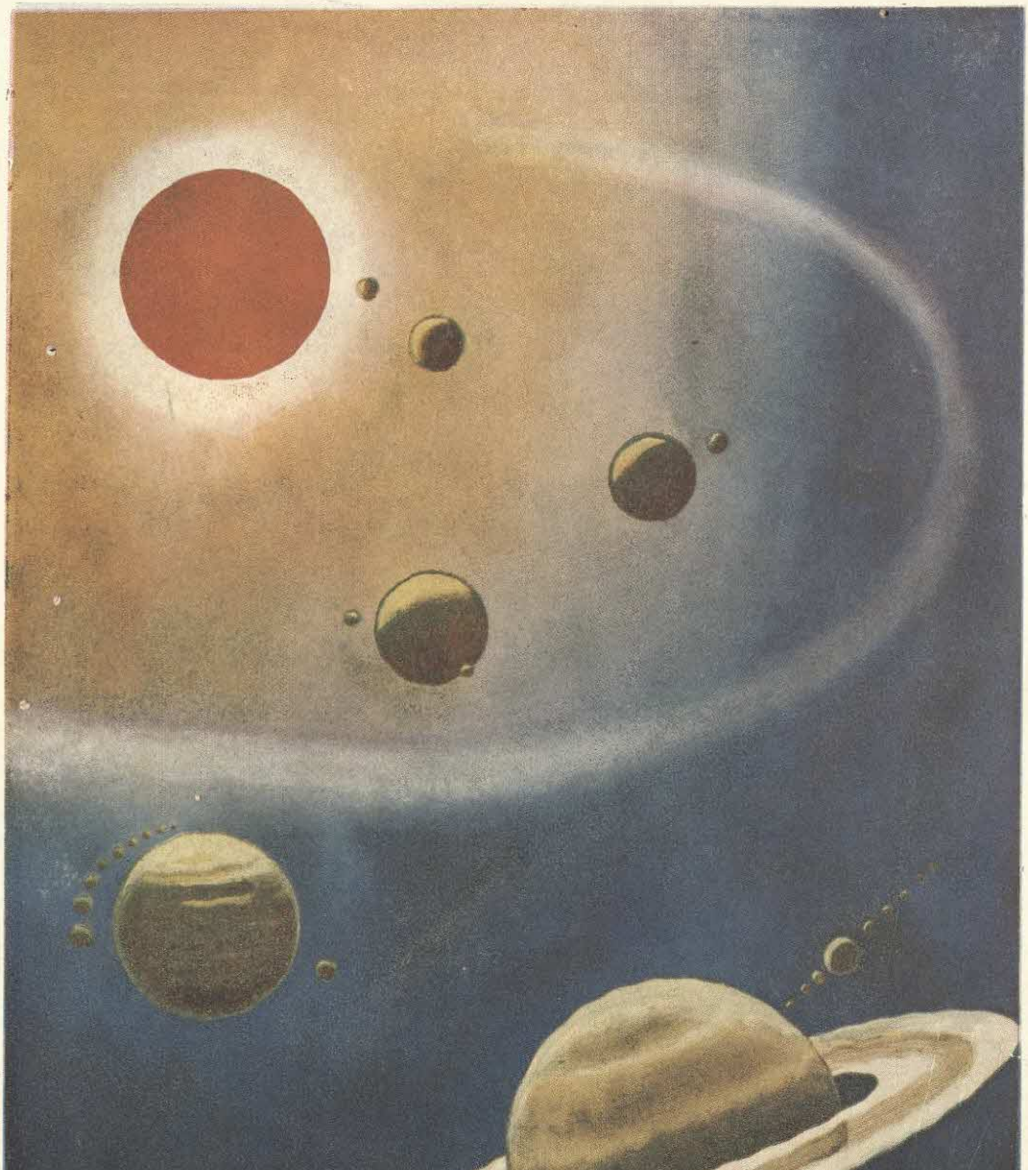
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

চিত্রসূচী

3230

সূচীপত্র

নির্ঘণ্ট



বিশ্বের বিশালতা—সৌরজগৎ



মহাকাশ—নীহারিকা ও বিশ্বের বিশালতা

বিচিত্র এই বিশ্বের আপাত সাধারণ কোন বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও মানুষের সম্মুখে আরব্য উপন্যাসের গল্পের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার অপেক্ষা চমকপ্রদ ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হইতে দেখা যায়। পরিষ্কার নৈশ আকাশে নক্ষত্র সমূহের সঙ্গে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মত আলোক-চিহ্ন দেখা যায়—যেন পাতলা উজ্জ্বল একটু মেঘ; ইহাকে বলা হয় নীহারিকা। দূরবীণে এইরূপ বহু নীহারিকা দেখা যায়। নক্ষত্রের জটলাকেও খালি চোখে নীহারিকা মনে হইতে পারে, কিন্তু একটি সাধারণ দূরবীণ দিয়াও ইহার পৃথক্ পৃথক নক্ষত্রগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বহুদিন হইতে একটা ধারণা চলিয়া আসিতেছিল যে, নীহারিকা শূন্যে বিস্তৃত বায়বীয় (Gaseous) মেঘ এবং ইহা নক্ষত্রের শৈশবাবস্থা বা অবয়বহীন অবস্থা। এই অতি সাধারণ একটু আলোক-চিহ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া মানুষ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের বিশালতা সম্বন্ধে যে তথ্য অবগত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। এই বিশ্ব ছোট-বড় বহু কোটি নক্ষত্র-জগৎ লইয়া গঠিত; আর এক একটি নক্ষত্র-জগতে রহিয়াছে আমাদের সূর্য্যের মত বহু কোটি সূর্য্য বা নক্ষত্র। আবার নক্ষত্র সমূহের পরস্পর দূরত্ব বুঝাইতে গিয়া স্যার জেম্স্ জীন্স্ উপমা দিয়াছেন—হাওড়া ষ্টেশন অপেক্ষা বড় একটা ষ্টেশনের ভিতর ছয়টি ধূলিকণা যে ব্যবধানে থাকিতে পারে, তুলনায় নক্ষত্রদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান তাহার অপেক্ষা ও বেশি। এই যে বিশ্বের কথা বলা হইল, এরকম আর ও বিশ্ব আছে কিনা জ্যোতিষী সে খবর জানেন না। মনীষী এডিংটন (Sir Arthur Eddington) বিশ্বের ধারণা দিয়াছেন এইরূপে—

দশ সহস্র কোটি (১০^{১১}) নক্ষত্র=১ নক্ষত্র জগৎ
দশ সহস্র কোটি (১০^{১১}) নক্ষত্র জগৎ=১ বিশ্ব.

আমরা দেখিব যে, ছোট-বড় নানা প্রকার নক্ষত্র জগৎই আছে। এক একটির ব্যাস ১৬০০ হইতে ১০০,০০০ আলোক বৎসর* পর্য্যন্ত হইতে পারে অর্থাৎ এক একটি নক্ষত্র জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আলো পৌঁছিতে ১৬০০ হইতে ১০০,০০০ বৎসর সময় দরকার, আর আলোক এক সেকেন্ডে যায় ১,৮৬,০০০ মাইল।

তেশিরা কাঁচের ভিতর দিয়া কোন বস্তু হইতে আগত আলোকরশ্মি পরিচালিত করিয়া তাহার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করা যায়; ইহাকে বর্ণরশ্মি বিশ্লেষণ বলে। আকাশের কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আলো বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক তাহার সম্বন্ধে নানা তথ্যই অবগত হন।

*আলোক প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ ভ্রমণ করে। এক বৎসরে আলোক যতদূর ভ্রমণ করে সেই দূরত্বকে অর্থাৎ ৬×১০^{১২} বা ছয় লক্ষ কোটি মাইল দূরত্বকে এক আলোক বৎসর বলে।

হাগিন্‌স্ (Huggins) কতকগুলি উজ্জ্বলতর নীহারিকার আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পান যে, ইহাদের বর্ণচ্ছত্র জ্বলন্ত গ্যাসের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ। ইহার কিছুকাল পরে ধরা-পড়ে যে, কতকগুলি নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড রসের (Lord Rosse) ৬ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট দূরবীণ তৈয়ার হয়। নির্ম্মাণের তিন মাসের ভিতরই একদিন একটি নীহারিকার আকৃতি দেখা গেল আশ্চর্য্য রকমের—সুন্দর কুণ্ডলীচক্র পাকানো আকৃতি, যেমনটি দেখা যায় সামুদ্রিক শঙ্খ প্রভৃতিতে। কয়েক বৎসরের ভিতর ছোট দূরবীণে যাহাদিগকে সাধারণ নীহারিকা মনে হইত এমন আরও কতকগুলি কুণ্ডলিত নীহারিকা ধরা পড়ে। আরও পরে আলোকচিত্র (Photography) সাহায্যে দেখা গেল, প্রায় সমস্ত নীহারিকারই কুণ্ডলীর আকৃতি এবং যে নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র গ্যাসের মত নহে তাহাই কুণ্ডলী পাকানো। বর্ত্তমানে নীহারিকা গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়; ছায়া পথান্তর্গত (galactic) এবং ছায়াপথ বহির্ভূত (extragalactic)। ছায়াপথন্তর্গত নীহারিকা আবার দুই রকম—(১) উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল অবয়বহীন নীহারিকা (Diffuse nebulae), (২) গ্রহাকৃতি নীহারিকা (Planetary Nebulae)। আর ও জানা গিয়াছে ছায়া-পথ বহির্ভূত নীহারিকা সবই কুণ্ডলী পাকানো নহে; মোটামুটি শতকরা ৭৪-টি কুণ্ডলী পাকানো বটে। শতকরা ২৩-টি ডিম্বাকৃতি এবং অবশিষ্ট ৩-টি অনির্দ্দিষ্ট আকারের। প্রথমোক্ত নীহারিকা-গুলিকে ছায়াপথের নিকটে দেখা যায়; শেষোক্ত-গুলি যেন ছায়া পথকে এড়াইয়া চলে।

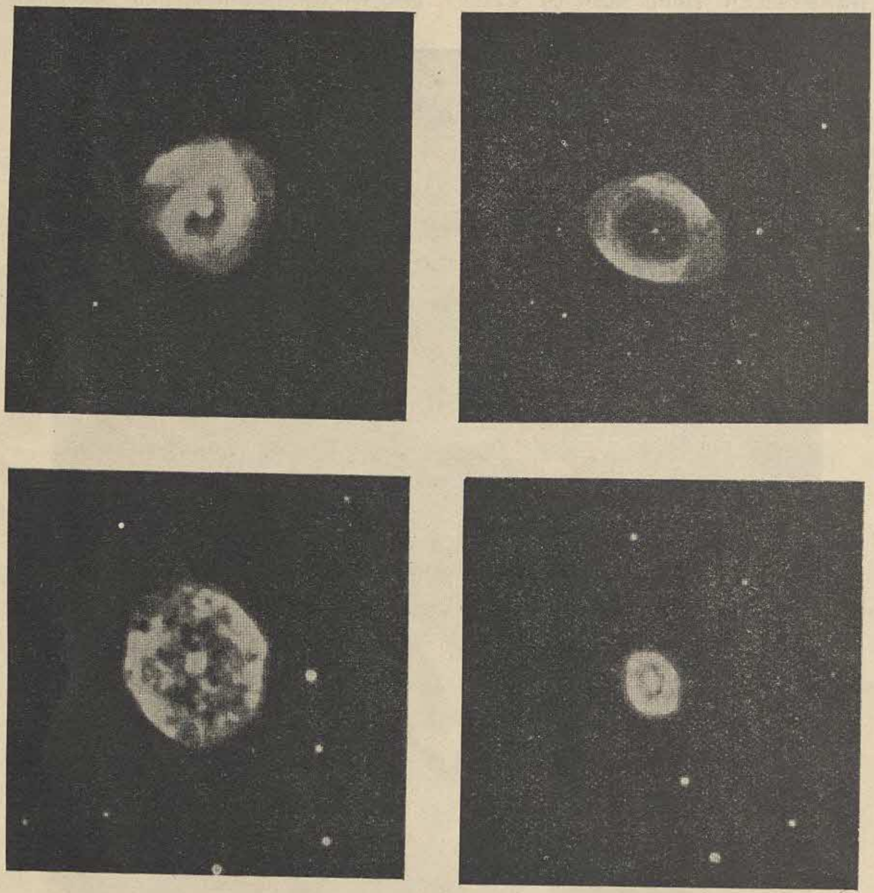
প্রথমে আমরা ছায়াপথান্তর্গত নীহারিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অবয়বহীন নীহারিকা-গুলি গ্যাস ও বস্তুকণা, ইহাদের বিশেষ কোন আকার নাই—এক একটি অনেক জায়গা জুড়িয়া আছে। ইহারা অতি শীতল এবং অতিমাত্রায় লঘু। ইহাদের মধ্যে বস্তুকণা এমনই বিরল যে, সমান আয়তনের বাতাস ও ইহাদের বস্তু লইলে বাতাসের বস্তুমান বা ঘনাঙ্ক (density) ইহাদের বহু কোটিগুণ হইবে। কালপুরুষ নক্ষত্র-মণ্ডলের (Orion) কোমরের তরবারির মধ্য-নক্ষত্রকে ঘিরিয়া একটি অতি বড় অবয়বহীন নীহারিকা আছে। উহা তরবারিস্থ সকল তারা এবং কোমরের তারাগুলিকে ব্যাপিয়া আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ইহার বস্তু বাতাস অপেক্ষা বহু কোটি গুণ হাল্‌কা। যখন পিছনের নক্ষত্রা-লোককে ঢাকিয়া রাখে অথবা নিকটস্থ তপ্ত তারকার দ্বারা আলোকিত হয় তখনই মাত্র অবয়বহীন নীহারিকার অস্তিত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়ে। জানা গিয়াছে, খুব উত্তপ্ত তারকা-গুলির সঙ্গেই ইহারা জড়িত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কতকগুলি নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র জ্বলন্ত গ্যাসের বর্ণচ্ছত্রের মত। অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যে ইহাদের চেয়ে ঢের বেশি অবয়বহীন নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র নক্ষত্রলোকিত গ্যাসের বর্ণ-চ্ছত্রের মত। নীহারিকাস্থ নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রই পাওয়া যায়, তবে তাহার মাঝে মাঝে কাল দাগ। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই নীহারিকা-গুলি নক্ষত্রালোকে আলোকিত হইয়া আমাদের নিকট উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়—যেমন চন্দ্র সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া উজ্জ্বল দেখায়—ঠিক সেই রকম। বহু আলোচনার পর বুঝিতে পারা গিয়াছে,—যে সকল নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র জ্বলন্ত গ্যাসের বর্ণচ্ছত্রের মত, তাহারা যে প্রকৃত পক্ষে জ্বলিতেছে তাহা নয়। ইহাদের সকলেই অত্যধিক উত্তপ্ত তারাদের সহিত জড়িত। এই তারার নিকট হইতে অতি সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ শুষিয়া লইয়া ইহারা নিজে ভিন্ন তরঙ্গের আলোক ছড়ায়। অনেক অবয়বহীন নীহারিকা কিন্তু চিরান্ধকারাবৃত। ছায়াপথে দক্ষিণক্রস নক্ষত্রের কাছে বহুদূরব্যাপী যে খালি জায়গা আছে তাহা এই রকম অন্ধকার নীহারিকা। আগে মনে করা হইত, এই রকম খালি জায়গাতে বাস্তবিকই কোন নক্ষত্র নাই। ছায়া-পথের তারাদের ভিতর দিয়া ইহারা যেন বহু দীর্ঘ

এক একটি সুঁড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের ভিতরদিয়া আমরা পিছনের চিরান্ধকার মহাশূন্যকে দেখি। কিন্তু পৃথিবীর দিকে এমন সোজা সুড়ঙ্গ সকল থাকিবার কোন কারণ বুঝা যায় না। বার্ণার্ড নামক জ্যোতিষী এই প্রকার প্রায় দুই শত খালি জায়গার সন্ধান পান। আলোকচিত্রের সাহায্যে তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করেন যে ইহারা নীহারিকা। মেঘ যেমন সূর্য্যালোক ঢাকিয়া রাখে ইহারা সেরূপ পিছনের নক্ষত্রালোক ঢাকিয়া রাখে। তাঁহার আলোকচিত্রে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পিছনের সূর্য্যালোকে একটুক্‌রা মেঘের কিনারা যেমন উজ্জ্বল দেখায় সেইরকম পিছনের নক্ষত্রালোকে এই নীহারিকার কিনারাগুলিও উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু নীহারিকার ঘনাঙ্ক নগণ্য—ইহার মধ্যে বস্তু-



কালপুরুষ নীহারিকা

কণা এতই বিরল যে, ইহার প্রায় সমস্তটাই ফাঁকা জায়গা। তবে কি করিয়া এই নীহারিকারা পিছনের নক্ষত্রালোক ঢাকিয়া রাখে? বৈজ্ঞানিক এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। আলোক ঢাকা দেওয়ার ক্ষমতা কেবল ঘনাঙ্কের উপরই নির্ভর করে না। একটা সীমা আছে যে পর্য্যন্ত বেশি। অবয়বহীন নীহারিকাগুলির দূরত্ব ২০০ হইতে ৪০০০ আলোক বৎসর। দূরত্ব জানিয়া ইহাদের আয়তন জানা যায়। এক একটির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আলো যাইতে শত শত বৎসর গত হয়। কালপুরুষ নীহারিকার ঘনমান (Volume) অন্ততঃ এক লক্ষ ঘন আলোকবৎসর।



গ্রহাকৃতি নীহারিকা

বস্তুকণা যত ছোট হইবে তাহার আলোক ঢাকিবার ক্ষমতা তত বেশি এবং বস্তুকণার ব্যাস যখন আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সমান তখন এই ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। তারপর বস্তুকণা যত ক্ষুদ্র হয়, বস্তু তত স্বচ্ছ হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যায়, অন্ধকার নীহারিকাগুলির মধ্যে আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সমান ব্যাসবিশিষ্ট বস্তুকণাই এইটিই ছায়াপথান্তর্গত নীহারিকা সমূহের মধ্যে বৃহত্তম এবং উজ্জ্বলতম।

গ্রহাকৃতি নীহারিকাগুলি গ্রহের মত কোন সূর্য্যের (অর্থাৎ নক্ষত্রের) চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় না, কিংবা তাহাদের ন্যায় আমাদের নিকটের বস্তুও নহে। দূরবীন দিয়া দেখিলে গ্রহগুলি আকারে বড় দেখায় কিন্তু তারাগুলি এত

দূরে যে তাহাঁদিগকে আকারে বড় দেখায় না, কিছু বেশি উজ্জ্বল দেখায় মাত্র। গ্রহাকৃতি নীহারিকাগুলি দূরবীনে গ্রহের মত দেখায়। ইহারা এক একটি প্রকাণ্ড গ্যাসের খোলস; অনেকের ভিতরেই একটি গুরুভার নক্ষত্র আছে। কোন কোনটিতে পর পর কয়েকটি খোলসই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত-গরম—সাধারণতঃ সূর্য্যের অন্তত দশগুণ। ইহারা সাধারণতঃ গোলকাকৃতি। ইহাদের দূরত্ব এবং আয়তন সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। মাঝারি রকমের একটি গ্রহাকৃতি নীহারিকার ব্যাস এক আলোকবৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে। ভান মানেন (Van Maanen) যে ২১টি গ্রহাকৃতি নীহারিকার আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের দূরত্ব গড়ে ৪০০০ আলোক-বৎসর বলিয়া তিনি মনে করেন। প্রায় দেড়শত গ্রহাকৃতি নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দূরবীনের দৃষ্টিসীমার ভিতরে আর কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহাকৃতি-নীহারিকা আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ আকৃতি এবং বর্ণচ্ছত্র আলোচনায় ইহারা সহজেই ধরা পড়ে। [চারিটি গ্রহাকৃতি নীহারিকার চিত্র দেওয়া গেল।

প্রথমেই বলা হইয়াছে বহুদিন হইতে একটি ধারণা চলিয়া আসিতেছিল যে, নীহারিকা নক্ষত্রের অতি শৈশবাবস্থা বা অবয়বহীন অবস্থা। নীহারিকা প্রায়ই নক্ষত্রের সঙ্গে জড়িত দেখা যায় বটে কিন্তু যে সমস্ত নক্ষত্রের সঙ্গে ইহারা জড়িত নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ নক্ষত্রগুলি বৃদ্ধাবস্থায়, শৈশবাবস্থায় নহে; সুতরাং এই মত টিকিতে পারে না। তখন কেহ কেহ মনে করিলেন, এক একটি নক্ষত্র তৈয়ার হইবার পর যে কিছু মালমশল্লা পড়িয়া থাকে তাহাই নীহারিকা। কিন্তু তাহা হইলে ত প্রত্যেক নক্ষত্রের আশে পাশেই নীহারিকা মিলিত। দেখা যায়, নীহারিকা অতিতপ্ত তারকা সমূহের সঙ্গেই জড়িত। এইজন্য অধুনা বহু পণ্ডিতের মত এই যে, অত্যধিক উত্তাপে এই অতিতপ্ত তারাগুলির শরীর হইতে গ্যাস ও বস্তুকণা বাহির হইয়া মেঘের আকারে বিরাজ করে এবং ইহাই নীহারিকা। সূর্য্যের বহির্ভাগে এই ব্যাপার নীহারিকার তুলনায় ছোটখাট ভাবে আমরা প্রত্যক্ষই করি। যে সমস্ত তারার কথা বলা হইল তাহাদের তাপ সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক বেশি।

ছায়াপথ বহির্ভূত নীহারিকা সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনার পূর্ব্বে 'আমাদের নক্ষত্র জগৎ' সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। সগ্রহ সূর্য্য, ছায়াপথান্তর্গত বহু কোটি তারা (যাহাদের প্রত্যেকেই এক একটি ছোট বড় সূর্য্য—কিন্তু আধুনিক মতে ইহাদের মধ্যে কয়েকটির ও গ্রহ আছে কিনা সন্দেহ) বহু নক্ষত্রপুঞ্জ, অবয়বহীন ও গ্রহাকৃতি নীহারিকা মিলিয়া বিশ্বের যে অংশ জুড়িয়া আছে তাহাই 'আমাদের নক্ষত্র জগৎ'। সার উইলিয়ম হার্শেল 'আমাদের নক্ষত্র জগতের' গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়া-ছিলেন যে, ইহা দেখিতে একখানি গোলাকৃতি চ্যাপ্টা বিস্কুটের মত কেন্দ্রের কাছে নক্ষত্রের ভিড় বেশি, যতদূরে যাওয়া যায় নক্ষত্র তত কম। তিনি মনে করিয়াছিলেন ইহার কেন্দ্র সূর্য্যের কাছাকাছি কোন জায়গায়। অধুনা বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—ছায়াপথে ধনুরাশির নিকটে যেখানে নক্ষত্রের ভিড় সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, সেখানেই আমাদের নক্ষত্রজগতের কেন্দ্র অবস্থিত। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩০,০০০ আলোক বৎসর। যেমন আমরা সৌরজগতের ভিতর আছি বলিয়া সৌরজগৎকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাই না, সেই রকম এই নক্ষত্রজগতের ভিতর থাকিয়া ইহাকে সমগ্র ভাবে দেখা সম্ভব নহে। প্রথম যখন গ্যালিলিও দূরবীন সাহায্যে দেখিলেন যে বৃহস্পতির চারিদিকে অন্য চারিটি অপেক্ষাকৃত ছোট জড়পিণ্ড (উপগ্রহ) ঘুরিয়া বেড়ায় তখন সগ্রহ সূর্য্যকে অর্থাৎ সৌরজগৎকে সমগ্রভাবে বুঝা সহজ হইল। হার্শেল দূরবীন যোগে কতকগুলি নীহারিকার গোল বিস্কুটের মত আকৃতি প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি বলিলেন, ঐ নীহারিকাগুলি আমাদের নক্ষত্রজগতের বাহিরে বহুদূরের এক একটি নক্ষত্রজগৎ হইবে এবং ভবিষ্যতে বড় দূরবীনে উহাদের মধ্যে পৃথক্ নক্ষত্র দেখা সম্ভব হইতে পারে, যেমন নাকি যে

ছায়াপথকে খালি চোখে ঝাপ্‌সা একটা ক্ষীণোজ্জ্বল বলয়ের মত দেখায়, গ্যালিলিও প্রথম তাহার মধ্যে দূরবীনে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্র সকল দেখিতে পাইয়াছিলেন। সত্যই আজ এই নীহারিকাগুলির কোন কোনটিতে বড় দূরবীনে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্র ধরা পড়িয়াছে এবং হার্শেলের ঘোষণার বহুবৎসর পরে গত ৩০-৩৫ বৎসরের ভিতর তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, ছায়াপথ বহির্ভূত নীহারিকাগুলি প্রত্যেকেই এক একটি নক্ষত্রজগৎ।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যেদিন প্রথম একটি নীহারিকার কুণ্ডলীর আকৃতি রসের (Lord Rosse) বড় দূরবীনে ধরা পড়ে, সেদিন জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ইহার পর স্বভাবতই এই প্রকার নীহারিকার সন্ধান চলিতে থাকে; ফলে আজ দূরবীন ও আলোকচিত্র সহায়ে বহুলক্ষ কুন্ডলিত নীহারিকার সন্ধান মিলিয়াছে। ছায়াপথে এরকম নীহারিকা দেখা যায় না। ইহাদের আলো সাধারণতঃ সাদা (ছায়াপথান্তর্গত নীহারিকার আলো প্রায়ই সবুজ)। আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের বর্ণচ্ছত্র নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ। তারপর একদিন জ্যোতির্বিদ্ ইহাদের দূরত্ব নির্ণয়ের উপায় অবগত হইলেন। দেখা গেল, অচিন্তিতপূর্ব্ব দূরত্বে ইহারা রহিয়াছে। অ্যান্ড্রোমিডা বা উত্তরভাদ্রপদমন্ডলে যে কুন্ডলিত নীহারিকা আছে উহা আমাদের নিকটতম। ইহার দূরত্ব নির্ণীত হইয়াছিল ১০ লক্ষ আলোক বৎসর। খালি চোখে ইহাকে পাতলা একটু উজ্জ্বল মেঘের মত দেখায়। ইহা ছাড়া আর কোন কুণ্ডলিত নীহারিকাই খালি চোখের গোচর নয়। মাউন্ট উইল্‌সন্ বীক্ষণাগারের শতইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট দূরবীনে উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকা এবং আরও কয়েকটি কুণ্ডলিত নীহারিকায় বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে; অবয়বহীন নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তিত্ব ও প্রকাশ পায়। এই সমস্ত কারণে সহজেই বুঝা যায়, কুণ্ডলিত নীহারিকা সমূহ আমাদের নক্ষত্র জগতের বাহিরে অতি দূরে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্রজগৎ। আমাদের নক্ষত্রজগৎকেও অন্য নক্ষত্রজগৎ হইতে একটি কুন্ডলিত নীহারিকা দেখাইবে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

ছায়াপথ বহির্ভূত নীহারিকার দূরত্ব নির্ণয় করা হয় এক অদ্ভূত উপায়ে। প্রকৃতি তাহার আপন মহিমায় নিজেই যেন জ্যোতির্বিদকে এই দূরত্বের সন্ধান দেয়। এক রকমের নক্ষত্র আছে যাহাদের আলো নির্দিষ্ট কাল পরে পরে বাড়ে এবং কমে ইহাদের নাম সিফাইড্ নক্ষত্র (Cepheid Variables)। কি কারণে বলা যায় না—ইহাদের পৃষ্ঠদেশ পর্যায়ক্রমে ক্রমশ স্ফীত হইয়া আবার সংকুচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে প্রতীয়মান উজ্জ্বলতার ও বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়। যাহা হউক, কোন নীহারিকা অর্থাৎ নক্ষত্রজগতে যদি এরকম নক্ষত্রের সন্ধান মিলে, তবে তাহার দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়। দেখা গিয়াছে, এই নক্ষত্রদের উজ্জ্বলতা ও পর্যায়কালের (Period) মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সমান দূরত্বে সমান পর্যায়কাল-বিশিষ্ট নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সমান এবং পর্যায়কাল যে অনুপাতে বেশি উজ্জ্বলতা সে অনুপাতে বেশি। আবার কোন উজ্জ্বল পদার্থকে যতদূরে নেওয়া যায় উজ্জ্বলতা তত কম দেখায় এবং উজ্জ্বলতা যে অনুপাতে কম দেখায় দূরত্ব তাহার বর্গানুপাতে বেশি। আমাদের নক্ষত্রজগতে ও সিফাইড্ তারা আছে, আবার আমাদের নক্ষত্রজগতের কোন জ্যোতিষ্কের দূরত্ব জানিবার অন্যান্য উপায়ও আছে। সুতরাং আমাদের নক্ষত্রজগতের কতকগুলি সিফাইড্ তারার দূরত্ব জানা। এখন অন্য যে কোন সিফাইডের, উজ্জ্বলতা ও পর্যায় কাল জানিয়া সমানুপাতের অংক সাহায্যে তাহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এই নক্ষত্র কোন নীহারিকায় অবস্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ও দূরত্ব জানা হইল। কিন্তু অল্পসংখ্যক নীহারিকাতেই এইরূপ নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। অধিকতর দূরের নীহারিকার দূরত্ব জানিবার জন্য নীহারিকাস্থ অত্যুজ্জ্বল তারকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অত্যুজ্জ্বল তারকার প্রকৃত উজ্জ্বলতা সর্ব্বত্রই

সমান ধরিতে পারা যায়। পূর্বোক্ত উপায়ে দূরত্ব জানা কোন নীহারিকার অত্যুজ্জ্বল তারকার প্রতীয়মান উজ্জ্বলতার সহিত অন্য নীহারিকার ঐরূপ তারকার প্রতীয়মান উজ্জ্বলতা তুলনা করিয়া ইহার দূরত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু এমন দূরেও ত নীহারিকা সকল আছে যাহাদের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল তারকা ও দেখা সম্ভব নয়। কতকগুলি নীহারিকা লইয়া এক একটি নীহারিকা পল্লী আছে। শেপ্লি (Shapley) ইহার নাম দিয়াছেন সুপারগ্যালাক্সি (Supergalaxy)। আলোকচিত্র-সাহায্যে এক একটি নীহারিকা-পল্লীর উজ্জ্বলতা নির্ণয় করা হয় এবং



কুণ্ডলিত নীহারিকা

উহাতে কতটি নীহারিকা আছে তাহা গণনা করিয়া প্রত্যেকের গড় উজ্জ্বলতা বাহির করা হয়। তারপর দূরত্ব জানা নীহারিকা পল্লীর একটি নীহারিকার গড় উজ্জ্বলতার সহিত তুলনা করিয়া পল্লীটির দূরত্ব জানা যায়। অধ্যাপক হাবল্ (Dr. Edwin Hubble) ছায়াপথ বহির্ভূত নীহারিকার দূরত্ব নির্ণয় বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছেন। তিনি মহাশূন্যে দশ কোটি আলোকবৎসর দূরে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার মাউন্ট প্যালোমারে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই নক্ষত্রজগতের দূরত্ব নির্ণয়ে এক নূতন আবিষ্কার হয়। দেখা গেল আগের দূরত্ব নির্ণয়ের মাপ-কাঠিতে একটা ভুল ছিল। বলা হইয়াছে



কুণ্ডলিত নীহারিকা (সপ্তর্ষিমণ্ডলে)

সিফাইড্ তারার সাহায্যেই প্রধানতঃ নীহারিকার দূরত্ব নির্ণয় করা হয়, কিন্তু সিফাইড্ তারা দুই শ্রেণীর—(১) স্বল্প পর্য্যায়কাল বিশিষ্ট (পর্য্যায়কাল ৬ হইতে ১৮ ঘন্টা) (২) দীর্ঘ পর্য্যায়কাল বিশিষ্ট; দীর্ঘ পর্য্যায়কালের সিফাইড্ তারা স্বল্প পর্য্যায়কালের তারার ৪ গুণ উজ্জ্বল। দূরত্ব নির্ণীত হইয়াছিল স্বল্প পর্য্যায় কালের সিফাইড্ তারাদের দূরত্বকে মাপকাঠি ধরিয়া। নীহারিকাতে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল দীর্ঘ পর্য্যায় কালের সিফাইড্ তারা। কিন্তু স্বল্প পর্য্যায় কালের একটি তারা ও তাহার দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত দীর্ঘ পর্য্যায় কালের একটি তারা সমান উজ্জ্বল দেখাইবে। সুতরাং বুঝা গেল নীহারিকার প্রকৃত দূরত্ব পূর্ব্ব নির্ণীত দূরত্বের দ্বিগুণ। তাহা হইলে উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার প্রকৃত দূরত্ব বিশ লক্ষ আলোক বৎসর। এইরূপ আমাদের নক্ষত্রজগতের বাহিরের প্রত্যেক নক্ষত্র-জগতেরই দূরত্ব পূর্ব্ব নির্ণীত দূরত্বের দ্বিগুণ।

পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছিল কন্যা রাশির কুন্ডলিত নীহারিকার দূরত্ব ৬০ লক্ষ আলোক বৎসর—পেগাসাস্ মন্ডলে একটির দূরত্ব ২ কোটি ৩০ লক্ষ আলোকবৎসর, সপ্তর্ষি মন্ডলে একটির দূরত্ব ৮২ কোটি আলোক বৎসর, মিথুন রাশিতে এইরূপ একটি নীহারিকার দূরত্ব ১৩২ কোটি আলোক বৎসর। ইহাদের সকলেরই দূরত্ব দ্বিগুণ ধরিতে হইবে। পূর্ব্বের মাপকাঠি অনুসারে মাউন্ট উইল্সনে অবস্থিত শতইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনের দৃষ্টি সীমা ৫০ কোটি আলোক বৎসর এবং দুইশত ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনের দৃষ্টিসীমা ১০০ কোটি আলোক বৎসর। মাপকাঠির ভুল আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুঝা গেল ইহাদের দৃষ্টি-সীমা যথাক্রমে ১০০ কোটি এবং ২০০ কোটি আলোক বৎসর। ইতিমধ্যেই বৃহত্তম দূরবীণে ১৩৬ কোটি আলোক বৎসর দূরে নীহারিকা অর্থাৎ নক্ষত্র জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কুন্ডলিত নীহারিকা ব্যতীত আর ও দুই রকমের ছায়াপথ বহির্ভূত নীহারিকা আছে। তন্মধ্যে ডিম্বাকৃতি বা গোলকাকৃতিগুলির মধ্যে গঠিত নক্ষত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহাদের কেন্দ্রের দিকে উজ্জ্বলতা বেশি; চারিদিকের প্রান্তভাগ সুস্পষ্ট নয়। কুন্ডলিত নীহারিকাগুলিতে কেন্দ্রপিন্ডের দুই বিপরীত দিক্ হইতে দুই বাহু কুন্ডলীর আকারে বাহির হইয়া গিয়াছে; সবগুলিরই বাহিরের দিকে গঠিত নক্ষত্রের চিহ্ন স্পষ্ট। কাহার ও কাহারও মতে ডিম্বাকৃতি নীহারিকাই কুন্ডলিত নীহারিকাতে পরিণত হয়। উত্তর ভাদ্রপদ নীহারিকার প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহার ডিম্বাকৃতি হইতে কুন্ডলী সম্যক্ পরিণতি লাভ করে নাই। ইহার বাহিরের দিকে গঠিত নক্ষত্রের সন্ধান মিলে কিন্তু কেন্দ্রের দিকে এরকম কিছু মিলে না। একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত, আমরা আজ উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার যে চেহারা দেখি উহা তাহার বিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের চেহারা। এই নীহারিকা হইতে বিশ লক্ষ বৎসর আগে যে আলো বাহির হইয়াছে তাহাই আজ আমাদের চোখে (এবং ক্যামেরা ফলকে) দৃষ্টির অনুভূতি জাগাইতেছে। নক্ষত্র-জগতের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে ইহা এমন কিছু দীর্ঘ সময় নহে। তবু ইতিমধ্যে কোনদিন যদি কোন কারণে উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকা ধ্বংস ও হইয়া গিয়া থাকে, সে বার্ত্তা আমাদের কাছে পৌঁছিবে তাহার ধ্বংসের বিশ লক্ষ বৎসর পরে। যে কুন্ডলিত নীহারিকা সুপরিণত তাহার কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের সন্ধান মিলে। আমাদের 'নক্ষত্র জগতের' নক্ষত্রগুলিও কুন্ডলীর আকারেই সজ্জিত এবং ইহা একটি সুপরিণত কুন্ডলিত নীহারিকা। অনির্দ্দিষ্ট আকারের নীহারিকা কুন্ডলিত নীহারিকারই পরিণতি বলিয়া অনুমান করা হয়; বলা বাহুল্য ইহার কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে, কুন্ডলিত নীহারিকাগুলি নিজ নিজ অক্ষরেখার উপর আবর্ত্তন করে—ইহাদের নক্ষত্র সমূহের গতিতে চক্রাকারে ঘূর্ণনের একটা মিল আছে। কিন্তু অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকাদের মধ্যে এরকম কিছু দেখা যায় না। তিন রকমের ছায়াপথ বহির্ভূত নীহারিকার মধ্যে ডিম্বাকৃতিগুলি

সর্বাপেক্ষা ছোট, কুন্ডলিতগুলি সর্বাপেক্ষা বড়। অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকাগুলির আয়তন এই উভয়ের মাঝামাঝি। 'আমাদের নক্ষত্রজগতের' আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, ইহার কেন্দ্রের নিকটে নক্ষত্র-সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রত্যেক সুপরিণত কুন্ডলিত নীহারিকা বা নক্ষত্রজগতেই যে এইরূপ, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। এই অত্যধিক নক্ষত্র সমাবেশকেই আমরা নীহারিকার উজ্জ্বলতম কেন্দ্রপিন্ডরূপে দেখি।

অধুনা দেখা গিয়াছে ছায়াপথ বহির্ভূত নীহারিকাগুলিকে আয়তন হিসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—সাধারণ এবং অতিকায়। সাধারণ নীহারিকাগুলির আয়তন মোটামুটি এইরূপ—ডিম্বাকৃতি নীহারিকার ব্যাস ৩০০০ আলোক বৎসর, অনির্দ্দিষ্ট আকারের নীহারিকার ব্যাস ১২০০০ আলোক বৎসর এবং কুন্ডলিত নীহারিকার ব্যাস ২০,০০০ আলোক বৎসর। অতিকায় কুন্ডলিত নীহারিকার ব্যাস ৩০,০০০ হইতে ১০০,০০০ আলোক বৎসর হইয়া থাকে; ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম—পৃথিবীর বৃহৎ লোকসংখ্যার তুলনায় কয়েকজন অভিজাতের মত। আমাদের নক্ষত্রজগৎ এবং উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকা এই উভয়েই অতিকায় শ্রেণীভুক্ত। সাধারণ এবং অতিকায় উভয়ের মধ্যেই বহু কোটি নক্ষত্র এবং নক্ষত্র গঠনোপযোগী বস্তু আছে। এখন সহজেই বুঝা যায়, এতদিন ইহাদের নীহারিকা বলিয়া কত খাটো করা হইয়াছে। আজ ইহাদের স্বরূপ অবগত হইয়াও এতদিনের ডাকনাম পরিবর্ত্তন করা চলে না—বহু দলিল পত্রে এই নামই চলিয়া আসিয়াছে।

উল্লেখ করা হইয়াছে, কুন্ডলিত নীহারিকাগুলি নিজ নিজ অক্ষরেখার উপর আবর্ত্তন করে। আমাদের নক্ষত্রজগতের এক আবর্ত্তন শেষ করিতে প্রায় ২২ কোটি বৎসর সময় লাগে। তবু এই আবর্ত্তনের ফলে বাহিরের দিকের নক্ষত্রগুলি সেকেন্ডে প্রায় ২২০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার আবর্ত্তন কাল প্রায় দুই কোটি বৎসর। একটি নক্ষত্রজগতের কোন নক্ষত্রের গতিবেগ এবং কেন্দ্র হইতে দূরত্ব জানিয়া উহার ভার নিরূপণ করা যায়। আমাদের নক্ষত্র-জগতের ভার সূর্য্যের একাদশ সহস্র কোটি (১১×১০^{১০}) গুণ। যদিও সূর্য্য অপেক্ষা গুরুভার নক্ষত্র আছে, সাধারণত নক্ষত্রের ভার সূর্য্যের অপেক্ষা কম। এই হিসাবে আমাদের নক্ষত্রজগতে পঞ্চদশ সহস্র কোটি (১৫×১০^{১০}) নক্ষত্র আছে।

এখন আমরা যে নীহারিকা পল্লীতে আছি তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। এই নীহারিকা পল্লীতে আমাদের নক্ষত্রজগৎ সহ অন্তত নয়টি নীহারিকা আছে (ছায়াপথের আবছায়ার আড়ালে আরও কয়েকটি থাকা সম্ভব)। ইহাদের মধ্যে ২টি ডিম্বাকৃতি, ৩টি কুন্ডলীপাকানো এবং ৪টি অনির্দিষ্ট আকারের। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে যদিও সমগ্র বিশ্বে অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকা অতি বিরল, তবু আমাদের পল্লীতেই ৪টি রহিয়াছে। (১) ডিম্বাকৃতি নীহারিকা দুইটি উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার প্রতিবেশী; ইহাদের কোনটিতেই নক্ষত্রের সন্ধান মিলে নাই। সুতরাং অত্যুজ্জ্বল কোন তারকা এখানে নাই অথবা থাকিলে ও বস্তুকণার মেঘের আড়ালে ঢাকা আছে। বর্ণচ্ছত্র পর্য্যালোচনায় ইহাদের মধ্যে কোন বায়বীয় (Gaseous) নীহারিকার ও সন্ধান মিলে না। (২) কুন্ডলিত ৩টির মধ্যে উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকা অপরিণত; ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে নানা রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং নক্ষত্র-পুঞ্জের সন্ধান মিলিয়াছে কিন্তু কোন বায়বীয় নীহারিকার অস্তিত্ব এ পর্যন্ত ধরা পড়ে নাই। দ্বিতীয় কুন্ডলিত নীহারিকাটি (M_{33} in the Constellation of Triangulum) পরিণত: ইহার কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা সর্বপ্রকারে 'আমাদের নক্ষত্রজগতের' মত, তবে এত বড় নহে। 'আমাদের নক্ষত্রজগতে' যত-রকম উজ্জ্বল তারকা আছে, ইহাতে সেই সকল প্রকার তারারই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণচ্ছত্র পর্য্যালোচনায় বায়বীয় নীহারিকার অস্তিত্বও ধরা পড়ে। 'আমাদের নক্ষত্রজগৎ' যে একটি

কুন্ডলিত নীহারিকা তাহা বুঝিতে হয় পরোক্ষ-ভাবে। যেহেতু ইহার গঠন পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায়, ইহা চ্যাপ্টা আকারের, সেই হেতু ইহা ডিম্বাকৃতি জাতের নয়। আবার ইহার সুনির্দিষ্ট চক্রাকারে ঘূর্ণন দেখিয়া বুঝা যায়, ইহা অনির্দিষ্ট আকারের ও নয়। (৩) 'আমাদের নক্ষত্রজগৎ' হইতে দূরে (এ দূরত্ব উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার দূরত্ব অপেক্ষা কম) দক্ষিণ আকাশ মেরু প্রদেশে অর্থাৎ ধ্রুবতারার বিপরীত দিকে দুই খন্ড নক্ষত্র-মেঘ আছে—যেন ছায়াপথেরই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ। ইহাদিগকে বলা হয় ম্যাগিলন মেঘ।* অধুনা বুঝিতে পারা গিয়াছে, ইহারা দুইটি অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকা। ইহাদের নক্ষত্রগুলির গতিবিধির মধ্যে মিলিতভাবে আবর্ত্তনের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। ইহারা আমাদের নিকটতম নক্ষত্রজগৎ বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে অনেক খবরই জানা সম্ভব হইয়াছে। এই দুইটিতে ৩০০০ এর অধিক সিফাইড্ তারা এবং আর ও নানা প্রকার উজ্জ্বল তারকা, নক্ষত্র-পুঞ্জ এবং বায়বীয় নীহারিকা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বড় মেঘটিতে দোরাদাস (S. Doradus) নামে একটি তারা আছে; বিশ্বে ইহাপেক্ষা উজ্জ্বলতর কোন তারার অস্তিত্ব এ-পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। অপর দুইটি অনির্দ্দিষ্ট আকারের নীহারিকার দূরত্ব অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার দূরত্বের প্রায় সমান। ইহারা আয়তনে অনেক ছোট।

কুন্ডলিত নীহারিকা আমাদিগকে বিশ্বের বিশালতার সন্ধান দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহা নক্ষত্রের উৎপত্তি তত্ত্বেরও একটি আভাস দেয়। অনুমান করা যায়, সৃষ্টির আদিতে বস্তুকণা সব নিঃসম্পর্কভাবে বিশ্বময় ছড়াইয়া ছিল। ইতস্ততঃ চলা-ফেরার ফলে কোথাও কোথাও কতকগুলি এক জায়গায় মিলিত হয়। ক্রমশ আরও বস্তুকণা সব আকৃষ্ট হইয়া স্থানে স্থানে প্রকান্ড গোলকাকৃতি জড়পিন্ড সমূহের সৃষ্টি হয়, এক একটা জড়পিন্ডের বস্তুকণা এক একটা নক্ষত্র-জগৎ গঠনের উপযোগী। এই বৃহৎ জড়পিন্ড-গুলি সংকুচিত হইবার কালে ইহাদের মধ্যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। অন্য জড়পিন্ড নিকট দিয়া যাইবার সময় দুই বিপরীত দিক জোয়ারের মত স্ফীত হইয়া উঠে। জড়পিন্ডের সান্নিধ্য যত বাড়িতে থাকে, ততই স্ফীতি বাড়িয়া বর্ত্তুলাকারে পরিণত হয়। তারপর দ্বিতীয় জড়পিন্ড দূরে চলিয়া গেলে দুই বর্ত্তুলাকৃতি ঘুরিতে ঘুরিতে বস্তুকণা জমাট হইয়া নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিয়া চলে। সকল জড়পিন্ডের এই পরিণতি না হওয়াই সম্ভব। তাই আমরা ডিম্বা-কৃতি বা গোলকাকৃতি নীহারিকা দেখিতে পাই।

বর্ণচ্ছত্র পর্য্যালোচনায় আর একটি খবর অবগত হওয়া যায় যে, ছায়াপথ বহিভূর্ত নীহারিকাগুলির একটি বিশেষত্ব—ইহারা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে, আপেক্ষিক-বাদ (Theory of Relativity) মতে নক্ষত্র-জগৎগুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্য যে কোন নীহারিকা বা নক্ষত্র-জগৎ হইতে দেখাইবে—'আমাদের নক্ষত্রজগৎ' উহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িতেছে। বিশ্ব স্ফীত হইতেছে বলিয়াই নক্ষত্রজগৎগুলির পরস্পর দূরত্ব বাড়িতেছে। ছবি বা চিহ্ন আঁকা রহিয়াছে এমন একটি খেলনার বেলুনকে ফুলাইলে ছবি বা চিহ্নগুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া যায়। বেলুনের পৃষ্ঠদেশ দুই আয়তনের—ইহা স্ফীত হইতেছে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ বিশিষ্ট তিন আয়তনের দেশে (Space)। বিশ্বের পৃষ্ঠদেশ তিন আয়তনের দেশ (Space) এবং সেখানে নক্ষত্রজগৎ সমূহ রহিয়াছে—ইহা স্ফীত হইতেছে চার আয়তনের দেশ-কালে (Four Dimentional Space-time)। বিশ্বগোলকের ব্যাসার্দ্ধ হইতেছে কাল; কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে আর বিশ্ব স্ফীত হইতেছে। ধারণা করা শক্ত হইলেও গণিত শাস্ত্র ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

দূরবীনের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা

*ফার্ডিনান্ড ম্যাগিলন সমুদ্র পথে ভূপ্রদক্ষিণ কালে, বহু নক্ষত্র-সমাবেশ হেতু উজ্জ্বল দুই খন্ড মেঘের মত ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁরই নামানুসারে ইহাদের নাম Magellanic Clouds.

মহাশূন্যে দূর হইতে দূরকে দেখিতে পাইতেছি। এখন এই প্রশ্ন মনে জাগে—এই যে নক্ষত্রজগৎ-সমন্বিত বিশ্ব ইহা কি সসীম না অসীম, সান্ত না অনন্ত? আর নক্ষত্রজগৎগুলির পরস্পর দূরত্ব সে আবার যাত্রা স্থানেই ফিরিয়া আসিবে। আমরা বলিতে পারি ভূপৃষ্ঠ অসীম কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অনন্ত নয়; ইহা তিন আয়তন বিশিষ্ট পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং ইহার পরিমাণ



এন্ড্রোমিডা নীহারিকা
(আমাদের নিকটতম একটি নক্ষত্র জগৎ)

যে বাড়িয়া চলিয়াছে ইহারই বা পরিণতি কোথায়? ভূপৃষ্টের উপর কেহ যদি একদিকে চলিতে থাকে, তাহার চলার পথ কোন সীমায় গিয়া আটকাইয়া পড়েনা সত্য কিন্তু এ-যাত্রা তাহাকে অনন্তের দিকে লইয়া যাইবে না—একদিন (ক্ষেত্রফল) নির্দিষ্ট। আমাদের যে পূর্বপুরুষ পৃথিবীপৃষ্ঠকে সমতল মনে করিতেন, যিনি পৃথিবীর গোলত্ব ধারণা করিতে অক্ষম ছিলেন, তাঁর কাছে ইহা খুবই আশ্চর্য্য ঠেকিত সন্দেহ নাই। আপেক্ষিকবাদ মতে এই বিশ্বও অসীম

কিন্তু অনন্ত নহে অর্থাৎ নক্ষত্রজগৎগুলি যেই দেশে (Space) আছে, তাহার পরিমাণের (ঘনফল) একটা অন্ত আছে। ইহা চার আয়তন বিশিষ্ট আমাদের দেশকালকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং স্ফীত হইতেছে অর্থাৎ ইহার ঘনমান বাড়িয়া চলিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপ যদি ইহাই হয় তবে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া ত ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ চিরকালই ঠকিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর গোলত্ব, ইহার সূর্য্য পরিক্রমা এবং আপন মেরুদন্ডের উপর আবর্ত্তন—একদিন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল না, এমন কি বুদ্ধিগ্রাহ্যও ছিল না। পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের ঘুরপাক খাওয়াকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সত্য মনে করিয়া আসিয়াছিলেন—আজ আমরা জানি এত বড় অসত্য আর নাই। সেইরূপ আজ যে সত্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কঠিন, আমাদের পরবর্ত্তীরা যখন অধিকতর জ্ঞানসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে তখন তাহাদের পক্ষে উহা হয়ত সহজ হইবে। আর বিশ্ব যে স্ফীত হইতেছে, এই স্ফীতি একটা সীমায় পেঁাছানর পর ইহা আবার সংকুচিত হইবে অথবা কালের কোলে ফাটিয়া পড়িবে—খেলার বেলুনেরই মত, এ-প্রশ্নের উত্তর মানুষ কোন দিন পাইবে কিনা বলা যায় না।

বিশালতাকে ক্ষুদ্রতায় সংকুচিত করিলে কি রকম দেখাইবে তাহার একটি চিত্র উপস্থাপিত করিব। ধরা যাক্, কোন ঐন্দ্রজালিক বিশ্বকে সংকুচিত করিয়া এমন অবস্থায় আনিয়াছে যে আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস এক শত মিটার (১১০ গজ)। তখন আমাদের সূর্য্য ঠিক অণু-প্রমাণ হইয়া পড়িবে—মনে রাখিতে হইবে সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ১৩ই লক্ষ গুণ। আমাদের নক্ষত্র জগতের দশ সহস্র কোটি তারার অধিকাংশই এখন এক একটি অণু। সূর্য্য হইতে তাহার নিকটতম তারার দূরত্ব অর্দ্ধ সেন্টিমিটার মাত্র। এই সংকুচিত বিশ্বে এন্ড্রোমিডা নীহারিকার দূরত্ব আমাদের নক্ষত্র-জগত হইতে ২০০০ মিটার; আর বর্ত্তমান বৃহত্তম দূরবীণের দৃষ্টি সীমা ২০০০ কিলো মিটার (১২ই শত মাইল)। এই দেশে আলো সহস্র বর্ষে এক মিটার পথ অতিক্রম করিবে।

মানুষ ছিল আত্ম কেন্দ্রিক। সে মনে করিত—তাহাকে এবং তাহার পৃথিবীকে ঘিরিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ঘুরিতেছে তাহাকে তাপ, আলো দিবার প্রয়োজনে। তারপর সে জানিল পৃথিবী ও বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্, নেপচুন গ্রহ সকলে এক সূর্য্য পিতারই সন্তান এবং সূর্য্যেরই চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহার পর মানুষ অবগত হইল, তারাদের প্রত্যেকেই দূরের, সুদূরের এক একটি সূর্য্য এবং সূর্য্য তারাদেরই এক ভ্রাতা মাত্র, কিন্তু সে মনে করিয়াছিল এই তারার জগতে সূর্য্য রহিয়াছে কেন্দ্রে। মানুষের এই অহমিকাও চূর্ণ হইয়াছে যখন সে জানিতে পারিল সূর্য্য নক্ষত্র জগতের কেন্দ্র হইতে বহু দূরে। পরিশেষে আজ মানুষ অবগত হইয়াছে—বিশ্ব আমাদের নক্ষত্র জগতের মত বহু কোটি নক্ষত্র জগৎ লইয়া গঠিত; আয়তনের দিক দিয়া, বয়সের দিক দিয়া ছোট বড় হইলেও ইহাদের সকলের সমান অধিকার।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মানুষের সম্বন্ধে এই উক্তি "ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্ত্তমান, বিরাট বিশ্ব সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছ ঘেঁষা বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখ্‌ছে—এর চেয়ে আশ্চর্য্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই,......একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে ভূমা বাহিরের আয়তনে নয় পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরি-পূর্ণতায়।"

—বিশ্বপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ভারতীয় সংস্কৃতি

বহুদিন থেকে এদেশে প্রচলিত কথা আছে যে যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ কালের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সমাজ সংগঠন দেখলেই বোঝা যায় কথাটি কত সত্য। নানা দেশের নানা জাতি বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা বয়ে নিয়ে এদেশে এসে মিলেছে। যাঁরা নৃ-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা বলেন যে দুনিয়ায় অমিশ্র বা বিশুদ্ধ জাতির নমুনা মেলে না। আমরা যাদের ককেশিয় বা মঙ্গোল বলি, অথবা উপজাতিদের মধ্যে নর্ডিক বা শ্লাভদের মধ্যে তফাৎ করবার চেষ্টা করি, প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই নানা ধরণের মানুষের মেলামেশার ফল। নীল রক্তের অহঙ্কার তাই কাউকেই সাজেনা। সংস্কৃতির বেলায়ও ঠিক তাই—সমস্ত সংস্কৃতিই বিভিন্ন ধারার সংঘাত ও সমন্বয়ের ফলে গড়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে যে সংস্কৃতি যত সমৃদ্ধ তার মধ্যে তত বেশী বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতার পরিচয় মিলবে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির যত বৈচিত্র্য, বোধ হয় অন্য কোথাও তার তুলনা মেলে না। ভারতীয় সংস্কৃতি কেবল পাঁচমিশেলী নয়, তাকে দশ বা পনেরো-মিশেলী বললেও অন্যায় হবে না।

ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাসে কয়েক হাজার বছরের পরিচয় মেলে, কিন্তু তারও আগে যে অলিখিত ইতিহাসের যুগ, সেই আদিকালেই সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবাসীর আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল। মহেনজোদারো এবং হারাপ্পার সভ্যতার যে সমস্ত নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা দেখে মনে হয় যে মধ্যপ্রাচ্যের সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সে যুগের ভারতবাসীর যোগাযোগ ছিল। মহেনজোদারোর বাসিন্দারা কোন্ জাতির লোক, কোথা থেকে তাঁরা ভারতবর্ষে আসে সে সব কথা আমরা আজও সঠিকভাবে জানি না। একটি কথা কিন্তু জোর করে বলা যায় যে প্রাক্-মহেনজোদারো সভ্যতার ভিত্তিতেই সেকালের মহেনজোদারো এবং হারাপ্পার সুপরিণত সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

আর্য্য অভিযাত্রীরা ভারতবর্ষে কবে আসতে সুরু করেন, তারও সঠিক বিবরণ জানা নেই। বহু শতাব্দী ধরে দলে দলে আর্য্য অভিযাত্রী এদেশে এসেছেন মনে হয়, কিন্তু তাঁরা যখন এদেশে এলেন, তার আগেই এদেশে সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল একথা মনে করবার কারণ রয়েছে। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার যে বিবরণ তা থেকেই বোঝা যায় যে নাগরিক সভ্যতায় আর্য্যদের তুলনায় অনার্য্যই সেদিন বেশী অগ্রসর ছিলেন। মহাভারতের যুগেও আমরা পড়ি যে যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের পত্তন করলেন, তখন ময়দানবের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ময়দানব নতুন নগরীতে যে সব ব্যবস্থা করেছিলেন, সেকালে আর্য্য রাজারা

পর্য্যন্ত তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে বারবার অপদস্থ হয়েছেন। এসব দেখে মনে হয় যে ভারতবর্ষের অনার্য্য আদিবাসীরা যে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছিলেন, তা বহুক্ষেত্রেই যাযাবর আর্য্য অভিযাত্রীদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল।

মহেনজোদারোর বাসিন্দারা যে দ্রাবিড় বা আদিবাসী, তার কোন প্রমাণ নাই। তাদের বহিরাগত মনে করাই বোধ হয় বেশী যুক্তিযুক্ত। তাই বলা চলে যে রামায়ণ মহাভারতের যুগেই ভারতবর্ষে সভ্যতার ত্রিবেণী সঙ্গমের পরিচয় মেলে। সে সভ্যতার প্রাচীনতম ধারা দ্রাবিড় ও আদিবাসীদের দান। তার সঙ্গে মিশেছে মহেনজোদারো ও হারাপ্পার পরিণত সভ্যতার ধারা, এবং সকলের শেষে এসে মিলল আর্য্য-অভিযাত্রীদের বহিরাগত সংস্কৃতির উপাদান। ত্রিবেণী সঙ্গম বল্লেও বোধ হয় সেকালের ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্যের পূর্ণ ধারণা হয় না। দ্রাবিড় এবং অন্য আদিবাসীদের সংস্কৃতির মধ্যেও পার্থক্যের বহু পরিচয় মেলে। ভারতবর্ষের এই আদিম সভ্যতাকে একধর্ম্মী সংস্কৃতির বদলে বহু সংস্কৃতির সমাবেশ বল্লেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। মহেনজোদারো ও হারাপ্পায় যে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, তা-ও বহুযুগ ধরে বহু বিস্তৃত ভূখন্ডে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বলে তার মধ্যেও বৈচিত্র্যের অবকাশ কম নয়। আর্য্য অভিযাত্রীদের বেলায় ও ঠিক সেই একই ধরণের পরিণতির পরিচয় মেলে। বিরাট জনপ্রবাহের অংশ হিসাবে আর্যেরা তিন ধারায় ইরাণ, ভারতবর্ষ এবং ইউনানে ছড়িয়ে পড়েন। শতাব্দিব্যাপী সে অভিযানে ভারতবর্ষেও আর্য্য-প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তার ফলে স্থানীয় সভ্যতা এবং জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ ও সমন্বয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বর্ত্তমান কালের পৃথিবীতে চলাচলের যে বিস্ময়কর উন্নতি, তার ফলে স্থানকালের পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এল। কিন্তু পুরাকালের মানুষও ঘরে বসে থাকেনি। যাতায়াতের সমস্ত বাধা ও বিপদ সত্ত্বেও এক দেশের মানুষ অন্য-দেশে গিয়েছে, এক জাতির বিশ্বাস ও সংস্কারের ছায়া অন্য জাতির উপর পড়েছে। বৌদ্ধ মতবাদ প্রথমে কবে ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তা বলা কঠিন, কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারা যে অতি প্রাচীন কালেই মিশরে এবং সম্ভবত ইয়োরোপে পোঁছেছিল, এ-কথা মনে করবার কারণ আছে। ইউনানী দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাচ্য দেশে এসেছিলেন, কিম্বদন্তিতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের রচনায় ও তার ইঙ্গিত মেলে। পিথাগোরাস নিজে ভারতবর্ষে এসেছিলেন একথা প্রমাণ করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর রচনা থেকে একথা বোঝা যায় যে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে কোথাও কোন সূত্রে তার পরিচয় হয়েছিল। প্লেটোর সম্বন্ধে ও এধরণের কথা বলা চলে। আলেকজান্ডারের যুগ যে ইউনান ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, এ কথা তো সবাই জানে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম এসিয়ায় বুদ্ধের বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্যই অশোক দেশ বিদেশে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথাও তাঁরা এ সব দেশে প্রচার করেছেন। যেখানেই বিভিন্ন দেশের মানুষ পরষ্পরের সংস্পর্শে আসে সেখানেই সংস্কৃতির বিনিময় অনিবার্য্য। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে পদার্থ জগতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমান হতে বাধ্য। ভাব জগতে বিভিন্ন শক্তি ও ধারণার আদান প্রদান বোধ হয় আরো বেশী ব্যাপক ও কার্য্যকরী।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে তাই দুতিন অর্থে মিশ্র সংস্কৃতি বলা চলে। টানা ও পোড়েনের সুতো মিলিয়ে কাপড় বোনা হয়। দ্রাবিড় টানার সঙ্গে আর্য্য পোড়েনের সংমিশ্রণে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি রচিত হয়েছিল একথা বলা অন্যায় হবে না। শুধু তাই নয়। দ্রাবিড় ও আর্য্য অবদানের সমন্বয়ে কাপড়ের যে জমিন তৈরী হল, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নানা দেশ ও নানা সভ্যতা থেকে তার উপর নক্সা আঁকবার উপাদান এল। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইউনানী এবং পশ্চিম এসিয়ার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের তবু খানিকটা ধারণা আছে, কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের

প্রতিবেশীরা কি ভাবে ভারতীয় সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছেন তার বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এ-সব অঞ্চল থেকে যে অনেক জিনিষ আমরা পেয়েছি, সে সম্বন্ধে কিন্তু সন্দেহ করা চলে না। বহু শতাব্দি ধরে ব্রহ্মদেশ, মলয়, শ্যাম, সুমাত্রা-যব দ্বীপপুঞ্জ এবং কম্বোজ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এ-সমস্ত দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ এত স্পষ্ট যে এ-সমস্ত অঞ্চলকে কেউ কেউ বৃহত্তর ভারত বলে থাকেন। সাংস্কৃতিক প্রভাব কিন্তু একরোখা হতে পারেনা, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাতে দেওয়া নেওয়ার এবং নেওয়ার প্রায় সমান পরিচয় মেলে। যেখানে একপক্ষ নিজেকে সকল-ভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অন্যপক্ষ তা মেনে নেয়, সেখানেও তথাকথিত হীনপক্ষের প্রভাব গোচরে অগোচরে ক্ষমতাদর্পী পক্ষকে অভিভূত করে। প্রায় দুশো বছর ধরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইয়োরোপিয় ও নিগ্রো অধিবাসীর মধ্যে এ-ধরণের সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিগ্রোদের গান বাজনা নাচের নানা ভঙ্গী, বিশ্বাস ও আচারের বিচিত্র প্রকাশ আমেরিকার শ্বেত সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং ধীরে ধীরে ইয়োরোপকেও অভিভূত করছে। বাণিজ্য, রাজ-নীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ার যে সম্বন্ধ, তার ফলা-ফলের সকল কথা আমরা জানিনা, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি, ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠান এবং স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে—শিল্পে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের যে পার্থক্য, তার অন্তত একটী কারণ এই সম্পর্ক ও দানপ্রতিদানের মধ্যেই মিলবে, একথা মনে করা বোধ হয় অন্যায় নয়।

ভারতবর্ষে মুসলমান আসবার আগেই ভারতীয় সংস্কৃতি নানা রীতি ও প্রভাবের সংমিশ্রণের ফলে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। পার্থিব ও অপার্থিব দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা সেকালের ভারতবর্ষে পাই। নিরীশ্বরবাদী, একেশ্বরবাদী এবং বহু ঈশ্বরবাদী নানা ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ নিজের কোলে স্থান দিয়েছে, তাই লোকশ্রুতি বলে যে ভারতবর্ষের বিশ কোটী লোকের ত্রিশ কোটী দেবতা। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের বুদ্ধ কোন উত্তর দেন নি, উপনিষদের ঋষি ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হয়ে অপূর্ব্ব ভাষায় ভগবৎ মহিমা প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে কারুর দানকেই আমরা অবহেলা করতে পারি না।

এ-কথাও অনেকে ভুলে যান যে মুসলমান যেদিন ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে প্রথম দেখা দিলেন, সেদিন তাঁরা বিজেতা বা নৃপতির ভূমিকায় আসেন নি। নাবিক এবং বণিক হিসাবেই আরব দেশের মুসলমান প্রথম এদেশে এলেন। মহম্মদ বিনকাশিম অষ্টম শতকের গোড়ায় সিন্ধুদেশ জয় করেন, কিন্তু তার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই চীন সমুদ্রে বাণিজ্য করবার পথে আরব জাহাজ যে-সব বন্দরে থামত, মালাবার উপকূলের সে-সব জায়গায় আরব নাবিক বণিকের ছোট বড় অনেক উপনিবেশ গড়ে উঠে। মুষ্টিমেয় মুসলমান সওদাগর সে অঞ্চলে কি রকম প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন, কালিকটের শেষ রাজার কাহিনী থেকেই তা বোঝা যায়। কিংবদন্তী বলে যে কালিকটের শেষ রাজা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে যখন হজ করতে মক্কা চলে যান, তখন তাঁর প্রতি-নিধি হিসাবে জামোরিণকে সিংহাসনে বসিয়ে যান। একথাও বলা হয় যে মোপলা কথাটী সেকালের আরব বণিকের মর্য্যাদার নিদর্শন হিসাবে বেঁচে আছে। কয়েক শতাব্দি ধরে জামোরিণের অভিষেকের সময় একজন মোপলা এসে তাঁকে বরণ করতেন। এ-সমস্ত বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে সামরিক বা রাষ্ট্রিক আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই সেকালের মুসলমান ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপিত করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা যে সিন্ধুদেশের রাজা আরব নাবিক ও বণিকদের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে পারেননি বলেই মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে-ছিলেন।

"ইন্ডিয়ান হেরিটেজ" (বা ভারতীয় উত্তরাধিকার) বইখানিতে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির


"চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীতরব
চারিদিকে সুখ আর হাসি
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধআধ বুলি
চারিদিকে স্নেহ প্রেম রাশি!"
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপর ইসলামের প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি বলে এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না। এখানে শুধু এইটুকু বল্লেই চলবে যে ইসলামের আবির্ভাবের পরে ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগ এবং স্তরে রূপান্তর ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে সে রূপান্তর এত সূক্ষ্ম অথচ সুদূর প্রসারী যে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। হাজার বছরের সম্বন্ধের ফলে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের সংগঠন এবং চিন্তাধারা দুই-ই বদলেছে। ভারতীয় মুসলমানকে দেখলেই ভারতীয় বলে চেনা যায়, অন্যদেশের মুসলমানের সঙ্গে তাকে ভুল করা চলে না। প্রায় চারশো বছর আগে তা লক্ষ্য করে এদেশের মুসলমানকে বাবর হিন্দুস্থানী মুসলমান বলে অভিহিত করেছিলেন। আধুনিক কালের হিন্দুও ঠিক সেই ভাবে প্রাচীনকালের হিন্দুর থেকে স্বতন্ত্র। সাম্প্রতিক হিন্দুসমাজের সবচেয়ে গোঁড়া এবং রক্ষণশীল ব্যক্তিও প্রাক-মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজে সহজে খাপ খাবেন না। এক কথায়, হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, আধুনিক কালের ভারতবাসী একই উত্তরাধিকার কমবেশী পেয়েছেন বলে প্রাচীন কালের হিন্দু অথবা মধ্যযুগের অভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

এ-দেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা-বোধ ও সাদৃশ্য যে আরো গভীর হয়নি, তার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে এদেশে আবেগের স্তরেই সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে, বুদ্ধির স্তরে সে সমন্বয় আজো অসম্পূর্ণ। যাঁদের সত্য বোধ গভীর, মরমী হৃদয়ের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় তাঁরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মবন্ধন অতিক্রম করে সমস্ত আচার ব্যবহারের পিছনে সত্যের ঐক্যকে অনুভব করেছেন। মধ্য যুগের সাধু সন্তেরা তাই ধর্ম্মের খোলসে ভোলেন নাই, তাঁদের উপলব্ধিতে মানব-মনের গহন অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে যাঁরা সরল ঘরোয়া জীবন যাপন করেন, তাঁরাও প্রতিদিনের মেলামেশার মধ্যে পরষ্পরকে সয়ে থাকতে শিখেছেন, সহজভাবে প্রীতিবিদ্বেষকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার কোন দার্শনিক ভিত্তি খোঁজেননি। সাধুসন্ত বা সাধারণ মানুষ দুইয়ের বেলায়ই কিন্তু সংস্কৃতির সমন্বয় কেবল মাত্র আবেগের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে বলে সে সমন্বয় সর্ব্বদা কায়েমী হয় নি। আবেগের প্রাবল্যে কঠিনতম বাধা ও অকস্মাৎ দূর হয়ে যায়, কিন্তু দিনের পর দিন একটানা জীবন যাপনের জন্য আবেগের চেয়ে বুদ্ধির সমন্বয় বেশী জরুরী। আবেগ জোয়ারের টানে কখনো ফুলে উঠে, কখনো ভাটার নদীর মতন স্তিমিত হয়ে পড়ে। আবেগের স্রোতে যখন মন্দা পড়ে, তখন সহজ বাধাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে এরকম তীব্র অনুভূতি বা ঐক্য বোধ হয় না, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে সে সমন্বয় সাধিত হয়, তার স্থৈর্য্য এবং স্থায়িত্ব অনেক বেশী। ভারতবর্ষে দর্শন ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ধারার সমন্বয় হয়নি বলে এদেশের পন্ডিত ও দার্শনিক ভারতীয় সংস্কৃতির সমগ্রতাকে বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। যাঁরা এদেশে সংস্কৃতি শিখেছেন, তাঁরা সংস্কৃতই শিখেছেন। ঠিক তেমনি আরবী ফারসীতে ফাজেল মৌলবী সংস্কৃতের ধার ধারেন নাই। মোগল আমলে ফৈজী বা দারাশিকোই, অথবা বর্ত্তমান কালে রাজা রামমোহন একথার ব্যতিক্রম, কিন্তু এ-রকম ক্ষণজন্মা মনিষীর কথা ছেড়ে দিলে ভারতীয় পান্ডিত্যের ধারা আজো প্রায় সর্ব্বত্রই এক। দেশদর্শী, একভাষা নির্ভর, একথা বলা অন্যায় হবে না।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বহুমুখী এবং বিচিত্র ছিল, একথা আগেই বলেছি। মধ্যযুগে, আরব পারসিক ও তুর্কী সংস্কৃতির ধারা ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আরো বিচিত্র ও ঐশ্বর্য্য-বান করে তোলে। মধ্যযুগের শেষে এদেশে ইয়োরোপের আবির্ভাবের ফলে নতুন ধরণের চিন্তাধারা, নতুন জীবনদৃষ্টি এবং নতুন সমাজ-সংগঠনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। প্রথম সংস্পর্শের আকস্মিকতা দূর হবার আগেই সামরিক সংঘর্ষের ফলে ইয়োরোপ ভারতবর্ষে বিজয়ীর রূপে দেখা দিল। যুদ্ধক্ষেত্রে

ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠতার ফলে তখন অনেকেরই মনে হল যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বোধ হয় ইয়োরোপ শ্রেষ্ঠ। ফলে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসের পুনর্বিচার সুরু হল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী এদেশের বহুমনিষীকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ইয়োরোপের সংস্পর্শ ও সম্পর্কের ফলে এম্নিতেই ভারতবর্ষে বহু পরিবর্ত্তন আসত, কিন্তু একটী বিশেষ কারণে সে পরিবর্ত্তনের ধারা বিপ্লবকর মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সেদিন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং উৎপাদন পদ্ধতির নব নব বিকাশের ফলে ইয়োরোপের জীবনের সকল স্তরে যে আমূল পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল, এত অল্পদিনের মধ্যে এত বড় বদল বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন কালে বা কোন দেশে হয়নি। মধ্যযুগের ইয়োরোপ এবং মধ্যযুগের এসিয়ার মধ্যে গরমিলের চেয়ে মিল ছিল বেশী। উভয় মহাদেশেই জীবন ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর, সমাজ সংগঠন ছিল মন্হর ও স্হাবর। সতেরো শতকের গোড়ায় ইয়োরোপে যে চিন্তার বিপ্লব সুরু হল, অল্পদিনের মধ্যেই তার ফলে শিল্পবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের জীবন আমূল বদলে গেল। সেই বিপ্লবের ফলে উনিশ শতকের গোড়ায় বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে যে যুগ সুরু হয়েছে, তাকে ইয়োরোপীয় যুগ বল্লে অন্যায় হবে না।

ইয়োরোপে মানুষের প্রাচীন জীবন পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। গ্রাম সভ্যতার বদলে নতুন নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ইয়োরোপের মানুষের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ধর্ম্মবিশ্বাস পর্য্যন্ত বদলে দিয়েছে। বাস্তব জগতে যে রূপান্তর, তার চেয়েও বেশী বিপ্লবকারী রূপান্তর ঘটেছে চিন্তা জগতে। যে নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বুদ্ধির স্বাধীনতা ইয়োরোপের প্রগতির মূলে, তার শক্তি ও বেগ আজো কমে নাই। অনেকে বলেন যে গত চারশো বছরে পৃথিবী যে পরিমাণে বদলেছে, তার আগের চল্লিশ হাজার বছরেও বোধ হয় ততখানি বদলায় নি। সেই কথার জের টেনে বলা চলে যে গত চল্লিশ বছরে মানুষ যতখানি বদলিয়েছে, আগের চারশো বছরেও বোধ হয় ততখানি বদলায়নি। তার প্রভাবে কেবল ধর্ম্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান বদলায়নি, মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাত্রার ধরণ ও বদলিয়েছে। মোগল যুগেও বরফ দেখার সৌভাগ্য কম লোকেরই হ'ত—আজকাল ক্ষুদ্রতম গ্রামে দরিদ্রতম ব্যক্তিও এক পয়সার বরফ সময় সময় কেনে! পূর্ব্বে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে তিন মাস সময় লাগত, আজকাল তিন ঘন্টায় লোকে কলকাতা থেকে দিল্লী পেঁাছতে পারে। চল্লিশ বছর আগেও ভারতবর্ষে থেকে লন্ডন যেতে একুশদিন সময় লাগত, আজকাল প্রায় একুশ ঘন্টায় কলকাতা থেকে লন্ডন যাওয়া যায়, এবং দুয়েক বছরের মধ্যে বোধ হয় বারো ঘন্টাও লাগবে না। শুধু তাই নয়। আগে যে-খবর পেঁাছতে বারো মাস লেগে যেতো, আজকাল টেলিগ্রাফ, টেলিফোন রেডিওর দৌলতে সে-খবর বারো মিনিটে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। চোখের সামনে পৃথিবীর পরিধি যেন দিন দিন ছোট হয়ে আসছে,—তার প্রভাব মানুষের মনে ও দিন দিন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে।

ইয়োরোপের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষকেও স্পর্শ করেছে। সব জিনিষ আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি না, প্রাচীন সংস্কার এবং কোন ক্ষেত্রে কুসংস্কার এখনও আমাদের জীবনে কার্য্যকরী। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগে ভারতবর্ষের বিশ্বাস ও আচার বদলাতে সুরু করেছে। শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র সভ্যতার প্রসারও বাড়ছে। যুক্ত পরিবার, বর্ণাশ্রমধর্ম, জাতিভেদপ্রথা তাই দেখতে দেখতে ভেঙে যাচ্ছে। বাস লরীর যাতায়াতে দূরতম গ্রামে সহরের বাণী পেঁাছয়, কারখানা ফ্যাক্টরীর যন্ত্র নির্ঘোষে পুরাতন আচার বিশ্বাস কেঁপে উঠে। ফলে ভারতবর্ষের গ্রাম কেন্দ্রিক পরিবার নির্ভর প্রাচীন সভ্যতার জায়গায় নগর কেন্দ্রিক ব্যক্তি নির্ভর এক নতুন সভ্যতা আমাদের চোখের সামনেই গড়ে উঠছে।

এই সম্পর্কে আর একটী কথা মনে রাখা

দরকার। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণশক্তি যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন বাইরের প্রভাব প্রতিপত্তিকে ভারতবর্ষ সাগ্রহে এবং স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ করেছে। সেই প্রাণশক্তিতে যখন মন্দা এসেছে তখনই কেবল নানা ধরণের ছুঁৎমার্গ এ-দেশে দেখা দিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর প্রভাবকে কিন্তু এভাবে ঠেকানো যায় না। ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ফল শুধু এই হয় যে সক্রিয়ভাবে বাইরের প্রভাবকে গ্রহণ করবার বদলে নিষ্ক্রিয়ভাবে বহিরাগত শক্তির হাতের পুতুল হতে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার তার পরিচয় মেলে। একদিন ভারতবর্ষের জাহাজ পৃথিবীর সাতসমুদ্র পার হয়ে নানা অচেনা বন্দরে নোঙ্গর ফেলেছে—সেদিন ভারতবর্ষের গৌরবের যুগ। তারপরে একদিন ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল, বলা হল যে কালাপানি পার হলে ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতিচ্যুত হতে হবে—সেদিন ভারতবর্ষের লজ্জা ও অপমানের যুগ। মৌর্য্য-যুগে ভারতবর্ষ ইউনানী জ্যামিতি জ্যোতিষ গ্রহণ করেছে, গুপ্তযুগে গান্ধারের স্থাপত্য ভাস্কর্য্যকে নিজস্ব করে নিয়েছে, মোগল যুগে ইরাণী চিত্রকলা স্থাপত্যকে এক অপরূপ ভারতীয় রূপ দিয়েছে। একথাও ভুললে চলবে না যে ইয়োরোপের বিজ্ঞান দর্শন রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করার ফলেই ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক নব-জাগরণ সম্ভব হয়েছে। যতদিন ভারতবর্ষের চিত্ত সাগ্রহে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাকে গ্রহণ করবে, সমস্ত মানুষের সঙ্গে ভারতবাসীর হৃদয়ের যোগ যতদিন অব্যাহত থাকবে, ততদিন ভারতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যত নিয়ে কোন আশঙ্কা নাই।

বহু বিচিত্রধারার সমন্বয়ে বহু শতাব্দী ধরে যে সংস্কৃতি ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে আজও তার বিকাশ তাই অব্যাহত। প্রথম থেকেই সে সংস্কৃতি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। আর্য্য অনার্য্য দ্রাবিড় মহেনজোদারোর বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণের ফলে এ-দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিতে পরমত সহিষ্ণু উদারতার এক বিচিত্র প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগে প্রাচীনভারতের বহুমুখী বহুব্যাপী সভ্যতার সঙ্গে এসে মিশল ইস্লামের প্রবল প্রাণ-শক্তি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তাই মানবাত্মার নব জাগরণের পরিচয় মেলে। সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃ-ভাবের এক নতুন বাণী সেদিন ভারতীয় সাধুসন্ত আউলিয়া দরবেশের কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষে ইয়োরোপ প্রতীচ্য জগতের যে আহ্বান নিয়ে এদেশে এল, বুদ্ধির মুক্তি সাধনা তার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। ফলে ভারতবর্ষে এক নতুন বৌদ্ধিক জাগরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই ভারতবর্ষ শ্বাশ্বত ও সাবির্বকের সন্ধান করেছে। নতুন ও পুরাতন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শকে সমান আগ্রহে গ্রহণ করেছে এবং আজও গ্রহণ করতে উন্মুখ বলে ভারতবর্ষের সেই সাধনা সার্থক হবে, এ-আশা করা অন্যায় নয়।

মানব-বিজ্ঞান বা ইতিহাস আলোচনার—অর্থাৎ আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কেমন করিয়া এমন হইয়াছি, আমাদের সংস্কার, আমাদের আচার কি ভাবে অংকুরিত হইয়া কি কারণে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে ইত্যাদি জানিয়া কি কিছুই লাভ নাই? আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছি তাহার কোন্ অংশ আমাদের জাতিগত বা বংশগত কোন্ অংশ দেশের মাটির এবং জলবায়ুর গুণে পরিণত, এবং কোন্ অংশ শিক্ষা-দীক্ষার ফল তাহা জানার কি কোনই উপকারিতা নাই? রাষ্টীয় ইতিহাসের উপকরণ অর্থাৎ সাবেক কালের দলিল দস্তাবেজ—আমাদের হাতে খুব কম আছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসের উপকরণ আমাদের হাতে যথেষ্ট আছে। আমাদের জাতিভেদ, আমাদের আচার ভেদ, এমন অনেক পুরাতন জিনিষ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, যাহা অন্য সভ্য-সমাজে দেখা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে দিন দিনই তাহা লোপ পাইতেছে। সুতরাং সময় থাকিতে তাহার বিবরণ যথাবিধি রক্ষা না করিলে মানব-বিজ্ঞানের-মানব-সভ্যতার ইতিহাসের—অনেক মহামূল্য মালমশল্লা চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে।—ইতিহাস—রমাপ্রসাদ চন্দ

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা

আমি যে কালের কথা বলব সে কালের প্রাচীনতা সম্পর্কে একটা ধারণা ক'রে নেওয়া দরকার। স্বাধীন ভারত সরকার যে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলে গ্রহণ করেছেন তার মাঝখানে একটি চক্র আছে। আমরা এই জাতীয় পতাকাকে বছরে দুবার সম্মান জানিয়ে অভিবাদন করি। সুতরাং সকলেরই এই চক্রটি নজরে এসে থাকবে। আর ও হয়ত শুনে থাকবে তাকে অশোকচক্র বলা হয়।

তার কারণ হল এই। এখন হতে বাই শ' বছর আগে এ দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু সেই জন্যই তাঁর খ্যাতি নয়। তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন তেমন দয়ালু ছিলেন। দেশের মানুষের কল্যাণ সাধন এবং দেশের মানুষকে সৎশিক্ষা দানকে তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তখনকার মানুষকে সৎশিক্ষা দেবার জন্য তিনি এক নূতন ধরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের নানা জায়গায় পাথরের থাম বানিয়ে তার গায়ে তিনি সুন্দর সুন্দর কথা লিখে দিতেন। লোকে তাই পড়ে সকলকে ভালবাসতে শিখত, হিংসা ত্যাগ করতে শিখত। সুন্দর কথাকে সুন্দর জায়গায় না রাখলে মানায় না। তাই এই থামগুলিকে সুন্দর ক'রে মানাবার জন্য তার মাথায় নানা সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন ক'রে সাজাতেন। এমনি একটি থামের মাথায় তিনি চারটি সিংহ মূর্ত্তি দিয়ে সাজিয়ে ছিলেন। এই সিংহগুলি পরস্পরের দিকে পিঠ রেখে চার দিকে চেয়ে রয়েছে। তাদের তলায় আছে চারটি জীবের মূর্ত্তি। একটি হাতীর, একটি ঘোড়ার, একটি বৃষের এবং একটি হংসের। এদের প্রত্যেকটির মাঝখানে একটি ক'রে চক্র আঁকা। তাই হল অশোক চক্র।

অশোকের যুগ আমাদের দেশের সব থেকে গৌরবময় যুগ। তাই তাকে স্মরণ রাখবার জন্য আমাদের জাতীয় পতাকায় অশোক স্তম্ভে যে চক্র স্থাপিত আছে, তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ-চারটি সিংহ সংযুক্ত স্তম্ভের মাথাটিও ভারত সরকার জাতির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই সরকারের ব্যবহৃত চিঠির কাগজের শিরোভাগে তার ছবি রাখা হয়, সরকারী অট্টালিকার উপর এই স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। কলিকাতার রাজভবনের তোরণের উপরে এই মূর্ত্তিটি স্থাপিত আছে। অনেকে তা নজর ক'রে থাকবেন।

এই যে চক্রের কথা বলছিলাম এই চক্রের ও একটা অর্থ আছে। আমাদেরই দেশে অশোকের তিন শ' বছর আগে আর এক রাজবংশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। অন্যের দুঃখে তাঁকে ভারি পীড়া দিত। মানুষের জীবনে কত দুঃখ আছে। সকল মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তারপর অনেক বছর সাধনা ক'রে জ্ঞান লাভ ক'রে তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি যে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন তার নাম বৌদ্ধধর্ম্ম। এই

ধর্ম্মচক্র তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের চিহ্ন। অহিংসা ও সকল জীবে দয়া এই ধর্ম্মের মূল নীতি। সেই কারণে সে কালের মানুষ বুদ্ধকে পরম কারুণিক মহর্ষি বলত। রাজা অশোক পরে বৌদ্ধ হয়ে ছিলেন। তাই তাঁর স্তম্ভকে এই চক্র দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন।

বুদ্ধ যখন এ দেশে আবির্ভূত হন তখন এ দেশ জ্ঞানে ও সভ্যতায় অনেক অগ্রসর ছিল। আমাদের দেশের মানুষ তারও অনেক পূর্ব্ব হতেই জ্ঞান ও শিক্ষায় অনেক অগ্রসর হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। মহাভারতে পাণ্ডবদের যে গল্প পাই ও রামায়ণে রামের যে গল্প পাই তার ঘটনা ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে হয়েছে। বুদ্ধের যুগের লিখিত ইতিহাস আছে, কিন্তু রামসীতার কাহিনী বা পাণ্ডবদের কাহিনী যে যুগের কথা বলে তার কোন লিখিত ইতিহাস নাই। আমাদের দেশের মানুষ রামের যুগেরও আগে জ্ঞানে ও শিক্ষায় বেশ অগ্রসর হয়েছিল। আমরা মানি আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষার নাম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষায় লেখা বই আমরা এখনও কিছু কিছু ইস্কুলে পড়ে থাকি। সব থেকে প্রাচীন যুগে যে ভাষায় বই লেখা হত তার নাম ছিল বৈদিক ভাষা। সে ভাষা সংস্কৃতের মত কিন্তু সংস্কৃত হতে বিভিন্ন। মায়ের সঙ্গে মেয়ের যেমন অনেক সময় মিল পাওয়া যায় এ-হল তেমনি। বৈদিক ভাষা হতেই সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়েছে। বৈদিক ভাষা মা, সংস্কৃত ভাষা মেয়ে।

এই ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলা হত এই কারণে যে বেদ এই ভাষায় লেখা হয়েছিল। বেদ পৃথিবীর সব থেকে পুরাতন লিখিত গ্রন্থ। সুতরাং তা হতে অনুমান করা যায় এই বেদ যে যুগে রচিত সেই যুগ কত প্রাচীন। কতকাল আগে যে বেদ লেখা হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে। তা নিয়ে আমাদের বিব্রত হবার দরকার নাই। আমরা সহজেই এইটুকু অনুমান ক'রে নিতে পারি যে বুদ্ধের যুগের অনেক অনেক শত বছর পূর্ব্বে বেদ রচিত হয়।

এই বেদের যুগেই আমাদের দেশ সভ্যতায় বেশ অগ্রসর হয়েছিল। আমাদের দেশে তখন সমাজ গড়ে উঠেছিল। তখন লেখবার ভাষা মানুষের আয়ত্ত হয়েছিল। তখনকার দিনে যাঁরা জ্ঞানী হতেন তাঁদের ঋষি বলা হত। তাঁরাই বেদ রচনা করেছিলেন। তখন শিক্ষার ব্যবস্থা ও বেশ এগিয়েছিল। তা যে কেমন ছিল তারই পরিচয় এইখানে দেওয়া হবে।

সেকালে মানুষের সারা জীবনটিকে চারটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হত। এক একটি ভাগকে তারা এক একটি আশ্রম বলত। এই প্রতিটি আশ্রমের জীবন-যাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন ছিল। জীবনের প্রথম অংশকে বলা হত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। আমাদের কালে এটিকে ছাত্রাবস্থা বলা যেতে পারে। তার পরের অংশকে বলা হত গার্হস্থ্য আশ্রম। এই আশ্রমে মানুষ শিক্ষা শেষ ক'রে বিবাহ ক'রে গৃহী হত। তার পরের অংশকে বাণপ্রস্থ আশ্রম বলা হত। এই আশ্রমে মানুষ সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে নির্জ্জনে বাস করত। জীবনের সবার শেষ অংশকে বলা হত যতি আশ্রম। সেই অবস্থায় মানুষ পরিব্রাজক হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত। আমাদের কালে এখন ছাত্রাবস্থার পরেই সংসারে প্রবেশের ব্যবস্থা। তারপর একবার সংসারে প্রবেশ করলে তা হতে আর মুক্তি নাই। সংসারী অবস্থাতেই মানুষের জীবনের বাকি অংশ কেটে যায়। সুতরাং আমরা এখন জীবনের শেষের দুটি আশ্রমকে ত্যাগ করেছি।

সকল সমাজেই মানুষের জন্ম হতে আরম্ভ ক'রে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নানা উৎসব হয়। সব সমাজেই তার প্রচলন আছে। আমাদের সমাজে এই ধরণের উৎসবকে সংস্কার বলা হয়। সমগ্র জীবন জুড়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এই রকম দশটি সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। এদের মধ্যে সবগুলির সঙ্গে আমাদের ভাল পরিচয় না থাকলেও কয়েকটির সঙ্গে বেশ পরিচয় আছে। যেমন শিশুর ছয় মাস বয়স

হবার পর প্রথম দাঁত উঠলে তাকে প্রথম যেদিন ভাত খাওয়ান হয় তখন যে উৎসব হয়, তার নাম অন্নপ্রাশন উৎসব। প্রতি মানুষের জীবনে বিবাহের দিনটিতে খুব ঘটা ক'রে উৎসব করা হয়। এই উৎসবগুলির সঙ্গে আমরা সকলেই বেশ পরিচিত। এই অন্নপ্রাশন, এই বিবাহ, এরা এই দশটি সংস্কারের মধ্যে দুটি প্রধান সংস্কার। এখন আমাদের হয়ত অনেকের জানা নাই যে এই সংস্কারের ব্যবস্থা সেই বেদের সময় হতেই আমাদের সমাজে চলে আসছে। তার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এমন কি বেদের যুগে যে ভাবে কাঠে আগুন জ্বালিয়ে ঘৃতের আহুতি দেওয়া হত, এখন ও তাই দেওয়া হয়। সে কালে যে-মন্ত্র এই সকল উৎসবে উচ্চারণ করা হত এখনও তাই হয়। কতকাল ধরে এই সংস্কার-গুলি আমাদের দেশে চলে আসছে।

একটু আগেই বলা হয়েছে যে সে কালের ব্যবস্থা অনুসারে মানুষের জীবনের প্রথম আশ্রম ছিল ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রাবস্থা। শিশু একটু বড় হয়ে যখন চলতে ফিরতে শেখে, যখন মায়ের সেবা আর যত্ন তার আর সর্ব্বক্ষণ দরকার হয় না, তখনই এই আশ্রম আরম্ভ হবার কথা। এই আশ্রমকে উপলক্ষ্য করেই দুটি প্রধান সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। তার একটি সম্পন্ন হয় সে যেদিন গুরু গৃহে যাত্রা করে সেই দিন আর অপরটি সম্পন্ন হয় যেদিন সে শিক্ষা শেষ ক'রে গুরুর গৃহ ত্যাগ ক'রে আবার সংসারে ফিরে আসে সেই দিন।

গুরুর গৃহে যাবার দিন যে উৎসবটি হয় তার নাম উপনয়ন। এই উপনয়ন সংস্কারটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। ব্রাহ্মণের সন্তান হলে তার উপনয়ন হয়। মাথা মুন্ডন করতে হয়, গেরুয়া রঙের কাপড় আর উত্তরীয় ধারণ করতে হয় এবং উপবীত গ্রহণ করতে হয়। সে কালেও গুরুর গৃহে যাবার দিন শিক্ষার্থী বালক এই রকম মস্তক মুণ্ডন করত, এই রকম গৈরিক বসন পরিধান করত, এই রকম উপবীত ধারণ করত। উপনয়নের সময় এখনকার দিনেও একটি ঝুলি দেওয়া হয়। সেই ঝুলিতে তন্ডুল ভিক্ষা নিতে হয়। সেই তন্ডুলে যে ভাত রান্না হয় তাই খেতে হয়। এখনকার দিনে এই ভাবে জীবন যাপন করতে হয় তিন দিন মাত্র। সেকালে এই ধরণের জীবন যাপন করতে হত সমগ্র ছাত্র জীবন জুড়ে।

এখনকার দিনে আমরা উপার্জ্জনশীল হবার আগে ত কম দিন পড়ি না। কোন বালকের হাতে খড়ি যদি হয় পাঁচ বছর বয়সে, তার ইস্কুলে পড়তে হয় অন্তত দশ বছর। তার পর সে কলেজে ভর্ত্তি হয়। সেখানে ও বি· এ· পাশ করতে লাগে চার বছর, এম· এ· পাশ করতে ছয় বছর, আরও বেশী পড়তে লাগে আরও বেশী সময়। সুতরাং ছাত্র জীবন চৌদ্দ পনের বছর সাধারণত স্থায়ী হয় বৈ কি।

সেকালেও ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম কম করে বার বছর স্থায়ী হত। এই দীর্ঘ সময় শিক্ষার্থী পিতা মাতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে গুরুর গৃহে আশ্রয় নিত। গুরু এবং গুরু পত্নীই তার দেখা শোনা করতেন। তাকে শিক্ষা দেবার ভার এবং খাওয়ানের ভার সবই গুরুর উপর পড়ত। সেই শিষ্য তখন গুরুর সংসারেরই এক জন হয়ে যেত। গুরু তার জন্য শিষ্যের পিতার নিকট হতে কোন অর্থ আদায় করতেন না। প্রশ্ন ওঠে তা হলে গুরুর চলত কি ক'রে? গুরুর নিজের জীবন ধারণের খরচ আছে, তার উপর শিষ্যের গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ। এ-বিষয় ব্যবস্থাটা ছিল সহজ। ওই যে আগে ঝুলির কথা বলা হয়েছিল সেই ঝুলির সাহায্যেই এই ব্যবস্থাটা সম্পাদিত হত। যতকাল শিষ্য গুরুর গৃহে বাস করত এই ঝুলি তার সঙ্গে থাকত। প্রতিদিন এক সময় অবসর ক'রে নিয়ে তার ভিক্ষায় বাহির হতে হত। সংসারী গৃহস্থরা এই রকম ব্রহ্মচারীকে খুসী হয়ে ভিক্ষা দিতেন, কারণ এই ব্যবস্থাটিকে সেকালের গৃহীরা একটি অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য হিসাবে পালন করতেন। ভিক্ষা ক'রে যা পাওয়া যেত তা গুরুর ভান্ডারে সঞ্চিত হত। তাতে যেমন গুরুর সংসারের খরচ চলত তেমন শিষ্যের খাওয়ার ব্যবস্থা ও হত।

বেদের যুগে পাঠের যা বিষয় ছিল সবই বেদকে কেন্দ্র ক'রে। মানুষ তখন সবে জ্ঞান সঞ্চয়

করতে শিখেছে, সবে পুস্তক লেখা আরম্ভ হয়েছে। কাজেই পাঠের বিষয় খুব বেশী ছিল না। আমরা চার বেদের কথা জানি। সেই চারটি বেদ ভিন্ন আরও ছয়টি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তাদের বলা হত বেদাঙ্গ। এখনকার দিনে ছাত্র জীবনে আমরা খুব ঘটা ক'রে সরস্বতী পূজা করি। অঞ্জলি না দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করি না। প্রতি বছর অঞ্জলি দেবার সময় যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করি তা হয়ত অনেকের মনে আছে। তার আরম্ভ 'সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং' বলে আর শেষে আছে নানা গ্রন্থের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন। কথাটা এই রকম—'বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।' এখানে যে বেদাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, এ হল সেই ছয় বেদাঙ্গ যা ছিল বেদের যুগে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়।

এই ছয়টি বেদাঙ্গের নাম ছিল এই—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ। তাদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সে কালের মানুষ বেদকে অত্যন্ত ভক্তি করত। বেদে আছে নানা প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশ্যে রচিত স্তব। যেমন সূর্য্য, যেমন অগ্নি, যেমন বায়ু। ভোর বেলাকার নবারুণ দীপ্ত আকাশকে তারা ঊষা বলত। এই ঊষার নামে ও স্তব আছে। এদেরই সে কালে মানুষ দেবতা বলে গ্রহণ করত। এই স্তব গুলির নাম ছিল সূক্ত। এই স্তবগুলিতে যে-সব কথা আছে তা যাতে ঠিক মত উচ্চারিত হয় সে নিয়ে সেকালের মানুষ খুব উদ্বিগ্ন ছিল। শিক্ষা বেদে ব্যবহৃত এই কথাগুলির সঠিক উচ্চারণ শিক্ষা দিত।

ঊষা, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যখন এই স্তোত্রগুলি পাঠ হত তখন বালুকার উপর কাঠ সাজিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হত। সেই যজ্ঞ করতে বেদি নির্ম্মাণ করা দরকার, তারপর তার উপর কাঠ সাজান দরকার। তখন ত দেশলাই ছিল না, তাই চকমকি ঠুকে বা কাঠে কাঠে ঘষে আগুন ধরান দরকার এবং সেই আগুনকে প্রদীপ্ত করবার জন্য ঘৃতের আহুতির দরকার। যজ্ঞের এই সকল বিভিন্ন কাজ কেমন ভাবে করতে হবে, কোন ক্রমে করতে হবে, এই সব বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন। কল্পতে এই সব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বেদের যে সব স্তব বা সূক্তগুলি আছে তা ত শুধু পাঠ করলেই হয় না, তা বোঝা চাই। অর্থ না বুঝে পাঠ করার কোন সার্থকতা নাই। আমরা আজ কাল কোন শব্দের অর্থ না জানা থাকলে করি কি? অভিধানে তার অর্থ খুঁজি। নিরুক্তও ঠিক তাই। নিরুক্ত বেদে ব্যবহৃত যে সব শব্দ আছে আর অর্থ বলে দেয়। বেদকে বুঝতে হলে তাই নিরুক্ত পাঠের দরকার হয়ে পড়ে।

ব্যাকরণের অর্থ আমরা সকলেই জানি। এখনকার ছাত্রদেরও কোন ভাষায় অধিকার পেতে হলে ব্যাকরণ পড়তে হয়। ব্যাকরণ শিক্ষা দেয় বিশুদ্ধ ভাবে বাক্য রচনা করতে। সেকালেও ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হত বৈদিক ভাষাকে ভাল রকম আয়ত্ত করতে পারলে নির্ভুল ভাবে বৈদিক ভাষা ব্যবহার করা যায়।

আমরা জানি কবিতা ছন্দে লেখা থাকে। বিভিন্ন ছন্দে লেখা কবিতা বিভিন্ন ভাবে পাঠ করতে হয়। বেদ যে স্তবগুলি নিয়ে রচিত সেই স্তবগুলি সব কবিতায় লেখা। সেই কবিতাগুলির বিভিন্ন ছন্দ আছে। কোনোটির নাম গায়ত্রী ছন্দ, কোনোটির নাম অনুষ্টুপ ছন্দ, কোনোটির নাম ত্রিষ্টুপ ছন্দ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ছন্দের বিশেষত্ব জানা না থাকলে এই সব স্তবগুলি ঠিক মত পাঠ করা সম্ভব নয়। ছন্দ নামে যে বেদাঙ্গ তা বেদে ব্যবহৃত এই বিভিন্ন ছন্দের পরিচয় দেয়।

যে শাস্ত্র আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে পরিচয় দেয় তাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে। যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে পন্ডিত তাঁদের জ্যোতিষী বলা হয়। আমাদের যুগে নিউটনের নাম সকলেই শুনেছে। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। বেদের বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান হত বিভিন্ন তিথিতে। কখন কোন্ তিথি পড়বে তা ভাল ক'রে জানতে হলে আকাশের কোথায় কখন কোন গ্রহের বা নক্ষত্রের অবস্থিতি ঘটে তা জানা দরকার হয়ে পড়ে। সেই কারণেই সেকালে জ্যোতিষ

তারপর খানিকক্ষণ নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, যা বললাম তার অর্থ বোধ হয়েছে?

শিষ্যটি খুব সপ্রতিভ। উত্তরে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

কি?

আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দাম্যত' অর্থাৎ আত্মদমন কর।

তারপর মানুষ শিষ্যটির পালা। সে গুরুকে প্রণাম ক'রে উপদেশ চাইল।

গুরু আবার উত্তরে সেই একটি অক্ষর মাত্র বললেন, 'দ'।

খানিক বাদে প্রশ্ন করলেন, যা বললাম, বোধগম্য হয়েছে ত?

আজ্ঞে হাঁ।

কি বুঝেছ?

আপনি উপদেশ দিলেন 'দত্ত' অর্থাৎ দান কর।

সবার শেষে অসুর শিষ্যটির পালা।

শিষ্যটি যখন প্রণাম ক'রে তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করল, গুরু তাকেও সেই এক অক্ষরে সম্পূর্ণ একই উত্তর দিলেন, 'দ'।

তারপর তাকে প্রশ্ন করলেন, কি বুঝলে? শিষ্য উত্তর দিল, 'দয়ধবম্', অর্থাৎ দয়া কর।

বর্ষাকালে আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায়, একটা গুরু গম্ভীর ভাব আমাদের মনকে তখন আবিষ্ট করে। সূর্য্য দেখা যায় না, মেঘের বিস্তার তার মুখ ঢেকে দিয়েছে। তার আলোর সে তেজ নাই। সেই গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা যায়। তখন মেঘ কি বলে?

আমাদের এই উপনিষদ বলে, মেঘ বলে, 'দ দ দ'।

কেন বলে? কেন বলে তার উত্তরও উপনিষদে দেওয়া হয়েছে। সেটা হল এই :

সেই যে কোন্ আদিকালে প্রজাপতি তিন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'দ দ দ', এ তারই প্রতিধ্বনি। যুগ-যুগান্তর ধরে মেঘে ঢাকা দিলে নূতন ক'রে তাকে শোনা যায়। দেবতা অসীম ক্ষমতার আধার। সে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে বিশ্বের কল্যাণে ব্যাঘাত হয়। তাই তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন আত্মদমন করতে। মানুষ বড় লোভী প্রাণী। ভোগ করতে সে নিত্য উন্মুখ। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'দত্ত', দান কর, যা পাও তা ভাগ ক'রে ভোগ কর, একা ভোগ কোরো না। আর অসুর স্বভাবত হিংসা-পরায়ণ। এই প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিলে অন্যের উৎপীড়ন হবার সম্ভাবনা। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দয়ধবম্', সকলকে দয়া কর, তা হলে হিংসা বৃত্তি বশে থাকবে।

সেই জন্যই নাকি মেঘ বছরে বছরে প্রজাপতির সেই উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আমাদের বলে, 'দ দ দ', দাম্যত দত্ত দয়ধবমিতি।'

বেদের যুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে তার কোন পরি-বর্ত্তন হয়নি। আশ্রম ধর্ম্ম তখনও পালিত হত। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে গুরুগৃহে বিদ্যালাভের ব্যবস্থা তখনও বলবতী ছিল। তবে সমাবর্ত্তনের পূর্বে যে নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তার যেন কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছিল। বেদের যুগে নীতি সম্বন্ধে উপদেশের ব্যবস্থা দেখেছি, তার অতিরিক্ত নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নের ব্যবস্থাও দেখেছি। রামায়ণ মহাভারতের যুগে শুধু উপদেশ বা প্রশ্ন নয়, তার অতিরিক্ত একটি পরীক্ষাও নেওয়া হত। এই পরীক্ষারও একটু বৈশিষ্ট ছিল। গুরু শিষ্যকে একটি বিশেষ কাজ করতে আদেশ করতেন। সেই কাজ সন্তোষজনক হয়ে সম্পাদিত হলে শিষ্য গুরুর আশীর্ব্বাদ লাভ করত এবং গৃহে প্রত্যাগমনের অনুমতি পেত। মহাভারতে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প পাওয়া যায়। সেটি এখানে বলা যেতে পারে।

মহাভারতের যুগে ধৌম্য বলে এক আচার্য্য ছিলেন। তাঁর তিন শিষ্য ছিল। তাদের নাম হল আরুণি, বেদ ও উপমন্যু।

বিদ্যা অর্জ্জন শেষ হবার পর ধৌম্য উপমন্যুকে বললেন, বৎস উপমন্যু, আজ হতে তুমি আমার গোরু রক্ষণ কর।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে উপমন্যু

তাঁর গোরুর দেখা শোনার ভার নিল। বেশ কিছু দিন যায়। এক দিন গোরু চরান শেষ ক'রে গোষ্ঠে তাদের রেখে বেলা-শেষে উপমন্যু এসে গুরুকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

গুরু বললেন, বৎস, তোমাকে ত বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখছি। তুমি খাও কি?

সে বলল যে গোরুর সেবা শেষ ক'রে সে ভিক্ষা করতে যায় এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন খায়।

গুরু আদেশ করলেন, ভবিষ্যতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন সমস্তই আমাকে দিয়ে যাবে, নিজে তার কোন অংশ গ্রহণ করবে না।

উপমন্যু আদেশ পেয়ে প্রথম খানিকটা অবাক হয়ে গেল। ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারাইত সে সমগ্র ছাত্রজীবন ধরে শরীর পোষণ ক'রে এসেছে। সেইত রীতি। গুরুত কোন দিন নিষেধ করেন নি। তবে এ আদেশ কেন? কিন্তু এ আদেশের যুক্তিযুক্ততা বিচার করবার ত তার অধিকার নাই। সর্বান্তঃকরণে গুরুর আদেশ পালন করবার শিক্ষাই সে পেয়ে এসেছে। তাই নীরবে সে আদেশ মাথায় গ্রহণ ক'রে ফিরে এল।

এমন ভাবে কিছু দিন গেল। তারপর একদিন অবসর সময় সে আবার গুরুর নিকট গেল। গুরুকে প্রণাম ক'রে যখন সে দাঁড়াল তখন গুরু দেখেন পূর্বের মতই শিষ্য হৃষ্টপুষ্ট আছে।

তাই গুরু তাকে বললেন, এখনও ত দেখছি তুমি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট আছ। এখন তুমি কি খাও?

উপমন্যু বলল, প্রথমবার ভিক্ষা ক'রে এসে যা পাই তা আপনার আদেশ মত আপনার ভান্ডারে দিই। তারপর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা ক'রে যে অন্ন লাভ করি তাই দিয়ে শরীর পোষণ করি।

গুরু একথা শুনে রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, এ-কাজটি ভাল নয়। দুবার ভিক্ষায় বার হলে অন্য ভিক্ষাজীবিদের উপরোধ করা হয়।

উপমন্যু ফিরে গেল। গোরুর দেখা শোনা সে ক'রে যায়। দ্বিতীয়বার ভিক্ষায় যাওয়া সে ত্যাগ করেছে। আবার বেশ কিছু দিন যায়। তারপর একদিন সে গুরুর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। গুরু দেখলেন এখনও তার পীবরত্ব হ্রাস পায়নি।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি খেয়ে জীবন ধারণ কর?

উপমন্যু জানাল, গুরুর নিষেধ হেতু দ্বিতীয়বার আর সে ভিক্ষায় বাহির হয় না, তবে যে গোরু সে চরায় তাদের দুধ সে পান করে। গুরু তখন গোরুর দুধ পান করতেও তাকে নিষেধ করে দিলেন।

এ নিষেধের হেতুও উপমন্যু খুঁজে পেল না। তবু গুরুর আদেশ। সুতরাং পালন করতে হয়। আবার সে গোরু চরাতে ফিরে গেল।

পরের বার যখন সে গুরুর নিকট এসে উপস্থিত হল, ধৌম্য দেখেন, ভারি আশ্চর্য্য, তখনও তার পীবরত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি।

তিনি প্রশ্ন করলেন, বৎস উপমন্যু, ভিক্ষার অন্ন খাও না, দ্বিতীয়বার ভিক্ষায় যাও না, দুধও পান কর না, তবুও 'পীবানসি ভৃশম', বেশ মোটা আছ। এখন কি খেয়ে থাক?

উপমন্যু বলল, গোবৎসগণ যখন দুধ পান ক'রে তখন তাদের মুখ হতে যে ফেন নিপতিত হয় তাই পান করি।

গুরু বললেন, গোবৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা ক'রে অধিক ফেন ফেলে। তুমি এই ভাবে গোবৎসদের বঞ্চিত ক'রে ভাল কাজ কর না। ফেন পান করাও তোমার উচিত হবে না।

বিনা প্রতিবাদে গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে উপমন্যু ফিরে গেল। কিন্তু এখন সে কি করে? ভিক্ষা করা নিষেধ, দুধ পান করা নিষেধ, এমন কি গোবৎসদের মুখ হতে নির্গত ফেন পান করাও নিষিদ্ধ। সে বনে গোরু চরাতে চরাতে ক্ষুধার তাড়নায় অর্ক পত্র ভক্ষণ ক'রে অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধ অবস্থায় বনে চলতে চলতে সে এক শুষ্ক কূপের মধ্যে পড়ে গেল।

এদিকে গোরুগুলো চরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে এল। উপমন্যু আর ফেরে না। গুরু উদ্বিগ্ন হলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন তার সন্ধান পেলেন না তখন তিনি নিজেই এক দল শিষ্য নিয়ে অন্ধকারে তার সন্ধানে বাহির

হলেন। এখানে ওখানে অনেক অনুসন্ধান ক'রেও তার দেখা মিলল না। তখন ক্ষোভে দুঃখে তিনি তার নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন।

ভাগ্যক্রমে তিনি এক সময় যেখানে এসে হাজির হলেন সেখানে উপমন্যু কূপের ভিতর পড়ে গিয়েছিল। গুরুর মুখে তার নাম শুনতে পেয়ে সে তখন সাড়া দিল। গুরুর তখন কি আনন্দ! তাকে কূপ হতে উদ্ধার করলেন। যখন দেখলেন অর্কপত্র ভক্ষণ ক'রে তার চোখ দুটি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে তখন তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ডাকলেন। তারা ছিল দেবতাদের চিকিৎসক। তাদের চিকিৎসায় উপমন্যু তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে সে গুরুকে প্রণাম ক'রে অভিবাদন জানাল।

তখন গুরু তার প্রতি প্রীত হয়ে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বুকে টেনে নিলেন এবং এই বলে আশীর্ব্বাদ করলেন, বৎস! তুমি শ্রেয় লাভ করবে, সমস্ত বেদ এবং সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার মধ্যে প্রতিভাত হবে।

উপমন্যু তখন এতদিন ধরে গুরুর এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ খুঁজে পেল। গুরু এতদিন ধরে তাকে পরীক্ষা করছিলেন। হাজার অপ্রিয় হক তবু আদেশ পালন করতে সে প্রস্তুত কিনা দেখছিলেন।

আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম ছিল বেদ। উপাধ্যায় তাঁকে এই আদেশ করলেন যে, বৎস বেদ! তুমি কিছুদিন আমার গৃহে থেকে গুরু শুশ্রূষা কর। তোমার মঙ্গল হবে।

যে আজ্ঞে বলে বেদ বহুকাল গুরুকুলে থেকে গুরু-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। উপধ্যায় বলীবর্দ্দের ন্যায় নিত্য তাঁহার উপর নানা কার্য্যের ভার অর্পণ করতেন। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সমুদয় দুঃখ সহ্য করে এবং কোন বিষয়ে প্রতিকূল না হয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত গুরু-শুশ্রূষা করলেন। বহুকাল পরে উপাধ্যায় তুষ্ট হলেন, তাতেই বেদ, কল্যাণ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হলো। তিনি উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা নিয়ে গুরুকুল হতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করলেন।

স্বগৃহে বাসকালে তাঁহার তিন শিষ্য হল। তিনি শিষ্যগণকে "কর্ম্ম কর বা গুরু শুশ্রূষা কর" কিছুই বলতেন না। কারণ তিনি গুরু কুলবাসের দুঃখ বিলক্ষণরূপেই জানতেন, সুতরাং শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করতেন না। একদা জন্মেজয় ও পৌষ্য এই দুইজন ক্ষত্রিয় এসে বেদকে উপাধ্যায়ে বরণ করলেন। বেদ একদা যাজন কার্য্যোপলক্ষে গমন কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করলেন, হে উতঙ্ক! আমি ইচ্ছা করি, আমার অনুপস্থিতি কালে গৃহে যে বিষয়ের অপ্রতুল হয়, তুমি তা পূরণ করে দিবে। বেদ উতঙ্ককে এই আদেশ করে প্রবাসে গমন করলেন।

কিছুকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হতে গৃহে আগমন করলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে উতঙ্কর প্রতি প্রীতমান হলেন এবং বললেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করব বল। তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার শুশ্রূষা করেছ, অতএব আমাদের পরস্পর প্রীতি বর্দ্ধিত হয়েছে, এক্ষণে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি গৃহে গমন কর, তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হবে। উপাধ্যায় এইরূপ বললে, উতঙ্ক বললেন, আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করব? এমন কথা আছে যে, যিনি বিদ্যাদান করে দক্ষিণা গ্রহণ না করেন, এবং যিনি ধর্ম্মত বিদ্যা অধ্যয়ন করে দক্ষিণা প্রদান না করেন, সেই উভয়ের মধ্যে একজন মৃত হন ও পরস্পর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, অতএব আপনি অনুজ্ঞা করলে আমি গুরু-দক্ষিণা আহরণ করতে যত্নবান্ হই। উপাধ্যায় বললেন বৎস! উতঙ্ক! তবে কিছুদিন আমার গৃহে বাস কর পরে বলব।

কিছু দিন পরে উতঙ্ক উপাধ্যায়কে বললেন, আজ্ঞা করুন, কিরূপ গুরু-দক্ষিণা দিলে আপনি প্রীত হন তাই বলুন। পরে গুরুর আদেশে উপাধ্যায়িনীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি পৌষ্য রাজার পত্নীর কানের দুটি কুন্ডল প্রার্থনা করলেন। উতঙ্ক বহু ক্লেশে তাহা এনে দিয়ে গুরুগৃহ হতে বিদায় নিলেন।

রাজস্থান



বাঙ্গালী কবির ভাষায় "বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তিমেখলায়" আমাদের দেশের ইতিহাসে সেই রাজোয়ারা অর্থাৎ রাজপুতনা বা রাজস্থানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ভৌগোলিক, রাজনীতিক ও সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজস্থানের প্রভাব দেখা যায়। রাজস্থান ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া পশ্চিম হইতে আগত মুসলমান বৈদেশিক আক্রমণ প্রথমে এই অঞ্চলের উপর আসিয়া পড়ে। তাহার পর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে যে সকল বৈদেশিক আক্রমণের ধারা আসে তাহা যখন স্থায়ী রাজত্বে পরিণত হয় তখন রাজস্থান হইতে মুসলমানগণ বহু বাধা পান। তাহারা ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবার সময় পশ্চিমে নিকটবর্ত্তী রাজস্থান অঞ্চলের রাজন্যদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে বা তাহাদের স্বপক্ষে রাখিতে বাধ্য হন। রাজপুতদের নিষ্ক্রিয়তা, সদিচ্ছা বা সহযোগিতা দিল্লীর মুসলমান সম্রাটদের রাজনীতি ও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টার উপর প্রভাব বিস্তার করিত। এই প্রভাব এত গভীর ছিল যে মোগল যুগে দিল্লীর সম্রাট বংশ রাজপুত রাজ বংশ গুলির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার নীতি অবলম্বন করেন। স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বহু রাজপুত রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী এবং লোকজীবনের আনন্দময় উৎসব লোকসঙ্গীত প্রভৃতি ভারতের সাহিত্যে, গানে ও কবিতায় সম্মানজনক স্থান পাইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের যুগে স্বদেশপ্রেমিক কবি ও সাহিত্যিকগণ এই সকল কাহিনী হইতে জাতীয় বীরগাথা এবং কথা ও কাহিনী রচনা করেন। রাজস্থানের বীরগাথা ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু উদ্দীপনা দেয়। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ এবিষয়ে অগ্রগামী হয় এবং রাজস্থানের ইতিহাসের প্রেরণা ক্রমশ সমস্ত ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে।

রাজপুত বলিতে কোন জাতি বা বংশবিশেষকে বুঝাইত না। কোন বিশেষ অঞ্চলেই যে রাজপুতগণ বাস করিতেন তাহাও নহে। অনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধপ্রিয়, শাসনদক্ষ ও পরাক্রমশালী কয়েকটি শ্রেণী রাজত্ব করিতেছেন। তাহাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বাহির হইতে আগত যোদ্ধা শক, হূণ প্রভৃতি জাতির লোক ছিলেন। তাহাদের অনেকে ভারত আক্রমণের পর এদেশেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে এদেশের উচ্চবংশ বা উচ্চ পদস্থ জাতিগুলির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া যান। তাহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন এবং হিন্দুসমাজ তাহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকারও করে। প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয়গণের উপযোগী গুণ কর্ম ও সামাজিক রীতি নীতি

তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দেখা গেল যে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট আর চালুক্য, পশ্চিম ভারতে প্রতীহার, শোলাঙ্কি (চালুক্য), চৌহান, রাঠোর, প্রমার প্রভৃতি নামধারী বহু গোত্র রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মধ্যভারতে চন্দেল, বুন্দেলা প্রভৃতি গোত্র রাজবংশ স্থাপন করিলেন। চন্দেল-

জাতি পরিচয় নিজ কর্ম ও ব্যবসার উপর অনেক-খানি নির্ভর করিত। গুর্জরগণ বিদেশাগত ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হুণ ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয় ধর্মালবম্বী হইয়া গুর্জর প্রতিহার ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। বাকী সকলে হিন্দুধর্মে জাতি বিভাগে গুজর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিম্ন-



রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে যশলমীর দুর্গ

গণ সম্ভবত আদিবাসী গন্ডদের সঙ্গে সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য গোত্রও এইরূপে অন্যান্য দেশজ জাতির সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুসারে অন্যকুল বা নীচ কুল হইতে স্ত্রী আহরণ করিলে কোন দোষ হইত না। এমনকি এইরূপ কোন বংশের পুত্র নিজ বলে রাজ্য স্থাপন করিলে বা সেনাধ্যক্ষ হইতে পারিলে তাহার পক্ষে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করা বা প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় বংশের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া কঠিন হইত না।

স্তরের গ্রামবাসী কৃষক বৃত্তির লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এই ভাবেই পারস্যের ধর্ম্মপ্রচারক মাগী আগন্তুকগণ মগ ব্রাহ্মণ হইয়া গেলেন। বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যাহারা ধর্ম্মপ্রচার বা ধর্ম্ম-ব্যবস্থার কাজে ভারতে আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এক দল নাগর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন লোক ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং রাজসভায় শুধু পুরোহিত বা মন্ত্রীরূপে না থাকিয়া কেহ কেহ নিজেই রাজা

হইয়া বসেন। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ উজ্জয়িনী ও বুন্দেলখন্ডে ব্রাহ্মণকে রাজত্ব করিতে দেখেন। ক্রমশ ব্রহ্ম-ক্ষাত্র নামে একটি শাখা জাতির ও সৃষ্টি হয়।

মোট কথা, সর্বত্রই যে সকল জাতি বহু পুরুষ বা বহু দিন ধরিয়া রাজ্যশাসন বা রাজ্য-রক্ষা প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের উপযোগী কাজ করিতে থাকেন তাহাদেরই রাজপুত্র বা রাজপুত এই নাম দেওয়া হইত। মনে রাখিতে হইবে যে ভারতের স্বাধীন অস্তিত্বের সময়ে জাতিভেদ প্রথা খুব দৃঢ় ছিল না এবং জাতি গুণ এবং কর্মের ফলে জাতি বদল করা অসম্ভব ছিল না। মৌর্য্যগণ রাজপাটে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। সুঙ্গ, কণ্ব প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মেবারের শিশোদীয় বংশ ব্রহ্ম-ক্ষাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমশ এই রাজবংশাবলি নিজেদের সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির বংশধর বলিয়া আপনাদের ঘোষণা করেন এবং হিন্দুসমাজে পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করেন। পরস্পরের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার ফলে রাজপুত এই নামটি এই সকল বংশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

দুঃখের বিষয় এই রাজপুত বংশগুলির নিজেদের মধ্যে কোন একতা বা সদ্ভাব ছিল না। ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত জনপদ গুলিতে রাজ-পুতরা নিজেদের গোত্রকেই সর্বাপেক্ষা উপরে স্থান দিতেন এবং সেজন্য একতার বিশেষ অভাব হইত। কোন পরাক্রমশালী রাজা অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেও সেই সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া সম্ভব হইত না। তাহার ফলে অন্য দেশ হইতে অন্য ধর্মাবলম্বী অন্য যুদ্ধপ্রথায় শিক্ষিত আরব, তুর্কী, মঙ্গোল প্রভৃতি আক্রমণকারী ভারত আক্রমণ করিলেও রাজপুতগণ সাধারণত একে একে পৃথক ভাবে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও হারিয়া যান। বরং কোন কোন স্থলে রাজপুত-রাই মুসলমান বিদেশীর পক্ষ লইয়া অন্য রাজপুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সহায়তা করেন। এই ভাবে কান্যকুব্জের পরিহার রাজা জয়চাঁদের আহ্বানে মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও কয়েক বার আক্রমণের পর খৃষ্টীয় ১১৯২ সালে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান রাজাও জয়চাঁদেরই আত্মীয় পৃথ্বীরাজকে তিরোরীর যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু এইরূপ আত্মকলহ বা একতার অভাব সত্ত্বেও রাজপুতগণ কখনো কখনো শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সকল যুদ্ধের বর্ণনা ও তাহাদের প্রেরণা ভারতবর্ষের সাহিত্যে অমর কাহিনী হইয়া রহিয়াছে। নিজের দেশ বা রাজ্য রক্ষার জন্য একক বীরত্বের কাহিনীর চেয়ে সমবেত বীরত্বের কাহিনী মানুষকে অধিকতর প্রেরণা দেয়। পৃথ্বীরাজের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সভাকবি চাঁদ বরদাই রাজস্থানী ভাষার আদি মহাকাব্য 'পৃথ্বীরায় রাসো'তে এইরূপ একটি বহু রাজপুত রাজার সম্মিলিত যুদ্ধযাত্রা ও মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চমৎকার বর্ণনা করিয়া ছিলেন। সে কালের রাজস্থানী কাব্যের যুদ্ধ বর্ণনা একালের বাঙ্গালী পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য নয়। পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ বর্ণনা :

রাজা রুক্খে অরী।
সিংহ রোহং পরী।।
মন্জরং মোলিয়ং।
বীরসা বোলিয়ং।।

বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের আরো দুইটি গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ রাজপুতদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১০০১ সালে পাঞ্জাবের রাজা আনন্দপাল উজ্জয়িনী, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের রাজন্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া গজনীর সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রাজপুত নারীগণ যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য নিজেদের গহনা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দেন। সাধারণ গরীব লোকরা সৈন্যদের পোষাক তৈয়ারীর জন্য বিনা মূল্যে সূতা প্রস্তুত করে ও বস্ত্র বয়ন করে। খৃষ্টীয় ১৫২৭ সালে মোগল সম্রাট বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মেবারের রাণা সঙ্গ বহু

রাজপুত রাজার সহায়তা পান। ১২০ জন রাজপুত রাজা ফতেপুর শিক্রির এই যুদ্ধে যোগ দেন। তাহাদের সঙ্গে আশী হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ শত হস্তী ছিল। এই দুই যুদ্ধেই রাজপুতদের সংখ্যাবল অনেক বেশী হওয়া সত্বেও তাহাদের পরাজয় হয়। সেই পরাজয়ের কারণ-গুলি বিশেষ ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

রাজপুত রাজা সামন্ত প্রভৃতি কেহ ইহার পূর্বে সঙ্গের অধীনে মিলিত ভাবে যুদ্ধ করেন নাই। রাণা সঙ্গের অশ্বারোহীদের মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ প্রভুভক্ত ছিল। বেশীর ভাগ সৈন্য ছিল শৃঙ্খলাহীন লোকের "দঙ্গল"। একজনের নেতৃত্বে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না। অন্যপক্ষে সৈন্যগণ সাধারণত দেশ বা ধর্মের জন্য অনু-



রাজস্থানের লোকনৃত্য

রাজপুতগণ সাধারণত একতাবদ্ধ হইতে পারিতেন না। প্রতিরাজাই স্বস্ব প্রধান ও নিজের গোত্র মর্য্যাদায় অতিরিক্ত মাত্রায় অন্ধ থাকিতেন। তাহার ফলে শত্রুপক্ষ একে একে তাহাদের রাজত্বগুলি গ্রাস করিতে পারিত। যখন তাহারা যুদ্ধের জন্য একত্র হইতেন তখনো একতা থাকিত না। ফতেপুরশিক্রির যুদ্ধ বর্ণনায় বাবর তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে সম্মিলিত

প্রাণিত হইয়া যে যুদ্ধ করিত তাহাও নহে। কোন কারণে রাজা আহত বা দৃষ্টির অগোচর হইলে সৈন্যগণ জেতা যুদ্ধেও ছত্রভঙ্গ হইয়া পরাজয় স্বীকার করিত। প্রাচীন চতুরঙ্গ যুদ্ধ প্রথা অনুসারে রাজা হাতীর উপরে থাকিয়া সৈন্য চালনা করিতেন। দূর হইতে বর্শা, তীর বা গুলি দিয়া রাজা বা মাহুত বা হাতীকে লক্ষ্য করিয়া আহত বা পলায়ন করিতে বাধ্য করা শক্ত

হইত না। মধ্য এশিয়ার বলবান্ বেগবান্ অশ্বকে পাহাড়ী রাজপুত ঘোড়া কোন দিন বাধা দিতে পারিত না। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারও রাজপুতদের মধ্যে চালু হয় অনেক পরে। দলবদ্ধ অশ্বারোহী ও পদাতিক রাজপুত বাহিনী বন্দুক ও কামানের পাইকারী লক্ষ্য হইয়া পড়িত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই একই রণকৌশল রাজপুতদের পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল।

অথচ ব্যক্তিগত বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে রাজপুতদের মহিমা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। সেই কাহিনীগুলিই তাহাদের অমর করিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়াছে ও কবি সাহিত্যিকগণের রচনার বিষয়বস্তু হইয়াছে। সমসাময়িক রাজপুতেরা ইতিহাস রচনা করিতেন না। কিন্তু তাহাদের সভাকবিরা প্রশস্তি বংশাবলি প্রভৃতি কবিতায় রচনা করিতেন এবং সেগুলি তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ করা হইত। এই ভাবে বহু রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। মেবারের রাজসমন্দ হ্রদের প্রস্তর গাত্রে মেবার রাজবংশের কাহিনী খোদিত আছে। তাহা ছাড়া চারণ কবিদের রচনায় রাজপুত ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। এই কবিরা রাজসভার আশ্রয়ে থাকিতেন আর শুধু দেশ ধর্ম্ম ও রাজ্যরক্ষার জন্য গানে গানে প্রেরণা দেওয়া ছাড়াও রাজবংশের অতীত কীর্ত্তি ও বর্ত্তমান ঘটনাবলির কাহিনী গান করিতেন। ইহার একটি সামাজিক সার্থকতাও ছিল। রাজা অন্যায় অবিচার করিতে ইতস্তত করিতেন কারণ চারণ বা ভাটের রচনায় সে কাহিনী ভবিষ্যৎ বংশের কাছে জানা হইয়া থাকিবার ভয় ছিল। চারণগণ দেনার জামিন হইতেন এবং তাহাদের চাপে দেনা সহজে শোধ হইত। মাড়োয়ার আর যশলমীর রাজ্যের চারণরা নিজ চেষ্টায় একাধিকবার সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজপুত কাহিনী বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকদের নিকটে স্বাধীনতার প্রেরণার বিষয়বস্তু হইয়া উঠে। বীরগাথা ও বীরপূজার আধার হইয়া উঠে। সেই হিসাবে রাজপুতানা বাঙ্গালীর আবিষ্কার। বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল গাহিয়াছিলেন:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙখল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

সামন্ত তন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী রাজপুতদের কাহিনী তাহাদের বংশ হিসাবে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করাই সুবিধাজনক। প্রথমেই মেবারের শিশোদীয়া রাজবংশের কথা বলা উচিত। কারণ সম্মানে, রাজ মর্য্যাদায়, রাজ্যের বিস্তারে ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের গৌরবে এই বংশই সর্বাপেক্ষা গরীয়ান।

শিশোদীয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পারাওয়ের ইতিহাস শুধু কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়। তাহার পিতাকে শত্রুরা মারিয়া ফেলিলে বালক বাপ্পা রাখাল বালকদের সঙ্গে পালিত হন এবং ক্রমশ নিজ বাহু বলে মেবার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চিতোর তাহার রাজধানী হয়। এই বংশ মর্য্যাদা এত বেশী ছিল যে মহম্মদ ঘোরীর সমসাময়িক দিল্লীর হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ মেবারের রাণা সমর সিংহের সঙ্গে তাহার ভগ্নীর বিবাহ দেন। এই বংশ একলিঙ্গ মহাদেবের দেওয়ান হিসাবে রাজ্য শাসন করিতেন ও সমরসিংহ তাহার বুদ্ধি বীরত্ব ও সাত্বিক জীবনের জন্য যোগীন্দ্র নামে অভিহিত হইতেন। তাহার পর মেবারের বিশেষ উল্লেখ পাই দিল্লীর পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে। চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনীতে কতটা সত্য ও কতটা কবি কল্পনা আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। এমন কি পদ্মিনীর স্বামীর নাম ভীম সিংহ না রতন সিংহ এবং তিনি নিজে রাণা ছিলেন না রাণার পিতৃব্য ছিলেন সে সম্বন্ধেও ভিন্ন মত আছে। কিন্তু রাজস্থানী ডিংগল ভাষায় লেখা খোমান রাসো, মুসলমান ধর্মগুরু মালিক মহম্মদ জৈসী রচিত কাব্য প্রভৃতি পাঠে কোন সন্দেহ থাকে না যে আলাউদ্দিন চিতোর দুর্গ জয়ের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও সফল হইয়াছিলেন। গল্পটি এই যে পদ্মিনীর রূপের প্রশংসা শুনিয়া

আলাউদ্দিন তাহাকে লাভের জন্য চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর প্রস্তাব হয় যে তিনি বহু দূর হইতে পদ্মিনীকে গড়ের মধ্যেই দেখিয়া চলিয়া যাইবেন। দেশ রক্ষার আশায় রাজপুতগণ আলাউদ্দিনকে দুর্গে আসিয়া বারোবার আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত পদ্মিনীকে দেখিতে দিলেন। কিন্তু রাজপুতের জাতিগত অতিথিবৎসলতা দেখাইয়া রাণা নিজে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইবে। সখীদের ছদ্মবেশে রাজপুত সৈন্যগণ সাতশত চৌদোলায় করিয়া পাঠান শিবিরে আসিলেন। কিন্তু রাণা মুক্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠান সৈন্যগণ বাধা দিতে আসিল এবং রাজপুত সৈন্যরা ছদ্মবেশ খুলিয়া যুদ্ধ করিলেন। রাজপুতের বাহুবল ও পদ্মিনীর বুদ্ধিবলের নিকট পরাস্ত হইয়া আলাউদ্দিন দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।



রাজস্থানের লোক-উৎসব

আলাউদ্দিনকে দুর্গের বাহিরে পর্য্যন্ত বিদায় দিতে আসিলেন। অমনি বাহিরে লুকান পাঠান সৈন্যগণ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট চক্রান্ত অনুসারে রাণাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। বহু যুদ্ধের পর সন্ধির প্রস্তাব হইল যে পদ্মিনী স্বয়ং সখীগণ সহ আসিয়া পাঠান শিবিরে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং তখন রাণাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। মুক্তির সময় রাণী ও রাণাকে শেষবার নিভৃতে এই যুদ্ধে সেনাপতি গোরা ও তাহার বার বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের বীরত্ব অমর কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। আলাউদ্দিন নূতন সৈন্য-সামন্ত লইয়া আবার চিতোর আক্রমণ করেন এবং এবার ভীষণ যুদ্ধের পর জয়লাভ করেন। রাজপুত কাহিনী অনুসারে একদিন রাত্রে রাণা দেখিলেন যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন 'ম্যয় ভূখা হু।'

রাণার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে বার জন রাজার রক্ত না হইলে তাহার ক্ষুধা মিটিবে না এবং রাজবংশেরও রক্ষা হইবে না। সে অনুসারে রাণার বার জন পুত্র রাজা রূপে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। কে আগে প্রাণ দিবেন তাহা লইয়া রাজপুত্রদের মধ্যে যে ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছিল তাহাও রাজপুতদের বীরত্বের একটি গৌরবময় অধ্যায়।

আলাউদ্দিন চিতোর জয় করিলেন কিন্তু কোন রাজপুত আত্মসমর্পণ করেন নাই। সমস্ত রাজপুত নারী শত্রু হস্তে বন্দী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু বরণ শ্রেয় মনে করেন এবং জহর ব্রত পালন করিয়া অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। কবি জৈসীর ভাষায়:

লাগি কন্ঠ ভাঙ্গ দৈ হোরী।
ছার ভই জর অঙ্গ ন মোরী।।

ইহার কিছু কাল পরে শিশোদীয়া রাজা চিতোর পুনরুদ্ধার করেন। রাণা কুম্ভ এই বংশের একজন বিখ্যাত রাণা ছিলেন এবং তাহার বহু যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিস্তম্ভ বিখ্যাত চিতোরের জয়স্তম্ভ রাজস্থানের একটি বিশেষ কারুকার্য্যময় দ্রষ্টব্য। তাহার পর কিছুকাল কোন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন না এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শিশু উদয়সিংহকে গুপ্তহত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হয়। সে সময় তাহার ধাত্রী পান্না রাজশিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার স্থলে নিজের শিশুকে রাখিয়া গোপনে উদয় সিংহকে সরাইয়া ফেলিয়া মেবারের রাজবংশ রক্ষা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ প্রভুভক্তি অতুলনীয়। রাজস্থানের আদিবাসী ভীলগণও বহু সময়ে অসামান্য প্রভুভক্তি দেখাইয়াছিল।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং আকবর রাজস্থানকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। রাণা উদয় সিংহ চিতোর হইতে চলিয়া যান, কিন্তু রাজপুতগণ প্রাণ দিয়া চিতোর রক্ষা করেন। এই সময় জয়মল ও পুত্ত নামে দুই সেনাপতি যে বীরত্ব দেখান তাহার তুলনা বিরল। রাজপুতগণ সকলেই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন এবং দেখা যায় যে তাহাদের উপবীতেরই ওজন ছিল ৭৪৸৹ মণ। এই ওজন হইতেই সাড়ে চুয়াত্তর সংখ্যাটির সঙ্গে পবিত্রতা রক্ষার একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কেহ তাহার চিঠিতে ৭৪৸৹ কথাটি লিখিয়া দেওয়া সত্ত্বেও চিঠিটি যদি কোন অনধিকারী লোক খোলে তাহা হইলে এই বিশাল সংখ্যক রাজপুত হত্যার পাপ তাহার হইবে এই রূপে কিংবদন্তী হইয়াছে।

মেবারের পশ্চিম প্রান্তে ও মোগল অধিকৃত এলাকা হইতে দূরে উদয় সিংহ উদয়পুরে নিজের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আকবরের সাম্রাজ্য আরো বিস্তার লাভ করে। রাজপুত রাজাদের তিনি নিজ সৈন্য দলে সেনাপতি প্রভৃতি পদ দিয়া অথবা তাহাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজ বশ্যতা স্বীকার করান। অম্বর অর্থাৎ বর্ত্তমান জয়পুর রাজবংশের রাজা মানসিংহ এই দুই সম্বন্ধেই আকবরের সেনাপতি ও আত্মীয় হন এবং মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেন। উদয়সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দারুণ যুদ্ধ করেন এবং বিরাট মোগল বাহিনীকে সারা জীবন বাধা দেন। মোগল পক্ষে সেনাপতি ছিলেন রাজা মানসিংহ ও মোগল যুবরাজ সেলিম, এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। হলদীঘাটের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া রাণা প্রতাপ পরাজিত হন এবং স্বাধীনতা বিসর্জন অপেক্ষা দুঃখ বরণকে শ্রেয় মনে করিয়া দুর্গম বন ও পর্বত অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। অশেষ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি জীবনের শেষ ভাগে মেবারের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু যতদিন চিতোর জয় করিতে পারিবেন না ততদিন মাটির পাত্রে ভোজন করিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহার বংশধরগণও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ভোজন পাত্রের নীচে ঘাস রাখিয়া আহার করিতেন। এই সব উদাহরণ হইতেও রাজপুতদের স্বদেশপ্রেম ও নিজ

প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার পরে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত মোগল ও মেবার বংশে সন্ধি ও শান্তি ছিল। কিন্তু মেবার দিল্লীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই বা বিবাহ সম্বন্ধ করে নাই। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসাইলে এবং সর্বত্র মন্দির ধ্বংসের হুকুম দিলে খৃষ্টীয় ১৬৭৯ সালে মেবারের রাণা রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মোগলগণ রাজপুতদিগকে হারাইতে পারেন নাই। রাণা রাজসিংহই শেষ মেবার বীর। তাহার পরে মেবার বংশ আর কোন উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা যুদ্ধে বা বীরত্বে অংশ গ্রহণ করে নাই। বরং মারাঠা সৈন্য ও পিন্ডারী দস্যুদের লুন্ঠনে মেবারের প্রভূত ক্ষতি হয়। বিশেষ দুঃখের বিষয় যে যদিও রাজসিংহের রাজ্যকালে যোধপুরের রাঠোরগণ তাঁহার সহিত সহযোগিতায় মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন উত্তরকালে রাজপুতদের মধ্যে আর কখনো স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একতা বা বীরত্বের নিদর্শন দেখা যায় নাই।

যোধপুরের রাঠোর রাজপুত বংশের খ্যাতিমান রাজা ছিলেন রাজা যশোবন্ত সিংহ। তাঁহার বীরত্ব দুঃসাহস ও রাজনৈতিক বুদ্ধিকে সম্রাট সাজাহান ও ঔরঙ্গজেব বিশেষভাবে ভয় করিতেন। একবার তিনি সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যোধপুর দুর্গে ফিরিয়া আসেন। রাণীর কাছে স্বামীর এই কাপুরুষতা অসহ্য মনে হইল ও তিনি আদেশ দিলেন যে তাহার দৃষ্টিতে স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত, অতএব দুর্গের দ্বার যেন খোলা না হয়। রাজপুত বীরধর্ম অনুসারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজপুত হয় ঢাল পিঠে বহিয়া অর্থাৎ জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবে; অথবা ঢাল তাহাকে বহিয়া ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ ঢাল ফেলিয়া পলায়ন করার অগৌরবের চেয়ে মৃত্যুও বরণীয়। এই কাহিনীটি রাজপুত চরিত্রের একটি মূল সূত্রের ইঙ্গিত দেয়।

দিল্লীর সম্রাটগণ রাজপুত বীরদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিলেও তাহাদের ভয় ও সমীহ করিয়া চলিতেন। যোধপুরের রাজা যশোবন্তসিংহকে সেজন্য ঔরঙ্গজেব সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। সেখানে তাহাকে সম্ভবত বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজেব তাহার শিশু পুত্র দুইটিকে বন্দী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রভুভক্ত রাঠোরগণ অমানুষিক বিক্রমে আত্মদান করিয়া শিশুদের উদ্ধার করে এবং রাঠোর বীর দুর্গাদাস বহু কষ্টে যোধপুরের (মাড়োয়ার) রাজবংশকে রক্ষা করেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মাড়োয়ারকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রাঠোরগণ মেবারের রাণা রাজসিংহের আশ্রয় প্রার্থনা ও লাভ করেন। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে এই একতা রাজপুত ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তখনো তৃতীয় পরাক্রমশালী রাজপুত রাজ্য জয়পুর মোগলদের সহায়তা করে। অথচ সেই সময়ে এই তিনটি রাজপুত রাজ্যই সমভাবে ঔরঙ্গজেবের মন্দির-ধ্বংস নীতিতে লাঞ্ছিত হইতেছিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই যুগে জয়পুরের রাজারাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও প্রভুভক্ত সামন্ত ছিলেন। মানসিংহ ছাড়াও মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও সোয়াই রাজা জয়সিংহ কূটনীতি ও সেনা পরিচালনার কুশলতায় মোগলদের বিশেষ সহায়তা করেন। মীর্জা রাজা দাক্ষিণাত্য বিজয়ের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু জয়পুর দিল্লীর মাত্র দেড় শত মাইল দূরে এবং তাহার মোগলের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। সেজন্য মোগলদের স্বপক্ষে থাকাতেই জয়পুরের সমৃদ্ধি হয়। অম্বরের মহামূল্য কারুকার্য জয়পুর সহরের প্রতিষ্ঠা, মর্মর শিল্প, বস্ত্র শিল্প সব কিছুই এই শান্তির যুগে বিস্তৃতি লাভ করে। জয়পুর সহরের পরিকল্পনা করেন বাঙ্গালী স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য এবং এই পরিকল্পনায় গঠিত জয়পুর এখন সমস্ত পৃথিবীর ভ্রমণকারীদের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

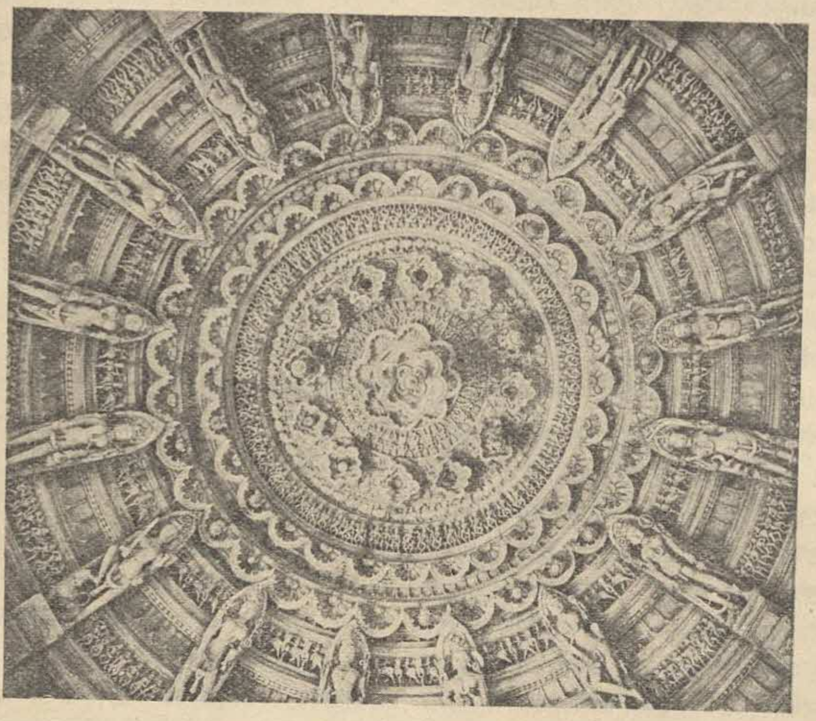
মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় সোয়াই দ্রদর্শী রাজা জয়সিংহ মারাঠাদের আত্মবিস্তার ও নাদিরশাহ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে জয়প্রকে কৌশলে দ্রে রাখিয়া নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশে রত হন। জয়প্র, দিল্লী, কাশী, মথ্রা ও উজ্জয়িনীতে তিনি মানমন্দির তৈয়ারী করান ও গ্রীক জ্যামিতিক ইউক্লিডের গণনা হইতে বহু পাশ্চাত্য গণিতিকের তথ্য সংস্কৃতে অন্বাদ করান। দুর্গম সমরখন্দ ও পোর্ট্রগাল হইতেও তিনি জ্ঞান আহরণের ব্যবস্হা করেন। বহু সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টাও করেন এবং সমগ্র রাজপ্তানায় সতীদাহ নিবারণের জন্য নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়া তাহা প্রচলনের চেষ্টাও করেন। শিশুকন্যা হত্যার প্রথা নিবারণের চেষ্টাও তিনি করেন।

কিন্তু সামন্ত তান্ত্রিক রাজ্য ব্যবস্হায় শাসন-প্রণালী ও প্রজায় সম্বন্ধ নিবিড় থাকিত না। সেজন্য এই সকল সৎকার্য্যের প্রভাব বেশী অন্ভূত হয় নাই। সামাজিক সংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারকদের চেষ্টা জনসাধারণের মধ্যে অনেক বেশী ফল দিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্ত্তি-গুলির মধ্যে অন্যতম আব্ পাহাড়ের মন্দির-গুলির প্রভাব বা চিতোরের রাণার মহিষী মীরাবাইয়ের ভজন গানের প্রভাব রাজপ্তানার নর-নারীর মধ্যে অনেক বেশী ব্যাপক ছিল। অবশ্য বর্ত্তমান যুগে যে রূপ জনচেতনা সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায় তাহা কেবল রাজপ্তদের মধ্যে কেন, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলেই দেখা যায় নাই।

মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্ত রাজাদের প্রাধান্যও কমিয়া যায়। সামান্য কয়েক বছরের জন্য যোধপ্রের রাজ-নীতিক গুরুত্ব কিছু বাড়িয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহাদের আর ন্তন কোন দান ছিল না। তাহারা ইতিহাসের মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্বল খন্ড রাজ্যে বিভক্ত অবস্হায় হোলকার, সিন্দিয়া প্রভৃতি মারাঠা রাজার আক্রমণে ও পিন্ডারীদের লুন্ঠনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। এমন কি একজন সামান্য মারাঠা সর্দারও উনিশ শতকের প্রথম ভাগে মাত্র আট বছরের মধ্যে মেবারের কাছ হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা আদায় করিয়াছিল। মহামতি টড এই সময়ে এগার বৎসর বিভিন্ন রাজপ্ত দরবারের সঙ্গে ন্তন প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ কোম্পানীর রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে রাজস্হানের বড় বড় সহর এমনকি উদয়প্রেরও লুটপাটের ফলে যে দুরবস্হা দেখিয়াছিলেন তাহা অবর্ণনীয়। তিনি এই সময়ে রাজস্হানের বিস্তীর্ণ প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া চারণ কাহিনী শ্নিয়া ও অন্যান্য সূত্র হইতে রাজস্হানের বীর কাহিনী লিখিয়া যান। তাঁহার কাহিনীই সর্বপ্রথমে পৃথিবীর সম্খে রাজপ্তদের গৌরব গাথা তুলিয়া ধরে।

এই সময়েই রাজপ্ত রাজাগণ একে একে কোম্পানীরাজের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধির নিয়ম অন্সারে তাহারা রাজ্যের ভিতরের শাসনকার্য্যে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতেন; কিন্তু সেই রাজ্যে অবস্হিত ইংরেজ প্রতিনিধি বা এজেন্ট সাধারণ ভাবে গুরুত্ব পূর্ণ সব ব্যাপারেই দৃষ্টি রাখিবার অধিকারী ছিলেন। রাজার বহির্বিভাগীয় অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন স্বাধীনতা থাকিত না এবং বাহিরের আক্রমণ বা বিশৃঙ্খলাজনক কার্য্যকলাপের হাত হইতে নিশ্চিন্ত ভাবে রক্ষার জন্য ইংরেজ কর্ত্তৃ-পক্ষ দায়ী থাকিতেন। তাহার পরিবর্ত্তে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হয়। বিভিন্ন রাজ্যের বা রাজ্যদলের জন্য যে সকল ইংরেজ প্রতিনিধি থাকিতেন তাহাদের উপরে ছিলেন একজন এজেন্টজেনারেল ও রেসিডেন্ট। রাজস্হানের এজেন্ট জেনারেলের প্রধান দপ্তর আজমীরে অবস্হিত ছিল। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে মোগল যুগেও সুবেদারগণ আজমীর হইতেই এই অঞ্চলের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন। ইংরেজ রাজত্বের সময় রাজপ্তগণ অবিচলিত ভাবে আন্গত্য দেখাইয়াছেন এবং জার্মানপক্ষের বিরুদ্ধে দুই বিশ্বযুদ্ধে রাজপ্ত রাজন্য ও সৈন্যগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত বিদেশে যুদ্ধ করিয়াছেন।

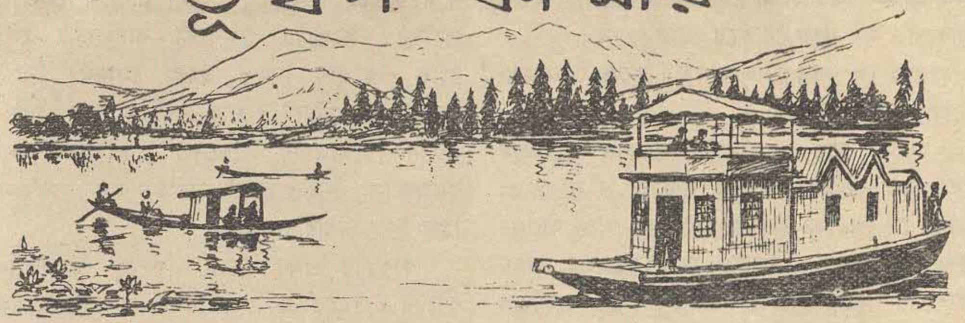
কিন্তু দেশীয় রাজন্য প্রথার প্রভুভক্তির ফলে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মধ্যে যে ভাবে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি হয় তাহা রাজপুতনার মধ্যে হওয়া সম্ভব হয় নাই। তবুও নিখিল ভারতীয় একতা ও স্বাধীনতার জন্য আকুলতা যে রাজস্থানে যথেষ্ট ছিল তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ ১৯৪৭ সাল। যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল তখন ইহাও ঘোষিত মিলিয়া মৎস্য ইউনিয়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু উদয়পুরের (মেবারের) মহারাণা নিজেই এইরূপ একটি বৃহত্তর রাজস্থান ইউনিয়ন সৃষ্টিতে সম্মত হওয়ায় সকল রাজপুত রাজ্যই মিলিত হইয়া একটি ঘ তপশীল ভুক্ত রাজ্যে পরিণত হয়। বংশ ও অন্যান্য মর্য্যাদায় সকলের শ্রেষ্ঠ হওয়ার মেবারের মহারাণা রাজস্থানের মহারাজ প্রমুখ হন ও জয়পুরের মহারাজা রাজপ্রমুখ হন।



আবুতে দিলোয়ারা মন্দিরের কারুকার্য্য

হয় যে বৃটেনের স্বার্বভৌমত্ব চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজাদের ভারতবর্ষের নব গঠিত রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে সব রাজপুত রাজ্যই হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের প্রেরণায় কিছু ছোট রাজ্য একত্র হইয়া একরাজ্যগোষ্ঠী অর্থাৎ ইউনিয়ন গঠন করে। জয়পুর ও কয়েকটি নিকটবর্ত্তী সামন্তরাজ্য কিন্তু কোন রাজারই স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্যশাসনের অধিকার থাকে না এবং নিখিল ভারতীয় আইন ও নিয়ম অনুসারেই রাজপুতানার শাসনকার্য্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সংবিধান অনুসারে নব গঠিত রাজস্থান ভারতবর্ষের একটি বিরাট গণ-তান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত হইয়াছে এবং রাজ প্রমুখ পদের পরিবর্ত্তে রাজ্যপাল পদের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজস্থান এখন ভারত সাধারণ তন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর



ভ্রমণ আর ভ্রমণকাহিনী এ দু'টোর ওপর আমার চিরদিনের আকর্ষণ। ভ্রমণের সুযোগ যদি না জোটে, ভ্রমণকাহিনীই বা মন্দ কি? দূরের দেশে যাবার সুবিধে না হয় কাছের দেশই সই।

এ-যুগে মানুষের দেশভ্রমণ অনেক বেড়েছে, কারণ বিজ্ঞান যানবাহনের অগাধ সুবিধে করে দিয়েছে। হাজার হাজার মাইল পথ এখন আর কিছুই নয়। কথায় কথায় সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে লোকে, পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে, পাহাড় ডিঙোচ্ছে। আর শুধুই কি পৃথিবী?

বৃহৎ পৃথিবী আজকে হয়েছে ক্ষুদ্র,
দেশান্তরের দূরত্ব ঘুচে যাচ্ছে।
পৃথিবীর পথ সংক্ষেপি আজ মানুষে,
গ্রহান্তরের পথে পাড়ি দিতে যাচ্ছে।
বিজ্ঞানীদল যন্ত্র বসিয়ে শূন্যে
চন্দ্রলোকের কথা না কি আজ শুনছে,
মঙ্গল গ্রহে কোন জীব থাকা সম্ভব,
তাই নিয়ে না কি তর্কের জাল বুনছে।

সত্যিই চাঁদে অভিযান আজকে আর নিছক কবি-কল্পনা নয়। কাজেই সামান্য কয়েক দিনের তুচ্ছ ভ্রমণ-কাহিনীটুকুর কীই বা সার্থকতা?

তবু এও সত্যি নিত্য যে সূর্য্য ওঠে, তাকে নিয়ে কবিরা নিত্যকাল কাব্য রচনা করে, প্রত্যহ যে সূর্য্য অস্ত যায় অনন্তকাল শিল্পীরা তার ছবি আঁকে।

প্রকৃতি চির নূতন।

ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বর্ণনা। সৌন্দর্য্যময়ী ভারতবর্ষের মুকুটমণি কাশ্মীর না কি ভূতলে পাহাড়ের বুকে বিছিয়ে রেখেছে একখানি স্বপ্নের ছায়ায় গড়া সুষমার আঁচল।

শুনে শুনে কল্পনার জগতে গড়ে উঠেছিল একটি অপূর্ব্ব ছবি।

সে ছবি হচ্ছে নীল নির্মল আকাশের নীচে তুষারমৌলী পাহাড়ের উপত্যকায় এক আলো ঝল্‌মলে দেশ! সেখানে পাইনবন আর আখরোট ক্ষেত, উইলো, চেনার আর ফলন্ত আপেলগাছের সমারোহ। সেখানে বড় বড় হ্রদ জুড়ে পদ্মবন আর 'নৌগৃহের' মেলা। আর সেখানের বাসিন্দাদের না কি দুধে আলতায় গোলা রং পাকা আপেলের মতো গাল, সুর্মাপরা চোখের মত কাজল কালো চোখ, আর নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া মূর্ত্তির মতো নিখুঁৎ মুখ।

তাদের বছরের অর্দ্ধেকটা কাটে চাষবাস করে আর পদ্মমধু এবং পশুলোম সংগ্রহে, বাকী অর্দ্ধেকটা কাটে বরফে ঢেকে যাওয়া নীচু নীচু ঘরের মধ্যে শুকনো মাংস আর লঙ্কার আচার খেয়ে বসে বসে শালের গায়ে নক্সা তুলে।

তুষারতীর্থ অমরনাথের নাট মন্দির কাশ্মীর।

ছেলেবেলায় সেই জোরালো কল্পনাটা বজায়

না থাক কাশ্মীর যাবার ইচ্ছেটা বজায় ছিল। সেই ইচ্ছে পূরণ হলো প্রায় বুড়ো বয়সে। ইচ্ছে থাকলেও সব কাজ যে হয়ে ওঠে তা নয়!

যাক যে বছর গেলাম সেটা হচ্ছে উনিশশো চুয়াল্ল সাল।

যেতে হলে পারমিটের দরকার, শুনলাম কিছুদিন থেকে কাশ্মীর যাত্রীর ভীড় এতো বেশী যে পারমিট অফিস হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কারণও ছিল। কারণ দেশ-বিভাগের সময় কাশ্মীর যাত্রার যেটা সহজ পথ সেটা পড়েছিল পাকিস্হানে! তাছাড়া ভারতে স্বাধীনতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাশ্মীরে এসেছিল এক বিষম বিপর্য্যয়। সে-সময় দেশীয় রাজারা কেউ বা যোগদান করেছিলেন ভারতে, কেউ কেউ বা পাকিস্হানে। কিন্তু কাশ্মীর তখনো পর্য্যন্ত ছিল স্বাধীন।

কিন্তু সেই পটভূমিকায় হঠাৎ যেন এক ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় সুরু হয়ে গেল। উপজাতি হানাদারদের আক্রমণে সোনার কাশ্মীর প্রায় তচ্‌নচ্‌।

রাজসিংহাসন ওঠে কেঁপে, রাজ্য বুঝি রক্ষা হয় না। বিপন্ন রাজা হরিসিং ভয়ংকর একটা অবস্হার সামনে দাঁড়িয়ে নিরুপায় হয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন নেহেরুজীর দপ্তরে। সেটা হচ্ছে উনিশশো সাতচল্লিশের পঁচিশে অক্টোবর।

শরণাগতকে রক্ষা ভারতের চিরন্তন ধর্ম।

কিন্তু আইনতঃ কাশ্মীরকে সৈন্য সাহায্য পাঠানো ভারতের চলেনা, কারণ কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাগজে পড়ি মুমূর্ষু কাশ্মীর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে "ভারত রাজ্যের অন্ত-র্ভুক্ত হলাম।"

'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল ভারত প্রান্তে।

'কাশ্মীরকে বাঁচাতে হবে।'

সদ্য স্বাধীন দেশ ভারতবর্ষ! নিঃস্ব দরিদ্র ছন্নছাড়া। কোথায় বা তার অস্ত্রশস্ত্র কোথায় বা তার সৈন্যবল। তবু দলে দলে ছোটে সাহায্য-কারী সৈন্য। 'সৈন্য নেই? সবাই সৈন্য হও।'

সে এক আশ্চর্য্য ইতিহাস!

কাশ্মীর রক্ষার সেই যুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, কেরাণী, রাঁধুনী, মশালচী, যুদ্ধ করেছে রসদবাহী কুলি, সাধারণ প্রহরীরা পর্য্যন্ত। কাশ্মীর উপকন্ঠে বারমুল্লার সেই যুদ্ধে বহুপ্রাণ বিনষ্ট হলো সেদিন! নিহত হলেন লেফটেনান্ট কর্ণেল রণজিৎ রায়, নিহত হলেন ব্রিগেডিয়ার লাওনেল প্রতীপসিং আর রাজেন্দ্রসিং, নিহত হলেন সর্বজন মান্য, সর্বজন-প্রিয় ব্রিগেডিয়ার ওসমান!

কাশ্মীর রক্ষা হলো, কিন্তু এতোগুলি বীরের মৃত্যুতে একটি স্তিমিত বিষাদের হাওয়া বইতে লাগলো ভারত রাজ্যে। অতঃপর নানা পরিস্হিতির ফলে মহারাজা হরিসিং হলেন রাজ্যচ্যুত, কিশোর রাজকুমার 'করণসিংকে' 'গদিতে বসানো হলো, আর রাজ্য পরিচালনার ভার পেলেন শেখ আবদুল্লা।'

প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা, দেশনেতা শেখআবদুল্লা, নেহরুর প্রিয়বন্ধু শেখআবদুল্লা। শেখ আবদুল্লা পূজা পেতে লাগলেন জন মনের কাছে। কিন্তু পরের ইতিহাস? যে এক অদ্ভুত।

কিন্তু থাক ওকথা, বেড়ানোর কথাই বলি।

কোথাও যেতে সময় সংক্ষেপেই যাঁদের কাম্য, তাঁরা সোজাসুজি আকাশে উড়ে ঘন্টা কয়েকেই কলকাতা থেকে কাশ্মীর পৌছে যেতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় 'পথটা' ভ্রমণেরই একটা বড়ো অংশ। তাড়াহুড়োর পাড়িতে ভ্রমণের স্বাদ কিছু কমে যায়। পথইতো তীর্থ!

হাওড়া থেকে পাঠানকোট পর্য্যন্ত ট্রেন আর পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত বাসে......এই হচ্ছিলো কথা। কিন্তু শুনলাম সে বছর বাস-মোটরের ওই পাহাড়ে পথটা ধবস্‌ ভেঙে ভীষণ হয়ে উঠেছে। অতএব ঠিক হ'লো পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর ওড়াই ভালো।

যদিও শুনেছিলাম ওই যে বাস সার্ভিস, তার পথের শোভা সৌন্দর্য্য নাকি অতুলনীয়। গাড়ী বানিহাল পাসের মধ্যে দিয়ে যায়, আর 'বানিহাল পাস' না দেখলে না কি কাশ্মীর যাওয়াই বৃথা! বৃথা না হোক অসম্পূর্ণ তো বটেই। কিন্তু আমাদের দল কম, মাত্র স্বামী পুত্র ও আমি,

কাজেই বিপজ্জনক সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশেষ উৎসাহবোধ করলাম না।

পরে শুনেছিলাম রাস্তা সত্যিই ভীষণ হয়ে উঠেছিল, মাঝপথে দেড়দিন বাস নিশ্চল হয়ে বসেছিল, খাদ্যাভাবে আর স্থানাভাবে যাত্রীদের কষ্টের অবধি ছিলনা। পাহাড়ে পথের দস্তুরই অবশ্য এই। শ্রীনগরে ওই সময়ের যাত্রী যাঁদের দেখেছিলাম, তাঁরা পথ সৌন্দর্য্যের চেয়ে পথ ক্লেশের বর্ণনাতেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

কাজেই 'বানিহাল' না দেখতে পাওয়ার আক্ষেপ অনেকটাই লাঘব হয়ে গিয়েছিল আমাদের।

তবু একেবারেই কি গিয়েছিল? ভয়ঙ্করেরও একটা আকর্ষণ আছে বৈ কি! তাই মাঝে মাঝেই মনে হতে লাগল, সেই বা মন্দ কি ছিল? জল না পাওয়া, খেতে না পাওয়া, নিশ্চল বাসের মধ্যে বসে থাকা, সেটাও তো একটা আমোদ হতো। আসল কথা আমরা মানুষরা কোন কিছুই হারাতে রাজী নই।

অন্যে ভোগ করলো আমরা করলামনা, এটা আপশোসের বিষয়। তা হো'ক যে দুর্ভোগ।

হাওড়া থেকে পাঠানকোট।

স্টেশনের পর স্টেশন।

জানা আর অজানা নামের মিছিল! জানলা দিয়ে ধুলো আসছে মুঠো মুঠো, তবু জানলা বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। বই ছিলো সঙ্গে, তাই উল্টোচ্ছি, আর মাঝে মাঝে গাড়ী নড়ে উঠে স্টেশনে থামলেই চমকে উঠছি। আরে এযে চেনা নাম! এটা বড্ড চেনা না? অমৃতসর! এখানে নামতে হবে?

হবে বৈ কি অমৃতসরের চির বিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দির দেখে যেতে হবেনা? কে বলতে পারে এ-লাইনে আর আসাই হবে কি না।

ভারতবর্ষের মধ্যে অমৃতসর স্বর্ণমন্দির একটি বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য!

মানুষের কীর্ত্তি আর কুকীর্ত্তি দুটোই জমা পড়ে ইতিহাসের খাতায়। দুটোর জন্যেই পরবর্ত্তীকালের সমান কৌতূহল। সৃষ্টির মহান সৌন্দর্য্য, আর ধ্বংসের নির্লজ্জ মূর্ত্তি দুটোই দেখতে চায় সে।

অমৃতসরে এসে যদি স্বর্ণমন্দির দেখবে তো, জালিয়ানওয়ালাবাগও দেখে এসো।

নৃশংস হত্যাকান্ডের লীলাভূমি জালিয়ান-ওয়ালাবাগ বৃটিশ কুকীর্ত্তির চিহ্ন বহন করছে। বাগিচার আশেপাশের দেওয়ালের গায়ে গায়ে বুলেটের ক্ষতচিহ্নগুলি ঘিরে রাখা হয়েছে কাঠের ফ্রেমে আঁটা তারের জালতি দিয়ে। অর্থাৎ রক্ষিত থাক এই কলঙ্কিত চিহ্নগুলি, চিরকাল সচেতন রাখুক দেশবাসীকে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

গাড়ী পাঠানকোটে পেঁছল রাত্রে।

সারারাত ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে ভোর বেলা প্রস্তুত হতে হলো বিমানঘাঁটির উদ্দেশে। জায়গাটার নাম বোধ হয় মাধোপুর, সেখানে ঘন্টা দুই কাটলো নানান লেখালিখি, পারমিট পরীক্ষা আর ওজন ইত্যাদির ব্যাপারে। অবশেষে সময় হলো।

ছোট্ট সিঁড়িটায় ঠেলাঠেলি!

তারপর কাঁপলো সুদর্শনচক্র। গরুড়পক্ষী ডানা ঝাপট্‌লো মাটি ছেড়ে উঠছে আস্তে আস্তে। নীচের দৃশ্য ছবির মতো হয়ে আসছে!

কাশ্মীরের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হলো শ্রীনগরের মাটিতে ট্যাক্সীস্ট্যান্ডে।

বেলা দশটা, আশ্বিনের রোদে ঝকঝক করছে আকাশ আর মাটি, শীতের দেশ বলে মনেই হচ্ছেনা। তাকিয়ে দেখলাম চারদিক! সত্যি বলতে কি প্রথম দৃষ্টিতে যেন হতাশই হয়ে-ছিলাম! মনে হলো এই কাশ্মীর! এই ভূস্বর্গ! আবার একটা কথা মনে পড়ে আশা এলো। মনে পড়লো এমনি হতাশ হয়েছিলাম প্রথম তাজমহল দেখে। দেখেছিলাম দিনের বেলা দূর থেকে! মনে হয়েছিল এই তাজমহল!

তারপর দেখলাম কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে দুধের ফেনার মতো জ্যোৎস্নায়! মনের সুর বদলে গেলো। চোখের দরজার গন্ডী পেরিয়ে মনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হলো তাজমহল!

চোখ তুলে তাকালাম!

দেখলাম একেবারে চোখের সামনে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের শ্রেণী! মনে হলো বুঝি আমার অবস্থা বুঝে ফেলে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ কৌতুকের হাসি হাসছে।

সত্যিই, যেমন কোন মানুষকে প্রথম দৃষ্টিতেই বিচার করা চলেনা; তেমনি কোন দেশকেও। নতুন দেশকে জানতে হ'লে প্রয়োজন একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের, একটি বিশেষ পরিবেশের। দোকান বাজার ষ্টেশন পোষ্টআফিস অথবা টাঙা ট্যাক্সীর স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে যে দেশের আত্মাকে বিচার করতে চাওয়া মানেই তার প্রতি অবিচার।

উদ্যানের শিল্পচাতুর্য্যে আর সবুজ শ্যামল সিঁড়িক্ষেতের প্রাচুর্য্যে আর সমারোহে।

দিনে আর রাত্রে সকালে আর সন্ধ্যায় তার নতুন নতুন রূপ।

হানাদারদের আক্রমণ শ্রীনগরের অনেক শ্রী নষ্ট করেছে, নষ্ট করতে পারেনি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

কাশ্মীর উপত্যকার উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্প কত কিছু আছে। কাশ্যপ মুনির নাম থেকে না কি কাশ্মীর।

একদা 'জলোদ্ভব' নামে এক ক্রূরনাগকে নিধন করতে হিমালয় কন্যা পার্ব্বতী না কি—'সারিকা'র (ময়না পাখী) মূর্ত্তি ধরে জনবাসী



সোনমার্গের হিমানী প্রবাহের কাছে

'ভূস্বর্গকে' অনুভব করেছি বৈ কি!

অনুভব করেছি চারিদিকে পাহাড়ঘেরা হ্রদের-জলে ছোট্টভেলায় চড়ে ভাসতে ভাসতে, অনুভব করেছি 'সোনমার্গে' যেতে 'সিন্ধুনালা'র অপরূপ নৃত্যছন্দের রূপবৈচিত্র্যে, আর 'সোনমার্গে'র উপরে হিমানী প্রবাহের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। অনুভব করেছি পহলগ্রামে হিমরাত্রির প্রহর গুণতে গুণতে।

কাশ্মীরের রূপ দেখেছি গুলমার্গের বিস্তীর্ণ উপত্যকায়, খিলেনমার্গের বন্ধুর চড়াই পথের ভয়ঙ্করা আনন্দের মধ্যে, দেখলাম মোগল

নাগের উপর একটি পাথরের নুড়ি ফেলেছিলেন, আর সেই নুড়ি বাড়তে বাড়তে একটি পর্ব্বতাকার ধারণ করে জলোদ্ভবকে পিষে মারে। সেই পাহাড়টিই না কি এখন কার 'হরিপর্ব্বত'। ডাল হ্রদের বুক থেকে উঠেছে।

এই হরিপর্ব্বতের মাথায় আকবরের প্রতিষ্ঠিত দুর্গ আছে, মুসলমানদের মসজিদ্ আছে, শিখদের গুরুদ্বার আছে, আর আছে হিন্দুর 'সারিকা' দেবীর মন্দির।

পৌরাণিক গল্প বাদ দিলে—দেখা যায় পূর্ব্বকালে প্রায় চারহাজার বছর ধরে হিন্দু

রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। তারপর খৃষ্টপূর্ব্ব দু'শো পঞ্চাশ শতকে মহারাজ অশোক কাশ্মীর জয় করেন, এবং তারপর এখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধদের পর আবার হিন্দু মুসলমানদের আমলে শ্রীনগরের অনেক ভাঙাগড়া ঘটেছে। কেউ বা তার শ্রী নষ্ট করেছে, কেউ শ্রী বৃদ্ধি করেছে। এই উত্থান পতনের বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে কালের চাকা।

বর্ত্তমানেও এই কাশ্মীরকে নিয়েই ইতিহাসের যে বিরাট অধ্যায় রচনা হচ্ছে, এ-দেশে তার তুলনা মেলা ভার। যে শেখ আবদুল্লা একদিন 'শেরই কাশ্মীর' নামে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে পূজিত হয়েছেন, আজ সেই শেখ আবদুল্লার ভন্ডামির মুখোস খুলে পড়েছে। ষড়যন্ত্রের অপরাধে শেখ আবদুল্লা আজ বন্দী।

তবু সমস্যার শেষ হয়নি, আজও কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ দুশ্চিন্তাজনক। কাশ্মীর তো শুধুই একটি সৌন্দর্য্যময়ী উপত্যকা মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবর্ষের একটি প্রধান দরজা। তাই তাকে নিয়ে এতো কাড়াকাড়ি এতো হানাহানি।

কাশ্মীরের বিশেষত্ব নৌ-গৃহ বা হাউসবোট

কাশ্মীরে যাঁরা বেড়াতে যান হাউসবোটই তাঁদের কাছে সব থেকে আকর্ষণীয়। কারণ ভারতবর্ষের আর কোথাও তো এই মজাটি নেই। আর কাশ্মীরের সর্ব্বত্রই যেখানে জল সেখানে হাউসবোটের ব্যবস্থা।

অবশ্য হোটেলও অনেক আছে। অস্থায়ী যাত্রীর দেশ কাশ্মীর, কাজেই নানা শ্রেণীর নানা ধরণের অসংখ্য হোটেল সাজানো আছে বহিরাগতদের জন্যে। শীতের সময় বন্ধ থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যাঁরা আসেন তাঁরা সাধারণতঃ হোটেলগুলিতেই ওঠেন। যতদূর দেখলাম বাঙালী ভ্রমণকারীদের বিশেষ প্রিয় হচ্ছে এই হাউসবোট। তবে এও তো হোটেলই, জলহোটেল এই আর কি! বোটের মালিকই হোটেলওয়ালা। তার হাতে টাকাটি ধরে দাও, আর আরামসে খাওদাও ঘুমোও এবং বেড়াও। বোটওয়ালা তোমার জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব কিছুর ভার নেবে। আবার শুধু বোটে থেকে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্থা, অথবা নিজেরা রেঁধে খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

ভিতরের ব্যবস্থা মোটামুটি এই সামনেই একটি কমনরুম, তার পাশ দিয়ে সরু লম্বা করিডোর আর তার গায়ে গায়ে সারি সারি ঘর। দরকার অনুসারে ঘর ভাড়া নেওয়া চলে। কেউ বা পুরো বোটও নিতে পারেন।

সব বোটেই ঘর খুব সাজানো গোছানো।



হাউসবোটের মেলা—জল হোটেল

বিশেষ করে কমনরুম। সেখানে জরি-মখমল রেশম কার্পেটের ছড়াছড়ি। অবশ্য সব জিনিসেরই যেমন উত্তম মধ্যম অধম তিন শ্রেণী আছে, বোটেরও তাই। তবু মোটামুটি সকলেই প্রাণপণে সাজিয়ে রাখে।

আমাদের কিন্তু বোটে থাকা সম্ভব হলো না, অসুবিধে ছিলো। আমরা একটা হোটেলে উঠলাম। কেবলমাত্র নিরামিষাশীদের জন্যই এই হোটেলটি। ব্যবস্থা মন্দ নয়।

ক'দিন আগে আমাদের একটি বন্ধু পরিবার কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং উঠেছেন ডাল হ্রদে হাউসবোটে। দেখা করতে গেলাম একদিন। ঘাট থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি! কী চমৎকার দৃশ্য!

সারি সারি বোট, ঝাঁকে ঝাঁকে বোট, যতোদূর দৃষ্টি চলে শুধু বোট আর বোট! ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের, জানলা দরজায় বিচিত্র বাহারি বাহারি পর্দার ঝালর ঝুলছে, কারো কারো বা ছাতের উপর রেলিংদিয়ে ঘেরা বসবার জায়গা। হালকা চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো। যেগুলো লোক ভর্ত্তি সেগুলি যেন অহংকারে ভারী হয়ে বসে আছে বড়লোকের গিন্নীর মতো, আর যে গুলো খালি তারা কপালে 'টুলেট' মার্কা টিকিট এঁটে যেন যাত্রীদের করুণা ভিক্ষা করছে। অবশ্য শেষ অবধি খালি কেউই থাকে না। সকল বোটেরই বেশ সৌখিন নাম থাকে। আমাদের বন্ধুরা যাতে উঠেছিলেন, তার নাম 'মে কুইন'। নাম জানতাম, পড়তে পড়তে ঘাটের পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম। ও'রা দেখতে পেয়ে শিকারা পাঠিয়ে দিয়ে ডাকছেন। যেতে হলে তো জল পার হতে হবে। শিকারা হচ্ছে ছোট ডিঙ্গি। প্রত্যেকটি বোটেরই নিজস্ব একখানা শিকারা থাকে ঘাট থেকে বোট আর বোট থেকে ঘাট পারাপার করতে। এগুলির তেমন সাজ সজ্জা নেই৳ হয়তো একটা করে বালক মাঝি, তাদের হাতে হরতনের টেক্কার মতো মোথাওয়ালা বৈঠা। সেইটা ছপছপিয়ে মুহূর্ত্তে এপার ওপার করছে।

বন্ধুরা খুব খুসি। বললেন "হাউসবোটের ব্যবস্থা, এবং মালিকদের ব্যবহার খুব চমৎকার! কাশ্মীরের প্রধান বিশেষত্ব হাউসবোটে বাস করার আনন্দটাই হারালে তোমরা!"

যাইহোক কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থলগুলি দেখার জন্যে পরামর্শ করতে এসেছিলাম, ও'রা বললেন, ও'রা প্রায় সবই সেরে ফেলেছেন।

দ্রষ্টব্য স্থল?

গড়গড় করে নাম বলে গেল বন্ধু কন্যা!

"গুলমার্গ, খিলেনমার্গ, সোনমার্গ, পহল গ্রাম, মোগল গার্ডেনস্, নেহরু পার্ক, কবুতর-খানা, শঙ্করাচারিয়া পাহাড়, উলার, ক্ষীর ভবানী, গদাউরের স্বর্ণমন্দির, নূরজাহানের পাথর মসজিদ, লালমন্ডীর যাদুঘর, প্রতাপসিং লাইব্রেরী, রেশমের কারখানা, পশম মিল, কনভেন্ট কলেজ, জম্মু কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি, শেরগড় প্রাসাদ, গান্ধী পার্ক, 'করণ নগর', অমর সিং ক্লাব, স্টেট্ গেট হাউস, কাশ্মীর এমপোরিয়ম, সেন্ট্রাল মার্কেট, রেডিও স্টেশন,—"

আমি হেসে ফেলে হাত জোড় করে বলি "দোহাই তোমারা আর বোলো না। শেষ পরে যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে, চলে যেতে হবে, মনে হবে হায় হায় তিনভাগ দ্রষ্টব্যই তো দেখা হলো না!"

বন্ধুও হাসলেন। এবং বাজে বাজে ঘুরে অর্থ এবং সময়ের অপচয় না করে সদ্ব্যবহার করতে পরামর্শ দিলেন। আর অবহিত করিয়ে দিলেন নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে। যথা দূর দূর জায়গা গুলি স্টেটবাসে চড়ে যাওয়াই ভালো, আর মোগল উদ্যান ও বিতস্তার দুধারে সহরের দ্রষ্টব্যগুলি শিকারায় চড়ে। এখানে টাঙা শিকারা ইত্যাদি সব কিছুরই ভাড়ার দর বাঁধা। সরকারি ছাপানো নোটিস ওদের কাছেই থাকে। ......যেটা দেখতে না চাইলেই বেদম দর হেঁকে বসে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া বন্ধু এ তথ্যও পরিবেশন করলেন পহল গ্রামে টাকায় চারশো আখরোট, বন্দীপুরে আধমুনি আপেলের ঝোড়া মাত্র দশ-টাকা। অন্য জিনিশ পত্র যা কিনবো, কাশ্মীর এমপোরিয়ম থেকে কেনাই ভালো নইলে ঠকতে হবে, যেখানে যেখানে 'আসন উলার হ্রদের পদ্ম-

মধু' বলে যেগুলো বেচে সেগুলো স্রেফ চিনির রস, এই সব গল্প।

অনেক রাতে উঠলাম! এখন অন্ধকারে জল ছপছপিয়ে ডাঙায় আসতে হবে।

এখানে ডালহ্রদের জলের কথাটা বলি।

জলের অপচয়কে বন্ধ করবার জন্যে সব জলকে একটি খালে বইয়ে দিয়ে তাকে ক্রমেই সংকীর্ণ করে এনে দুটি কাঠের ফটকের মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে, একে বলে 'ডাল গেট্' বা 'ডাল দরজা'। প্রথম দরজা খুললেই ডালের জল তার মধ্যে ঢুকে পড়ে দ্বিতীয় দরজা পর্যন্ত যায়, সঙ্গে সঙ্গে জলের উচ্চতা বেড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নৌকো ও শিকারাগুলোও ঢোকে। তারপর প্রথম দরজা আটকে রেখে আস্তে আস্তে দ্বিতীয় দরজা খোলা হয়, জল বেশ খানিকটা কমে গেলে ভেতরের নৌকো গুলিকে বার করে দেবার জন্যে ফটক পুরো খুলে দেওয়া হয়। দিনের মধ্যে অনেকবার এরকম করে জল নিয়ন্ত্রণ করা হয়! শিকারা চড়ে বেড়াবার সময় হঠাৎ এই গেট বন্ধ, গেট খোলার ব্যাপার হলে, বেশ একটা আমোদের ব্যাপার হয়!

শিকারা

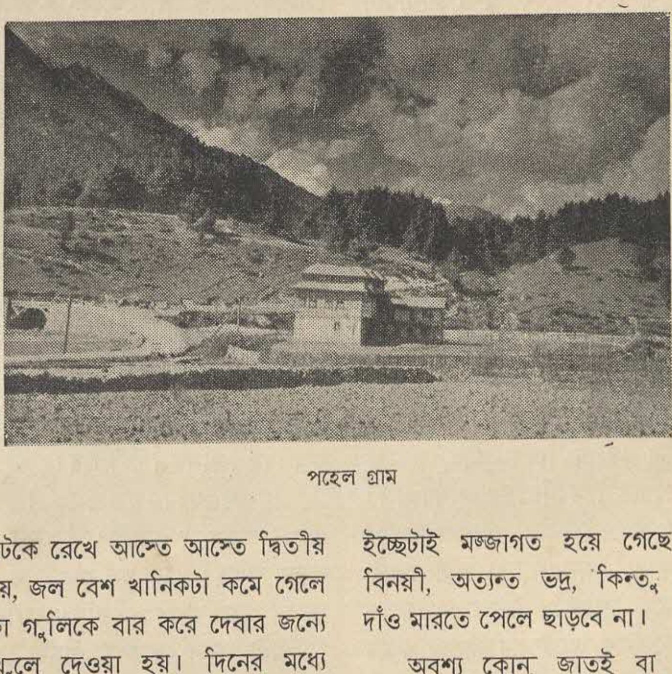
যে গুলি বেড়াবার শিকারা তার নাম 'ট্যাক্সী শিকারা'। এ-গুলি খুব জমকালো সাজানো, স্প্রিংয়ের গদি দেওয়া। মাত্র দু'জনের বসবার মতো সীট! যেন 'জল রিকশা'!

কাশ্মীর দীর্ঘকাল ধরে বৃটিশ শাসকদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন, আর প্রমোদ ভ্রমণের জায়গা ছিলো বলে এদের সাধারণ বা শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে অনেক ইংরেজী শব্দের চলন দেখা যায়। আবার বোধকরি এদের লোভী স্বভাবের জন্য দায়ীও ওই সাহেবরাই।

সাহেবরা এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যশালী দেশে এবং অপূর্ব শিল্পকলার দেশে এসে যা দেখেছে, তা'তেই মুগ্ধ হয়েছে, আর সব জিনিসই স্থানীয় লোকেদের তুলনায় দশগুণ দাম দিয়ে কিনেছে। কাজেই এদেরও দাঁও পেয়ে পেয়ে দাঁও মারবার ইচ্ছেটাই মজ্জাগত হয়ে গেছে। এরা অত্যন্ত বিনয়ী, অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু বেজায় লোভী। দাঁও মারতে পেলে ছাড়বে না।

অবশ্য কোন্ জাতই বা ছাড়ে? এটা এ যুগের ধর্ম!

তবু এও ঠিক এমন গরীব দেশও অল্পই আছে। দেখলে আশ্চর্য্য লাগে,—যে দেশের 'কুটির শিল্প' এতো উঁচুদরের আর এতো দামী, সে দেশের কুটিরবাসীরা কী দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ওদের শিল্পপটুত্বকে মূলধন করে ব্যাবসায়ীরা কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছে, আর বরফঝরা



পহেল গ্রাম

দেশে ওদের ছেলেদের পায়ে একজোড়া জুতো জোটেনা, গায়ে জোটেনা একটা গরম জামা। কাঠকয়লার আগুনই ওদের একমাত্র ভরসা। সকলেই গলায় একটা করে 'কাব্‌ড়ী' (আগুনের পাত্র। সাজির মত দেখতে) ঝুলিয়ে বেড়ায়। অথচ এই আগুন থেকে বিপদও কম হয় না।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা কাশ্মীরে যে এতো ভিখিরির প্রাদুর্ভাব তা' আগে ধারণা ছিল না।

'মিস্কিন্' 'মিস্কিন!' পথ চললেই, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে একপাল ছেলেমেয়ে। খালি পা, ধূলিধূসর রুক্ষ চুল, গায়ে শতছিন্ন, বিদীর্ণ একটা সুতিজামা মাত্র, লালচে ফরসা ফুলোফুলো অথচ শুকনো মুখ, এবং মুখে অদ্ভুত একটা বুলি! যেটা শুনতে কানে লাগে 'মিস্কিন্' 'মিস্কিন্'! একটি দুটি পয়সার জন্যে গাড়ীর পিছন পিছন একমাইল দু'মাইল ছুটে চলে।

আমার বন্ধু বললেন "এটা এদের অভাব নয়, স্বভাব। এরা জাত ভিখিরি।"

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

অভাব যে ওদের আপাদ মস্তকে আঁকা রয়েছে। যুগ যুগান্তরের অভাব! কাশ্মীরের জীবনধারায় ভারসাম্যেরও অভাব। তার একদিকে ঐশ্বর্য্য আর আড়ম্বরের বিপুল বন্যা, আর অপরদিকে তীব্র দারিদ্র্যের রুক্ষতা। একদিকে 'শেঠ' সম্প্রদায় আর অপর দিকে শুধু শ্রমিক আর ভিখিরি! মধ্যবর্ত্তী মধ্যবিত্তের সংখ্যা কম।

'শেঠ' কথাটা বলতেই মনে পড়লো এদের দোকানীদের সম্বোধন! জামাজুতো পরা লোক মাত্রেই এদের কাছে শেঠজী! রাস্তায় চলছো, হঠাৎ যেন মাটিফুঁড়ে কে একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো! বিনয়ে গলে গিয়ে হাত জোড় করে ডাকছে 'শেঠজী শেঠজী'!

দেখে যাও ওর দোকানটা এই অনুরোধ।

'দরকার নেই' বললে ছাড়বেনা, একেবারে না ছোড়। অবশ্য যুক্তিটাও ওদের অকাট্য। "এতো কষ্ট করে, এতো খরচ করে এতো দূর থেকে কাশ্মীরে এসেছো, একবার অন্তত দেখেও যাবেনা তার শিল্পকলার নমুনা? একবারও চোখ যাবেনা তার সুগন্ধী সুরসাল আপেল ফল আর আঙুর বেদানা পীচ্ আখরোট? দেশের জন্যে একটুও অন্তত নিয়ে যাবেনা কাশ্মীরের বিখ্যাত সুর্মা, জাফরাণ মধু?"

তবে দরহাঁকার ব্যাপারে আগেই বলেছি কাশ্মীরের দোকানদার গুলি যেন যুধিষ্ঠিরের অবতার! প্রথমে এমন করে বলবে, মনে হবে এমন খাঁটি দর বলে বসেছে যে একটি আধলাও কমাবার জো নেই ওর। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত?

যে জিনিশটি হয়তো আটাশ টাকার এক পয়সা কমে ছাড়তে হলে তাকে লোকসান খেতে হবে বলে মাথা খুঁড়বে, দিব্যি গালবে, গড়াগড়ি খাবে, সেই জিনিশই শেষপর্য্যন্ত আট টাকায় দিয়ে সেলাম ঠুকে হাসিমুখে "আবার মেহেরবানী করবার" অনুরোধ জানাবে।

বিনয় আর মিষ্ট বচনে এদের জুড়ি বোধহয় ত্রিভুবনে নেই। যাঁরা দরকসাকসি করতে আমোদ পান, এবং "বাহান্ন টাকার জিনিশ বাইশ টাকায় সওদা করলাম" বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে উৎফুল্ল হতে পারেন, কাশ্মীরের বাজার তাঁদের কাছে আদর্শস্থল।

তবে দোকানীদের এই রকম অসাধুতার জন্যে কাশ্মীর সরকার 'কাশ্মীর এমপোরিয়াম' খুলে দিয়ে বিদেশী যাত্রীদের অনেক সুবিধে করে দিয়েছেন। সেখানে সরকারের বেঁধে দেওয়া দরে যাবতীয় জিনিশ বিক্রী হয়।

কিন্তু ফেরিওলার কাছে সওদা করার আলাদা একটা আস্বাদ আছে। বিশেষ করে মেয়েদের মনের কাছে। এরা সে কথাটা খুব ভালো বোঝে বলেই জলে জলেও জিনিশ ফেরি করে বেড়ায়!

এই "জল দোকান" গুলি ছোট ছোট খেয়া নৌকোর মত। সেই ভাসন্ত দোকানে —'নেই' এমন জিনিশ নেই। শাল দোশালা র‍্যাপার স্কার্ফে রেশম জরী মালা পাথর সুন্দর সুন্দর কাজকরা জামা, অপূর্ব্ব সুন্দর সুন্দর কাঠের কাজ, বেতের কাজ, কাগজ মন্ডের কাজ কার্পেট 'গাববা' আসন তামার আর রুপোর নানাবিধ সৌখিন বাসন ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প দ্রব্যের সম্ভার নিয়ে তো বেড়াচ্ছেই, তা ছাড়াও আছে—

ফলওয়ালা, সব্জীওয়ালা, মাছ-মাংসওয়ালার দল। এক কথায়,—প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব কিছু সামগ্রীর পশরা সাজিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ওরা, বৈঠা দিয়ে জল ছপ ছপ করতে করতে। আর হাউসবোটের ধারে ধারে ছেঁকে ধরে হাঁক পাড়ছে 'শেঠজী শেঠজী'।

'ফিরে তাকাবোনা' ভাবলেও তাকাতে বাধ্য হতে হবে। আর তাকালেই টপাটপ বোটে চড়াও হয়ে খুলে ধরবে আপন আপন পশরা। তার পর অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ। যার শেষ পরিণতি 'ঢেঁকি গেলা।'

বিতস্তা

পরদিন আমরা প্রথম শিকারা চড়ে বেড়াতে বেরোলাম!

৪। জৈন কদল বা জেন্না বদল
৫। আলি কদল
৬। নওয়া কদল
৭। সাফা কদল

এ-গুলি এক একজন বিখ্যাত লোকেদের দ্বারা তৈরি, এবং তাঁদের নাম অনুসারেই এদের নাম।

বিতস্তার ধারে ধারেই গড়ে উঠেছে সহর।

মাঝে মাঝে নৌকো ভিড়িয়ে নেমে নেমে কিছু কিছু দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে নেওয়া হচ্ছে। আর হচ্ছেও না। তবে এই ভাবে সহর এগিয়েছে, ডানদিকে অমরসিং ক্লাব, স্টেট্ গেষ্ট হাউস, শ্রীনগর ক্লাব, কাশ্মীর এমপোরিয়ম, ভিজিটার্স বুরো, জেনারেল পোষ্ট অফিস, পোষ্ট অফিসের পিছনে বাঁধের নিচে রেসিডেন্সি, রেডিও স্টেশন,



বোটের দোকান

শ্রীনগরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বিতস্তা। বিতস্তার জলধারাই শ্রীনগরের ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা বজায় রেখেছে। সহরের মাঝখান দিয়ে নদী, কাজেই দুই তীরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে সেতুর দরকার। বিতস্তার বুকে সাতটি সেতু আছে। ওদের ভাষায় 'কদল'!

১। আমীরা কদল (অপভ্রংশে মীরা বদল)
২। হাববা কদল বা হাওয়া বদল
৩। ফতে কদল

শেরই কাশ্মীর পার্ক, এবং বাঁধের উপরে ঝিলমের তীরে হাইকোর্ট, লয়েড্স ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আর দোকান আর দোকান। দোকানের শোভাযাত্রা!

এই ডানদিকেই একটী অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম! দোতলা একটি মসজিদ, তার নীচের তলাটা হচ্ছে মহাকালীর মন্দির। পরিত্যক্ত মন্দির নয়, দেবীর নিয়মিত পূজা হয়। এর কিংবদন্তী গল্পটি জানবার চেষ্টা করলাম,

পেলাম না। এ হিসেবে এখানের মাঝিগুলো এক একটি ভূত বিশেষ। কোন কিছুর তথ্য বলতে পারেনা, এমন কি আমাদের দেশের লোকের মতো বানিয়েও না।

বাঁদিকে পড়ছে—

কনভেন্ট কলেজ, সরকারি রেশমের কারখানা, পশম মিল, হাসপাতাল মিউজিয়াম, প্রতাপসিং লাইব্রেরী, জম্মু-কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি শেরগড় প্রাসাদ, গদাধরের স্বর্ণ মন্দির, গান্ধী পার্ক, পাথর মসজিদ, করণ নগর ইত্যাদি।

মাঝিরা এর সবগুলিকেই 'দ্রষ্টব্য' বলে।

ভাবলাম বন্ধুর মেয়েকে গিয়ে খবর দিতে হবে, 'তুমি যেমন এক নিঃশ্বাসে আউড়ে গিয়েছিলে নামগুলো, তেমনি একনিঃশ্বাসে অনেকগুলো সেরে নিয়েছি'।

কিন্তু কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য কি ওই ইটকাঠ গুলো?

মোগল উদ্যান

বিলাস ব্যসন এবং সখের খেয়ালে অপব্যয়ের যে বিরাট নমুনা মোগল বাদশারা দেখিয়ে গেছেন, ভারতের ইতিহাসে অন্যত্র তা' দুর্লভ।

ধর্মপ্রাণ হিন্দু প্রধান ভারতের প্রধান ঐতিহ্য ছিল তার দেব মন্দিরগুলি। প্রাচীনকাল থেকে ভারতের অধিকাংশ ঐশ্বর্য্য সম্ভারই পুঁজি হয়ে থেকেছে দেবতার নামে। যেন দেবতাই দেশের প্রকৃত রাজা, রাজা তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

যাগ যজ্ঞ ব্রত পূজা ইত্যাদি কাজে ব্যয় এবং অপব্যয়ের লেখাজোখা ছিল না, এবং প্রাচীন ভারতের সমস্ত শিল্প ও সৌন্দর্য্য চর্চা গড়ে উঠেছিল মন্দির আর বিগ্রহকেই কেন্দ্র করে।

এদিকে মোগল আমলে লেখা-জোখাহীন অর্থের অপব্যয় হয়েছে নবাব বাদশাদের খেয়ালে আর বিলাসিতায়। কতো হাজার হাজার মানুষের রক্ত জল হয়ে যাওয়া শ্রম, আর কতো লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত জল করা অর্থ বিনা দ্বিধায় খরচ করেছেন তাঁরা অকারণ সখে, ভাবলে অবাক লাগে।

মানবতার দিক দিয়ে এ-গুলির সমর্থন করা যায় না।

তবু ভুল থেকেও ফুল ফোটে!

অপব্যয়েরও অবদান থাকে।

তার পরিচয় তাজমহল! তার পরিচয় উত্তর ভারতের বহু অপূর্ব্ব স্থাপত্য কীর্ত্তির! মোগল বাদশাদের আমলে শিল্প কলা ও সৌন্দর্য্য বিকাশের যে ব্যাপক অনুশীলন ঘটেছিল, সেও বোধকরি ভারতের ইতিহাসে অন্যত্র দুর্লভ!

কাশ্মীরের মোগল উদ্যান গুলি দেখে বেড়াতে বেড়াতে নতুন করে এই কথা গুলোই মনে উদয় হচ্ছিল! মনে হলো এও এক অপব্যয়ের অবদান! কিন্তু কী অপূর্ব্ব সুন্দর এর পরিকল্পনা! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শকদের জন্য এ এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের পসরা ধরা আছে। কালের স্পর্শে অনেক ম্লান হয়ে গেছে সত্যি, তবু ও আশ্চর্য্য সুন্দর!

ভাবলে অবাক লাগে, সে-সময় না ছিলো উড়োজাহাজ না ছিলো রেলগাড়ী, এমন কি মালবাহী বা মানুষবাহী কোন দ্রুতযানই নয়। তখন কেবলমাত্র হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে, দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য পথ ডিঙিয়ে কাশ্মীরের নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকায় পাহাড়ের গা কেটে কেটে এই সিঁড়ি বাগানগুলি নির্মিত হয়েছিল কি করে?

শোনা যায় পূর্ব্বে নাকি এ রকম বাগান আরো অনেক ছিল, বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্য মাত্র এই কটি আছে। 'শালিমার বাগ', 'নিসাদ বাগ' 'চশমাশাহী' এবং 'আচ্ছাবল' ও 'ভৈরিনাগ'।

শালিমার বাগ তৈরি করিয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে। অদ্ভুত এর স্থান নির্বাচন! যে দিকে তাকাই সে-দিকে পাহাড়। পাহাড় যেন বাগানের শেষ প্রান্তটুকু ছুঁয়ে ছুঁয়ে আছে। এর পিছনের পাহাড়টির নাম মহাদেব পর্ব্বত!

পরপর চার পাঁচটি ধাপে ধাপে বাগান!

দু'ধারে পথ আর মাঝখান দিয়ে—উপর ধাপ থেকে ছাড়া ফোয়ারার জলরাশি ঝরণার মত নেমে এসে সামনের খালে পড়ছে। এই খালের নীচেই শিকারা এসে ভিড়ে। প্রতিটি চাতাল যেন সবুজ

কার্পেটে মোড়া! এমন উজ্জ্বল সবুজ ঘাস সহজে চোখে পড়েনা। মখমলি উজ্জল!

মাঝে মাঝে বাহারি করে ছাঁটা ঝাউ, উইলো ও অন্যান্য গাছ, আর রাশি রাশি নানা বিচিত্র রঙের ফুল গাছের কেয়ারি। জানিনা সেই অতীতকালে এখানে কোন সৌরভ আকুলিত পুষ্পস্তবকের সমারোহ ছিল। হয়তো বা গোলাপ, হয়তো বা আর কিছু! না জানি কি মনোরম ছিল তখন!

এখন শুধু কোমল উজ্জ্বল সীজ্ন ফ্লাওয়ারের ঘটা! তা'ও তাকিয়ে দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না!

শালিমারের তিনটি চাতালে তিনটি বিশ্রাম কুঞ্জ। সবচেয়ে বড়টি না কি নূরজাহান ও তাঁর সখীদের জন্যে তৈরি হয়েছিল। এর মেজেটি এমন একটি পালিশ করা কালো মার্বেল পাথরে মোড়া, যে আজও তার পালিশ নষ্ট হয়নি। আর্শির মত চকচক করছে!

'শালিমার' থেকে ফের শিকারা ছেড়ে যাত্রা করা হলো নিসাদবাগের উদ্দেশ্যে জলপথের দূরত্ব প্রায় দু'মাইল!

দু'পাশের দৃশ্য চমৎকার সুন্দর!

চোখ তুললেই পাহাড়, চোখ নামালেই জলের নীচে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক জগৎ! আর দু'পাশে গ্রামীন জীবন-যাত্রার চকিত আভাস!

জলের নীচে গাছপালা লতাপাতার এক আশ্চর্য্য জগৎ! অথচ সে গাছের শিকড় নেই জলে ভাসে। এই গাছগুলি এমন ঘন যে এর উপর মাটি ফেলে চাষীরা ছোট ছোট বাগান বা ক্ষেত তৈরি করে। ফল সব্জী এমন কি বড় বড় তরমুজ পর্য্যন্ত। আমরা একটা টম্যাটোর ক্ষেতে প্রচুর টম্যাটো ফলে থাকতে দেখলাম! এই 'ভাসন্ত বাগান' গুলি দড়ি বেঁধে টেনে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তাতে সুবিধে আছে বটে, আবার বিপদও আছে। মাঝে মাঝে বাগানকে বাগান চুরি হয়ে যায়। বেচারা চাষা রাতে প্রাণ-ভরা ক্ষেতটি দেখে গেল, সকালে এসে দেখলো একেবারে ফর্সা! কে কখন মাঝরাতে দড়ি বেঁধে টেনে লোপাট করে দিয়েছে!

মাঝিটা ছপাৎ ছপাৎ করে জল কেটে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাতাস উঠেছে মনোরম, মনে হচ্ছিলো অনন্তকাল ধরে এমনি ভেসে চলি!

নিসাদবাগটি বাইরে থেকে দেখতে যেন জেলখানার মত। নীরেট উঁচু খাড়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কে বলবে এর মধ্যে লুকোনো আছে নন্দনকানন! প্রাচীরের গেটে ঢুকলেই তাজ্জব!

ডালের তীর থেকে সুরু করে পর পর দশটি চাতাল উঠে গেছে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে, একেবারে পাহাড়ের কোলে। অর্থাৎ দশতলা বাগান।

এর দোতলায় একটি কাঠের ঘর আছে।

তার বন্ধ দরজা খোলার চাবিটি (অর্থাৎ কিছু পয়সা) মালির হাতে দিতেই, সে দোতলায় ওঠবার দরজা খুলে দিলো। এখান থেকে বাগানের আর জলের দৃশ্য যে কী অপূর্ব্ব তা না দেখলে বোঝা যায় না। এই দোতলা বারান্দা থেকে না কি বেগমরা ডালের সৌন্দর্য্য দেখতেন!

দশতলা বাগান!

এখানেও সেই সমস্ত চাতালগুলি মখমলি সবুজ ঘাসে মোড়া। আর পাশে পাশে ঝাউগাছ উইলো গাছ এবং কেয়ারি করা ফুলের চোখ ভোলানো দৃশ্য! ওপরতলা থেকে নীচের তলা পর্য্যন্ত ফোয়ারা, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে আসছে সেই জলধারা! যে জল ধাপে ধাপে পড়ছে, ভাঙছে, ছিটকোচ্ছে, ঠিকরে উঠছে। খাঁজে খাঁজে ভেঙে ভেঙে চপল মেয়ের মত নাচতে নাচতে নেমে আসা সেই অজস্র জলকণা গুলির কী তুলনা দেবো?

হীরের কুচি? ফুলঝুরি?

না হীরের ঝুরি?

ওরই মাঝখানে মাঝখানে যেন আপন আনন্দে উথলে উথলে উঠছে ফোয়ারার ফিন্‌কিগুলি! সুন্দর!

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, সব বাগানেই ফোয়ারার জল ছাড়া হয় মাত্র রবিবারে রবিবারে। কাজেই বাগানের প্রকৃত রূপ দেখতে হলে রবিবারেই আসতে হবে। জলই এর সৌন্দর্য্যের প্রাণ!

একেবারে পিছনের চাতালের প্রাচীরের ধারে আপেল বীট্ ও অন্যান্য কি সব ফলের গাছ। মালিদের ভয়ে হাত দিতে সাহস হলো না। বেলা পড়ে এসেছে, উপর তলার চাতালগুলি ক্রমশঃ গভীর আর অন্ধকার হয়ে আসছে, অতএব ফেরা!

রবিবারে নিসাদ বাগের বাইরে প্রচুর ফল ও খাবারের অস্থায়ী দোকান বসে।

শিকারার সঙ্গে আমাদের কথা ছিল একদিনে সব 'বাগ' গুলি দেখিয়ে দেবে, কিন্তু আমরা নিজেরাই বিভোর হয়ে বসে থেকে দেরী করে ফেললাম, কাজেই চশমাশাহী বাকী থেকে গেল পর রবিবারের জন্যে।

'আচ্ছাবল' আর 'ভেরিলনগ' এবং 'ট্রাউট'মাছের পালন কেন্দ্র অন্যদিন দেখলাম টাঙায়।

চশমাশাহী শ্রীনগরের সবচেয়ে কাছাকাছি! তাই এখানে লোকের ভীড় বেশী। অনেকেই বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের নিয়েও ফ্ল্যাস্ক টিফিন ক্যারিয়ার ভরে নিয়ে চলে আসেন বেড়াতে একেবারে সারা দুপুরের মত। তবে এটি খুব ছোট। এর নির্মাতা সাজাহান। (১৬৩৩ খৃঃ)

মোগল বাগান গুলির পরিকল্পনা মূলতঃ একই ধরণের! তবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। চশমাশাহীর বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব এই, এর প্রথম চাতালটাই অনেক উঁচুতে! যেন একেবারে দোতলার বারান্দায় বাগান সুরু। অনেক গুলো সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেখানে যেতে হয়। অবশ্য সিঁড়ির দুটি ধার সাজানো আছে থাকে থাকে ফুলে আর পাতায়। একেবারে পিছনে শেষ চাতালে পাহাড়ের গায়ে একটি স্বতঃ উৎসারিত কুন্ড আছে, তা' থেকে অবিরাম জলধারা উছলে পড়ছে।

এই কুন্ডের জলে নাকি পেটের গোলমাল অম্বল অহজম ইত্যাদি সারে। মালিরা বললো 'এজল সোনার চেয়ে দামী'।

তেষ্টা না পেলেও অনেক যাত্রীই পেটভরে জল খেয়ে নিচ্ছিলেন!

মোগল বাগগুলির মধ্যে নিসাদ বাগই কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল!

নিসাদ বাগের পিছনে কাছাকাছি কোথায় না কি, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুস্থান! সেই শোচনীয় স্মৃতির জায়গাটা একবার দেখে আসবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক কোথায়, এবং দেখতে পাওয়া সম্ভব কি না কিছুই জানি না। সে দিন টাঙা করে বেরিয়েছিলাম, টাঙাওয়ালাকে অনেক অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হলো না।

তখনও শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুশোক সদ্য হয়ে রয়েছে, মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো। উদ্দেশে প্রণাম জানালাম বাঙলার সেই বীর সন্তানকে, যিনি এই দূর দূরান্তরের দেশে এসে শেষ নিশ্বাঃস ত্যাগ করেছেন!

কাশ্মীরে আধুনিক যুগের একটি উদ্যান নেহরু পার্ক! এর ও কারুকৌশল কম নয়! মোগল বাগগুলি পাহাড়ের কোলে, আর এ হচ্ছে জলের বুকে। জলের মাঝখানে দ্বীপের মতো এই পার্ক আয়োজন অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। যদিও আসলে এটি সরকারি স্কুলের ছাত্রদের নৌকো চালানো শেখার কেন্দ্র, কিন্তু এর রূপ-সজ্জা অতুলনীয়! বেড়াতে আসবার একটি প্রকৃষ্ট জায়গা!

রাত্রে নেহরু পার্ককে যেন একটি আলো ঝলমলে পরীর দেশ বলে মনে হয়। বিদ্যুত সরবরাহের ঘাটতির জন্য তখন দেশের সর্বত্রই মিটমিটে আলো, কিন্তু নেহরু পার্কের আলো গুলি ঝলমলে ঝকঝকে!

'আচ্ছাবল' এখন হতশ্রী দশাগ্রস্ত!

'ভেরিনাগ' ও তেমন কিছুই নয়!

উলার ও ক্ষীর ভবানী

উলার! উলার! কে জানে এ-নামের মানে কি? আসলে তো এর নাম 'কমল হ্রদ' হওয়াই উচিত ছিল! ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদ এই উলার হ্রদ তো পদ্মবনের জন্যই বিখ্যাত। উলারের পদ্মমধু চোখের অসুখেরও ঔষধ!

কিন্তু এখন অক্টোবরের শেষ, শোনা যাচ্ছে শীতের পদধ্বনি, পদ্মবন গুলি শুকিয়েছে। অফুরন্ত ফুটন্ত পদ্মের শোভা দেখবার সৌভাগ্য আর আমাদের হলো না। এখন শুধু শুকনো

পদ্ম পাতার জঞ্জাল। উলারের জল 'ডালের' জলের মত ঘন কালো নয়, সাদাটে স্বচ্ছ।

'টুরিস্ট বাসে' চড়ে বেরিয়েছিলাম উলার অঞ্চল দেখতে। এই দিকেই ক্ষীর ভবানী।

ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রোলারের অফিস থেকে আগের দিন টিকিট সরবরাহ করা হয়। বেলা আটটা নাগাদ বাস ছাড়লো!

ছুটন্ত বাসের হাওয়ায় শীতটা বেশ মালুম হচ্ছে। নইলে—এসে পর্য্যন্ত শীত বিশেষ কিছুই পাইনি। কলকাতার ডিসেম্বর জানুয়ারীর মতো। আমি তো প্রতিদিনই চিরকালের অভ্যাস অনুযায়ী সকাল বেলা কলের ঠান্ডা জলেই স্নান করেছি। হোটেলের ব্যবস্থামতো বেলা দশটায় গরম জল মেলে, কে অতো অপেক্ষা করে?

জলটা অবশ্য বরফ জলের সমান কনকনে, কিন্তু খুব মোটা ধারা। চট্‌করে একবার মাথা পেতে নিলেই হয়ে যায়।

ঠান্ডাজলে স্নানের জন্য আমার সঙ্গীরা রোজই মন্তব্য করতেন 'বিদেশে এসে স্রেফ্ গোঁয়ার্তুমির জন্যেই না কি প্রাণটা হারাতে হবে আমাকে।'

কিন্তু দিব্যি রইলাম আমি। না জ্বর না একটু সর্দ্দিকাসি। শীতের দেশে বেশ জবর শীত না হলেই কি ভালো লাগে?

বাস ছুটে চলেছে।

পথে পড়ে 'বিচার নাগ' ও গন্ধর্বল! (গন্ধর্ব বল?) 'বিচার নাগ' একটি হিন্দুতীর্থ, কিন্তু নেমে দেখবার সুযোগ হলো না। কারণ বাসগুলির নিয়মবাঁধা থাকে কোথায় থামবে আর কোথায় থামবে না। সহযাত্রীরা অনেকেই কন্ডাকটারকে অনুরোধ করলেন একটিবার থামতে। তিনি কিন্তু অটল। আবদার খাটবেনা কারো।

গন্ধর্বল সিন্ধু নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম, শ্রীনগর থেকে চৌদ্দ মাইল। গ্রীষ্মকালে নাকি এখানে বহু জনসমাগম হয়, হাজার হাজার ভ্রমণকারীর ভীড়ে ছোট্ট জায়গাটি সরগরম হয়ে ওঠে। সিন্ধু নদীর বুকে তখন অসংখ্য হাউসবোটের মেলা বসে। আবার তাতেও কুলোয় না, স্থলে পড়ে তাঁবুর মেলা। প্রকৃতির কোলে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করবার এই ব্যবস্থাই ঠিক। একেবারে সহর বাজারের মাঝখানে আস্তাগেড়ে গাড়ী চড়ে আর ছুটোছুটি করে শুধু 'দ্রষ্টব্য' দেখে বেড়ানোয় প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না।

কিন্তু উপায় কি? সকলের পক্ষেতো সম্ভব নয়—ধীরে সুস্থে চেখে চেখে উপভোগ করা। সব ভালোর মূলকথাই তো প্রচুর অর্থ আর প্রচুর সময়!

গন্ধর্বল থেকে তিন মাইল দূরে ক্ষীর ভবানী!

ক্ষীর ভবানী একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। এ গ্রামের নাম তুলামুল্লা। বেশ শান্ত জায়গাটি! চারিদিকে খালের জল মাঝখানে চৌকো একটি দ্বীপের মতো জায়গা, তার মাঝখানে দেবীর কুন্ড ও মন্দির। মন্দিরে যাওয়া চলেনা, পূজা বা নৈবেদ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা কুন্ডের জলের মধ্যেই ফেলতে হয়। এই কুন্ডতীর্থের মাহাত্ম্য এই—'কুন্ডের জলের রং পরিবর্ত্তনশীল! জলের রং কখনো হয় লাল, কখনো সবুজ, কখনো কালো।

দেশে মড়ক লাগবার আশঙ্কা হলে আগে থেকেই নাকি কুন্ডের জল লাল হয়ে যায়, কালো রং ভয়ঙ্কর কোন বিপদের সঙ্কেত, আর সবুজটা শান্তি সুস্তির প্রতীক।

এখন আমরা সবুজ ধরণেরই দেখলাম, বদ্ধজল যেমন হয়। তবে জিজ্ঞেস করতে অনেকেই জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'হানাদারদের আক্রমণের সময় নাকি ছমাস ধরে জল ঘোর কালো হয়ে থেকেছিল। কে জানে সত্যি, না সংস্কারের ভ্রম?

'ক্ষীর ভবানীর' সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। যেমন জড়িত 'কন্যাকুমারীর' সঙ্গে। ১৮৯৮ খৃঃ বিবেকানন্দ যখন অমরনাথে যাবার জন্যে কাশ্মীরে আসেন, তখন নাকি এই ক্ষীরভবানীর মন্দিরে এসেই তাঁর মনের প্রকৃতি হঠাৎ বদলে যায়। বীর সন্ন্যাসী ভক্ত সন্ন্যাসীতে পরিণত হন।

বাসের সহযাত্রীদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক

আলোচনা হচ্ছিল, স্বামীজিকে নাকি দেবী দৈববাণী করেছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক।

কিছুদূর গিয়ে, (শ্রীনগর থেকে উনিস মাইল) মানসবল হ্রদ। এরা বলে 'মনসাবল'। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা গোল হ্রদ, বর্ষাকালে নাকি প্রচুর পদ্ম ফোটে। তখন এ-হ্রদের শোভা অতুলনীয়। এখন বিশেষ কিছু দেখলাম না। সেই শুকনো পদ্মলতার জঞ্জাল! তবে জলটা বেশ নির্মল।

বাস চলেছে.........

রাস্তার ধারে ধারে আপনা থেকে জন্মানো বেদানা গাছের সারি। যেমন আমাদের দেশে রাস্তার ধারে জন্মায় কুল পেয়ারা ইত্যাদি। খুব সম্ভব এ গুলি উৎকৃষ্ট জাতের নয়, বুনো ফলের মতোই, কিন্তু পথের ধারে গাছে বেদানা ফলে থাকতে দেখলে কেমন মজা লাগে?

শরতের কাশ্মীর ফলে ভরা!

আপেল, নাসপাতি, পীচ্, আখরোট, আলুবখরা, বেদানা! এ-সময় বেশীর ভাগ ফলই গাছ থেকে নেমেছে, তবু যে দিকে তাকাই সর্ব্বত্রই শ্যামল শোভা। যে দিকে তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়। পাহাড়ের গায়ে উ'চু পর্য্যন্ত থরে থরে গাছ, থাকে থাকে গাছ, ঘেঁসাঘেঁসি ঠেশাঠেশি গাছ-পালা লতা-পাতা। শুধু সবুজ আর সবুজ!

সমতল ছেড়ে বাস পাহাড়ের গায়ে উঠতে লাগলো, এ পাহাড়ের নাম হরমুখ! উঠে যাচ্ছি ওপরে নীচে উলারের জল দেখা যাচ্ছে, জল আর জঞ্জাল!

অনেকেই বলতে লাগলেন 'বৃথাই এতো দূর আসা হলো।'

উলারের প্রকৃত রূপ দেখতে এপ্রিল মে মাসই নাকি প্রকৃষ্ট সময়। পদ্মছাড়াও এতে পানিফল হয় প্রচুর। এবং মাছ। মাছের জন্যে উলার বিখ্যাত।

উলারের গা দিয়ে খানিক এগিয়ে গিয়ে বন্দীপুরা।

ছোট্ট সহর! এখান থেকেই গিলগিট গিরিবর্ত্মের রাস্তা! কাশ্মীরের উত্তরে কারাকোরাম পর্ব্বত মালার দুর্লঙ্ঘ্য বেষ্টনী। তার মাঝখান দিয়ে এই একটি মাত্র পথ! যে পথ কাশ্মীরের মাধ্যমে সমগ্র ভারতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে মধ্য এশিয়ার দিকে! এই দরজাটি দখলে রাখার জন্যেই কাশ্মীর সমস্যা এমন গুরুত্বপূর্ণ!

বন্দীপুরার পর সো'পুর। (সূর্য্যপুরের অপভ্রংশ) সোপুর থেকে সারদা মহাপীঠে যাওয়ার পথ। সে পথ এখন পাকিস্হানের অন্তর্গত!

সোপুরের পর বারমুল্লা!

নামটা শুনেই মনটা চমকে উঠলো! এই সেই বারমুল্লা? দিনের পর দিন খবরের কাগজে যার নাম দেখা গিয়েছে! প্রকান্ড এই সহরটি হানাদাররা তো প্রায় ধ্বংস করে ছেড়েছিল।

দুর্য্যোগের রাত্রি কেটে আবার নতুন সূর্য্যের উদয় হয়েছে, সহর গড়ে উঠছে নতুন করে। শুধু—যারা চিরদিনের জন্য গেল, তারা গেলই! যারা আপন প্রিয়জনকে হারাল, তারা হারালই। কোন রাজশক্তি বা রাজভান্ডারের সাধ্য নেই সে ক্ষতি পূরণ করবার!

বারমুল্লা থেকে সন্ধ্যার পর শ্রীনগরে ফিরলাম আমরা। একশো মাইলের ওপর বাসে চড়া, শরীর খুব ক্লান্ত লাগছিল। এই অভিযানে বাসের ভাড়া লাগলো মাথাপিছু আট টাকা করে।

অক্টোবর শেষ হয়ে গেছে!

পীর পঞ্জলের চূড়ায় চূড়ায় যেন তুলোর টুপী। বরফে ঢেকে গেছে পর্ব্বতমালার সমস্ত চূড়া গুলি। তার থেকে মাঝে মাঝে নীচে পর্য্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে দুধের ধারার মত। যেন নটরাজের জটার বাঁধন খুলে পড়েছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, শীতের হিম কঠিন থাবা। যে থাবা আর কয়েকটা দিন পরেই টিপে ধরবে কাশ্মীরের টুঁটি। তার কঠোর নিষ্পেষণে শ্রীনগরের শ্রী যাবে মলিন হয়ে। প্রাণচঞ্চল সহর নিঃঝুম মেরে যাবে, বহিরাগতরা বিদায় নেবে, ব্যবসায়ীরা কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলবে, বন্ধ হবে হোটেলগুলির দরজা, হাউসবোট গুলি সাজ-সজ্জা খুলে মৌনমুখে বিশ্রাম নেবে আগামী গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত।

যারা পাহাড়ের উপর দিকের বাসিন্দা, তারা নীচের দিকে নেমে আসতে বাধ্য হবে জলের অভাবে। কারণ ঝরণাগুলি জমে গিয়ে কঠিন

বরফ হয়ে যাবে। যা কিছু উত্তাপ থাকবে শুধু হ্রদের জলে!

আমাদের বন্ধু পরিবার বিদায় নিলেন।

বলে গেলেন, "পাহাড়গুলো এই বেলা দেখে নাও, এরপর যাত্রীর ভীড় কমে যাবে, নির্জ্জনতায় অস্বস্তি বোধ করবে। তা ছাড়া সীজ্‌ন ফুরোলে যানবাহনও দুর্লভ হয়ে পড়ে।"

তাড়াতাড়ি পরদিনই যাত্রা করা গেল 'গুলমার্গের' উদ্দেশে।

কাশ্মীরবাসীদের মতে কাশ্মীরের প্রধান আকর্ষণীয় গুল মার্গ ও খিলেন মার্গ! এর পর সোন মার্গ ও পহল গ্রাম। খিলেন মার্গ সোন মার্গ ও পহল গ্রামে হচ্ছে চির তুষারের রাজ্যে পাড়ি দেবার পথ!

হোটেলে একজন অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁর একমাত্র হবি তুষার রাজ্যে পাড়ি দেওয়া! তিনি এবং তাঁর সমবয়সী ভাইপো, এই দুটি মাত্র প্রাণী। অবশ্য ঘোড়া-ওয়ালারা ছিল! দু'বছর আগে নাকি অমরনাথের পথ 'পঞ্চতরণী' থেকে ভিন্নমুখী পথে চলে গিয়েছিলেন এক দুর্গম তুষার ভূমিতে! পথ-ক্লেশের যা বর্ণনা করছিলেন, শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। কি করে যে বেঁচে ফিরেছেন। কিন্তু ক্লেশই তাঁর আনন্দ! এ-বছর তোড়জোড় করছেন 'সোন মার্গ' থেকে কতোদূর যাওয়া যায় তার চেষ্টা করবেন। বিশেষ কোন সুশৃংখল পরি-কল্পনা আছে বলে মনে হলনা, শুধু অজানাকে জানবার কৌতূহল। আর কষ্ট পাওয়া ও এক-রকমের গৌরবময় আনন্দ!

গুলমার্গ যেতে টাংমার্গ পর্য্যন্ত গাড়ী চলে।

তাই টাংমার্গ বা 'টাঙামার্গ'। ওখান থেকে ঘোড়ায় গুলমার্গ। আবার গুলমার্গ থেকে ঘোড়া বদলে খিলেনমার্গ!

আমাদের বাস ছুটে চললো বারমুল্লার পীচঢালা চকচকে রাস্তা দিয়ে। দু'ধারে পপ্‌লার গাছের শ্রেণী। দূর থেকে যেন প্রাচীরের মতো দেখতে লাগে। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য তিন কোণা ছাদওয়ালা ছোট ছোট বাড়ী! বেশীর ভাগ বাড়ীরই ছাদ-গুলি লাল টুকটুকে!

না, লাল টালী দিয়ে ঢাকা নয়, আগাগোড়া ছাদ পাকা টুকটুকে লঙ্কা দিয়ে ঢাকা! অদ্ভুত কায়দায় সুতো বেঁধে মালার মতো করে লঙ্কা শুকোতে দেয় এরা। মালার পর মালা, সারা ছাদ ঢেকে যায়। শুধুই কি ছাদে? কোথায় নয়? জানলায় বারান্দায় দরজার মাথায় সর্ব্বত্র শুধু লঙ্কা, আর লঙ্কা! টমেটোর মতো গোলগাল বড় বড় লঙ্কা।

এতো লঙ্কা মানুষে খেয়ে ফুরোবে বিশ্বাস হয় না!

বাসের সহযাত্রীরা বলছিলেন পপ্‌লার কাঠ থেকে না কি দেশালাই কাঠি খুব ভালো হয়!

শ্রীনগর থেকে 'মাগান' (১৪ মাইল) গ্রাম পর্য্যন্ত সমতল, তারপর থেকেই চড়াই! মাইল দশেক চড়াই ঠেলে বাস থামলো টাংমার্গে!

এখান থেকে ঘোড়া নেওয়া হলো।

ঘোড়াগুলি ঘোড়াওয়ালাদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, অনেকগুলি এক একজন ঠিকেদারের অধীন। এদের সমস্ত দর বাঁধা! শুধু ঘোড়াওলাগুলি কাকুতি মিনতি করে যেটুকু বখশিস্ আদায় করতে পারে, সেই টুকুই তাদের লাভ।

ঘোড়ায় চড়া তো এক হাসির ব্যাপার!

এর আগে এমন অঘটন ঘটেনি!

তবে কিনা চড়াটা নামে মাত্র ঘোড়াওলা লাগাম ধরে প্রায় হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। ওরই মধ্যে যাঁরা ঘোড়ায় চড়িয়ে, তাঁরাই যা দু' একজন টগবগ্ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন!

গিয়েছেন অনেক বাঙালী মহিলা।

সকলের পরণেই শাড়ী। কাজেই একে অপরের ঘোড়ায় চড়া দেখে হেসেই কুটিকুটি! জনকয়েক কম বয়সী মেয়ে অবশ্য চটপট শাড়ী বদলে 'সালোয়ার' পরে নিলো দেখলাম।

একদিকে কঠিন পাহাড়ের গা, আর একদিকে নীচু খাদ। তার মাঝখানে পাহাড়ের প্রায় খাড়াই গায়ে এবড়ো খেবড়ো সরু রাস্তা, নুড়ি পাথর আর ঝরণার ঝিরঝিরে জলে ভরা।

ঘোড়াগুলির বিবেচনার ওপরেই নির্ভর আর কি!

তবে নিতান্ত শিক্ষিত ঘোড়া! মনে হয় 'পড়লো বুঝি, পড়লো বুঝি', কিন্তু পড়ে না। মুখস্থ কবিতা আওড়ানোর মত তরতরিয়ে এগিয়ে চলে!

সঙ্গীরা কেউ এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ পিছিয়ে পড়ছে, কারণ পাশাপাশি দু'তিনটে ঘোড়া যাবার মত পথও তো নেই। একটু একটু ভয় ভয় যে না করছে তা নয়, তবে যখন দেখছি সামনের দল দিব্যি তড়বড়িয়ে ও—ই উঁচুতে উঠে গেলেন, তখন বেশ সাহস আসছে।

পথের দৃশ্যটি সুন্দর!

কখনো একেবারে কান ঘেঁসে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘন জঙ্গল, কখনো খানিকটা সবুজ ঘাসে মোড়া শ্যামল-শ্রীমন্ডিত চাতাল, কখনো ছোট ছোট ঝরণা!

দেড় ঘন্টার কাছাকাছি লাগলো গুলমার্গে যেতে।

গুলমার্গ!

ঘোড়াওয়ালারা চেঁচাচ্ছে "গোল মোরাগ! গোল মোরাগ" গুলমার্গ হচ্ছে পাহাড়ের উপর বিরাট বিস্তীর্ণ এক অধিত্যকা। আর সেই সুবিশাল ভূমিখন্ড সাটিনের মতো উজ্জ্বল কোমল সবুজ খাসে ঢাকা! আর এই অধিত্যকার তিন দিক দিয়ে তিনটি রাস্তা উঠে গেছে—খিলেন মার্গের দিকে। কে জানে আরও কোনও দিকে কি না।

সমতল জায়গাটা থেকে ওই ওপর দিকে উঠে যাওয়া রাস্তাগুলো এতো সুন্দর দেখতে লাগে! মনে হয় ওই পথ ধরে এগোতে এগোতে কোথায় বুঝি হারিয়ে যাওয়া যায়!

গুলমার্গের পরিকল্পনাকায় ছিলেন না কি রাজমহিষী কবি হাববা খাতুন! যাঁর নামে 'হাববা কদল'।

পরবর্ত্তী কালে, সাহেবদের আমলে গুলমার্গ ছিল তাদের পোলো গ্রাউন্ড, গল্‌ফ্‌ ময়দান, আর হকি খেলার মাঠ। সেই বিরাট পোলো গ্রাউন্ড এখন পরিণত হয়েছে গরু চরার মাঠে। বহু গরু চরে বেড়াচ্ছে এই ঘাসের কার্পেটের ওপর।

এখানে পথের গায়ে গায়ে না কি অনেক ডাক-বাংলো ছিল। ছোট ছোট কাঠের ঘর, তার মধ্যে খাদ্য পানীয় আর শয্যার সামান্য কিছু আয়োজন। এ-গুলি ছিল সাহেবদের বিশ্রাম নিকেতন। হানাদাররা সে সমস্তই পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। একখানি মাত্র পাকাবাড়ী রয়েছে দাঁড়িয়ে, বেশ সুন্দর। দলের অনেকেই সেখানে উঠে চা—টা খেয়ে নিলেন।

ভারী সুন্দর লাগছিল এই জায়গাটা!

কিন্তু কোথাও খুব ভালো লাগলেও, ইচ্ছে-মত বসে থাকবার তো উপায় নেই! দলের সকলে এগিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াওয়ালা তাড়া দিচ্ছে—সন্ধ্যার মধ্যে খিলেন মার্গ থেকে ফেরার আদায় রাখা চাই। নচেৎ বিষম বিপদ।

অগত্যা চলো।

খিলেনমার্গের রাস্তা আরো খাড়াই, ও বেশ বিপদজনক। সব সময় মনে হচ্ছে ফসকালো বুঝি ঘোড়ার পা, নিশ্চিত ফসকালো এইবার!

অবশ্য যাঁদের পাহাড়ে রাস্তার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের কাছে এ কিছুই নয়, তবে পাহাড়ে চড়া আর ঘোড়ায় চড়া যাঁদের কাছে নতুন তাঁদের ভয় ভয় করবেই।

খিলেনমার্গের ওপর আর সবুজ শ্যামলিমা নেই, শুধু ধূসর প্রান্তর! মেঘ মেঘ বিকেল, হাড় কাঁপানো শীত। শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সবাই, কি মানুষ, কি ঘোড়া!

ঘোড়াওলারা ঘোড়াগুলোকে লাগাম খুলে ছেড়ে দিলো, মানুষরাও বসতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য্য সেখানের ক্লান্তিহরা বাতাস! দু'এক মিনিটেই শরীর তাজা হয়ে ওঠে। খোলা চত্বরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে বসা হয়েছে, অনেকেই সঙ্গে আনীত চা ও খাবারের সদ্ব্যবহারে মন দিলেন।

একপাশে একখানা নড়বড়ে কাঠের ঘর, বোধহয় যাত্রীদের শ্রম নিবারণের জন্যই। তার থেকে বেরিয়ে এলো একটা বুড়ো বেচারা। প্রত্যেককে অনুরোধ করছে তার কাছে চা খাবার জন্যে।

বলাবাহুল্য তার কাছে চা একমাত্র ঘোড়াওয়ালারা ছাড়া কেউই খেলো না। একটা ঘোড়াওয়ালা ছিল নেহাৎ ছোট ছেলে বছর বারো বয়েস হবে। পায়ের তলায় তার জুতোর অনুকল্পে পুরু এক চাপড়া ঘাস পায়ের পাতার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গায়ে মান্ধাতার আমলের একটি জরাজীর্ণ জামা, হাঁটুর নীচে থেকে খালি। সে এসেছে একটা বড় ঘোড়ার ভার নিয়ে।

দেখলে এতো মায়া লাগে।

এর জন্যে কী ই বা পাবে সে? ছেলেটার হাতে দুটো চকোলেট দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখটা যেন হাসির আলোয় ঝল্‌সে উঠলো! যেন আস্ত একটা রাজ্যই পেয়েছে। হায়! আমাদের সঙ্গের সব খাদ্যদ্রব্যই তখন ফুরিয়ে ফেলেছি আমরা! পয়সা দেওয়ার চাইতে খাবার দিলেই এর পক্ষে ভালো ছিল। পয়সা তো কেড়ে নেবে ঘোড়ার ঠিকেদার!

এরা খুবই গরীব, কিন্তু খুব অল্পে সন্তুষ্ট। সামান্য চার আনা আট আনা বখসিসেই যেন বর্ত্তে যায়। কেবল মনে হচ্ছিলো, কলকাতার বাড়ীতে কতো পুরনো জামা জুতো ইত্যাদি থাকে, বেড়াতে বেরোবার সময় যদি সে-সব কিছু সঙ্গে নিয়ে আসতাম, এদের দেওয়া যেতো!

সামনে অতলস্পর্শি খাদ, আর পিছনে সমুন্নত পাহাড়। সেই পাহাড় প্রায় ঢেকে এসেছে গলিত তুষারে, সে তুষার হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়। পাহাড়ের কোলে এখানে সেখানে এক আধটা হালকা পাইন গাছ, আর পাথরের নুড়ি।

হঠাৎ দেখি আমার পুত্র-রত্ন শ্রীমান সুশান্ত খাদের দিকে পিছন করে ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ছবি নিচ্ছেন। দেখে তো বুক দুরদুর! বকুনি দিতে গিয়ে কিন্তু নিজেই বকুনি খেলাম। তাকিয়ে দেখি সত্যিই বটে একা সে নয়, যতো দল গেছে তাদের কেউনা কেউ ওই রকম ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে ক্যামেরা বাগিয়ে।

দু'চারটে ছবি নিয়ে ক্যামেরাটাকে 'স্বয়ংক্রিয়' করে রেখে পুত্র বসে পড়লো আমাদের দু'জনের মাঝখানে। অ্যালবামের পাতায় সঞ্চিত রইলো সে স্মৃতি খিলেনমার্গে আমরা তিনজন।



খিলেনমার্গে আমরা তিন জন

বিকেল পড়ে এসেছে, পাহাড়ের কোলে কোলে ছায়া।

মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা ভাবের উদয় হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য-কোন রাজ্যে এসে পড়েছি বুঝি! যে-দিকে তাকাই খাদ আর পাহাড়, লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই কোনখানে। শুধু এই নিথর নিস্তব্ধ আদিম প্রকৃতির বুকের ওপর একদল আধুনিক জীব, তাদের অতি আধুনিক সাজ-সজ্জা আর

যন্ত্রপাতি নিয়ে যেন অনধিকার প্রবেশ করে বেমানান হুটোপাটি করছে। একটু পরেই নেমে যাবো আমরা, নেমে যাবে ওই কাঠের ঘরের বুড়োটা পর্য্যন্ত। তখন আদিম প্রকৃতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত গাম্ভীর্য্যে ফের ধ্যানে বসবে।

খিলেনমার্গ থেকে দেখা যায় নাঙ্গ পর্ব্বত, হরমুখ ও কোল্‌হাই। গ্রীষ্মকালে এখানে না কি নানা বিচিত্র ফুল ফোটে, ধূসর প্রান্তর নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

মনে হচ্ছিলো পৃথিবীতে এখনও কতো জায়গা আছে যেখানে আজও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। সেখানেও প্রকৃতি তার কাজ করে চলে। ফুল ফোটে, ঝরে, আবার ফোটে। কখনও সবুজে শ্যামলে নীলে লালে বিচিত্র হয়ে ওঠে, কখনো হিমঝড়ের মার খেয়ে মৃতের মতো পড়ে থাকে। মানুষ পৃথিবীর কতোটুকুই বা দেখেছে?

তাড়াতাড়ি ওঠার পালা।

আর দেরী করা চলেনা। কোথায় সেই শ্রীনগরে সহরের মধ্যবর্ত্তী হোটেলের ঘরখানি, আর কোথায় আমরা? আবার যে যার ঘোড়া-গুলিতে উঠেপড়া হলো। চলতে চলতে হঠাৎ চমকে উঠি, ওকি? এখানে ও কি? যাবার সময় তো চোখ পড়েনি? পাহাড়ের খাঁজে খোঁজে চাতালের ওপর ধোবার কাপড় শুকোচ্ছে!

আশ্চর্য্য! এখানে ধোবা এলো কোথা থেকে? আর কাদের কাপড়ই বা কেচেছে? লোকালয়ের চিহ্নমাত্র তো নেই!! হঠাৎ দেখি আমাদের পাশের দলের ক'জন ছেলে-মেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে, আর সেই বিছিয়ে রাখা ধবধবে কাপড়ের টুকরো গুলোর ওপর থাবা মেরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে গোলা পাকাচ্ছে!

এ কী কান্ড!

নেমে পড়লাম সকলেই।

কান্ড এই—ওগুলি ফর্সা কাপড় চাদর ও নয়, পেঁজা তুলোও নয়, তুষার। জমে থাকা ঝরণার জলরাশি জমে গিয়ে বরফ হয়ে উঠেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে কে বুঝি সাদা কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে বিছিয়ে রেখেছে!

মিহি বরফের গুড়ো! মুঠোয় পাকিয়ে গোলা বানালে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শক্ত হয়ে থাকে। অনেকগুলো গোলা পাকিয়ে একটা খালি টিফিন কৌটোয় ভরে নিলাম। হোটেলের ঘরে এসে খুলে দেখি হায় হায় সব গলে জল!

কাশ্মীরের দ্রষ্টব্যের মধ্যে গুলমার্গই না কি সব থেকে বিখ্যাত। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল সোনমার্গ অতুলনীয়। সোনমার্গের পথের যে রূপ সত্যিই তার তুলনা হয় না। সামান্য কয়েকটি লাইনে তার বর্ণনা করার চেষ্টা বৃথা। একদিকে সোজা খাড়াই পাহাড় উঁচু হতে হতে যেন আকাশে মাথা তুলতে চায়, সে পাহাড় বনে বনে ঢাকা। অপরদিকে গাছপালা শূন্য রুক্ষ পাথুরে পাহাড়, তার গা কেটে কেটে তৈরি হয়েছে পথ। মাঝখান দিয়ে বহে চলেছে সিন্ধু নালা! কোন পর্ব্বত গুহা থেকে তুষার স্তূপ গলে গলে নেমে আসছে জলকন্যা হয়ে।

কী বিচিত্র তার গতি ভঙ্গী!

কখনো নেচে, কখনো লাফিয়ে, কখনো তীব্র তরঙ্গের ঘূর্ণি তুলে, কখনো ভীম গর্জ্জনের প্রচন্ড হুঙ্কার হেনে, কখনো দুধের ফেনার মতো শুভ্র হাসির ফেনায় উছলে উছলে, কখনো নুড়ি পাথরের পাশ কাটিয়ে ধীর মন্থর গতিতে, চলেছে তো চলেইছে!

আমরা উঠছি, ও নামছে!

যেন পাশাপাশি দু'টো সিঁড়ির যাত্রী আমরা। যতোক্ষণ চলেছি, শুনতে পাচ্ছি জলতরঙ্গের উদ্দাম কলকল্লোল ধ্বনি। এর চলতি নাম হচ্ছে 'ওয়াঙ্গাথ নালা'। কিন্তু আসল নাম নাকি সিন্ধু নালা। আসলে এ হচ্ছে সিন্ধু নদীর অববাহিকা। পঁচিশ মাইল ধরে এই দুরন্ত জল-স্রোত অবিরাম নেমে চলেছে। কিন্তু কেন যে এই জলধারার একদিকে বনরাজিনীলা, আর একদিকে রুক্ষ কাঠিন্য, সে রহস্যের সমাধান কে করতে পারে? প্রকৃতি চির রহস্যময়ী।

উঠছি তো উঠছি। এ-পথের যেন শেষ নেই। জায়গায় জায়গায় 'মিলিটারীর' আড্ডা। হঠাৎ

কোন একটা বাঁকের মুখে চোখে পড়ে যাচ্ছে দু'চারজন খাকী পোষাকধারী।

অবশেষে পথ শেষ হলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি—ওই পথটা কি ফেলে এলাম?

কোথায় সেই আকাশ ছোঁওয়া উঁচু পাহাড় শ্রেণী? সমস্ত শিখরগুলো যেন মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে পাতালের পথ ধরে।

বাসের রাস্তা শেষ। যেখানে গিয়ে জোটা হলো সেখানের নাম 'তাজবাস'।

এখান থেকে যে-পাহাড়টা চোখে পড়ে, তার নাম 'ক্যাথিড্রাল পিক্'। ছড়িয়ে পড়া প্রকান্ড ঢালু চত্বর। এখান থেকে ঘোড়া নিতে হবে। এখানে ঠিকেদার নেই, ঘোড়াওয়ালারাই স্বয়ং কর্ত্তা। কাজেই বহুৎ দরাদরি। তা ছাড়া আছে ঘোড়া বাছাই পর্ব্ব! বেশীর ভাগ ঘোড়াই এমন হাড়-জিরজিরে যে ছুঁতেই ইচ্ছে হয় না। ওরা জীবনে কখনো পেট ভরে খেয়েছে, দেখে এ-বিশ্বাস হয় না। অবশ্য মালিকদের অবস্থাও তথৈবচ!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পাওয়া গেল তিনটে 'মানিষ্যের মতো' ঘোড়া।

সোনমার্গের ঘোড়া চলার পথটা খিলেন-মার্গের চেয়ে অনেক বেশী দুর্গম। 'যা থাকে কপালে' বলে চোখ বুজে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। কিন্তু অদ্ভুত এই ঘোড়ারা, সেই উঁচু নীচু, এবড়ো খেবড়ো, নুড়ি পাথর, সব কিছু ডিঙিয়ে উঠছে তো উঠছেই। ক্লান্ত হয়না, ভুল জায়গায় পা দিয়ে ফেলেনা।

ঘন্টাখানেকের পর যেখানে থামা হলো, সে এক অপূর্ব্ব জায়গা! দু'পাশ থেকে পাহাড় নেমে এসেছে ঢালু হয়ে, আর মাঝখান দিয়ে বহে চলেছে সদ্য গলা তুষার স্রোত! পথ চলে গেছে উঁচুতে একেবারে তুষার স্তূপের কাছ অবধি, কিন্তু বেলা পড়ে এসেছিল আর সাহস হলো না। তাছাড়া পূর্ব্বগামী যাত্রীদের শেষ মানুষটি পর্য্যন্ত নেমে এসেছেন।

পুত্র সুশান্ত তো নাছোড়, সে আরো উঁচুতে উঠবেই, ছবি নেবে। হঠাৎ দেখি এ কি, সকলেই যে চলে গেছে। এই স্তব্ধ ভূমিতে কেবল আমরা তিন জন আর ওই ঘোড়াওলাটা।

আচমকা একটা ভয়ে প্রাণ হিম হয়ে এলো ওকি? লোকটার গতিক তো সুবিধের নয়; অমন চোরের মতো গুঁড়ি মেরে মেরে সুশান্তর পিছন পিছন যাচ্ছে কেন? কী মতলব ওর? এই জন শূন্য পাহাড়ের ওপর ও যদি আমাদের মেরে ফেলে দিয়ে চলে যায়, কে জানতে পারবে?

সোনা টাকা ঘড়ি আংটি ইত্যাদি তিন জনের কাছে যা আছে তা' নিলে ওর—

আর ভাবতে হলোনা, দেখলাম গুড়ি মেরে মেরে গিয়ে সে তার প্রার্থিত জিনিসটি সংগ্রহ করেছে। আর কিছুই নয়, একটুকরো রাংতা! ফিলম জড়ানো ফেলে দেওয়া রাংতাটুকু! সরল বন্য যুবকের মুখটা খুসিতে চকচকে হয়ে উঠেছে......ওই দুর্লভ রত্নটুকু পেয়ে।

নিজের মনের কাছেই নিজের মাথাটা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেল! মনে হলো ওরা বন্য, না আমরাই বন্য? যারা গরীব, তাদের কতো সহজেই সন্দেহ করে বসি আমরা? 'নরঘাতক' ভাবতেও দ্বিধা করি না!

আর ওরাও হয়তো আমাদের সন্দেহ করে, তাই চেয়ে না নিয়ে চুপি চুপি সংগ্রহ করেছে। ভেবেছে 'চাইলে দেবে না'।

কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না!

দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসা হলো, হচ্ছেনা শ্রীনগরের ভিতরটা ভালো করে দেখা। এখনও ওঠা হয়নি শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ে, কি হরি পর্ব্বতে; দেখা হলোনা দোকানপাট। কিছু কিনতে কাটতেও তো হবে? এবার চটপট সব সেরে নিতে মন দিই।

দূরের মধ্যে বাকী আছে পহলগ্রাম! তোলা-থাক শেষ দিনের জন্যে।

দোকানপাট মানেই কাশ্মীরের শিল্পকলা!

কিন্তু তার পরিচয় দেবার চেষ্টাটা অনাবশ্যক নয় কি? কাশ্মীর শিল্পের নমুনা কে না দেখেছে? কার চোখে কখনও না কখনও পড়েছে কাশ্মীরের অপূর্ব্ব সূচিশিল্প, শাল দোশালার নমুনা, তার কাঠশিল্প বেতশিল্প কাগজ মন্ডের

কাজ, কার্পেট গাববা বাসন-কোসন? এ যে কাশ্মীরের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য। এখানে শুধু একত্রে অনেক! কিন্তু দেখতে দেখতে চোখ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

কাশ্মীর এমপোরিয়ামে একটা (মেয়েদের পরবার) কালো লোমের কোট দেখলাম, দাম লেখা রয়েছে ছ'হাজার (৬০০০) টাকা! ছাপার ভুল ভেবে 'শূন্য' সংখ্যাটা সম্বন্ধে হাসাহাসি করছিলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভুল ভাঙলো। ছাপার ভুল নয় সত্যিই!

এ নাকি একটা ছোট্ট মাপের দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর লোম। সংগ্রহ করা ব্যয়সাধ্য, এবং এরকম একটি কোট বানাতে প্রায় তিন চারশোটি প্রাণী হত্যা করতে হয়! না মারলে ধরা যায়না ওদের। তবুও এই জামা বানাতেই হবে।

আর একবার মনে হলো মানুষ কি বন্য বর্ব্বর!

আরও একটা জিনিস দেখলাম! নিতান্ত নিরীহ চেহারার একখানি তুষ। দাম না কি সাতশো টাকা। সত্যি মিথ্যে ঈশ্বর জানেন দোকানী বললো 'শ্যামাপ্রসাদের' মৃতদেহ ঢেকে দেবার জন্যে কাশ্মীর সরকার বিশেষ ভাবে তৈরি একখানি তুষ উপহার দেন, এটি তারই জোড়া!

বহিরাগত যাত্রীদের কাছে সেন্ট্রাল মার্কেট যেন একটি পীঠস্থান! ভীড় লেগেই আছে।

অভিজাত পাড়া কয়টি বাদ দিলে, শ্রীনগরে শ্রীর বড়ই অভাব। দোকানপসার এতো বিশৃঙ্খল, বলবার নয়। হয় তো একটি সুন্দর কার্পেটের দোকানের গায়েই কাঁচা মাংসের দোকান!

পহলগ্রাম শ্রীনগর থেকে একষট্টি মাইল। স্টেটবাস যাতায়াত করে দৈনিক একবার। সকালে ছেড়ে বেলা এগারোটায় আমাদের বাস গিয়ে দাঁড়ালো সুন্দর একটি ডাক-বাংলোর সামনে। যেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও চমৎকার! সভ্য ভব্য পরিপাটি!

সারি সারি, এখান সেখান বহু ডাক-বাংলো! অমরনাথ যাত্রার এই তো সদর দেউড়ি! যাত্রীরা এখান থেকেই রওনা দেন। তখন না কি এতোতে ও লোক ধরে না, অজস্র তাঁবু পড়ে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও না কি ভাড়া পাওয়া যায়!

কাশ্মীরে গিয়ে যদি কেউ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতে চান তো বলবো শ্রীনগরে না থেকে থাকুন পহলগ্রামে। এ-অঞ্চলে এমন মনোরম জায়গা বোধ করি অল্পই আছে।

সামনেই সবুজ শোভামন্ডিত নীচু ঢালু পাহাড় হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যায়, তার গায়ে গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য ঝর্ণা একদিক দিয়ে চলে-গেছে, অমরনাথের দরজা 'চন্দনবাড়ীর' রাস্তা যেন অমরলোকের হাতছানির মতো, অপর দিকে অজানা গ্রামের আভাস। একটু উঁকি মারলেই দুরন্ত নদী 'লীডারের'অতুলনীয় রূপ! এখানে তিনটি নদী 'লীডার' 'শেষ নাগ' আর 'অমরনাথ'।

বাস থেকে নেমেই সকলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লেন গ্রামের ভিতরে। আমরা খুব খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে একটা চাষীদের বাড়ী ঢুকে বেশ বাছাই বাছাই আখরোট কিনলাম অনেক। পাঁচ আনায় শ'। তাকিয়ে দেখলাম চারদিক। বেশ খোলামেলা বাড়ী, বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাড়ীর বৌটি উঁচু মাচা থেকে আখরোটের বস্তা পেড়ে এনে দিল, ওজন করলো বুড়ো শ্বশুর।

সব দেশেই চাষীদের জীবন-যাত্রা পদ্ধতি প্রায় এক।

বিকেল পাঁচটায় বাস ফিরে যাবে।

অনেকেই ফিরে গেলেন তাতে। কেউ কেউ রয়ে গেলেন, আমরা শেষের দলে। কিন্তু কতোটুকুর জন্যেই বা? মাত্র আর একটী দিন! ছুটির মেয়াদ ফুরিয়েছে, রওনা দিতে হবে পর্শুই। ভীষণ আপশোষ হচ্ছিলো—আগে কেন এখানে আসিনি। তাহলে দু'পাঁচ দিন অন্তত থাকা যেত। এতো ভালো লেগেছিল, আর এতো মন কেমন করেছিল ফিরে আসতে!

শীত পেলাম রাত্রে! আশ মিটোনো শীত, হাঁড় কাঁপানো শীত।

ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে পড়া হলো ঘোড়ার সন্ধানে, 'চন্দনবাড়ী' নিয়ে যাবে।

অবশ্য অর্থহীন এই যাত্রা। শুধু কষ্টভোগ।

রাস্তার অবস্থা অবর্ণনীয়, আর ঠান্ডায় তো হাত পা হিম হয়ে আসছে। তবু মনে হলো তীর্থের কিছুটা বুঝি আহরণ করা হলো।

কে জানে আর কখনো আসা হবে কি না। কখনো সুযোগ হবে কি না অমরনাথ যাবার। প্রণাম জানিয়ে ফেরবার সময় বারে বারে এই কথাই মনে হচ্ছিল, যুগ যুগান্ত ধরে এই দুর্গম পথ সচকিত হয়ে উঠছে মানুষের পদধ্বনিতে। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে তীর্থ যাত্রার যাত্রীরা। চলেছে—হয়তো কতো রুগ্ন, বৃদ্ধ, অশক্ত, হয়ত কতো শিশু বালক। 'পঞ্চতরণীর' ভয়াবহ পিচ্ছিলতা, বন্ধুর গিরিপথের দুর্গমতা, 'বায়ুযানের' ঝড়, তুষার বৃষ্টি, হাড় গুঁড়োনো শীত, কোন কিছুই নিরস্ত করতে পারেনা তাদের। এগিয়ে চলে বিশ্বাসের পথে, নিষ্ঠার পথে।

এবার ফেরার তোড়জোড়।

পরদিনই শ্রীনগর ত্যাগ করতে হবে! নেমে আসতে হবে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে!

*　　　*　　　*

ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা কবিতাটি পড়লে কাশ্মীরের সমুদয় সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভাও মাধুর্য্য চোখের সমুখে ফুটে উঠবে অতি উজ্জ্বলতর ভাবে। ১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সবুজ পত্রে' 'বলাকা' শিরোনামে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

"এই কবিতাটি কাশ্মীর শ্রীনগরে লেখা। কবি সন্ধ্যাবেলা বজরার ছাদে বসেছিলেন। সেই সময়ে এক ঝাঁক বলাকা তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো তাহা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কবি-চিত্তে যে ভাবতরঙ্গ খেলে গেল, তাহাই এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।"

সন্ধ্যারাগে—ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার-তরু সারে সারে;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস বলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

....



ভারতের স্বাস্থ্য

উনিশশ সাতচল্লিশ সালের পনরই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে। ঐ দিন ঘুচিয়াছে ভারতের পরাধীনতার গ্লানি আর তার পূর্ব দিগন্তে দেখা দিয়াছে বহু প্রতীক্ষিত নবলব্ধ স্বাধীনতার অরুণাভা! তার পরেও ব্যরো বছর অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে; বিগত বারো বছরে আমরা নানা দিকে নিজেদের দুরবস্থার নিরসনে, বিশেষতঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করিয়াছি, আজ তাহার হিসাব নিকাশের কতকটা প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। দীর্ঘ পৌনে দু'শ বছর ব্রিটিশ রাজের আশ্রিত ভাবে থাকার শেষ দশ বছর অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের ঠিক আগের বারো বছরের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব আমরা ইতিমধ্যে কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছি কি না। ১৯৩৭ সালে

দেশ (১৯৩৭)	প্রতি শতে জন্ম হার	প্রতি শতে মৃত্যু হার	প্রতি শতে শিশু মৃত্যুর হার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১·৭	১·১২	৩·৪
ইংলণ্ড	১·৪৯	১·২৪	৫·৮
অস্ট্রেলিয়া	১·৭৪	০·৯৪	৩·৮
সিংহল	৩·৭৮	২·১৭	১৩·৮
ভারতবর্ষ	৩·৪৫	২·২৪	১৬২
জাপান	৩·০৬	১·৭	১০·৬

ইংলন্ড এবং ওয়েল্‌স এ আমাদের প্রভু প্রত্যেক ইংরেজের বছরে গড়পড়তা আয় যখন ছিল হাজার টাকার মতন, তখন তার আশ্রিত প্রত্যেক ভারত-

১৯৪১	লণ্ডন	নিউ ইয়র্ক	কলিকাতা	বোম্বাই	মাদ্রাজ
লোক সংখ্যা	৪,০৯৫,০০০	৭,৫২৯,০০০	২,১১০,০৫৯	১,৪২৯,৪৯৮	৭৬৮,৭৯৮
হাজারকরা মৃত্যুর হার	১·১৪	০·৯৯	২·৭৬	২·৫	৩·৩৯
হাজারকরা জীবন্ত জাত শিশুর মৃত্যুর হার	৪·৮	৩·০৮	২১·২	২০·১৪	২০·৫৮
জন্মের হার	১·৫	১·৩৬	২·৬১	৩·৩৪	৪·৩২

বাসীর আয় ছিল গড়পরতা ছেষট্টি টাকার মতন, তার অর্থ প্রত্যেক ভারতবাসীরই কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন গুজরান হইত এবং ফলে তার স্বাস্থ্যের অবস্থাও যে ছিল শোচনীয়, ঐ বছরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক জন্মের হার, মৃত্যুর হার ও শিশু মৃত্যুর হারের নীচেকার তালিকা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

দেশ	এক বছরের কম	১-৫ বছর	৫-১০ বছর	১০ বছরের নিম্নবয়স্ক (সমগ্র)
ব্রিটিশ শাসিত ভারত (১৯৩৫-৩৯ এর গড়)	২·৪৩	১·৮৭	·৫৫	৪·৮৫
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ (১৯৩৮)	·৬৮	·২১	·১১	১

শতকরা গড়ের পরিবর্তে হাজারকরা গড় দেখান হইয়াছে।

এই বছরে বসন্ত ও কলেরা রোগে যখন প্রতি একলাখ লোকের মধ্যে আমাদের দেশে মৃত্যু হইয়াছে যথাক্রমে ১৬·২ ও ২৯·৩ জন লোকের

তখন আর একটি প্রাচ্য দেশ জাপানে মৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে মাত্র ০·০০৮ ও ০·০১ জনের।

আরও কয়েক বছর আগে ১৯৩১ সালে ইংলন্ড ও স্কটলন্ডে যখন প্রত্যেক পুরুষের গড়পরতা আয়ু ছিল ৬৬·০৪ এবং প্রত্যেক নারীর ছিল ৬৭·৮৮, এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক পুরুষের গড়পরতা আয়ু ছিল ৬৩·৪৮ এবং প্রত্যেক নারীর ৬৭·১৪, তখন এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৭ ইংরেজীতে ভারতবর্ষের পুরুষ ও নারীর গড়পড়তা আয়ু ছিল যথাক্রমে ২৬·৯১ ও ২৬·৫৬ মাত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়াবাসী পুরুষ ও নারীর আড়াই ভাগের এক ভাগ মাত্র।

১৯৪১ ইংরেজীর আদমসুমারী হইতে

পৃথিবীর দু'টি শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ নগরী লন্ডন ও নিউইয়র্কের সঙ্গে আমাদের দেশের তিনটি নগরী কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর স্বাস্থ্যের অবস্থা নিম্নলিখিত তালিকা দেখামাত্র বুঝিতে পারা যায়।

জন্ম হইতে দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ইংলন্ড ও ওয়েল্স্ এর তুলনায় বৃটিশ ভারতে শিশু-মৃত্যুর হার নিম্নরূপ ছিল।

ঐরূপ সময়ে গর্ভবতী ও প্রসূতির মৃত্যুও হইতেছিল অতি ভয়াবহ সংখ্যায়। শুধু যে এই ভাবে প্রতি বছর প্রায় দু'লক্ষ নারীর মৃত্যুই হইত এমন নয় তা'রও প্রায় কুড়িগুণ অর্থাৎ প্রায় চল্লিশলাখ নারী সম্পূর্ণ ভাবে কিংবা আংশিক কাজেও অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। একমাত্র কলিকাতা নগরীতেই ১৯৪৩-৪৪, ৪৪-৪৫ ও ৪৫-৪৬ সালে প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ছিল যথাক্রমে ৪৯০·১, ৪২০·৩ ও ২৪৫·৩।

যদিও ১৯২১ সাল হইতে মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জাতি গঠন মূলক বিভাগ গুলির পরিচালন ভার দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে আসে, তাহা হইলেও স্বাধীনতার পূর্ববর্ত্তী ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ, এমন কি প্রাচ্য দেশ জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায়ও আমাদের দেশের স্বাস্থ্য অতি মর্ম্মান্তিক ভাবে শোচনীয় ছিল। সেই কারণে পূর্ববর্ত্তী কয়েক বছর ধরিয়াই দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির কল্পে সর্বাত্মক চেষ্টার দাবি ছিল জনসাধারণের এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আসেম্বিল্পর জন-প্রতিনিধিদের। তারই ফলে তৎকালীন ইংরেজ সরকার স্যার জোসেফ ভোরের নেতৃত্বে তৎকালে দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান ও তার উন্নতি কি উপায়ে সম্ভব, তাহার যথাযথ নির্দ্দেশের জন্য যে অভিজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেন সেই রিপোর্ট, সুপ্রসিদ্ধ "ভোর কমিটির রিপোর্ট" নামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী দশ বছরে যাহা কিছু সামান্য স্বাস্থ্যোন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহারই মূল ভিত্তি। রিপোর্টটির প্রথম খন্ডের ২২০ পৃষ্ঠায় দেশের সেকালের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাহাকিছু জ্ঞাতব্য তাহা বিশদ্ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং দীর্ঘ পাঁচ শ পৃষ্ঠা ব্যাপী পরবর্ত্তী খন্ডে কি করিয়া অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকে পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভবপর, সেই বিষয়ে যতদূর সম্ভব আলোচনা ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ রিপোর্টের ভূমিকায় যে সকল প্রগতিমূলক আদর্শে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের সারমর্ম অল্প কথায় দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্তসার হইতে কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি কত উদার, ব্যাপক, প্রগতিশীল ও ভবিষ্যদ্দর্শী ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যয়বহনে অক্ষম হইলেও দেশের কোন রুগ্ন ব্যক্তিই উপযুক্ত চিকিৎসা-লাভে বঞ্চিত হইবে না।

(২) উপযুক্ত ভাবে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য—বর্ত্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতি যতই জটিল হউক না কেন, স্বাস্থ্যবিভাগ তাহার জন্য পরীক্ষাগার (ল্যাবরেটরি), হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য-নিবাস (Institutional facilities) এবং অভিজ্ঞের মতও নির্দ্দেশ-এর (consultant), যতদূর সম্ভব সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিবেন।

(৩) স্বাস্থ্য পরিকল্পনায়, প্রথম হইতে অসুখ হওয়ার পর রোগ আরোগ্যের বন্দোবস্ত অপেক্ষা রোগ প্রতিষেধক এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তৎপর হইতে হইবে।

(৪) ভারতবাসীর মুখে অন্ন দেয় যে অগণিত গ্রাম্য চাষী, তাদের জন্য যতদূর সম্ভব রোগে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং যাতে রোগ না হয় তার জন্য প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

(৫) স্বাস্থ্যের জন্য যা' কিছু কর্ত্তব্য তা' জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এমন ভাবে পেঁাছাইয়া দিতে হইবে যাহাতে তাহারা সকল

প্রকারে সে সকল সুবিধা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে।

(৬) স্বাস্থ্য-পরিকল্পনাকে সফল করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাও অত্যাবশ্যক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহাদের যত রকমে পারা যায় অবহিত করাই ইহার একমাত্র উপায়।

(৭) প্রত্যেক প্রদেশের স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর উপরই স্বাস্থ্য-পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তোলার ভার ন্যস্ত করা উচিত, কারণ জনসাধারণের দ্বারা নির্ধারিত প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পক্ষে তাহাদের সহযোগিতা লাভ করা মোটেই কঠিন নয়।

(৮) স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার মধ্যে দু'টি পৃথক অংশ থাকিবে; একটি হইবে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বছরে সমগ্র রূপায়ণের এবং অপরটি হইবে স্বল্প মেয়াদী অর্থাৎ পাঁচশালা রূপায়ণের পরিকল্পনা।

(৯) আগামী কালের চিকিৎসক হইবেন সামাজিক চিকিৎসক এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে জনসাধারণ হইবে স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারী ও সুখী। রোগের যথাযোগ্য চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে যা'তে লোকের রোগ না হয় তাহাও হইবে তাঁহার কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ মৌলিক চিকিৎসকই (basic doctor) হইবেন সমাজের অটুট স্বাস্থ্যের ভিত্তি।

(১০) প্রতিগ্রামে থাকিবে একটি করিয়া স্বাস্থ্য কমিটি এবং তাহারই অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে গড়িয়া উঠিবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ এবং অধিকন্তু হইবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের (Health education) প্রসার যাহার ফলে গ্রাম্য সমাজ জীবন হইতে রোগ, শোক, দুঃখ ও দৈন্য চিরতরে কিংবা প্রায় স্থায়ী ভাবেই দূর হইয়া যাইবে।

কমিটির নির্দেশ ও সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল, তৎকালীন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় দুইটি পৃথক্ বিভাগের সমন্বয়; প্রসূতির স্বাস্থ্য, শিশুর স্বাস্থ্য, বিদ্যাভ্যাসরত বালক-বালিকার স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি; সংক্রামক ব্যাধি সমূহের প্রতিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পারিপার্শ্বিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলা প্রভৃতি, সারা দেশ ব্যাপী কতকগুলি প্রাথমিক ও দ্বৈতীক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের বেড়াজালের সাহায্যে গ্রাম্য জীবনের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন। এক কথায় অত্যাবশ্যক ব্যাপারটিকে সমগ্ররূপে বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে সকলের নাগালের বাহিরে রাজধানীর তুঙ্গ শীর্ষ হইতে একেবারে জনসাধারণের গৃহদ্বারের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দেওয়াই ছিল অভিজ্ঞ কমিটির আদর্শ ও মূল লক্ষ্য।

রামের জন্মের আগে রামায়ণের মত 'নব-স্বাধীনতার' জন্মের এক বছর আগেই স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা'র স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারিত হইলেও অর্থাভাবে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র স্বাস্থ্য-পরিকল্পনাকে সার্থক করার কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। শুধু অবিলম্বে ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের একত্রীকরণ সাধিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মূর্তিমতী করুণার মত আবির্ভূত হইলেন পৃথিবীর সকল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনগ্রসর দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিতে এবং ঘোষণা করিলেন যে পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য-লাভই জন্মগত অধিকার এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে 'স্বাস্থ্য' বলিতে কেবল রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই বুঝায় না, পরন্তু শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সামগ্রিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ অবস্থার একত্র সমাবেশই বুঝায়। স্বাস্থের এই নূতন সংজ্ঞা, এই নূতন উপলব্ধি, ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগের চিন্তা শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িয়া আপামর জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। এবং সেই অনুসারে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি জনহিতকর রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় ও পালনীয় কর্ত্তব্যগুলির অন্যতমরূপে স্থান লাভ করিয়াছে।

তারপরই আরম্ভ হইল দেশের সর্বাঙ্গীন

শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে শুভারম্ভ হইল পঞ্চান্নটি সমাজ উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টা (Community projects)। তাহাকে ভাগ করা হইল কয়েকটি অংশে, তাহাদের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন (Community development অথবা C.D.) এবং জাতীয় সেবা-প্রসারণ (National extension block অথবা N.E.S.) অংশই হইল মুখ্য। প্রথমোক্ত অংশের লক্ষ্য হইল তিন বছরের মধ্যে কৃষি, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কুটির-শিল্পের যতদূর সম্ভব উন্নতি বিধান করিয়া দ্বিতীয় অংশের উপর বাকী যাহা থাকে তাহা সম্পন্ন করার ভার দেওয়া, যাহাতে মুখ্যতঃ কৃষি এবং কিয়ৎ পরিমাণে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির অবশিষ্ট অংশটুকু অবশ্যই সাফল্য লাভ করিতে পারে। প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত নেহেরুর কথায় "এগুলিই হইল আমাদের সক্রিয় জনকল্যাণ কেন্দ্র, এবং দীপ শিখা যেমন আলোক ছড়াইয়া চারিদিকের অন্ধকার দূর করে, এই কেন্দ্র গুলির কার্যও ঠিক তেমনি দেশ ও সমাজের বুক হইতে রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে।" সুখের বিষয় নিঃসন্দেহে এই যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার পাঁচবছরের পরে প্রায় ১,২৭,০০০ গ্রাম জুড়িয়া, প্রায় আট কোটি একুশ লক্ষ লোকের জন্য এই রকম প্রায় ১২০০ ব্লকে আশানুরূপ কাজ হইয়াছে। আশা করা যায় যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দেশের বাকী যে অংশ এবং লোকসংখ্যা এখনও ইহার সুযোগ পায় নাই, তাহাদের প্রত্যেকেই অনুরূপ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

পরিকল্পনার উক্ত দু'টি অংশেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রাম্য জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধান। এই জন্য প্রতি তিনটি ব্লকের জন্য একটি স্বাস্থ্য-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়া তাহারই নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যেক ব্লকের জন্য একটি করিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের মারফতে যাহাতে সমগ্র স্বাস্থ্য পরিকল্পনাটি অব্যাহত ও সুষ্ঠু ভাবে অগ্রসর হয়, তাহার জন্যও সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত হইবেন, স্থায়ীভাবে কর্ত্তারূপে একজন চিকিৎসক, এবং তাঁহার অধীনে কাজ করিবেন স্থায়ীভাবে একজন কম্পাউন্ডার, একজন স্বাস্থ্য অনুসন্ধানকারী (Health visitor), চারজন ধাত্রী, একজন স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার এবং দু'জন চতুর্থ শ্রেণীয় সেবক (Class IV servants)। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য কর্ত্তব্য নির্দিষ্ট থাকিবে এবং ঐ কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহারা সর্বদাই সাহায্য লাভ করিবেন স্থানীয় সেবাব্রতী (Village level workers), সামাজিক শিক্ষাকর্মী (Social Education Organiser) এবং অন্যান্য বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরও।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্যগুলি নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) রোগীর চিকিৎসা একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইলেও, মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে যতদূর সম্ভব রোগকে হইতে না দেওয়া।

(২) প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ উচ্চ-সংখ্যার হ্রাস। গর্ভবতী মেয়েদের পরিপুষ্টি ও যত্ন-আত্তি, সন্তান প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্য, প্রসবের পর জননীর সেবা ও যত্ন, শিশুর পরিচর্যা ও পরিপুষ্টি বিধান প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দিলেও অন্য কয়েকটি বিষয়েও, যেমন (ক) বিবাহেচ্ছু নরনারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা (খ) গর্ভাধানের পূর্বে বিবাহিতা নারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এবং (গ) পরিবার-পরিকল্পনা বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা বা সাহায্য হইবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়।

(৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা; অর্থাৎ লোককে যতরকমে পারা যায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত করা। বিচারহীন আচার-সর্বস্ব সমাজের বুক হইতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন্ধ বা কুসংস্কার দূরকরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে স্বাস্থ্যনীতি গুলি পালন করা, প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

(৪) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গঠন, অর্থাৎ বাসস্থানের কাছাকাছি ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করা, বদ্ধ জলপূর্ণ নালা-নরদমা, এদোঁ পুকুর, পানা বা শ্যাওলা পূর্ণ পুকুর প্রভৃতি পরিষ্কার করা, কলকারখানার ধোঁয়া নির্গমের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ময়লা অপসারণ, মলমূত্রের সুষ্ঠু বিলিব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই কর্ত্তব্যের এই বিশেষ অংশের অন্তর্গত।

(৫) সংক্রামক রোগের প্রতিষেধ—অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ অন্যান্য শারীরিক প্রভৃতি রোগ অতি সতর্কতা মূলক ও আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থার ফলে, যাতে একেবারে না হইতে পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(৬) পরিশেষে দেশের সর্বত্র জন্ম-মৃত্যুর হার, গড়পড়তা পরমায়ু বাড়িয়াছে কিংবা কমিয়াছে তাহার যথাযথ পরিসংখ্যান রাখা এবং পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয়ের দ্বারা আরও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের চেষ্টাও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতার পরবর্ত্তী দশ বারো বৎসরে কি ভাবে দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ হইতেছে, তাহারই মোটামুটি একটা আভাষ দেওয়া গেল। পরিকল্পনার প্রথম পাঁচটি বছর অনেকটা উদ্যোগ পর্ব অর্থাৎ তোড়জোড়েই কাটিয়াছে এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মাত্র দুইটি বছর কাটিয়াছে; সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে যুগযুগান্তের কুসংস্কার দূর করা, ঝোপ ঝাড়-জঙ্গল সাফ করা, মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ ও ইদুঁরের বংশ নাশ করা, শত শত বছর

প্রতি হাজার লোক সংখ্যার অনুপাতে কারন জনিত মৃত্যু	ভারতবর্ষ		পশ্চিমবঙ্গ		সিঙ্গুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পঃ বঙ্গ	
	১৯৪৭	১৯৫৪	১৯৪৮	১৯৫৪	১৯৪৭	১৯৫১'
জ্বর (টাইফয়েড ও অন্যান্য)	১০·৮	৬·১	৫·৫	৩·১	০·৫৭	০·২০
প্লেগ	০·৩	০·০০	০·০০	০·০০	০·০০	০·০০
কলেরা ও ওলাউঠা	০·৪	০·০৪	০·৬	০·০৮	০·৪৬	০·২৩
আমাশয় ও পেটের অসুখ	০·৮	১·১	১·১	০·৫	১·৯৭	০·৬৩
	১·৫	১·৩	০·৪	০·১১		
বসন্ত	?	?	০·৪	০·০৩	০·০০	০·০৬
ম্যালেরিয়া	?	?	৩·৬	০·৯	২·৭৬	০·১৬

ব্যাপী সংক্রামক রোগগুলির কায়েমি ভিত্তির মূলে আঘাত করা প্রভৃতি দুরূহ কাজে অত্যাশ্চর্য রকমের সাফল্য আশা করা উচিত নয়। তবুও যে কতকটা সাফল্য লাভ হয় নাই এরূপ বলা চলে না। নিম্নলিখিত তুলনা মূলক পরিসংখ্যানই তাহার প্রমাণ।

এক কথায় বলা যায়, কী সমগ্র ভারতবর্ষে, কী অন্যরাজ্যগুলিতে, কী কয়েকটি গ্রাম্ সমন্বিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, সর্বত্রই এই দশটি বছরের মধ্যেই সাধারণ মৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার এবং প্রসূতি মৃত্যুর হারও অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। আর ফলে গড়পরতা আয়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায়

	ভারতবর্ষ		পশ্চিম বঙ্গ		সিঙ্গুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ	
	১৯৪৭	১৯৫৪	১৯৪৮	১৯৫৪	১৯৪৭	১৯৫১
জন্মের হার - প্রতি শতে	২·৬৬	২·৫৪	২·১৩	২·৩৯	৩·৮৮	৩·৯১
মৃত্যুর হার - প্রতি শতে	১·৯৭	১·২৯	১·৮১	·৯৩	১·৯৮	১·৩১
শিশু মৃত্যুর হার *প্রতি দশ হাজারে*	১·৪৬	১·১৩	১·৩৬৭	·৮৬৯	১·৬৩৪	১·০৫৫
প্রসূতির মৃত্যু হার *প্রঃ,হাজার জন্মদানে*	২ ? (১৯৩৮)		·৮৫	·৪৪	·৯৭৬	·৩২
গড়-পড়তা আয়ু	২৬	৩২		৩৫·৬		

১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হইয়াছে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্ধারিত কাল। পরিকল্পনার জন্য মোট বরাদ্দ ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে সমাজ-উন্নয়নের জন্য খরচ হইয়াছে ৩৪০ কোটি এবং স্বাস্থ্যের জন্য প্রায় একশ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৪·৮ ভাগ। সুতরাং উপরিউক্ত তালিকায় যে টুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাকে মোটামুটি প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলেই হইয়াছে, তাহা বলা চলে। অবশ্য নানা রোগের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ফলে সাফল্য জনিত অভিযানও তাহার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

ভারতবর্ষের মত চল্লিশ কোটি লোক অধ্যুষিত একটা উপমহাদেশের পক্ষে মাত্র দশটি বছর এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সময় নহে। তাহা সত্ত্বেও দশ বছরের মত। জন্মের হার কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে প্রায় একই থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে অতি স্বাভাবিক কারণেই অর্থাৎ কতকটা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এবং কতকটা দারিদ্র্যবৃদ্ধির ফলেই তাহা আগের অপেক্ষা অধিকতর হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে লোকসংখ্যা প্রায় জ্যামিতিক চক্রবৃদ্ধি হারেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়, জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়, এবং তাহার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ সকল রকমে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তাহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ও জনসাধারণের কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

বেকারত্ব ঘুচাইয়া প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হয় তাহা না করিতে পারিলে দেশ ও জাতির অগ্রগতি প্রতিপদে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা—এ বিষয়ে দ্বিমত নাই বলিলেও চলে। সমগ্র দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ৪৮০০ কোটি, তাহার মধ্যে সমাজ উন্নয়নের জন্য ৯০০ কোটি এবং স্বাস্থ্য পরিকল্পনার জন্য ২৮৪ কোটি! সুতরাং আশা করা যাইতে পারে এই দ্বিতীয় পাঁচবছরের অন্তে আমরা সকল বিষয়েই আরও কতকটা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

ইতিমধ্যে যেটুকু সাফল্য আমরা অর্জন করিয়াছি, তাহা ঘটিয়াছে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলিকে স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলেই, যথা—

(১) দেশের সর্বত্র উপযুক্ত পানীয় জলের ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা,

(২) ম্যালেরিয়া দূরীকরণ,

(৩) স্থানীয় ও চলমান কেন্দ্রের (local and mobile units) নিয়ন্ত্রণে গ্রামবাসীদের জন্য নানা রোগের প্রতিষেধ-মূলক ব্যবস্থা,

(৪) প্রসূতি ও শিশুদের সেবা ও যত্ন,

(৫) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা দান এবং স্বাস্থ্য পরিকল্পনার কার্য্যের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কর্মী-প্রস্তুতি,

(৬) ঔষধ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত স্থান ও যন্ত্রপাতির সুলভ্যতা, এবং

(৭) জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণকল্পে "পরিবার—পরিকল্পনা"।

প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সর্বত্র নলকূপ, সংরক্ষিত পুষ্করিণী প্রভৃতির দ্বারা উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, এবং কুম্ভমেলা, শোনপুরের মেলা প্রভৃতিতে সমবেত প্রতি লোকের জন্য প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থার দ্বারাও কলেরা ও টাইফয়েড প্রভৃতি জলবাহিত রোগের প্রকোপ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। একই ভাবে জলবাহিত অন্যান্য রোগ যেমন পেটের অসুখ, আমাশয় প্রভৃতির প্রতিষেধও সহজতর হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ কল্পে ম্যালেরিয়া দূষিত অঞ্চল সমূহে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য একটি করিয়া দুইশ ম্যালেরিয়া—প্রতিরোধক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে; ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক লোক ঐ রাক্ষসীর কবল হইতে আত্মরক্ষার অনেকটা সুযোগ পাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রেরিত একটি বিশেষজ্ঞ সহযোগী মিশন এই উদ্দেশ্যে বহু মাল-মশলা, ঔষধ পত্র (ডি, ডি, টি), পিচকারি, এমন কি সেইগুলিকে দেশের সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার মত যান পর্যন্ত ঐ সঙ্গে সরবরাহ করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিতেছেন। ১৯৫৬ সালের শেষ ভাগে এই রকম ১৪৬টি সহযোগী দল আমাদের দেশে ছিল, বর্ত্তমানে তাহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত ম্যালেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই হইতেছিল। অদূর ভবিষ্যতে দেশ হইতে এই সর্বনাশা রোগকে একেবারে সমূলে উৎপাটনের জন্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে।

ম্যালেরিয়ার মত যক্ষ্মাও আমাদের দেশের আর একটি দুরারোগ্য ও মারাত্মক রোগ। পরি-পুষ্টি হীনতা ও অন্যান্য নানা কারণে আমাদের দেশে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগে এবং প্রতিবৎসরে প্রায় পাঁচ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ট্রেপ্টোমাইসিন, পাস (Pas) আইসো-নিকোটিনিক অ্যাসিড প্রভৃতি ফলপ্রদ ঔষধ-সমূহের আবিষ্কারের ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা আজকাল বহু লোকের রোগ নিরাময় হইয়াছে, এবং প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার পাঁচ বছরে যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর জন্য হাসপাতালের শয্যার ব্যবস্থা ৫০০০ হইতে ২২০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইলেও প্রয়োজনের অনুপাতে এই সংখ্যা অতি নগণ্য। অবশ্য প্রতি যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর জন্য হাসপাতাল কিংবা স্যানিটোরিয়ামে শয্যার ব্যবস্থা করা কখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য রোগগ্রস্ত হওয়ার পর চিকিৎসার দ্বারা নিরাময়ের ব্যবস্থা অপেক্ষা রোগ যাহাতে না হয় অর্থাৎ

প্রতিষেধের জন্য সচেষ্ট হওয়াই ভাল ব্যবস্হা। সেজন্যই প্রায় টিউবারকুলিন পরীক্ষার পর সাড়ে নয় কোটি লোকের মধ্যে তিন কোটি আটাশ লক্ষের জন্য বি, সি, জি ভ্যাকসিন সাহায্যে প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্হা করা হইয়াছে এবং তাহার জন্য প্রায় দেড়শ দল কর্মী দেশের নানা স্হানে সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে। আশা করা যায় যে আর পাঁচ বছরের মধ্যেই দেশের প্রতিটি লোকের জন্যই যক্ষ্মা প্রতিষেধ-ব্যবস্হা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। এত ব্যাপক ভাবে যক্ষ্মার প্রতিষেধকরূপে বি, সি, জি টিকার ব্যবস্হা পৃথিবীর কুত্রাপি এখন পর্যন্ত হয় নাই।

বসন্ত, টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতির প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্হার ফলেও দেশের সর্বত্র এ সকল সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপও বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। প্রতি শহরের ঘিঞ্জি বস্তীগুলিতে প্রতি গৃহে গৃহে এবং অন্যান্য কেন্দ্রেও উপযুক্ত লোকের দ্বারা টিকা দেওয়ানোর ব্যবস্হা আছে। তাহা ছাড়া যে কোন মেলাস্হানেই কলেরার প্রতিষেধক টিকা যেমন প্রত্যেকের পক্ষে বাধ্যতা-মূলক, ঠিক তেমনি বসন্তের টিকা দেওয়ারও উপযুক্ত ব্যবস্হা আছে এবং তাহা না নিলে কাহাকেও সেই সকল অঞ্চলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

গর্ভবতী ও আসন্ন প্রসবা প্রসূতির স্বাস্হ্য-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্হা, সেবা ও যত্ন ও প্রতিটি স্বাস্হ্য কেন্দ্রের কর্ত্তব্যের একটি প্রধান অংশ। কেন্দ্র গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত প্রসূতি স্বাস্হ্য পরিদর্শিকাদের কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতি গৃহে গৃহে খোঁজ করিয়া গর্ভবতী ও আসন্ন প্রসবাদের নানা বিষয়ে স্বাস্হ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্হা আছে। চার বা ছয়টি শয্যাযুক্ত ছোট ছোট প্রসূতি ভবনও কোন কোন কেন্দ্রে আছে। প্রসবকালে সেইগুলিতে প্রসূতিকে ভর্তি করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসক কিংবা শিক্ষিতা দাইর সাহায্যে প্রসব করানো হয়, কিংবা প্রয়োজন মত যাহাতে গৃহে গিয়াও প্রসবকালে যথোপযুক্ত সাহায্যের ত্রুটি না হয়, সেরূপ বিকল্প ব্যবস্হাও আছে। তাহা ছাড়া গর্ভবতীর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, স্বাস্হ্যকর পরিবেশ এবং সর্বোপরি প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্হাও বহুলাংশে প্রসূতির প্রসবকালীন, কিংবা তৎপূর্ব বা পরবর্ত্তী কালে মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাসের জন্য দায়ী, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এই রকম ৭৫০টি প্রাথমিক স্বাস্হ্যকেন্দ্র ছাড়াও, প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য একটি করিয়া প্রায় তিন হাজার প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র আছে। অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্হ্য পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে এই বিশেষ কেন্দ্র গুলির দ্বারা নিম্নলিখিত কার্যগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

(ক) সাধারণ স্বাস্হ্য পরীক্ষা ও সেই অনুসারে যথোপযুক্ত উপদেশ দান,

(খ) প্রতি গৃহে গিয়া গর্ভবতী নারী ও শিশুদের স্বাস্হ্য পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের স্বাস্হ্য যাহাতে ভাল থাকে এবং শিশুদের যাহাতে উপযুক্ত দেহবৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য শিশুর মাতাকে এবং পরিবারস্হ অন্যান্যদের সমুচিত নির্দেশ দান,

(গ) ছোটখাটো কোন অসুখ লক্ষ্য করিলে তাহার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার বিধান,

(ঘ) যথাসময়ে উপযুক্ত প্রতিষেধক টিকার সাহায্যে সংক্রামক ব্যাধির নিরোধ,

(ঙ) শিশুদের স্বাস্হ্যকর অভ্যাস সমূহ যাহাতে রপ্ত হয় তাহার জন্য পিতামাতাকে উপযুক্ত সাহায্য দান, এবং

(চ) অপুষ্টি জনিত রোগে উপযুক্ত পুষ্টি-কর খাদ্যের এবং অন্যান্য রোগের জন্য যথাযথ ঔষধের ব্যবস্হা।

বলাবাহুল্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্হ্য-পরিদর্শকের যথাসময়ে উপযুক্ত উপদেশ এবং সর্বতোভাবে সাহায্য অনেকস্হলেই আসন্ন-প্রসবা নারী ও সদ্যোজাত কিংবা অল্পবয়স্ক শিশুদের অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। তাহা সত্ত্বেও এত বড় বিরাট উপ-মহাদেশের পক্ষে প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল ব্যবস্হাকে পর্য্যাপ্ত বলা যায় না। শুধু আমাদের দেশেই নহে, অ্যান্য বহু দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ডিরেক্টার জেনারেল ডাঃ কাঁদু (Dr. Candau) আমাদের দেশের জন্য প্রেরিত একটি বিশেষ বাণীতে বলেন "পৃথিবীর বহু দেশেই যুদ্ধোত্তর কালে শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গুরুতর। তাহাদের অর্ধেক সংখ্যাই সাধারণতঃ পাঁচ বছরের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে না। আর যাহারা ততোধিক কাল কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও রোগে এবং অবস্থার ফেরে এমন ভাবে বাঁচিয়া থাকে, যাহাতে তাহাদের যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত না হইয়া পারেনা।" বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ছাড়া আর একটি সংস্থা UNICEF ও এই জাতি-গঠনমূলক কর্তব্যে আমাদের সকল রকমে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তাহারাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ইতিমধ্যে যেটুকু ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা আশানুরূপ এবং পর্যাপ্ত না হইলেও একেবারে নগণ্য নহে। শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্য করণীয় যাহা কিছু, সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে জনক-জননীগণ খুবই সজাগ হইয়াছেন। শিশুদের স্বাস্থ্য যে অনেকটা ভাল হইয়াছে এবং শিশু-মৃত্যুর হারও অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে পরিসংখ্যান তথ্যেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এদেশে ১৯২০ সালে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ছিল ১৯৫, ১৯৩৫ সালে ছিল ১৫২, ১৯৪৫ সালে ছিল ১১০ তাহাই আবার ১৯৫৫ সালে নামিয়া আসিয়াছে হাজারকরা ১১০এ। ভারতবর্ষের শিশুরা আজ শুধু তাহাদের পিতামাতার নিজস্ব ভার স্বরূপ নয়, স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে প্রতিটি শিশু আজ জাতির সম্পদ-রূপেও পরিগণিত। তাহাকে সুস্থভাবে বাঁচাইয়া রাখা এবং উপযুক্ত কর্মক্ষম ভাবে দেশের ভবিষ্যৎ সুসন্তানরূপে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব আজ আমাদের গবর্নমেন্টের।

আজ তাই আমাদের দেশের প্রত্যেক শিশু দেশের গবর্নমেন্ট ও প্রত্যেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাছে দাবী করে কয়েকটি জন্মগত অধিকারে, যেমন:

(১) জাতি, বর্ণ এবং ধর্মনির্বিশেষে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ,

(২) প্রতি পরিবারের একটি বিশেষ অংশ হিসাবে সযত্ন পালন,

(৩) তাহার দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সর্বতোভাবে তাহার ব্যবস্থা,

(৪) ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে খাদ্যদান, রুগ্ন শিশুর জন্য উপযুক্ত শুশ্রূষা, দৈহিক অপটু এবং মানসিক পশ্চাৎপদ শিশুর যথাক্রমে দেহ ও মনের উন্নতি সাধন, বেখাপ্পা শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা, এবং পিতৃমাতৃহারা ও নিঃসম্বল শিশুদের উপযুক্ত আশ্রয় ও উদ্ধারের ব্যবস্থা,

(৫) দুঃস্থদের মধ্যে শিশুর অগ্রাধিকার,

(৬) সমাজ-উন্নয়ন ও নিরাপত্তা পরিকল্পনায় শিশুকে সকল প্রকারের সুবিধা ও সুযোগদান, ভবিষ্যতে যাহাতে সে সৎপথে জীবিকার্জন করিতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা এবং যাহাতে দুষ্ট ও মতলববাজ লোকেরা শিশুদের উপর কোনরূপ অন্যায় প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে, তাহার জন্যও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

(৭) প্রত্যেক শিশুর জন্য চাই এমন শিক্ষা যাহাতে তাহার বিবেকবুদ্ধি তাহাকে জনসাধারণের হিতার্থে ভবিষ্যদ্ জীবনে নিজকে নিয়োজিত করিতে সাহায্য করে।

এই অতি ন্যায্য দাবীগুলি মিটাইতে হইলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ শিশুর পিতামাতাকে হইতে হইবে সুস্থ ও সুখী। দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ পিতা-মাতার নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইবে এমন কোন স্বাস্থ্যকর গৃহ, যেখানে প্রচুর আলো, মুক্ত বাতাস ও বিশুদ্ধ পানীয়ের কখনো অভাব থাকিবে না। তৃতীয়তঃ তাহার দৈনন্দিন খাদ্য হইবে তাহার বয়স ও প্রয়োজনমত সুসমঞ্জস ও সুপক্ক। চতুর্থতঃ সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিকল্পনার সবটুকু সুযোগ ও সুবিধা তাহাকে দিতে হইবে। পঞ্চমতঃ তাহার খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত ক্রীড়াসামগ্রী এবং উপযুক্ত সঙ্গী-

সাথীরও ব্যবস্থা থাকিবে। ষষ্ঠতঃ উপযুক্ত শিক্ষা ও কাজকর্মের ফাঁকে তাহার বিশ্রাম এবং খেলাধুলাও চলিতে থাকিবে।

জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনায় এই সকল ব্যবস্থা অপরিহার্য এবং অগৌণে করণীয়। এই কারণেই স্বাধীন ভারত-সরকার শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পুরোভাগে স্থান দিয়াছেন। বিশ্ব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিয়ন্ত্রণে যে শিশুমঙ্গল তহবিলটি (UNICEF) আছে, তাহাতে পৃথিবীর প্রতি সুসভ্য দেশেরই স্বেচ্ছাকৃত দান আছে। আমাদের দেশও ১৯৫৭ সালে তাহাতে চাঁদা দিয়াছে ষোল লক্ষ টাকা। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই সংস্থা নানা ভাবে যন্ত্রপাতি, ও মালমশলার দ্বারা প্রসূতি, স্তন্যদাত্রী জননী ও শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রভূত সাহায্য বিধান করে। ভারতের অঙ্গরাজ্য গুলির বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার সাহায্যার্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও ইউনিসেফের প্রতিনিধিদের একত্র আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি ঐ তহবিল হইতে ১৯৫৭ সালের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ সাহায্য পাইবে।

স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার, গবর্নমেন্ট ও অন্যান্য জনহিতকর সংস্থার সাহায্যের দ্বারা, অর্থবল ও অভিজ্ঞ লোকবল বৃদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ ও নানা যন্ত্রপাতি ও মালমসলার দ্বারা সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নানা গবেষণা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গবেষণা, প্রতি শহরে ও সুদূর গ্রামাঞ্চলে নানা তথ্যানুসন্ধানের ফলেও নানা রোগের কারণ জানা গিয়াছে। তার উপর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রস্তুতি এবং সংক্রামক রোগগুলির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা ও অন্যান্য ব্যবস্থাও অনেকাংশে দায়ী। তাহা সত্ত্বেও যুগান্তকারী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আবিষ্কার গুলিও আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি, মৃত্যুর হার হ্রাস এবং গড়পরতা আয়ুবৃদ্ধির জন্য বড় কম দায়ী নয়। সেই কারণে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য ঔষধ পেনিসিলিনের আবিষ্কর্ত্তা ইংরেজ বিজ্ঞানী স্বর্গীয় স্যার আলেক্‌জেন্ডার ফ্লেমিং, স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কর্ত্তা মার্কিণ বিজ্ঞানী ডাক্তার সেলম্যান এ ওয়াক্‌স্‌ম্যান, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের নিকট ভারতবাসীরাও ঋণী বড় কম নহে। আমাদেরই দেশের স্বর্গত একজন সুসন্তানের অবদানও এই সম্বন্ধে বড় কম নয়, তাঁহার নাম ডাঃ ইয়েল্লাপ্রগদা সুব্বা রাও।

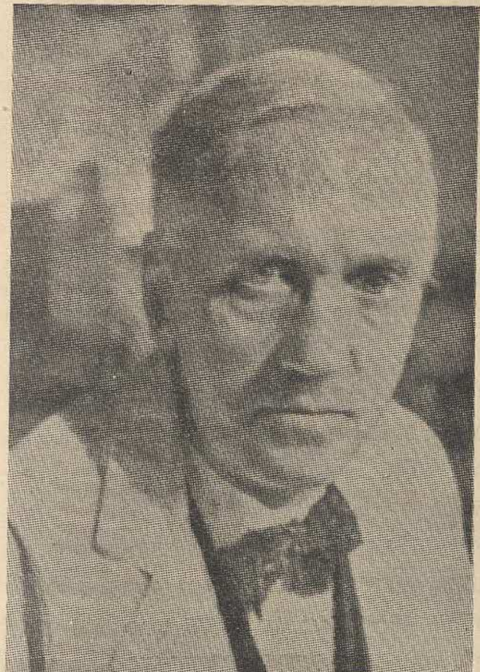
(১) যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধের জন্য	২৭৫,০০০	ডলার
(২) মান্দ্রাজ ও অন্ধ্র প্রদেশে শিশু রোগের চিকিৎসা শিক্ষার জন্য	৮৯,০০০	"
(৩) গলগন্ড-প্রতিরোধের জন্য	১৬,৫০০	"
(৪) ইস্কুলগামী ও কমবয়স্ক শিশুদের উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টিরজন্য	৩৮৩,০০০	"
(৫) বি, সি, জি টিকার জন্য	৫৩,২৩৬	"
(৬) আহমেদাবাদ দুগ্ধ-সংরক্ষণী পরিকল্পনার জন্য	৩৩০,০০০	"
(৭) পেনিসিলিন প্রস্তুতির কারখানার জন্য	২৫,৫২১	"

সুতরাং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রসূতি ও শিশুদের এবং ঐ সঙ্গে জনসাধারণের স্বাস্থ্যেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

স্বাধীনতা লাভের প্রথম দশ বৎসরে দেশের স্বাস্থ্যের যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহার কারণগুলির মধ্যে পরিকল্পনার রূপায়ণ, তাহাতে

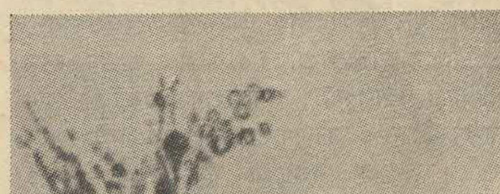
পেনিসিলিনের আবিষ্কার

লন্ডনের সেন্ট্‌ মেরী হাসপাতালের একটি অপরিসর গবেষণাগারে কার্যরত ছিলেন একজন মধ্যবয়স্ক জীবাণুবিদ্‌ ডাক্তার আলেক্‌জেন্ডার ফ্লেমিং। কাচনির্মিত গোলাকার চ্যাপ্টা পেট্রি-ডিশের মধ্যে চট্‌চটে আগার জেলীর উপর তিনি স্ট্যাফাইলো কক্কার্স জাতীয় জীবাণুর বংশবৃদ্ধির



পেনিসিলিন আবিষ্কারক
স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

জন্য তাতে বপন করেছিলেন প্ল্যাটিলাম তারের সরু চাকার সাহায্যে কতগুলি ঐ জাতীয় জীবাণু। অতি সাধারণ পরীক্ষা; তাই তিনি একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলেন এই বপনের কথা। কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে ঐ জাতীয় জীবাণুর বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ আগার মাধ্যমের উপরেই হরিদ্রাভ একপ্রকার ছত্রাকেরও কতকগুলি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে—খুব সম্ভবতঃ স্ফ্যাফাইলোকক্কার্স বপন করার সময়ে অসতর্ক মুহূর্তে বাতাস হইতে কোন ছত্রাক-বীজ উড়িয়া আগারের উপর পড়াতেই তাহার বংশবৃদ্ধির ফলে ঐরূপ উপনিবেশের পত্তন হইয়াছে, এইরূপ তাঁহার মনে হইল। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তিনি লক্ষ্য করিলেন যে যেসকল স্থানে স্ফ্যাফাইলোকক্কাসের উপনিবেশ গুলি বড় হইতে হইতে আসিয়া ছত্রাকের উপনিবেশ গুলির সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই সকল স্থানেই জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিহত হইয়া একেবারে থামিয়া গিয়াছে, অন্যত্র অব্যাহত ভাবে সে গুলি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক স্থানে আবার ছত্রাকের সংস্পর্শে স্ট্যাফাইলোকক্কাসের ঘোলাটে উপনিবেশ যেন কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে গলিয়া একেবারে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানের জন্য ঐ ছত্রাকের কতকটা তুলিয়া লইয়া তিনি অন্য পেট্রীডিশে অনুরূপ আগার মাধ্যমে এবং অন্যত্র মাংসের ক্কাথ মাধ্যমে তাহাকে বপন করিয়া তিনি ছত্রাকটির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন যে ইহা পেনিসিলিয়াম নোটেটাম জাতীয় বিরল ছত্রাক। আরও অনুসন্ধানক্রমে তিনি দেখিতে পাইলেন যে এই ছত্রাকের উপযুক্ত মাধ্যমে বংশবৃদ্ধিকালে এমন কোন রস নিঃসারিত হয়, যাহার সংস্পর্শে এবং প্রভাবে স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ জাতীয় জীবাণু নিবীর্য হইয়া পড়ে এবং এবং তাহার বংশবৃদ্ধি একেবারে প্রতিহত হয়। এইরূপ নিঃসারিত হরিদ্রাভ বস্তুটির তিনি নামকরণ করিলেন "পেনিসিলিন।" এই ঔষধটির এইরূপ অত্যাশ্চর্য



পেনিসিলিন নোটেটাম—পেনিসিলিন

জীবাণুনাশক ক্ষমতার সন্ধান পাইয়া তিনি ইহাকে লোকের জীবাণুঘটিত রোগ-নিরাময়ের কার্যে নিয়োগের জন্য সচেষ্ট হইলেও তিনি বা তাঁহার সহকর্মীরা ঐ সময়ে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাকে উপযুক্ত ভাবে ঘনীভূত করিয়া বিশোধিত অবস্থায় ঔষধরূপে প্রয়োগ-যোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তবু তিনি একেবারে হতাশ না হইয়া অন্যান্য নানা জীবাণুর উপর ইহার প্রভাব লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং কোন কোন সময়ে কোন কোন জীবাণুজনিত ক্ষতের চিকিৎসায় তাহার উপর অবিশোধিত ও অঘনীভূত অবস্থায় ইহার প্রয়োগে ক্ষতগুলির আরোগ্য সাধনে সফল হন।

দশ বৎসর পরে প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দুইজন ইংরেজ জৈব-রসায়নবিদ্ ডাঃ হাওয়ার্ড্ ফ্লোরি ও ডাঃ আর্ণেষ্ট বোরিস চেইন পেনিসিলিনের রাসায়নিক প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে অতি নিষ্ঠার সহিত গবেষণা আরম্ভ করেন। ক্লোরোফর্ম ও অ্যাসাইল এসিটেট দ্রব্যের সাহায্যে ইহাকে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহারা দেখিতে পান যে মাত্র শতকরা একভাগ বিশিষ্ট পেনিসিলিনের ঘনীভূত দ্রবণকে পাঁচলক্ষগুণ জলে মিশ্রিত করিলেও তাহা স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ জীবাণুর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করিতে পারে। ক্রমে চেইন, উইলিয়মস্, আব্রাহাম প্রভৃতি জৈব রসায়নবিদ্ ও জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানীর সহ-যোগে কয়েক বৎসরের সমবেত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৪০ সালে ফ্লোরি অল্প পরিমাণে কটা রঙের কিছু গুড়া প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অতি ফলপ্রদ অথচ প্রাণিদেহে প্রায় কোন বিষক্রিয়াহীন বলিয়া এই গুঁড়াকে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত ও বিশোধনের ভার দেওয়া হইল অক্সফোর্ডের উইলিয়ম ডান স্কুল অব প্যাথোলজি নামক সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের উপর। বহু অর্থব্যয়ে এবং বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও সাধনার ফলে তৎকালে অতি অল্প পরিমাণ পেনিসিলিনের উৎপাদন এই ভাবে সম্ভবপর হইয়াছিল। তখন ইংলন্ড দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরে লিপ্ত, অথচ এরূপ অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ একটি ঔষধের, বিশেষতঃ যুদ্ধে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য ইহার প্রয়োজন খুবই। সেজন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ডাক্তার ফ্লোরিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানীদের সাহায্যে সম্পূর্ণ বিশোধিত অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য পেনিসিলিনের ব্যাপক ভাবে উৎপাদনের জন্য। ফ্লোরি আমেরিকা যাত্রা কালে, তাঁহাদের প্রস্তুত তৎকালীন নির্দিষ্ট মান (ফ্লোরি বা অক্সফোর্ড ইউনিট) বিশিষ্ট পেনিসিলিন গুঁড়া সঙ্গে লইয়া যান এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সেখানে ব্যাপক ভাবে প্রস্তুতি, বিশোধন ও মাননির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। ১৯৪১ সালে অক্সফোর্ডেই পাঁচ হইতে কুড়িগুণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হইলেও ১৯৪২ সালে "এলী লিলি কোম্পানীর গবেষণাগারে প্রভূত শক্তিশালী উন্নত ধরণের ছত্রাক-বৃষ্টি (culture) সংগ্রহের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ হইতে ১০০ গুণ এবং পরে পিত্তরিয়ার সরকারী গবেষণাগারে ১৫০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে এই পেনিসিলিন প্রয়োগে বহু আহত ও রোগা-ক্রান্ত সৈনিকের প্রাণরক্ষা সম্ভবপর হয়। সেজন্য ১৯৪৫ সালে ফ্লেমিং, ফ্লোরি ও চেইন, এই তিনজন বিজ্ঞানীকে চিকিৎসা শাস্ত্রে এই মহৎ অবদানের জন্য 'নোবেল-পুরস্কার' দানে সম্মানিত করা হয়।

দুঃখের বিষয় ১৯৫৫ সালে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পথিকৃৎ স্যার আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মানবকল্যাণে তাঁহার অবদান চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হইবে। বর্ত্তমানে পেনিসিলিনের দাম অতি নগণ্য এবং আমাদের দেশেও তাহা উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে নিউমোনিয়া, টনসিলপ্রদাহ ব্রঙ্কাইটিস, জীবাণুদূষিত ক্ষত, যৌনব্যাধি প্রভৃতির জন্য মৃত্যু অথবা স্বাস্থ্যনাশের সংখ্যা ও পরিমাণ হ্রাসের অন্যতম কারণ যে অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ 'পেনিসিলিন', সেই সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আবিষ্কার

রুশ দেশের ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ হইতে ৯০ মাইল দূরে প্রিলুকা নামে একটি ছোট গ্রাম। সেখানে গত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম ভাগে জন্ম হয় ডাঃ সেলম্যান, এ



স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারক
ডাঃ সেলম্যান· এ· ওয়াক্সম্যান

অয়াক্স্‌ম্যানের। ১৯১০ সালে তরুণ যুবক ওয়াক্স্‌ম্যান স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিজ বাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। নিউব্রান্স্‌উইকে রাটগার্স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস্‌, সি ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি পরবর্ত্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ্‌, ডি, ডিগ্রী লাভ করিয়া তাহার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় রাটগার্স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো বায়োলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনিও ছাত্র অবস্থা হইতেই প্রথমে অণু, উদ্ভিদ ও জীবাণুদের ক্রিয়ার ফলে মাটিতে যে সকল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা নির্ণয় করিতে করিতে দেখিতে পান যে গ্যাস-গ্যাংগ্রীণ ও ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু ব্যতীত অন্যান্য নানা জীবাণু মাটিতে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না এবং মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে, এমন কি গোরস্থানে মৃতদেহে অবস্থিত অসংখ্য মারাত্মক জীবাণুও অচিরে একেবারে লোপ পায়। ফ্লেমিং এর নবতম আশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার মাটির জীবাণু-শাসন ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণায় নিজকে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে রেণে ডুব্‌স্‌ নামক তাঁহার একজন কৃতী ছাত্র রকফেলার ইনষ্টিটিউটে গবেষণাকালে দেখিতে পান যে মাটিতে এমন কিছু বর্ত্তমান আছে, যাহা স্টেপ্‌টোকক্কাস্‌, স্ট্যাফাইলো-কক্কাস্‌, নিউমোকক্কাস্‌ প্রভৃতি মারাত্মক জীবাণুকে সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কিছুকাল ধরিয়া চেষ্টার ফলে তিনি ভূমিস্থ এক শ্রেণীর জীবাণুর দ্বারা নিঃসৃত 'টাইরো থ্রিসিন' নামক এরূপ প্রভাব বিশিষ্ট একটি রাসায়নিক উপাদান বাহির করিতে সক্ষম হইলেও, কেবল মূত্রাশয় প্রদাহ বহুদিনের পুরাতন দুষ্ট ফোঁড়া ও বহুমুখী ফোঁড়া ছাড়া অন্য কোন রোগে ইহার প্রয়োগের দ্বারা সুফল লাভ সম্ভবপর হয় নাই, কারণ বিষক্রিয়া হেতু জীবদেহে ইহার ব্যাপক প্রয়োগে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল।

পেনিসিলিনের আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া ওয়াক্‌সম্যান কয়েকজন সহকর্মী সহ নানা ভাবে মৃৎজীবাণুর রোগজীবাণু শাসক ক্ষমতা-সম্বন্ধে নানা ভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। (১) রোগজীবাণুর কালচারের সঙ্গে মৃৎজীবাণুর কালচার অল্প পরিমাণে মিশাইয়া 'সিলিন্ডার কাপ' প্রক্রিয়াতে শাসক ক্রিয়া সম্পন্ন মৃৎজীবাণুর জাতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়: (২) ডুবস্‌ ব্যবহৃত ঘনীকরণ প্রক্রিয়াতে কোন বিশেষ রোগজীবাণুকে প্রতিদিন টবের মাটিতে ফেলিয়া মৃৎজীবাণুর দ্বারা শাসকবস্তু উৎপাদনের পর ঐ মাটির পরিবর্তে অন্য মাটিতে আবার অধিক পরিমাণে শাসকবস্তু উৎপাদন করতঃ কয়েক স্তরে যখন প্রচুর শাসক উপাদান জমা হয়, তখন তাহাকে সংগ্রহ করার চেষ্টাও চলিতে থাকে, এবং (৩) সহকর্মী উডুরুকের লক্ষিত অ্যাকাটিনো-মাইসিস অ্যান্টিবায়োটিকাস্‌ জীবাণুর দ্বারা

নিঃসৃত অ্যাক্টনোমাইসিস্ নামক শাসক উপাদান নিজ ওজনের দশ কোটি গুণ জলেও নানা প্রকারের সাধারণ ও রোগজীবাণুকে এবং রোগ উৎপাদক ছত্রাককেও নষ্ট করে, এরূপ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতে থাকে। মটর-পরিমাণে অল্প মাটিকে বেশ কতকটা জলে গুলিয়া তাহার সামান্য কিছু পেট্রিডিশে আগার



ম্যাক্টিনোমাইসিস্ গ্রিনিয়াস্—
স্ট্রেগ্‌টিনোমাইসিন

মাধ্যমে মিশ্রিত করা হয়, ফলে মৃৎজীবাণুদের বৃদ্ধি এক স্হানে অত্যধিক ভাবে জমা না হইয়া ছোট ছোট পৃথক উপনিবেশের আকারে হইতে থাকে। তখন যে উপনিবেশের চারিদিকে জমানো আগারের মধ্যে রোগজীবাণু প্রতিহত বা নষ্ট হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়, তাহাকেই পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সুনিপুণ ভাবে পরীক্ষা করা হইতে থাকে।

এই ভাবে প্রস্তুত অ্যাক্টিনোমাইসিনকেও কিন্তু তাহার বিষক্রিয়ার জন্য রোগের চিকিৎসা-কল্পে প্রয়োগ সম্ভবপর হয় নাই। এরূপ বিফলতা সত্ত্বেও ওয়াক্স্ম্যান নিরুৎসাহ না হইয়া, নানা স্হান হইতে সংগৃহীত গলিত লতা-পাতা, পচা গোবর প্রভৃতিতে বর্তমান অ্যাক্টিনো-মাইসিস্ ল্যাভেন্ডুলি নামক মৃৎজীবাণু হইতে বহু আয়াসসাধ্য চেষ্টার পর প্রায় পেনিসিলিনের মতই কিংবা ততোধিক ফলপ্রদ স্ট্রেপ্টোথ্রিসিন নামক একটি রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। তাঁহার আর একজন সহ কর্মী, আলিবার্ট সুল্ট্জ্ ইহার অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী আর একটি উপাদান আবিষ্কারে সক্ষম হন; ইহারই নাম স্ট্রেপ্টো-মাইসিন। শুধু সার যুক্ত মাটি হইতেই নয়, রুগ্ন মুরগীর গলা হইতেও যে পৃথক্ ধরণের স্ট্রেপটোমাইসিন গ্রিসিয়াস্ পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতেও যে স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইল, এবং তাহার অতি অল্পই বৈষিক ক্রিয়া আছে এইরূপ দেখা গেল। যে সকল রোগে পেনি্সিলিনের দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় নাই, সেই সকল রোগে বিশেষতঃ 'আনডুলেন্ট্ ফিবার', র‍্যাবিট ফিবার, এমন কি টাইফয়েড্ ও প্যারা-টাইফয়েড রোগেও ইহার কার্যকারিতা প্রমাণিত হইল। তাহার পরই আরম্ভ হইল নানা রকমের যক্ষ্মা রোগের প্রথম অবস্হায় ইহার প্রয়োগে জ্বর ও কাশির উপশম, ক্ষুধা ও দেহের ওজন বৃদ্ধি এবং অচিরে কতকটা সুস্হতাবোধ প্রভৃতি অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাইতে লাগিল। বস্তুতঃ এক কথায় পেনিসিলিনের পর ইহাকেই দ্বিতীয় অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধরূপে চিকিৎসা-জগৎ দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করিল। ফলে ১৯৫২ সালে ৬৪ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় ওয়াক্সম্যানকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন সংক্রান্ত গবেষণার পথিবৃৎরূপে ঐ বৎসরের জন্য ভেষজ ও শরীরবিদ্যার নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করা হইল।

স্ট্রেপ্টোমাইসিনের অধিক প্রয়োগে কোন কোন ক্ষতিকর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে, এ সম্বন্ধে আরও গবেষণার ফলে ইহার সঙ্গে হাইড্রোজেন অণু যোগ করার পর অনেকটা কম বিষ ক্রিয়া-সম্পন্ন ডাই-হাইড্রোস্ট্রেপ্টোমাইসিন্ যুক্তরাষ্ট্রের 'এলী লিলি' কোম্পানীর গবেষণাগারে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার প্রয়োগে ঠিক স্ট্রেপ্টোমাইসিনের মতই ফল পাওয়া যায়, অথচ

বহুদিন ইন্‌জেক্‌শন করিতে থাকিলেও শরীরের পক্ষে বিশেষ কোন হানি হয় না।

অধুনা বহুমিশ্র জীবাণু ঘটিত রোগে শুধু পেনিসিলিন বা স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগে আশানুরূপ ফল হয় না বলিয়া প্রায়শঃ একই সঙ্গে ইনজেক্‌শনের দ্বারা দুইটি ঔষধই প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায় বলিয়া দেখা গিয়াছে। 'কমবায়োটিক', 'পেন্‌স্ট্রেপ্‌' প্রভৃতি এই জাতীয় মিশ্র ঔষধ। ইহাদের ব্যবহারেও আমাদের দেশে জীবাণুঘটিত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি অতীব ফলপ্রদ ঔষধ যেমন প্যারা অ্যামাইলো স্যালিসিলিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে PAs), অ্যাসিটা মাইনো বেন্‌জোল্‌ডি-হাইড আয়োসেমিকার্বাজেন (সংক্ষেপে, টিবিয়োন), আইসো নিকোটিনিক হাইড্রাজাইড (সংক্ষেপে, নাইড্রাজাইড) প্রভৃতি প্রয়োগে যক্ষ্মারোগের নিরাময় অনেকটা সহজ সাধ্য হইয়াছে এবং সেই জন্যই যক্ষ্মাকে আজ আর আমাদের দেশে আগের মত "দেবের অসাধ্য রোগ" বলিয়া কেহ মনে করে না। যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার হ্রাসের মূলে যে এই সকল অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ ঔষধ, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

আর একজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডাঃ ডয়েসি 'আস্‌পার জিলাস্‌ ফিউমিগেটিন নাম ছত্রাক হইতে 'ফিউমিগেটিন' নামক যক্ষ্মা-রোগের আর একটি ফলপ্রদ ঔষধ আবিস্কার করিয়াছেন। ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের নিকটবর্তী কোন চাষ-আবাদের ক্ষেতের মাটি হইতে প্রাপ্ত 'স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ভেন্‌জুয়েলি' নামক ছত্রাক হইতে ডাঃ বার্কহোল্ডার ও তাঁহার সহকর্মীরা 'ক্লোরোমাইসেটিন' নামক যে ফলপ্রদ ঔষধটি প্রস্তুত করেন তাহারই প্রয়োগে আজকাল টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড প্রভৃতি রোগের মারাত্মকতা আর নাই বলিলেও চলে। ইহারই সাহায্যে যে টাইফয়েড রোগ আরো অব্যাহত গতিতে মাসাধিক কাল চলিতে থাকিয়া বহুস্থলে মৃত্যু ঘটাইত কিংবা অন্যথা বহুদিনের জন্য স্বাস্থ্য নাশের কারণ হইত, আজ বহু স্থলেই তাহা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইতে দেখাযায়। ফলে ঐরূপ মারাত্মক রোগ জনিত মৃত্যুর হার আশাতীত রূপেই হ্রাস পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'চার্লস ফাইজার' ঔষধের কারখানার গবেষণাগারে ডাঃ ই, কিউ, কিং ১৯৫০ সালে মাটির 'স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন রিথোসাস' নামক নোমাইসিস জাতীয় অণুছত্রাক হইতে টেরামাইসিন নামক আর একটি অত্যাশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার



ইয়েল্লো প্রাগদা সুববা রাও

করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ফলে ইহার প্রয়োগ নানা শ্বাস জনিত রোগ (যেগুলি শুধু পেনিসিলিন প্রয়োগে সারে না), স্পাইরোকীট, রিকেট্‌সিয়া, ও নানা ভাইরাস রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও খুবই হ্রাস পাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লেডারলে ঔষধ কারখানার ডাঃ বি, এম ভাপারও ১৯৪৮ সালে নেমাইসিন, জাতীয় আর একটি অণুছত্রাক, 'ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন অরিয়ো-ফ্যাসিয়েন্স' হইতে "অরিয়োমাইসিন" নামক

টেরামাইসিনের অনুরূপ আশ্চর্য ফলপ্রদ আর একটি ঔষধ কয়েকজন সহযোগীর সহযোগে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। ইহার প্রয়োগে বহু দুরারোগ্য রোগ যেমন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং-কাশি, প্যারট ফিবার, টাইফাস্ জ্বর, নানা প্রকারের নিউমোনিয়া প্রভৃতির নিরাময় সহজ-সাধ্য হইয়াছে এবং তজ্জনিত মৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের গৌরবের বিষয় যে আমাদেরই একজন স্বদেশ-বাসী ভারতীয়, ডাঃ ইয়েলাপ্রাগদা সুব্বা রাও তৎকালে অরিয়োমাইসিন আবিষ্কারে ডাঃ ডাপারকে প্রভূত সাহায্য করেন। সুতরাং এই আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কারের গৌরব কতকটা তাঁহারও প্রাপ্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতের গৌরব এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মাত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে অকালে ১৯৪৮ সালে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে পরলোক গমন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ডাঃ সুব্বা রাওয়ের অবদান বড় কম নহে। বিশেষতঃ তাঁহারই আবিষ্কৃত ফলিক অ্যাসিড প্রয়োগ পদ্ধতিতে পৃথিবীর সর্বত্র এবং আমাদের দেশেও দুরারোগ্য স্প্রু রোগে মৃত্যুর অত্যধিক সংখ্যা আজকাল আর দেখা যায় না বলিলেও চলে।

ফলিক অ্যাসিড, টেরোপ্‌টেরিন, হেট্রাজান, ফলিকাযেথাজি প্রভৃতির আবিষ্কারঃ

মান্দ্রাজ শহরে একজন সরকারী কেরাণীর কোন পুত্রের হইয়াছিল মারাত্মক অসুখ; জিহ্বার ঘা ও প্রদাহ, রক্তশূন্যতা, পেটের অসুখ এবং ঝড়ে পর্যুদস্ত কাকের মত চেহারা ছিল রোগের লক্ষণ! ডাক্তার ডাকা হইল, তিনি আসিয়া বলিলেন "স্প্রু" হইয়াছে, ইহার কোন চিকিৎসা নাই। কিছুই করা সম্ভবপর হইল না। রোগী রোগে ভুগিতে ভুগিতে অন্তিম্ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক ভাই ইয়েল্লোপ্রাগদা সুব্বারাও নিঃসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন—কিন্তু চিরকালের জন্য তাহা তাঁহার মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া রহিল এবং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়াই হউক এইরূপ অসহায় অবস্থা দূর করিতেই হইবে। এই প্রতিজ্ঞা পালনের প্রথম শুরু হিসাবে তিনি মান্দ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইলেন এবং কয়েকজন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুর সাহায্যে সেখানের শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডাক্তার হইলেন। ১৯২১—১৯২২ পর্যন্ত তিনি ঐ কলেজে শরীর বিদ্যার ডেমোনস্ট্রেটার হইয়া "স্প্রু"র কারণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিলেন এবং ঐ রোগ সম্বন্ধে আরও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য লন্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ১৯২২ সালে যোগ দিয়া ১৯২৩ সালে সেখানকার ডিপ্লোমা লাভ করেন। ঐ সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাসুসেট্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয় রোগ সমূহের অধ্যাপক স্বর্গত ডাঃ রিচার্ড স্টং এর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। তখন ঐ অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁহার অণু-সন্ধিৎসা এবং গবেষণার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া, এত মুগ্ধ হন যে তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়া "স্প্রু" সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতে উপদেশ দেন। অসাধারণ সাহস ও পুরুষকার ছিল সুব্বা রাওর। ঐ উপদেশকে শিরোধার্য করিয়া মাত্র ২৫ ডলার আর্থিক সম্বল (?) সহ তিনি ১৯২৩ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হন এবং গ্রাসাচ্ছা-দনের জন্য প্রথমে চুল্লীতে কয়লা দেওয়ার এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের সাথীর (orderly) কাজ করিয়া, এবং পথে মালিকহীন মার্জারগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কার্য আরম্ভ করেন। তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী সালেই তাহার গবেষণার সাহায্যের জন্য তাহাকে একটি বৃত্তি (research fellowship) দান করেন। ঐ বৃত্তির নির্ধারিত সময় শেষ হইয়া গেলে রকফেলার ফাউন্ডেশন তাহার জন্য আর একটি গবেষণামূলক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ১৯২৪ সালে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২৫ সালে হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ সাইরাস, এচ্ ফিস্কে

ও ডাঃ সুববারাও রড পরিমাপক প্রক্রিয়ার দ্বারা ফস্করাসের পরিমাণ নির্ণয় ও ১৯২৭ সালে পেশীর সংকোচনের জন্য অত্যাবশ্যক ফস্কো-ক্রিয়েটিন নামক উপাদান আবিষ্কার করেন। ১৯৪০ সালে তিনি হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয় হইতে জৈবরসায়নে পি, এচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত অন্যান্য সহযোগী সহ ডাঃ সুববা রাও যকৃৎ-নিষ্কাশের (liver extract) বিভিন্ন উপাদানের পৌষ্টিক মূল্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং ১৯৩৫—৩৭ পর্যন্ত প্রক্যাটোটার তহবিলের সাহায্যে এবং পরবর্তী তিন বছর আরও অন্যান্য গবেষণার সাহায্য তহবিল হইতে অর্থানুকূল্যে—প্যাল্লেগ্রা রোগের প্রতি-ষেধক নিকোটিনিক অ্যাসিডের পরিচিতি, স্বতন্ত্রীকরণ এবং বিশোধন সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করেন।

১৯৪০ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া নিউইয়র্কের আমেরিকান সায়ানামাইড প্রতিষ্ঠানের লেডারলে ভেষজ গবেষণাশাখার সহ-ডিরেক্টারের পদ গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই পদোন্নতির ফলে সেখানকার ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। মুখ্যতঃ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে গবেষণার ফলে ঐ গবেষণাগারে ফলিক অ্যাসিড, টেরোপ্-টেরিন, সালফামেথাজিন, অরিয়োমাইসিন, হেট্রা-জান প্রভৃতি নানা রোগের অসংখ্য নিশ্চিত ফলপ্রদ ঔষধ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয় ও চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করে।

যে স্প্রু রোগে তাঁহার ভ্রাতার ১৯১৮ সালে মৃত্যু হইয়াছিল এবং যাহার প্রতীকারের জন্য তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে পাগলের মত একদিন ছুটাছুটি করিয়া স্বদেশ হইতে বহুদূরে পৃথিবীর অপর প্রান্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় নিজকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' প্রতিজ্ঞা করিয়া, অবশেষে তিনি ঐ মারাত্মক রোগের অতি ফলপ্রদ ঔষধ 'ফলিক অ্যাসিড' আবিষ্কারের দ্বারা শুধু নিজের প্রতিজ্ঞা পালনই করেন নাই ঐ মারাত্মক রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি বন্ধ করিয়া ব্যান্টিং বেষ্ট্, ফ্লেমিং, ওয়াক্স্ম্যান প্রভৃতি মানবহিতৈষী বিজ্ঞানীদের একই স্তরে আসন লাভের গৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সেজন্য বিজ্ঞানী মহলে এবং জনসাধারণের কাছেও তিনি "অত্যাশ্চর্য ঔষধ সমূহের আবিষ্কর্তা অত্যাশ্চর্য মানুষ" নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মাত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে ১৯৪৮ সালে দুরারোগ্য করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে অকালে অকস্মাৎ তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। এভাবে শুধু ভারতবর্ষই নহে, পৃথিবীও একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে অকালে হারানোর দুর্ভাগ্য বরণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের এইরূপ একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবন কথা—আমাদের দেশের খুব কম লোকেরই জানা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুইজন ভক্ত ও অনুরাগী সহযোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহার একখানি বিস্তারিত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। আর যে গবেষণা-গারকে তিনি নিত্য নূতন আবিষ্কারের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সেখানে তাঁহারই অমর স্মৃতিকে চিরস্থায়ীকরার জন্য কৃতজ্ঞতার স্মারকরূপে, পৃথিবীর মধ্যেই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে পুস্তকালয় আছে, তাহার নূতন নামকরণ করা হইয়াছে "সুববা রাও স্মারক লাইব্রেরী।"

আজ স্বাধীন ভারতে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অগ্রগতির আলোচনা কালে ভারতের এই কৃতী সন্তানের অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা এবং কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত।



শিশু চরিত্রে ভয় ও সাহস

শিশুদের চরিত্র গঠন করাই যে শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য একথা আজ সর্ববাদি-সম্মত। কিরূপে তাদের চরিত্র ঠিক ভাবে গঠন করা যায় এটিই পিতামাতা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটি মস্তো বড়ো সমস্যা। আজকের দিনে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভংগী দিয়েই শিক্ষাসমস্যাগুলি দেখতে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই সেগুলির সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে শিশুচরিত্র পর্যবেক্ষণ করতেও তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। তাঁদের সেই নিরলস, অক্লান্ত চেষ্টার ফলাফলের উপরেই বিশেষ করে শিশু মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এখনও গভীর ও ব্যাপক গবেষণার প্রচুর অবকাশ আছে। আজ প্রত্যেক শিক্ষিত পিতামাতা ও চিন্তাশীল শিক্ষক-শিক্ষিকারই উচিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের চিন্তা-ধারার সংগে পরিচিত হওয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতগুলি অনুধাবন ও পরীক্ষা করতে চেষ্টা করা। গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতামাতাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট মূল্য আছে। এর দ্বারা শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদগণও বিশেষ উপকৃত হতে পারেন।

শিশুচরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এর মধ্যে কতোগুলি বিপরীতধর্মী গুণাগুণের অপূর্ব সমাবেশ। কতোগুলি বিশেষ বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি ও প্রবণতা ও যেমন দেখা যায় তেমনি কতোগুলি দুর্বলতাও। ক্ষেত্রবিশেষে রুচি ও প্রবণতাগুলি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে এবং দুর্বলতাগুলি ও নিরসন বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভয় ও শিশুমনের একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা, যা দূর করা বা নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ দরকার। মানুষ কখনও সম্পূর্ণ ভয়বর্জিত হতে পারে না। ভয় থেকেই সাবধানতার উদ্ভব। সুতরাং পরিমিত পরিমাণে কতোগুলি ভয় আমাদের থাকা দরকার। "The child is father of the man" শিশুই ভবিষ্যৎ মানব। তাই শিশুচরিত্র ঠিকভাবে গঠন করতে হলে তার অতিরিক্ত ও অহেতুক ভয়কে ও যেমন প্রশ্রয় দিতে নেই, তেমনি তার মানসিক দৃঢ়তা সাহসিকতাকেও উৎসাহিত করতে হবে। তবেই তার চরিত্র সবল ও বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠবে।

শিশুচরিত্রে কতোগুলি অহেতুক ও অমূলক ভয় থাকা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তার বিচারবুদ্ধি এখনও পরিণতি লাভ করেনি। সে যুক্তি প্রয়োগ করে সব সময়ে বুঝতে পারেনা কোথায় ভয়ের

প্রকৃত কারণ বিদ্যমান এবং কোথায় তা নেই। তার অহেতুক ভয়গুলি দূর করা নিতান্ত দরকার। নতুবা ক্রমে সেগুলি মানসিক দুর্বলতায় পরিণত হবে। অত্যধিক ভয় আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। অতিরিক্ত ভয় ভীরুতা বা কাপুরুষতারই নামান্তর। নৈতিক ভীরুতা অনেক সময়ে আমাদের অনেক মনুষ্যত্ব-বিরোধী কাজেও প্ররোচিত করে। অথচ ভয়কেও আমরা সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারি না। কিছু পরিমাণ ভয় না থাকলে আমরা সতর্ক হতেও শিখি না। দুঃসাহসিকতায় সমূহ বিপদ। ছেলেমেয়েদের তাই যেমন সতর্কতা শিক্ষা দিতে হবে তেমনি তাদের সাহস অর্জন করতেও উৎসাহিত করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই তারা যেন ভয়ের দাস না হয়ে তার প্রভু হতেই শেখে। তারা যেন জীবনের কোনও অবস্থাতেই ভয়ের কাছে পরাভব না মানে—তাকে যেন জয় করতেই চেষ্টা করে। তাদের সামনে রয়েছে জীবনের কঠিন বন্ধুর পথ। কঠোর জীবন-সংগ্রামে নেমে হয় তো তাদের কতো ভীষণ সংকট বা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হলে চাই তেজোদৃপ্ত, অমিত মনোবল—চাই "সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।" তাই শিশুচরিত্রে হওয়া চাই ভয় ও সাহসের সুষ্ঠু, সুন্দর সমন্বয়।

ভয় আদৌ শিশুদের সহজাত সংস্কার নয়। আমাদের অনেকেরই ধারণা ভয় তাদের সহজাত সংস্কার বিশেষ। কিন্তু অনেক কারণেই মনে হয় এ ধারণা ভ্রান্ত। নবজাত শিশুকে একরকম ভয়শূন্য বলেই মনে হয়। জন্ম থেকে এক দেড় বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিশেষ কোনও ভয়ই দেখা যায় না। এই বয়সে সাধারণত দুই প্রকার অনুভূতিই তাদের থাকে—সুখকর ও পীড়াদায়ক, যার জন্যে তারা হাসে ও কাঁদে। হঠাৎ কোনও জোর শব্দ শুনলেই শিশু কেঁদে ওঠে। মনে হয় সে বুঝি ভয় পেয়েই কেঁদে উঠলো। এই বয়সে পড়ে যাবার ভয়টিও তার কিছু কিছু থাকে। অনেক সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠরা শিশুদের আমোদ দেবার জন্যে খেলাছলে লোফেন। প্রথম প্রথম এতে তারা একটু ভয় পায় ও কাঁদে। পরে ক্রমে যখন তাদের ভয় ভেঙে যায় তখন তারা এতে প্রচুর আমোদ পায় এবং হাসে। আত্মরক্ষা আমাদের একটি সহজাত সংস্কার, যার থেকেই শিশুদের এই ধরণের ভয় উদ্ভূত হয়। এই রকম ভয় ছাড়া এক দেড় বছর বয়স পর্যন্ত তাদের আর কোনও ভয় বিশেষ দেখা যায় না।

ভয় বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত অথবা অপর কর্তৃক সংক্রামিত। জ্ঞানোন্মেষের সংগে সংগে যখন শিশুদের বাস্তব জগতের সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং তাদের নানা প্রকার অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হতে থাকে, তখনি তাদের মনে নানাবিধ ভয়ের সঞ্চার হতে দেখা যায়। কথাই আছে—"পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়"। ভয়ের মূল সাধারণত বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত থাকে। যে শিশু হেঁটে চলে বেড়াতে শেখেনি, তার ভয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা হবার সম্ভাবনাও খুব কম। অন্য কাউকে ভয় পেতে দেখলেও সে অনেক সময়ে কিছুই বুঝতে পারে না। সাধারণত দেড় বছর বয়সের পর থেকেই শিশুদের মনে ভয়ের বীজটি অংকুরিত হতে থাকে। ছোট ছেলে মেয়েরা প্রথমে অন্ধকারকে মোটেই ভয় করে না। এর মধ্যে যে কোনও অজ্ঞাত ভয় বা বিপদের সম্ভবনা আদৌ থাকতে পারে এ ধারণাও তাদের নেই। বয়োজ্যেষ্ঠদের ভয় করতে দেখেই তারা ক্রমে অন্ধকারকে ভয় করতে শেখে। অজ্ঞ, অবোধ শিশু জানে না কোনও পোকা মাকড় বা জীবজন্তু দ্বারা তার কোনও বিপদ বা অনিষ্ট হতে পারে। এগুলি দেখে প্রথমে ভয় করা তো দূরে থাকুক সে হয় তো খেলার জিনিষ মনে করেই হাত দিয়ে ধরতে যাবে, অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো খাবার জিনিষ মনে করেই মুখে পুরতে যাবে।

ভূতের ভয় পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। সাধারণত পল্লীগ্রামের লোকেরাই বেশী ভূতের ভয় পায়। ছোট শিশুর এ ভয়টি প্রথমে মোটেই থাকে না। ভূত যে কি তা তার জানা নেই। তার দ্বারা যে কোনও অনিষ্ট হওয়া সম্ভব এ ধারণাও তার নেই। সে বড়োদের কাছ থেকে নানারকম গল্প শুনে বা তাদের ভূতের ভয় পেতে

দেখেই ক্রমে এই ভয়টি শেখে। প্রথম প্রথম অনেক অবোধ শিশু আগুণ দেখে তাতে হাত দিতে যায়। আগুন থেকে যে কোনও বিপদ ঘটতে পারে এ জ্ঞান তার নেই। আগুনে নিজের হাত পুড়লেই অথবা অন্য কারুর হাত পুড়তে দেখলেই সে আগুনকে ততই ভয় করতে শেখে। ছাদ বা অন্য কোনও উঁচু জায়গা থেকে পতনের ফলে যে মৃত্যু ঘটতে পারে অথবা গুরুতর দৈহিক আঘাত লাগতে পারে এ ধারণাও শিশুদের প্রথমে থাকে না। দুই একবার পড়ে গেলেই তারা বোঝে পড়লে আঘাত পাবার সম্ভবনা। তখন তারা সাবধান হতেও শেখে। সেই রকম রোগের ভয় বা মৃত্যু ভয় ও তাদের অজানা। মৃত প্রিয়জন যে কোন্ অজ্ঞাত রহস্যলোকে চলে গিয়েছে—সেখান থেকে যে তার আর ফিরে আসা সম্ভব নয় একথা বোঝাও শিশুর সাধ্যাতীত। বড়োদের কাঁদতে দেখে সে ও কাঁদে। কতো মাতৃহারা অবোধ শিশুকে বড়োদের প্রশ্ন করতে শোনা যায়—"মা কোথা গিয়েছে?" উত্তরে সে হয়তো শোনে—"মা স্বর্গে গিয়েছেন, ভগবানের কাছে গিয়েছেন।"—ইত্যাদি। স্বর্গরাজ্যটি যে কোথায় তাও তাদের জানা নেই। কতো সময়ে তারা ভাবে তাদের মা বুঝি বা রাতের অগণ্য, অসংখ্য তারাগুলির মধ্যে একটি ছোট্ট তারা হয়েই আকাশের গায়ে জ্বল্ জ্বল্ করে ফুটে রয়েছে—হয়তো বা সেখান থেকেই স্নেহ করুণ নয়নে চেয়ে রয়েছে তাদের পানেই। বড়ো হয়ে যখন তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি বাড়ে, তখনি তারা যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা সব কিছু বুঝতে পারে। মৃত্যুর ভয়াল রূপটিও তখন তাদের চোখে ধরা পড়ে। সেই সময়েই তাদের মনে মৃত্যুভয় ও জাগে। তেমনি রোগের ভয়ও শিশুদের প্রথমে অজানাই থাকে। বড়োদের ভয় দেখেই তারা এই ভয়টি শেখে। পরে যুক্তি বিচার দ্বারা ভয়ের কারণটিও হৃদয়ংগম করতে পারে। এই রকম বড়োরা আরও অনেক ভয় করে থাকেন যেগুলি প্রথমে শিশুদের মধ্যে আদৌ দেখা যায় না। এই জন্যেই মনে হয় ভয় তাদের সহজাত সংস্কার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পরে অর্জিত। কতোগুলি ভয় অপর কর্তৃক সংক্রামিত, আবার কতোগুলি ভয় নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকেই সঞ্জাত।

অনেক সময়ে শিশুদের কতোগুলি অহেতুক বা অমূলক ভয় ও মনে পোষণ করতে দেখা যায়। তাদের শিশুসুলভ অজ্ঞতাই প্রধানত এই ভয়গুলির কারণ। তাই সর্বপ্রথম তাদের অজ্ঞতা দূর করতে চেষ্টা করাই দরকার। ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে কোনও অজানা, নতুন বা অদ্ভুত জিনিষ দেখলেই ভয় পায়। এগুলি বস্তুত কি তা তাদের জানা নেই। তাই তারা অনেক কিছু কল্পনা করেও ন্যায়। কল-টেপা, চাবি-দেওয়া যন্ত্রচালিত খেলনা গুলিও প্রথম প্রথম অনেক শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক করে। তারা প্রথমে এগুলি হাত দিয়ে ছুঁতে বা নাড়তেও ভয় পায়। যদি তারা অপর কাউকে এগুলি নিয়ে খেলতে দেখে তবেই ক্রমে ক্রমে তাদের ভয় দূর হয়।

অজানা রহস্য থেকেই ভয়ের উৎপত্তি। শিশুরা এই ধরণের খেলনাগুলির রহস্য ভেদ করতে পারে না বলেই ভয় পায়। জিনিষগুলির সংগে যখন তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে—যখন তারা সেগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে ও নেড়ে চেড়ে বোঝে এগুলির মধ্যে ভয়ের কোনও কারণ নেই, তখনি তাদের ভয় ভাঙে। এরূপ ক্ষেত্রে বড়োদের উচিত ছেলেমেয়েদের জিনিষগুলি হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে দেওয়া। পরে যখন শিশুরা বোঝে যে তাদের ভয় নিতান্তই অমূলক, তখন তারা লজ্জা পায় এবং ভয়কে জয় করবার গর্বে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ছোট ছেলেমেয়েরা অন্ধকার ঘরে একা শুতে বা থাকতে ভয় পেলে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে অন্ধকারে বাস্তবিকই ভয়ের কোনও কারণ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের অন্ধকারে থাকতে দিয়েই বোঝাতে হবে যে তাদের ভয়টি সম্পূর্ণ অহেতুক। প্রথম প্রথম ভয় পেলেও ক্রমে তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বয়োজ্যেষ্ঠরা অজান্তে বা অজ্ঞতাবশত ও অনেক ভয়ের বীজ শিশুদের মনে বপন করে থাকেন। অনেক সময়ে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অকারণ ভূতের ভয় দেখা যায়। সম্ভবত বড়োরাই এজন্যে

দায়ী। তাঁরা নিজেদের ভয়টি ছোটদের কাছে প্রকাশ করে ফেলেন বলেই ছেলেমেয়েদের মনে এই ভয়টি জন্মায়। এই রকম করে তাঁদের নিজেদের ভয়টিই ছোটদের মনে সংক্রামিত হয়। কখনও বা বয়োজ্যেষ্ঠরা ছেলেমেয়েদের অকারণ ভয় দেখান। শিশুরা যখন কিছুতেই ঘুমোতে বা দুধ খেতে চায় না, মায়েরা তখন বিব্রত হয়ে তাদের নানা রকম ভয় দেখিয়ে তাদের ঘুম পাড়াতে বা দুধ খাওয়াতে চান। তাঁরা তখন তাদের "জুজু", "জটাবুড়ি", "ল্যাজঝোলা পাখী" ইত্যাদি কাল্পনিক অজ্ঞাত জীবের ভয় দেখিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করেন। দুরন্ত ছেলেকে শান্ত করতে না পেরে জননী তাকে ভয় দেখান কান্না না থামালে তাকে ছেলেধরাকে ধরিয়ে দেবেন। "ছেলেধরা" জীবটি যে কী শিশু তা জানে না।

মা তখন সবিস্তারে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন—"ছেলেধরার একটি মস্তো বড়ো ঝোলা আছে, তার মধ্যে সে দুষ্টু ছেলেমেয়েদের ধরে পুরে নিয়ে যায়" ইত্যাদি। এর ফলে বড়ো হয়েও অনেক ছেলেমেয়ে ঝোলা-ওয়ালা কোনও লোককে দেখলেই ভয় পায়। এই রকম করে শিশুদের মনে অনেক অকারণ ও অহেতুক ভয়ের বীজ উপ্ত হয়। অনেক সময়ে বড়োরা তাদের কাছে রাক্ষস, খক্কোস, ভূত, প্রেত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী, দৈত্য, দানব, ডাইনী বুড়ি ইত্যাদি কল্পিত ভয়ংকর জীবগুলির গল্প নানা বর্ণনা সহকারে বলে থাকেন। যে সব শিশু পড়তে শিখেছে তাদের হাতেও অনেক সময়ে এমন সব বই তুলে দেওয়া হয়, যার মধ্যে এই কাল্পনিক ভয়ানক জীবগুলির ভীতিপ্রদ ছবি ও বর্ণনা আছে। গল্প শুনে বা পড়ে, কখনও বা ছবি দেখে ছেলে-মেয়েদের শরীর ভয়ে কন্টকিত হয়ে ওঠে এবং ঐ ভয়াল জীবগুলির কল্পিত চেহারাও তাদের মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়। এই প্রকার অহেতুক ও অমূলক ভয় শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের পক্ষেই হানিকর। ছেলে-মেয়েদের বিনা কারণে ভয় দেখানো তো উচিতই নয়। তাদের অমূলক ভয়গুলিও যথাসম্ভব নিরসন করতেই চেষ্টা করা দরকার। সম্ভব হলে ভয়ের কারণগুলির সংগে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়েই তাদের ভয় ভঞ্জন করলে ভালো হয়।

কোথায় ভয়ের যথার্থ কারণ বর্তমান অজ্ঞ শিশু তা বোঝে না। তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উভয়ই অতি সীমাবদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞতাবশত তার বিপদ ঘটাও বিচিত্র নয়। এস্থলে পিতামাতা, শিক্ষক শিক্ষিকাদের বা অপর বয়োজ্যেষ্ঠদের উচিত ভয়ের কারণটি শিশুদের কাছে যথাসম্ভব শান্ত, সংযত ও স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্ত করা এবং তাদের সাবধান করিয়ে দেওয়া। তাঁদের মনে রাখা দরকার ব্যাধির মতো ভয় ও সংক্রামক। কোনও ভয় বা বিপদের কারণ ঘটলেও বড়োরা যতোদূর সম্ভব শিশুদের সামনে নিজেদের ভয় ও মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করতেই চেষ্টা করবেন। **Example is better than precept** উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তই বেশী কার্যকরী। "আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়।" বয়ো-জ্যেষ্ঠরা ছেলেমেয়েদের সামনে অকারণ ভয় তো প্রকাশ করবেনই না, বরং নিজ সাহসিকতার দ্বারা তাদের মনে সাহস সঞ্চার করতেই চেষ্টা করবেন।

আমাদের সকলেরই কাম্য শিশুরা যেন সবল-চিত্ত ও দৃঢ় চরিত্র হয়েই গড়ে ওঠে। তাদের মনে সাহস ও সাহসিকতার স্পৃহা ও জাগানো দরকার। জীবনে ভীরুতা বা কাপুরুষতার স্হান কোথায়? **"Cowards die many times before their death"**—অর্থাৎ ভীরু লোকেরা মরবার আগেই অনেকবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। বিনা সাহসে জগতে কোনও বড়ো কাজই সম্ভব হয় না। জীবনের সব উদ্যম, সব কীর্তির মূলেই রয়েছে অসীম সাহস ও অপরাজেয় মনোবল। **"Nothing venture, nothing have"**—কথাটি খুবই ঠিক। ভয়াধিক্য জীবনে সর্বপ্রকার সফলতা অর্জনের পথে নিদারুণ অন্তরায় সৃষ্টি করে। দুঃসাধ্যকে সাধ্যায়ও করবার জন্যে চলেছে মানুষের দুশ্চর তপস্যা। অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার জন্যে তার দুর্বার আকাংখা। সেই আকাংখাই যুগে যুগে তার মনে জুগিয়েছে দুর্জয়, দুর্দম্য সাহস। অন্ধ উন্মাদনায় মেতে সে

তাই মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করতে পেরেছে—জীবন পণ করে নেমেছে দুরন্ত দুঃসাহসিক অভিযানে। এই দুর্মদ সাহসে বলীয়ান হয়েই সে অসম্ভবকে সম্ভব করবার স্বপ্ন দেখেছে। বিকাশোন্মুখ কিশোরমন এই অসম্ভবের স্বপ্নেই বিভোর। তাই এই বয়সে ছেলেমেয়েদের নানা বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাহিনী শোনাতে হবে, যাতে করে তাদের মনে সাহসী হবার স্পৃহা স্বতঃই জাগে। তাদের মনেরও ঐকান্তিক কামনা তারা কোনও অপূর্ব সাহসের কাজ করে বড়োদের অবাক করে দেবে এবং অর্জন করবে তাঁদের অজস্র প্রশংসা। শিশুমনের এই স্বাভাবিক স্পৃহাটিরই সুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষ" শীর্ষক কবিতাটিতে:

"মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে,
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা, চ'ড়ে,
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে।
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার'পরে,
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।" ইত্যাদি

শিশু কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়ে মনশ্চক্ষুতে দেখছে সে যেন তার মাকে নিয়ে অনেক দূরে বিদেশে চলেছে—পথে দুর্বৃত্ত দস্যুর ভীষণ আক্রমণ থেকে সে তার মাকে রক্ষা করলো। তার মা তাকে তাই বাহাবা দিয়ে যেন বলছেন—

"ভাগ্যে খোকা সংগে ছিল,
কী দুর্দশাই না হোত তা না হলে।"

শিশুদের ভয় শুধু দূর করলেই চলবে না, তাদের মনে জাগাতে হবে অশেষ সাহস—তাদের সাহসিকতাকেও উৎসাহিত করতে হবে।

ভীরু ও লাজুক শিশু ও পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি মস্তবড়ো সমস্যা। আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই ভীরুতা ও লজ্জাশীলতার কারণ। এই জন্যে শিশুদের সামাজিক ও অনুভূতিমূলক (emotional) প্রয়োজনগুলিও মিটাতে চেষ্টা করা উচিত। শৈশব থেকেই তাদের সমবয়স্কদের সংগে মিশবার সুযোগ দেওয়া দরকার, যাতে করে তারা সামাজিকতা ও শিক্ষা করতে পারে। এমনি করেই তাদের অপরিচয়ের ভয় ও সংকোচ দূর করা সম্ভব। নৃত্যগীত, খেলাধূলা, আবৃত্তি ও নাট্যাভিনয়াদির মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের আত্ম-বিকাশ ও আত্ম-প্রকাশেরও যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া আবশ্যক। এই সব কাজের জন্যে প্রচুর মানসিক বল ও সাহসেরও প্রয়োজন। অনেক লাজুক ও ভীরু শিশু অনেক সময়ে কোনও বিষয় জানলেও বলতে ভয় পায়, পাছে ভুল হয়, পাছে কেউ হাসে। যখন তারা ভয় বা লজ্জাবশত কোনও কিছু বলতে না চায়, তখন তাদের তিরস্কার করা মোটেই সমীচীন নয়। তারা একটু বলতে আরম্ভ করলেই—"বেশ হ'চ্ছে", "ঠিক হ'চ্ছে" বলে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। অনেক পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকা ছেলেমেয়েরা কোনও কিছু বলতে না চাইলে অনেক সময়ে বিরক্ত হন। কখনও বা তিরস্কার করেন, কখনও বা বলেন "ভয় নেই", "ভয় পেও না" ইত্যাদি। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই কথাগুলি বলা মস্ত বড়ো ভুল। এসব কথা বলে ভয়ের কারণটিই যেন আরও বিশেষ ভাবে শিশুদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত ভয় এই রকম করে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্বস্ফুরণেরও বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ভীরু ও লাজুক লোকেরা জীবনে আত্মবশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না।

অত্যধিক কঠিন শাসনের দ্বারা শিশুদের মনে ভয়ের উদ্রেক করাও মোটেই উচিত নয়। তাতে-করে তাদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ববিকাশই বাধাপ্রাপ্ত হয়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকার ফলে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা তো ব্যাহত হয়ই, তাদের চরিত্রে কতোগুলি অস্বাভাবিকতাও দেখা যায়। কথাই আছে—"বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো"। শাস্তি বা শাসনের ভয়ে শিশুরা অনেক সময়েই কপটতা, প্রবঞ্চনা, ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে থাকে। "Spare the rod and spoil the child" এই শাসন-নীতি আজকের দিনে সম্পূর্ণ অচল। এতে করে শিশুদের কোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলিই বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই রকম

করে তারা শুধু বড়োদের ভয় করতেই শেখে না, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতাও শেখে। অনেক সময়ে দেখা যায় শিশুরা তাদের পুতুল "খোকা খুকু"দের নির্দয়ভাবে মারছে বা শাসন করছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের নির্মম কঠিন শাসনে যে গভীর মর্মপীড়া তারা অনুভব করেছে এটি তারই প্রতিক্রিয়া। তারা নিজেরা বড়োদের কাছ থেকে যেরকম ব্যবহার পায় ঠিক সেই রকম ব্যবহারই তারা তাদের চেয়ে যারা আরও বেশী দুর্বল বা অসহায় তাদের উপরে করতে চায়। তারা বড়োদের ভয় করে। তাই তারা চায় অপরেও যেন তাদের ভয় করে। আগেকার দিনে শিক্ষকদের মনের ধারণা ছিল কঠিন শাসন বিনা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তখনকার দিনে তাঁরা তাই বেতকে শিক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলেই মনে করতেন। শিশুরা পাঠে অমনোযোগী হলেও বা পড়া না বলতে পারলেই অথবা কোনও রকম দুরন্তপনা করলেই অমনি সেই বেত পড়তো তাদের পিঠের উপরে। বেতের ভয়েই ছেলেমেয়েরা চুপচাপ বসে পড়াশুনা করতো বা করবার ভান করতো। সেকালে বেত ছাড়া যেন মাষ্টার মশায়ের রূপটি কল্পনাই করা যেতো না:—

"আজ আমি কানাই মাষ্টার,
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।
ওকে আমি মারিনে, মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।"

এই কয়টি পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তখনকার কালের মাষ্টার মশায়ের একটি নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেদিনে ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে শিক্ষকের এই মূর্তিটিই ভাসতো। ছোটরা বড়োদের শুধু ভয় করতেই শিখবে না, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে ও ভালোবাসতেও শিখবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময়েই বয়োজ্যেষ্ঠরা শিশুদের ভয়ের পাত্রই হয়ে ওঠেন। ছেলেমেয়েরা যাঁদের বাস্তবিকই অন্তরের সংগে শ্রদ্ধা করে বা ভালোবাসে, কোনও অন্যায় কাজ করে তাঁদের বিরাগভাজন হতে মোটেই তারা চায় না। বড়োদের ভয়ে হয়তো তারা অনেক অন্যায় কাজ থেকে নিরস্ত হতে পারে। কিন্তু তাঁদের অসাক্ষাতে বা অজান্তে সেই কাজগুলি করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। ভয়ে তারা অনেক সময়ে বড়োদের শাসন অমান্য করতে সাহস পায় না। কিন্তু তাদের সেই বাধ্যতা আদৌ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। শাস্তির ভয়ে ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে অনেক কাজ লুকিয়ে লুকিয়ে করতেও চেষ্টা করে এবং এই রকম করে কপটতা ও প্রবঞ্চনা ও শিক্ষা করে। পরবর্তী জীবনে এই সব ছেলেমেয়েরাই আরও বেশী দুর্দান্ত ও অত্যাচারপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা যে ব্যবহার অপরের কাছ থেকে পেয়েছিল সেটাকেই তারা স্বাভাবিক বলে মনে করে। তারা শৈশবে বড়োদের ভয় করতেই শিখেছিল। বড়ো হয়ে তারা নিজেরাও চাইবে অপরেও যেন তাদের ভয় করে।

মানুষ যতোই নির্ভীক ও ভয়শূন্য হোক না কেন, কতোগুলি বিশেষ বিশেষ ভয় একবারে বর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়, যেমন রোগের ভয়, প্রাণের ভয়, মানের ভয়, পাপের ভয় ইত্যাদি। কিন্তু তার এই ভয়গুলির মাত্রাধিক্যই অনেক সময়ে অশোভন, অস্বাভাবিক, ও দোষাবহ হয়ে পড়ে। যেমন রোগের ভয়, পরিমিত পরিমাণে এই ভয়টি সকলেরই থাকা উচিত। নতুবা কেউই স্বাস্থ্য-নীতি পালন করতে চাইবে না। আবার অতিরিক্ত রোগ ভয়ও হানিকর। তাতে করে আমাদের মানসিক শান্তি নষ্ট হবারই সম্ভাবনা। জীবের ধর্মই আত্মরক্ষা। তাই সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে প্রাণের ভয় থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে অতিরিক্ত প্রাণের ভয়ও ভালো নয়। তাতে করে আমরা অনেক সময়ে মনুষ্যত্বই হারিয়ে ফেলি। প্রাণের ভয় খুব বেশী হলে মানুষ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কল্পিত "নন্দলালের" মতোই হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। মান, সম্ভ্রম, ও মর্যাদা হানির ভয়টিও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমরা অনেক সময়ে প্রাণ দিতে চাই তো মান দিতে চাই না। আত্মসম্ভ্রম বোধ প্রত্যেক মানুষেরই কিছু থাকা উচিত। কিন্তু মানের ভয়ের ও মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাতে করে আমাদের

মন অতিরিক্ত স্পর্শকাতরই হয়ে পড়ে এবং মনে আত্মাভিমানও জাগা অসম্ভব নয়। সেই রকম পাপের ভয়, অধর্মের ভয়ও আমাদের থাকা উচিত। নতুবা নৈতিক স্খলন অবশ্যম্ভাবী। আবার অতিরিক্ত দুর্নীতির ভয়ও অনেক সময়ে নৈতিক শুচিবায়ুতেই পরিণত হয়। যুগে যুগে শৌর্য, বীর্য, ও সাহস মানুষের অকুন্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পেয়ে এসেছে। তাই ছেলেমেয়েদের চরিত্রে যথেষ্ট সাহস থাকাও প্রয়োজন। নতুবা সমাজের নৈতিক মেরুদন্ডটিই ভেঙে যাবে। কিন্তু তাদের সাহস যেন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাহস দুঃসাহসে রূপান্তরিত হয়ে ওঠাও আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। দুঃসাহসিক মানুষ অনেক সময়ে তার সহজ মনুষ্যত্ববোধকেও হারিয়ে ফেলে—হয়ে পড়ে দুর্বৃত্ত দস্যু ও তস্কর,—আত্মঘাতী ও নরঘাতী। নানা দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে তারা হয়ে ওঠে সমাজের পরম শত্রু। ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে নৈতিক সাহস ও অর্জন করতে শিখবে। তাদের চরিত্রে থাকবে অনমনীয় দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা যার বলে তারা জীবনে সবরকম অন্যায়, অসত্য, পাপ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও অভিযান চালাতে সক্ষম হবে।

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

এই আদর্শেই ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে হবে। এই আদর্শের প্রতিই যেন আজীবন তাদের অচঞ্চল নিষ্ঠা থাকে। তারা যেন বুঝতে শেখে যে অন্যায় করে আর যে অন্যায়কে অন্যায় জেনেও তার প্রতিবাদে মুখর না হয়ে ওঠে—তার প্রতিবাদ করবার যার সাহস নেই—দু'জনেই সমান অপরাধী। ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন্যে, আদর্শের জন্যে, স্বদেশের জন্যে জগতের কতো শত শত মহাপ্রাণ নরনারী মৃত্যুভয়কেও জয় করেছেন,—হাসিমুখে, অম্লান বদনে নিজ অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। আমাদের দেশের বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে—

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান"—

সেই সব বীরদের নাম দেশের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে। তাঁরা মরেও চির-অমর হয়েই থাকবেন। তাঁদের অতুলনীয় ত্যাগ ও মহত্ব, তাঁদের অসীম সাহস ও বীরত্বের চির-ভাস্বর আদর্শ যুগ যুগ ধরে অম্লান, অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং আগামী কালের নবীনদের মনে জাগাবে অশেষ অনুপ্রেরণা।

"এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলে ভুলানো বই লেখা হয়, তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে, তাহার কিছু বুঝিবেনা, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই'ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।"

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ব্যাঙ্কের কথা



অর্থ বা টাকা-পয়সা ছাড়া আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ একরূপ অসম্ভব। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আহার্য ও পরিধেয়ের অভাব ছাড়া অন্যান্য নানা উপকরণের অভাবও দেখা দিয়াছে আর সকল অভাবই আমরা অর্থের বিনিময়ে পূর্ণ করিতে সক্ষম হই। সভ্যতার আদিতে বা অপেক্ষাকৃত অপরিণত সমাজে মানুষের অভাব ছিল অল্প; বন্য ফলমূল ও মৃগয়ালব্ধ পশুমাংসে তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত আর বৃক্ষ বল্কলেই পরিধেয়ের সমস্যা মিটিত। সেই সমাজে মানুষ অর্থের প্রয়োজন তত বুঝিতে শেখে নাই। ক্রমে জীবনে যখন সে স্থিতি ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন উপলব্ধি করিল তখন পশুপালন, কৃষিকর্ম ইত্যাদি জীবিকা গ্রহণ করিল। তারপর একদিন যখন সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইল, তখন দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের আদান-প্রদান সমাজে দেখা দিল—ইংরাজীতে ইহাকে বলে বার্টার (Barter)। এই দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার নানা অসুবিধা ত ছিলই—তাহা ছাড়া ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষের ভিতরে জাগ্রত হইল, তাহার চরিতার্থতাও এই ব্যবস্থায় সম্ভব হইলনা। এই দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধার ফলে একদিন অর্থের প্রবর্তন হইল এবং সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা প্রচলিত হইল।

দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় উৎপাদক উদ্বৃত্ত পণ্য বিনিময়ে অক্ষম হইলে এবং উৎপন্নদ্রব্য পচনশীল হইলে তাহার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় অল্প মূল্যের দ্রব্যের সঙ্গে বেশি মূল্যের দ্রব্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যাহার বহু মূল্যবান হীরকখন্ড আছে, তাহার হয়ত খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন—এই খাদ্যের জন্য হীরকখন্ডের বিনিময় হয়ত তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইলনা। তৃতীয়তঃ বিনিময়কারীদের সঞ্চয়ে যাহা আছে তাহা লইয়াই বিনিময় সম্ভব। মনে করা যাক এক ব্যক্তির সঞ্চয়ে লেবু, দ্বিতীয় ব্যক্তির সঞ্চয়ে ডিম আছে। ইহার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির হয়ত ডিমের প্রয়োজন, দ্বিতীয়ের হয়ত লেবুর প্রয়োজন নাই—কলার প্রয়োজন আছে; তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত মিলিল যাহার কলা আছে কিন্তু যে ব্যক্তি লেবু বা ডিম কিছুই চায়না। বহু বিচিত্র অভাবের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান তাই দ্রব্য বিনিময়ের মারফৎ সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ বিনিময় যোগ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিবার মত কোন মান এই ব্যবস্থায় পাওয়া অসম্ভব। অর্থ প্রবর্তিত হইবার ফলে এখন আমরা সব কিছুর মূল্যই অর্থের দ্বারা স্থির করিতে পারি। এরূপ ক্ষেত্রে আদান-প্রদানে মানসিক অসন্তুষ্টির সম্ভাবনা কমে, দ্রব্যের বিনিময়ে মূল্যের আকাশ-পাতাল ভেদ হয় না।

তাই কোন কিছু সর্বজন-স্বীকৃত মাধ্যমের (অর্থ বা টাকা-পয়সা) সাহায্যে মানুষ দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা শুধু যে দূর করিল তাহা নহে—সে তাহার আদান-প্রদান বা কেনা-বেচার জগৎকে অনেক প্রসারিত করিতে সক্ষম হইল। নানা যুগে নানা দেশে নানা দ্রব্য অর্থ হিসাবে প্রচলিত ছিল—ক্রমে এ ক্ষেত্রেও সর্বজন-গ্রাহ্য, সর্বদেশ-গ্রাহ্য বস্তুর সন্ধান মিলিল। একদিন কড়ি, চামড়া, এমন কি গোরু বা ষাঁড় প্রভৃতিও অর্থ হিসাবে গৃহীত বা ব্যবহৃত হইয়াছে। নানা অসুবিধার ফলে তাহারাও অর্থ হিসাবে আর

গৃহীত হইল না; তাহাদের স্থানে আসিল সোনা, রূপা ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী, উজ্জ্বল, দুষ্প্রাপ্য, সহজ-ব্যবহার্য ও বহনযোগ্য ধাতু-মুদ্রা—মানুষ যে-মুদ্রা সহজে চিনিতে পারে, স্বীকার করিতে পারে, দেশ-দেশান্তরে বহন করিতে পারে, বিভিন্ন আকারে বিভক্ত ও পরিবর্তিত করিতে পারে। অর্থের যাহা গুণ থাকা দরকার, সবই সোনা-রূপায় আছে। কিন্তু অর্থ বা মুদ্রা হিসাবে সোনা-রূপার ব্যবহার সব দেশেই আজকাল কমিয়া আসিতেছে—আজ কাগজী মুদ্রা সোনা-রূপার স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও কাগজী মুদ্রা যে আপন মহিমাতেই ভাস্বর তাহা নহে—প্রায় সব সময়েই প্রচলিত কাগজী অর্থের পিছনে দেশের তহবিলে সোনা বা রূপা মজুত রাখা হয়। দেশের তহবিলে সংরক্ষিত ধাতুর মূল্য, কাগজী অর্থ বা নোটের সমান হইতে পারে। কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তিত হইতে পারে আবার ক্ষেত্র বিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রচলিত কাগজী মুদ্রার স্থানে যে দেশের সংরক্ষিত তহবিলে সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে সে-দেশে স্বর্ণমান বা রৌপ্যমান প্রচলিত আছে বলা চলে। যে-দেশে সংরক্ষিত তহবিলে উভয় প্রকার ধাতব-সম্পদ (সোনা-রূপা) থাকিবে, সে-দেশে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা আছে বলা চলে। এখন প্রায় বহু দেশের পক্ষেই কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সমান ধাতব মুদ্রা দেশের তহবিলে রাখা সম্ভব হয় না। মাত্র দু'চারটি দেশের সরকার কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সোনা বা রূপা দিতে বাধ্য থাকেন। ১৯১৩ সালের পূর্বে যে-দেশ (গ্রেট ব্রিটেন) শিল্পে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল সে-দেশেও কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে আজ সোনা লভ্য নহে।

সোনা বা রূপা জাতীয় ধাতব মুদ্রার স্থানে কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের নানা কারণ আছে। ভাল অর্থের সব বৈশিষ্ট্য বা গুণ কাগজী মুদ্রায় আছে। ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা ইহা সহজে বহনযোগ্য এবং আদান-প্রদানের পক্ষে সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া ধাতব মুদ্রা প্রস্তুত করিতে যে বিপুল ব্যয় হয়, কাগজী মুদ্রায় তাহার তুলনায় ব্যয় নাই বলিলেই চলে। ধাতব মুদ্রায় দেশের ধাতু সম্পদ যতখানি সেই অনুযায়ী ধাতব মুদ্রাও পরিমিত হইবে, প্রয়োজন মত ইহার পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। অন্য দিকে অবাধে কাগজী মুদ্রা প্রচলনেরও বিপদ আছে। ইহাতে মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ টাকার দাম কমিতে পারে। টাকার দাম কমিলে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ে। তাহা ছাড়া এক দেশে প্রচলিত কাগজী মুদ্রা অন্য দেশে গৃহীত হয়না কিন্তু সোনা সর্বত্রই আদান-প্রদানে গৃহীত হয়।

অতি অল্প পরিসরের মধ্যে আমরা অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও বিবর্তনের একটি বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। একদিকে মানুষের প্রয়োজন, সুবিধা-অসুবিধা, স্বার্থবুদ্ধি যেমন তাহার জীবিকা অর্জনকে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে সরকারের আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতি ইত্যাদি দেশের অর্থব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। সাধারণ মানুষের জীবনে স্থিতি ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন আছে; তাহার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও এই প্রয়োজনবোধ হইতে উদ্ভূত। ভবিষ্যতে বিপদে-আপদে, নানা কারণে তাহার অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়াই উপার্জনক্ষম মানুষ সঞ্চয়ের প্রয়োজন বোধ করে; আবার ব্যক্তিগত জীবনে সম্ভাব্য নানা বিপদ (চুরি, ডাকাতি), দুর্ঘটনা (ক্ষয়-ক্ষতি) ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করিয়া সঞ্চিত অর্থ সে নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করেনা। সঞ্চিত অর্থ যেখানে আজ মানুষ গচ্ছিত রাখে তাহাকে আমরা ব্যাঙ্ক বলি। সেখানে মানুষ যেমন টাকা জমা রাখে, প্রয়োজন মত সেখান হইতে টাকা তুলিয়া আনিয়া সে খরচ করে—বিপদে-আপদে সেখান হইতে সে ধারও করে। দেশে-বিদেশে মানুষের আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সাধিত হইতেছে। সে-কথা পরে বলিতেছি। এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নহে। ব্যাঙ্কের উদ্ভব যখন হয় নাই তখন সমাজে স্বর্ণকারের সাধুতায় ও আর্থিক সমৃদ্ধিতে লোকের আস্থা ছিল—নিরাপদ হইবে মনে করিয়া লোকে তাহার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখিত। এই কাজের জন্য স্বর্ণ-

কারেরা কিছু পারিশ্রমিক আদায় করিত। ক্রমে স্বর্ণকারের হাতে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অন্যদিকে অর্থাভাবগ্রস্ত লোকেরা বিপদে-আপদে অর্থের প্রয়োজনে স্বর্ণকারের কাছে ধার প্রার্থনা করিতে লাগিল। যাহারা টাকা জমা রাখিত, তাহারা টাকা বিশেষ তুলিত না। এই অবস্থায় অপরের নিকটে স্বর্ণকারেরা সুদে টাকা খাটাইতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে তাহাদের যথেষ্ট আয় হইতে থাকে। স্বর্ণকারের মাধ্যমে এই লেন-দেনের যে সূচনা হয়, তাহাতেই ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। স্বর্ণকারের মত ব্যাঙ্কও মানুষের আস্থাভাজন। সেজন্য ব্যাঙ্ককে ক্রেডিটের বা বিশ্বাসের কারবারী বলা হইয়া থাকে। লোকে বিশ্বাস করে ব্যাঙ্কে যে টাকা তাহারা জমা রাখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে তাহারা তাহা ফেরৎ পাইবে। অপর দিকে ব্যাঙ্ক-ও যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপরে আস্থা বা বিশ্বাস রাখিতে সক্ষম তাহাকেই টাকা ধার দেয়—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে যে নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে ধারের টাকাও সে ফিরিয়া পাইবে।

কাজেই সংক্ষেপে ব্যাঙ্কের কাজ জনসাধারণের টাকা আমানত (জমা) রাখা ও ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীকে এই আমানতী টাকার কিয়দংশ ধার দেওয়া। স্বর্ণকার যেমন সুদে টাকা ধার দিত, ব্যাঙ্কও টাকা ধার দিয়া সুদ আদায় করে। সঞ্চিত অর্থ ধার দিয়া তাহাদের যখন নিয়মিত লাভ হইতে লাগিল, তখন সঞ্চিত অর্থের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই অর্থ অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীদিগকে সুদ দিতে আরম্ভ করিল। একদিকে আমানত-কারীর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক নানা রূপ সর্ত্তে টাকা জমা নেয়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্তে টাকা দাদন বা ধার দেয়। এই ভাবে আমানতকারী ও দেনদারের ভিতরে থাকিয়া ব্যাঙ্ক উভয়কেই উপকৃত করে। ব্যাঙ্কের কাজের অনেকখানি অর্থ আমানত হইতে সংগৃহীত হয়। আমানত প্রধানতঃ তিন প্রকারের চলতি (Current), সঞ্চয়ী (Savings) এবং স্থায়ী (Fixed)। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কের যাঁহারা পরিচালক তাঁহারাও ব্যাঙ্কের মূলধনের অংশ (Share) ক্রয় করেন। এই অংশীদারদের টাকাও ব্যাঙ্কের কাজে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে একক ব্যক্তির পক্ষে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। পরবর্তীকালে স্বল্প মূলধনে ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্ভব না হওয়াতে অংশীদারদের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিতে থাকে—ক্রমে ব্যাঙ্কগুলি আজ একরূপ যৌথ-প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হইয়াছে। যৌথ প্রতিষ্ঠান বলিতে আমরা বুঝি এমন প্রতিষ্ঠান যাহা কয়েকজন অংশীদার লইয়া গঠিত। যে কয়েক জন অংশীদার একত্র হইয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করেন। এই বাবদ সংগৃহীত অর্থকে মূলধন বলে। তিন প্রকার আমানতী টাকার মধ্যে স্থায়ী আমানতের (Fixed deposit) টাকা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোলা যায়না, চলতি আমানতের (Current Account) টাকা যে কোন সময় তুলিতে পারা যায় এবং সঞ্চয়ী আমানতের (Savings deposit) কিছু অংশ চলতি আমানতের মত তোলা যায়। স্থায়ী ও সঞ্চয়ী আমানতের উপরে ব্যাঙ্কগুলি সুদ দিয়া থাকে, চলতি আমানতের ব্যাপারে কোন কোন ব্যাঙ্ক সুদ প্রদান করেনা আবার কোন কোন ব্যাঙ্ক কিছু সুদ দিয়াও থাকে। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কগুলি Debenture (অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তিকে দায়যুক্ত করিয়া বাহিরের ব্যক্তিদের নিকট হইতে কর্জ গ্রহণ করে) বিক্রয় করে। এই রকমেই ব্যাঙ্কের তহবিল প্রধানতঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রত্যেক রাজ্যে (Registrar of Joint Stock Companies) যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির রেজিষ্ট্রারের অফিস আছে—প্রত্যেক যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার পূর্বে এই অফিসের সম্মতি ও অনুমোদন প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক অন্যভাবেও কিছু অর্থ উপার্জন করে। কোন বিল (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার পত্র, ক্রেতা শর্তাধীনে টাকা শোধের প্রতিশ্রুতি দেয়) সময় হইবার পূর্বেই ভাঙাইয়া দিলে ব্যাঙ্ক সুদ আদায়

করে; লোকে নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্কে অলঙ্কার, মূল্যবান দলিল, কাগজ-পত্তর ইত্যাদি গচ্ছিত রাখে। এই বাবদেও ব্যাঙ্কের সামান্য উপার্জন হয়। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কগুলি ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তার জন্যে Traveller's Cheque বিক্রয় করে—ইহা দ্বারা ভ্রমণকারীরা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করিতে পারে এবং ব্যাঙ্কগুলিও সামান্য উপার্জন করে। এই চেক সঙ্গে থাকিলে ভ্রমণকারীকে নগদ টাকা পয়সা বহন করিবার ঝুঁকি লইতে হয় না। আমাদের দেশে এই জাতীয় চেকের ক্রম-প্রচলন সুরু হইয়াছে। শুধু স্বদেশে নহে, এই চেকের সাহায্যে আমরা বিদেশেও অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারি। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশে গভর্মেন্ট বা সরকারও জাতীয় প্রয়োজনে সুদ দিয়া ঋণ সংগ্রহ করে—ইহা হইতেও ব্যাঙ্কের কিছু উপার্জন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অন্য যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশ (Share) কেনা-বেচার কাজে ব্যাঙ্ক সুনাম অর্জন করিতে পারে।

টাকা ধার দিবার ব্যাপারে যেক্ষেত্রে জামিনের প্রয়োজন, ব্যাঙ্ক সেখানে যথাযোগ্য জামিন দাবি করে—এইরূপ কর্জদানকে নিরাপদ কর্জ (Secured Loan) বলে। এক্ষেত্রে দেনদার অর্থ পরিশোধে অক্ষম হইলে জামানত বিক্রয়ের দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে পারে। সাধারণতঃ অলঙ্কার ইত্যাদি, কোম্পানীর কাগজ, ভাল কোম্পানীর শেয়ার, গৃহ ইত্যাদি জামানতরূপে গৃহীত হয়। যেখানে কোন অর্থশালী ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির জামিনদার হন তখন তাহাকে ব্যক্তিগত জামিন (Personal Security) বলে।

ব্যাঙ্ক আপনার গ্রাহকবর্গের হইয়া অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া থাকে। জীবনবীমার প্রিমিয়াম প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের নানা অর্থ লেন-দেন, অস্থাবর সম্পত্তির ভার গ্রহণ, মূল্যবান গহনা-কাগজপত্র ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতির দ্বারা ব্যাঙ্ক আমাদের যোগ্য প্রতিনিধিরূপেই কাজ করে। যাঁহারা ব্যবসা করেন তাঁহাদের আরও বহুরকম লেন-দেন আছে সেগুলি সুষ্ঠুভাবে করিবার কাজে ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সহায়তা করে। সাধারণ লোক ও ব্যবসায়ী উভয়শ্রেণীর গ্রাহককেই ব্যাঙ্ক আমানতীকৃত টাকা প্রয়োজন মত তুলিবার জন্য চেক বই (Cheque Book) দেয়। এই চেকের সাহায্যে আমরা টাকা তুলিতে পারি, অন্যের প্রাপ্য শোধ দিতে পারি। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে নগদ আদান-প্রদানের অপেক্ষা চেকে লেন-দেনই সুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত ব্যবসায়ীরা যে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখেন সেখান হইতে প্রয়োজনের সময় গচ্ছিত টাকা নিঃশেষ হইলে কর্জও লইতে পারেন; ইহাকে বলে Overdraft। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা দেশের অভ্যন্তর হইতে এবং বিদেশ হইতে মালপত্র ক্রয় করিতে পারেন। মাল পোঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে মালের টাকা দেওয়া সম্ভব না হইলে ব্যাঙ্কের গুদামে মাল রাখার ব্যবস্থা করা যায়। বিদেশে আমদানি-রপ্তানির কাজে ব্যাঙ্ক হইতে ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা করিতে পারেন। ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই বিদেশে আমদানি-রপ্তানির দলিল-পত্রাদি আসিয়া থাকে—যৌথ-প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই এ-জাতীয় কঠিন দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হইতে পারে। বিদেশের ব্যবসায়ীরাও নিরাপত্তার জন্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই লেন-দেন বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

কাজেই ভাল ব্যাঙ্ক দেশের সমৃদ্ধি বিধানের কাজে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইতে পারে। একদিকে সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কে মূল্যবান সম্পদ ও উদ্বৃত্ত টাকা রাখিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করে, ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা বোধ করে এবং গচ্ছিত অর্থের বিনিময়ে সুদ ইত্যাদিতে কিছু লাভবানও হয়। অন্যদিকে এই অর্থই উপযুক্ত ব্যবহারের ফলে দেশের সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির হেতুস্বরূপ হয়। ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন-মত ব্যাঙ্কের সাহায্য পান বলিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, লেন-দেন ইত্যাদি আজ ব্যাঙ্কের সাহায্যেই সম্ভব। দেশের আর্থিক উন্নতি ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল—আমাদের শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনগ্রসতার বড় কারণ আজও আমাদের দেশে উপযুক্ত ও ভাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুবই কম।

বর্তমানে দেশে-বিদেশে সর্বত্র আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সরকারের অধিক নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। মর্যাদার দিক হইতে যে ব্যাংক দেশে শীর্ষস্থানের অধিকারী তাহার কর্ত্তৃত্ব অনেক দেশেই গভর্মেন্টের হাতে। এই ব্যাংককে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) বলি। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া নামে অভিহিত; যুক্তরাজ্যের (গ্রেট ব্রিটেনের) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম ব্যাংক অফ্ ইংল্যান্ড। এই ব্যাংকগুলির কর্তা গভর্মেন্ট এবং কর্ত্তৃত্ব গভর্মেন্ট মনোনীত পরিচালক সংঘের হাতে। কাজেই জনসাধারণ বা ব্যবসায়ীর প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কের ভূমিকার শেষ হয়না—আজ ব্যাংক রাষ্ট্র বা গভর্মেন্টের হইয়া একদিকে দেশের স্বার্থ, অপরদিকে দেশবাসীর স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করিবার ভূমিকা লইয়াছে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। দেশে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের অধিকার একমাত্র এই ব্যাঙ্কেরই আছে; মুদ্রামান যাহাতে স্থির থাকে তাহার জন্য সঞ্চয় (Reserve) করা ইহার অন্যতম কাজ; দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরে অর্পিত। ব্যাংক পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত যাহার ফলে দেশের ব্যাংকব্যবস্থা স্থায়ী ও শক্তিশালী হইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকএর এই বিশেষ ভূমিকার অন্য যৌক্তিকতাও আছে। অন্য ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে তাহার অন্যতম কারণ দেশের জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকাই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হয়। সাধারণ ব্যাংকগুলির পরিচালকবর্গ যোগ্যতাহীন ও স্বার্থবুদ্ধি-সম্পন্ন হইলে জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। আমাদের দেশে ব্যাংক-পরিচালনার ক্ষেত্রে এইরূপ যোগ্যতাহীনতার ফলে বহু আমানতকারী অতীতে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন তেমন নজীরের অভাব নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু মাত্র যে অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা নয়, তাহাদের ব্যাংক বা ব্যাঙ্কার হইয়াও কাজ করে। এই সমস্ত ব্যাংককে তাহাদের আমানতী টাকার নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয় এবং প্রয়োজন মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ইহারা অর্থ সাহায্য (ধার) লইতে পারে। ইহা ছাড়া দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। সর্বোপরি সরকারের ব্যাংক হিসাবে এই ব্যাঙ্কে সরকারী টাকা গচ্ছিত থাকে। কাগজী মুদ্রা চালু করা ছাড়া অন্যান্য মুদ্রাও তাহারাই বাজারে চালু করে, প্রয়োজন হইলে সরকারকে টাকা ধার দেয় এবং সরকারী (জাতীয়) ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজও এই ব্যাংকই সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) ১৯৩৪ সালের মার্চের এক আইনের বলে ১৯৩৫ সালে ১লা এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংক প্রথমে জনসাধারণের প্রদত্ত অংশ মূল্য (Share) লইয়া গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ভারত-সরকারই ইহার সমস্ত 'শেয়ার' ক্রয় করিয়াছেন। এই ব্যাংক ভারত-সরকারের এবং ভারতস্থ অঙ্গরাজ্যের সরকার সমূহের 'ব্যাংকার'। একদিকে যেমন এই ব্যাংক পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতি আছে, অপর দিকে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে স্থানীয়-কার্য্য-পরিচালনার জন্য স্থানীয় সমিতিও আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম 'গভর্ণর'। তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ভারতবর্ষে সর্বসমেত ৮৯টি তপশীলভুক্ত ব্যাংক (Scheduled Bank) এবং ইহাদের শাখার সংখ্যা ছিল ৩০১৮। রিজার্ভব্যাংক অব ইন্ডিয়া তাহার কার্যাদির দ্বারা যে লাভ করে তাহা দেশের জাতীয় সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ৩০ কোটি টাকা লাভ (মুনাফা) করে।

সরকারের পরিচালনায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তাহার মধ্যে ডাক ও তার বিভাগও (Posts & Telegraph Department) জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। এই আমানতের

টাকা দেশের নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমানতের ক্ষেত্রে ডাক ও তার বিভাগের স্বল্পসঞ্চয়-পরিকল্পনা (Small Saving Scheme) আজ আমাদের দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

ভারত বিভক্ত হইবার সময় অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২·৭২ কোটি টাকা স্বল্প-সঞ্চয়-পরিকল্পনাতে সংগৃহীত হয় এবং উহার পরিমাণ ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭০·৭৪ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। এই আমানতের পরিমাণও আইন প্রণয়ন করিয়াছে।

উপরের আলোচনায় সাধারণভাবে আমরা ব্যাঙ্কের প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেও, প্রসঙ্গতঃ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া), যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক (Joint Stock Banks) ডাকবিভাগীয় সঞ্চয়ী ব্যাঙ্কের (Postal Savings Banks) বিষয় উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। এইগুলি ছাড়া ভারতবর্ষে নিম্ন ব্যাঙ্কগুলির কথাও উল্লেখ্য।

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন সেই মুদ্রা সংস্থানের ব্যাপারে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব বিদেশীদের হাতে। এই ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত অন্য কাজও (টাকা আমানত রাখা বা ধার দেওয়া) করিয়া থাকে।

শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Bank)—এই ধরণের ব্যাঙ্কের কাজ হইবে শিল্প-পরিচালনা সংক্রান্ত দীর্ঘ-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী উভয় প্রকার মূলধন সরবরাহ করা। যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্কগুলির কাছ হইতে শিল্প পরিচালকদের দীর্ঘদিনের মেয়াদে মূলধন আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই প্রধানত এই কারণে শিল্প ব্যাঙ্ক দরকার হইয়া পড়ে। ১৯৪৮ সালে ভারত গভর্মেন্ট এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছে—এই ব্যাঙ্ক শিল্পীর অর্থসরবরাহ সংস্থা (Industrial Finance Corporation) নামে অভিহিত। এই সংস্থার মূলধন দশ কোটি টাকা। ভারত গভর্মেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও এই সংস্থার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং ইহা শিল্প উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবে। বর্তমানে এই জাতীয় আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। National Industrial Development Corporation নামে একটি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় গভর্মেন্ট কর্তৃক গঠিত, অপর সংস্থার নাম Industrial Credit and Investment Corporation.

সমব্যায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank) সমবায় প্রথায় পরিচালিত গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (জেলার পরগণায় বা সদরে প্রতিষ্ঠিত), রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (রাজ্যের রাজধানীতে স্থাপিত) ইত্যাদি প্রধানতঃ কৃষকদের অল্প সুদে ঋণ দিবার জন্যে গঠিত।

এই আলোচনা হইতে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমরা কিছুটা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব।

—:০:—



ভারতের গ্রন্থাগার

প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিশরে যে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল ঐতিহাসিক গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। খ্রীষ্ট জন্মের দেড় হাজার দু'হাজার বছর পূর্বে কাগজ ছিল না। তখন মাটির টালিতে লিখে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিলেই বইয়ের একটি পাতা হত। এমনি কয়েকটি পোড়া টালি নিয়ে হত একটি সম্পূর্ণ বই। এই সব পোড়া টালির কিছু কিছু বই প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্ধার করেছেন। প্রাচীন কালের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়। আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই গ্রন্থাগার পাঠকদের বই সরবরাহ করেছে বলে পন্ডিতরা অনুমান করেন। পোড়া টালির বই ছাড়া প্যাপাইরাসের উপরে লেখা বইও মিশরের গ্রন্থাগারে ছিল। প্যাপাইরাস কাগজের আদিরূপ। মিশরের জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে প্যাপাইরাস ঘাস জন্মাত।

প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বৈদিক যুগ থেকে ভারতে বিদ্যাচর্চার যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে এ দেশেও গ্রন্থাগার ছিল। পোড়া টালির মতো কঠিন বস্তুর ভারতে ব্যবহার ছিল না বলেই হয়ত প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরবর্তী যুগে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র আসত এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার না থাকলে এত ছাত্রের বইয়ের দাবি মেটানো সম্ভব হত না। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এখানকার বিরাট গ্রন্থাগারের খ্যাতি ভারতের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। নালন্দার গ্রন্থাগার তিনটি পৃথক ভবনে অবস্থিত ছিল। গ্রন্থাগারের এই তিনটি বিভাগের নাম ছিল 'রত্নোদধি', 'রত্নসাগর' ও 'রত্নরঞ্জক'। প্রথমটিতে শুধু ধর্মগ্রন্থ রাখা হত। অন্য দুটি ভবনে থাকত ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের বই।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়েছিল। শ্রমণদের ব্যবহারের জন্য এই সব বিহারে বই রাখা হত। ক্রমশঃ পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে অনেক বিহারে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল।

আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র টোলগুলিতেও ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য পুস্তক-সংগ্রহ থাকত। বড় বড় টোলগুলিতে পুস্তক-সংখ্যা এত বেশী ছিল এবং তাদের লেন-দেন এত অধিক হত যে এই সব পুস্তকসংগ্রহকে গ্রন্থাগার নামে অনায়াসেই অভিহিত করা চলে।

রাজা, মহারাজা এবং ধনী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের নিজস্ব গ্রন্থাগারের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। সভাপন্ডিতরা এই সব গ্রন্থাগারের সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা, অর্থনীতি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

মুসলমান আমলের পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা যেরূপ উন্নতি লাভ করেছিল তা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা বই ব্যবহারের অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের পুস্তক-সংগ্রহে অধিকাংশ বই ছিল ধর্ম ও দর্শনের উপর। বইগুলি ভূর্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতির উপর লেখা হত বলে অনেক অমূল্য গ্রন্থ কালের প্রভাবে ধবংস হয়ে গেছে।

মুসলমান আমলে ভারতে কাগজের ব্যবহার বেশ ভালোরূপেই আরম্ভ হয়। এই সুযোগ সত্ত্বেও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্হাগার ব্যবস্হার প্রসার ঘটেনি। কিন্তু অনেক মুসলমান সম্রাটের পুস্তক প্রীতি ছিল। তাঁরা ব্যক্তিগত গ্রন্হাগার গড়ে তুলেছেন। সম্রাট আকবরের গ্রন্হাগারে প্রায় বিশ হাজার বই ছিল। দিল্লীর বাদশাহী গ্রন্হাগারের অনেক অমূল্য সম্পদ ইংরেজরা নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে। টিপু সুলতানের গ্রন্হাগারও সমৃদ্ধ ছিল। পাটনার খুদাবক্স গ্রন্হাগার বর্তমান কালে মুসলমান ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্হাগার।

মুসলমান সম্রাটদের ব্যক্তিগত গ্রন্হাগারে যে-সব বই থাকত তাদের অধিকাংশই সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। কারণ সুদক্ষ শিল্পীরা দীর্ঘকালের সাধনায় বই নকল করতেন এবং বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করবার জন্য অনেক ছবি আঁকতেন। এই সব ছবিগুলি মুশিয়ম শিল্পকলার মূল্যবান নিদর্শন। ছবিতে অনেক ক্ষেত্রেই আসল সোনা ব্যবহার করা হত। সুতরাং সম্রাটের গ্রন্হাগারই ছিল এ-সব বইয়ের জন্য উপযুক্ত স্হান।

—আধুনিক যুগ—

(ইংরেজ আমল)। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা এদেশের শাসন ব্যবস্হা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হল। এর জন্য দেশের লোককে জানতে হবে। ভারতীয়দেরও দরকার ইংরেজ জাতির সভ্যতার পরিচয় লাভ করা। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে একে একে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল। স্যার উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি। তারপরে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্হাপিত হল। এমনি করে কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্হাপিত হয়েছে। শ্রীরামপুরের মিশনারী এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের চেষ্টায় ইংরেজী, বাঙ্লা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নানা বিষয়ের বই ছাপা হতে লাগল। ইংলন্ড থেকেও বই আমদানী হতে শুরু হল প্রচুর পরিমাণে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাতে লেখা পুঁথি সংগৃহীত হতে লাগল। আধুনিক পদ্ধতির গ্রন্হাগারের গোড়াপত্তন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা অঞ্চলেই হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্হাগার সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়। যারা প্রত্যক্ষরূপে এ-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শুধু তারাই সুযোগ পেতে পারে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে তখন পাঠস্পৃহা ছিল প্রবল। ইংরেজ ও ভারতীয় নাগরিকরা ১৮৩৫ সালের অগাস্ট মাসে এক সভায় মিলিত হয়ে স্হির করল যে, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য কলকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্হাগার স্হাপন করা হবে। পর বৎসর মার্চ মাসে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির কাজ আরম্ভ হয়।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা ভারতের গ্রন্হাগারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এমন সুপরিচালিত গ্রন্হাগার তখন এশিয়ায় তো ছিলই না, য়ুরোপেও বিরল ছিল। এই গ্রন্হাগারের প্রথম ভারতীয় গ্রন্হাগারিক ছিলেন 'আলালের ঘরের দুলালের' লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র। পরবর্তী সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল কিছু দিন গ্রন্হাগারিকের কাজ করেছিলেন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার গণ্যমান্য প্রায় সকল নাগরিকই এই গ্রন্হাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কলকাতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে-সব গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্কটিশচার্চ কলেজ, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ, বেথুন কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতির গ্রন্থাগার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ সাল নাগাদ।

বিশেষ-বিষয়ক গ্রন্থাগারের মধ্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে, শিবপুর বোটানিক গার্ডেন, বোটানিক্যাল সার্ভে, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্স, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতির গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। এ-সব গ্রন্থাগার ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছে।

কলকাতায় ছোট-বড় সকল প্রকার সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় দু'শ। এদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখ করতে হয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার, আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি। এই সব গ্রন্থাগার বিগত শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছে। কলকাতার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাপন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার বিংশ শতকের প্রথম ভাগে স্থাপিত হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে, সাধারণ গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপিত হল। কিন্তু বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের তুলনায় ঐ সব প্রদেশ অনেক পশ্চাতে পড়ে রইল। এখনো কলকাতার সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে অন্য কোনো রাজ্যের গ্রন্থাগারের তুলনা হয় না। কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় নানা প্রকারের প্রায় চারশ' গ্রন্থাগার আছে। স্কুলের গ্রন্থাগার এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। কলকাতার অনেকগুলি গ্রন্থাগারে এরূপ অমূল্য পুস্তক-সংগ্রহ রয়েছে যা ভারতের অন্যত্র নেই। বাংলা রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতে যেমন নেতৃত্ব করেছে, তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনেও বাংলা ছিল অগ্রণী।

বিংশ শতাব্দীতে এ-দেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা। লর্ড কার্জন ভারতের বড় লাট হয়ে এসে ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে জনসাধারণ এবং গবেষকদের ব্যবহারের উপযোগী কোনো সাধারণ গ্রন্থাগার কলকাতা বা ভারতের অন্য কোথাও নেই। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি তখন নানা কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার মূল্যবান লক্ষাধিক পুস্তক



লর্ড কার্জন—ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা

অযত্নে ধ্বংস হতে বসেছে। কার্জন গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির বইপত্র কিনে নিলেন। ১৮৯১ সালে ভারত সরকারের কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছিল। কার্জন এই ইম্পিরিয়েল ল্যাইব্রেরির সঙ্গে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তক-সংগ্রহ মিলিত করে স্থাপিত করলেন নতুন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি। ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া

হয়। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো ভারতীয় নাগরিক এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকারী। গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোনো প্রকার চাঁদা দিতে হবে না। কলকাতার বাহিরের সদস্যরা ডাকে বই নিতে পারবে। এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে সরকার সর্বপ্রথম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিনা চাঁদায় পুস্তক সরবরাহের দায়িত্ব স্বীকার করলেন।

বরোদার গাইকোয়াড় আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। দেশে ফিরে তিনি নিজের রাজ্যের সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করলেন। ডব্লু, এ, বোরডেন নামক একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু হয় ১৯১০ সালে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শাখা গ্রন্থাগার, গ্রাম্য গ্রন্থাগার, শিশু গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র বরোদা রাজ্যে বই পড়ার সুযোগ ছড়িয়ে দেওয়া হল। বরোদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেরূপ উন্নতি হয়েছিল পঞ্চাশ বছর পরেও অন্য কোনো রাজ্যে এখন পর্যন্ত তা হয়নি।

ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতি-গুলি। বিদেশী সরকার গ্রন্থাগার স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য মোটেই আগ্রহশীল ছিলেন না। সুতরাং এই সব বে-সরকারী সমিতিগুলি গ্রন্থাগারের উপযোগীতা সম্বন্ধে প্রচার করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। সমিতির অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া এবং ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশও এই সব সমিতির উদ্দেশ্য।

অল ইন্ডিয়া লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশান বা নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হয় ১৯৩৩ সালে। ভারতের সর্বত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার এবং উন্নয়ন, সর্বভারতীয়, পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা, ইত্যাদি এই সমিতির কর্মসূচীর অন্তর্গত। এর পূর্বেই অনেক প্রদেশে গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হয়েছে। প্রাদেশিক সমিতির কার্যক্ষেত্র প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতি আছে। এদের মধ্যে বাংলা, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের সমিতিগুলির দান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯২৫ সালে। পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উপযুক্ত সরকারী সাহায্য না পেয়েও এই পরিষদ বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, এবং প্রদর্শনী ও সম্মেলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগ্রহশীল করে তোলাই পরিষদের প্রধান কার্যক্রম। ভারতের গ্রন্থাগার সমিতিগুলির মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিশেষরূপে সক্রিয়।

পাঞ্জাব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশান ভারতে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বিষয়ে অগ্রবর্তীদের অন্যতম। মাদ্রাজ লাইব্রেরি অ্যাসাসিয়েশান অনেকগুলি মূল্যবান বই প্রকাশ করে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ভারতের দান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অধিকাংশ বই অ্যাসোসিয়েশানের কর্ণধার ডঃ এস্. আর. রঙ্গনাথএর রচিত। কলোন বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে ডঃ রঙ্গনাথএর নাম অমর হয়ে থাকবে। মেলাভিল ডিউই প্রবর্তিত পুস্তক বর্গীকরণের দশমিক পদ্ধতি য়ুরোপ আমেরিকার অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতীয় বিষয়ের উপরে লিখিত বইয়ের সুষ্ঠু বর্গীকরণ দশমিক পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নয়। কলোন বর্গীকরণ এই অসুবিধা দূর করেছে। এই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। কলোন বর্গীকরণ প্রথাই গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ভারতের এক-মাত্র দান।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য কুশলী কর্মী প্রয়োজন। না হলে সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আশা করা যায় না। বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন মিঃ বোর্ডেন। তারপর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এ, ডি, ডিকিনসনের পরিচালনায়

পাঞ্জাব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশান গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ক্লাশ আরম্ভ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ডিকিনসনের নেতৃত্বে ১৯১৫ সাল থেকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠনের কাজ শুরু হওয়ায় পাঞ্জাবের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। ১৯২৯ সালে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার সমিতি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। বর্তমানে এই কেন্দ্রের পরীক্ষায় প্রতি বৎসর প্রায় এক শত ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। এখানকার শিক্ষার খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাই মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, উত্তর-প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রতি বৎসর অনেক শিক্ষার্থী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের শিক্ষণ কেন্দ্র পড়তে আসে। অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগার সমিতিগুলিও স্বল্পকালীন শিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে।

উচ্চস্তরের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথম করা হয় ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিতে। ১৯৩৫ সালে এই ক্লাশ আরম্ভ হয়। এর পর একে একে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, বেনারস, বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, আলিগড়, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অন্যান্য বিষয়ের মতো নিয়মিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ হবার পর ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির ক্লাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

— স্বাধীনতার পরে —

স্বাধীনতার পূর্বে দেশে গ্রন্থাগারের প্রসার ও উন্নয়ন সম্বন্ধে সরকার উদাসীন ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্বন্ধে সরকার ও শিক্ষাবিদ সকলেই অবহিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এবং অন্যান্য শিক্ষা কমিশন গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রথম ধাপ হিসাবে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগার রাখেন। এই নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চাহিদা মেটাবার উপযোগী করে নতুন ভাবে গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজও শুরু করা হয়। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল মেটকাফ হলে। স্থানাভাব ঘটায় ১৯২৩ সালে লাইব্রেরি এস্‌প্লেনেড ভবনে স্থানান্তরের কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করা হয় জবাকুসুম ভবনে। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির নাম পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রশস্ত ঐতিহাসিক বেলভেডিয়ার ভবন জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য পাওয়া যায়। এই নিজস্ব ভবনে জাতীয় গ্রন্থাগার নতুন রূপে বিন্যাস করা হল। এ-বাড়িতে পাঠকদের পড়াশুনার জন্য অধিকতর সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি বেলভেডিয়ার ভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ঐ-সময় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবও পালন করা হয়।

ইংরেজ আমলে সংস্কৃত, বাংলা ও উর্দু ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার বই গ্রন্থাগারে প্রায় ছিল না বললেই চলে। বাংলা দেশে মুদ্রিত বই বিনামূল্যে পাওয়া যেত বলে জাতীয় গ্রন্থাগারে বাংলা বইয়ের সংগ্রহ ত্রিশ হাজারেরও অধিক। বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ পেয়ে গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ আধুনিক ভারতীয় ভাষার বই এবং অন্যান্য বিষয়ের বহু প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে পুস্তক-ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। গ্রন্থাগার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে বছরে মাত্র তিন দিন। পৃথিবীর আর কোনো দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারই পাঠকদের এত অধিক দিন পড়বার সুযোগ দেয় না। জাতীয় গ্রন্থাগার যে-সব বই ভারতে পাওয়া যায় না তা ইংলন্ড ও আমেরিকা থেকে এনে দেবার ব্যবস্থা করায় পাঠকদের প্রভূত উপকার হয়েছে। ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের যে

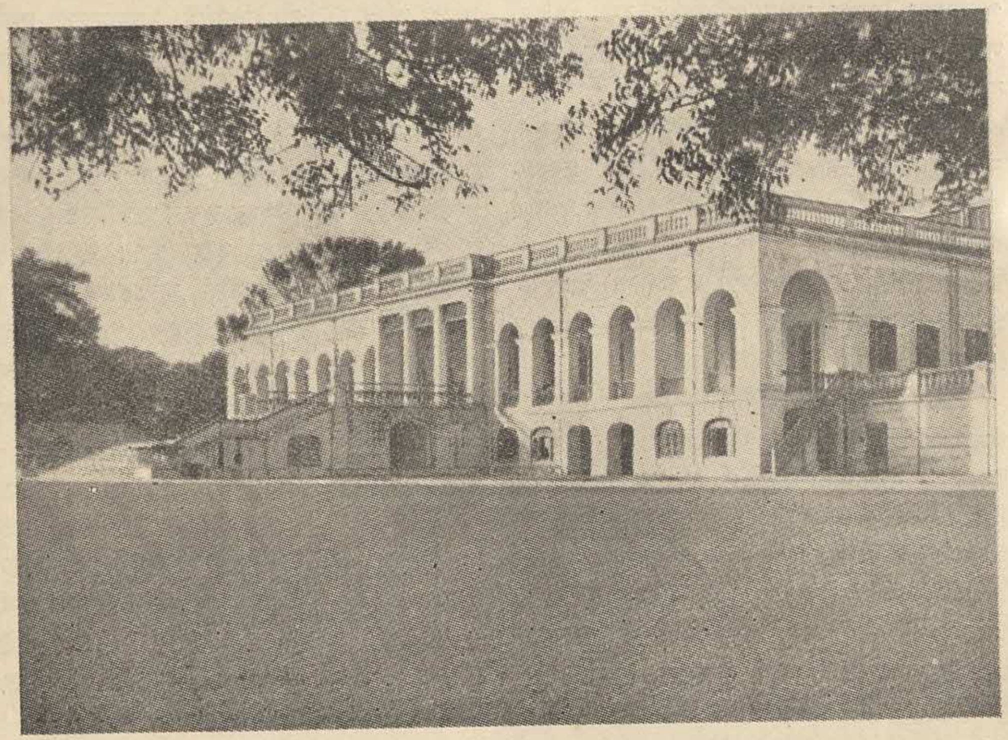
পরিকল্পনা আছে তা সম্পূর্ণ হলে সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের বহুদিনের অসুবিধা দূর হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের এই নবরূপ শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে যে অল্পদিনের মধ্যে লক্ষাধিক পুস্তক দান হিসাবে পাওয়া যায়। আশুতোষ সংগ্রহ, রামদাস সেন সংগ্রহ, বারিদবরণ সংগ্রহ প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। একমাত্র আশুতোষ সংগ্রহেই প্রায় আশি হাজার পুস্তক আছে। দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ্ স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রগণ এই অমূল্য সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জাতির ব্যবহারের জন্য দান করেছেন।

জাতীয় গ্রন্থাগার নিম্নলিখিত শ্রেণীর পুঁথি-পত্রে সমৃদ্ধঃ (১) ভারত সম্বন্ধীয় বই; (২) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমূহ কর্তৃক প্রকাশিত বই; (৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পুঁথিপত্র; (৪) ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দলিল ইত্যাদি; (৫) লীগ অব নেশনস্ ও ইউনাইটেড নেশনসের বই; (৬) পুরনো সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র।

বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ। পুঁথির সংখ্যা ১,৬০০। বইগুলি পর পর সাজালে লাইনটি প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ হবে।

ভারতের মতো এত বড় দেশে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার পাঠকদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়া দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে আরো তিনটি জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে বোম্বাই শহরের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ও মাদ্রাজের কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হবে বলে স্থির করা হয়েছে। দিল্লীর গ্রন্থাগারের কাজ কয়েক বছরের মধ্যে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।



বেলভেডিয়ার ভবন। ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী, উদ্বোধন করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

এই গ্রন্হাগারগ্লিকে ভারতের প‍ুঁথিপত্রে সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে "ডেলিভারি অব ব‍ুক্স (পাবলিক লাইব্রেরিস্) অ্যাক্ট" পাশ করেছেন। ১৯৫৬ সালে এই আইনের সংশোধন করা হয়। "ডেলিভারি অব ব‍ুক্স অ্যাক্ট" অন‍ুসারে ভারতের প্রকাশকদের প্রত্যেকটি বই, সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র কলকাতার জাতীয় গ্রন্হাগারে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গ্রন্হাগার দ‍ুটিতে এক কপি বই পাই না, বিলাতে তাদের পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতের প‍ুঁথিপত্র ভারতে রক্ষা করবার ব্যবস্হা করা হয়েছে।

দেশের সকল প‍ুঁথিপত্র আইনের সাহায্যে এক স্হানে সংগৃহীত হবার ব্যবস্হা হওয়ায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে এতদিনে হাত দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সেটি হল জাতীয় গ্রন্হপঞ্জী সঙ্কলন। দেশের কোথায় কি বিষয়ের কি বই প্রকাশিত হয় তার বিবরণ গবেষক, শিক্ষাবিদ্ ও



পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল—হরেন্দ্রক‍ুমার ম‍ুখার্জি'র জাতীয় গ্রন্হাগার পরিদর্শন

করে দিতে হয়। দিল্লীর গ্রন্হাগার স্হাপিত হলে সেখানেও বই পাঠাতে হবে।

ইংরেজ আমলেও ম‍ুদ্রাকরের নিকট থেকে প্রত্যেকটি বই সংগ্রহ করা হত। কিন্ত‍ু সে-সব বই এ-দেশের কোনো গ্রন্হাগারে রাখা হত না, পাঠিয়ে দেওয়া হত বিলাতে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইন্ডিয়া আপিসের গ্রন্হাগারে এ-সব বই রাখা হয়েছে; তাই এখন আমরা এদেশে যে সব বাঙলা গ্রন্হাগারিকদের পক্ষে অপরিহার্য। দেশের প‍ুঁথিপত্রের প্রকৃতি বিচার করে সাংস্কৃতিক ধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব। ভারত সরকার ভারতের জাতীয় গ্রন্হপঞ্জী সঙ্কলনের ব্যবস্হা করেছেন। জাতীয় গ্রন্হাগারে প্রাপ্ত প‍ুঁথিপত্রের উপর ভিত্তি করে জাতীয় গ্রন্হপঞ্জী ১৯৫৮ সালের জান‍ুয়ারি মাস থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্হপঞ্জী বিষয় অন‍ুসারে সঙ্কলিত।



বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক—আশুতোষ মুখার্জি—কলিকাতা

সরকারী ও বে-সরকারী প্রত্যেকটি বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম, বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা, দাম ও প্রকাশের তারিখ, ইত্যাদি বিবরণ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী থেকে পাওয়া যাবে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই গ্রন্থপঞ্জীর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

ভারতের সুপরিচালিত ও পুস্তক-সংগ্রহে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি হয় সরকারী দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। এই জাতীয় গ্রন্থাগারের মান উন্নত হলেও সাধারণ পাঠকের এবং স্বাধীন ভাবে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের বিশেষ উপকার হয় না। দেশে উন্নত ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেই জনসাধারণ উপকৃত হয় এবং ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নত হতে পারে। ১৯৫৫ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে প্রায় ২৪,০০০ সাধারণ গ্রন্থাগার আছে দেখা যায়। কিন্তু এরা শুধু নামেই সাধারণ গ্রন্থাগার। য়ুরোপ আমেরিকার আদর্শানুযায়ী নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার আমাদের দেশে বিরল। ভারতে একটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারত সরকার ও ইউনেস্কোর পারস্পরিক সহ-যোগিতায়। দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে। এই গ্রন্থাগার থেকে বাড়িতে পড়বার জন্য বই পাওয়া যায়; গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে বসে পড়বার ব্যবস্থা আছে; শিশু-বিভাগ ও ফিল্‌ম, গ্রামোফোন ইত্যাদি সমন্বিত সমাজ-শিক্ষা বিভাগ আছে; আর আছে দূর অঞ্চলের পাঠকদের বই সরবরাহের জন্য লাইব্রেরি ভ্যান। এরূপ আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার ভারতের অন্য কোথাও নেই।

সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু সংগঠন ও পরিচালনার জন্য আইনের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। বিদেশের উন্নতিশীল দেশগুলিতে গ্রন্থাগার আইন আছে। ভারতে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করা হয়। বর্তমান শতকের ত্রিশ দশকের প্রথম ভাগে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাননি।

ডঃ রঙ্গনাথন দীর্ঘকালের চেষ্টায় ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট পাশ করাতে সক্ষম হন। ১৯৫০ সাল থেকে এই আইন মাদ্রাজ রাজ্যে বলবৎ করা হয়েছে। এই আইনের সাহায্যে মাদ্রাজের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করবার চেষ্টা চলছে। ১৯৫৫ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আর একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৫৩ সালে অন্ধ্র পৃথক রাজ্যে পরিণত হবার পর সেখানেও মাদ্রাজের গ্রন্থাগার আইন বলবৎ করা হয়েছে।

বোম্বাই রাজ্য গ্রন্থাগার আইন পাশ না করলেও গ্রন্থাগার উন্নয়নে অগ্রগামী। ১৯৪০ সালে লাইব্রেরি ডেভেলাপমেন্ট কমিটি যে-সব সুপারিশ করেছেন তাদের কার্যকর করবার জন্য উদ্যোগ দেখা দেয় স্বাধীনতা লাভের পরে। ১৯৪৭ সালে। সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাই

সরকার ইতিমধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ পুনা ও ধারওয়ারে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বাইশটি জেলা ও ২২৯টি তালুকে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। এ-ছাড়া সমাজ শিক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ছ'হাজার গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার তত্ত্বাবধানে একটি কপিরাইট গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছে। বোম্বাইয়ের আদর্শ হল শহর অঞ্চল থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে প্রসারিত করা।

গত কয়েক বছরের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দুটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য Indian National Scientific Documentation Centre বা সংক্ষেপে Insdoc. ১৯৫২ সালে ইউনেস্কো ও ভারত সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় ইন্স্ডক স্থাপিত হয়। দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির ভবনে ইনস্ডক অবস্থিত। ইনস্-ডকের উদ্দেশ্য হল দেশে-বিদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয় যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, একটি পাক্ষিক প্রবন্ধপঞ্জী প্রকাশিত করে দেশের বিশেষজ্ঞদের সে-সম্বন্ধে অবহিত করা। বিদেশ থেকে প্রবন্ধের কপি আনিয়ে দেওয়া এবং বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ করে দেওয়াও ইনসডকের কাজ।

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান অব স্পেশাল লাইব্রেরিস অ্যান্ড ইনফরমেশান সেন্টারস্ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বার মাসে। বিশেষ-বিষয়ক গ্রন্থাগার-গুলির সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়নের পথ নির্দেশ করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত পুঁথিপত্রের পঞ্জী প্রকাশ করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারত সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নের উদ্যম কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং তা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যতদূর হিসাব পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় যে ভারতে সকল প্রকার গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় বত্রিশ হাজার। অবশ্য এদের অধিকাংশই প্রকৃত গ্রন্থাগার নামের যোগ্য নয়। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রাণবন্ত করা এবং নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করাই সরকারের উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর মোটামুটি তিন স্তরের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে গ্রামের লাইব্রেরির উপর; গ্রামের লাইব্রেরির উপরে থাকবে জেলা লাইব্রেরি; জেলা লাইব্রেরির উপরে থাকবে রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। যে-সব রাজ্যে একাধিক ভাষার প্রাধান্য আছে (যেমন, বোম্বাই) সেখানে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিবর্তে দু'টি বা তিনটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার থাকতে পারে।

গ্রামের লাইব্রেরিতে নিজস্ব পুস্তক-সংগ্রহ না থাকলে ক্ষতি নেই। থাকলেও সামান্য কিছু থাকবে। জেলা লাইব্রেরিগুলির প্রধান দায়িত্ব হবে গ্রামের প্রত্যেক লাইব্রেরিতে নিয়মিত পুস্তক সরবরাহ করা। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর থাকবে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষদেশে থাকবে কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার উন্নয়নের নীতি নির্দ্ধারণ, তত্ত্বাবধান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অনুকূল আব-হাওয়া সৃষ্টি করবার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলন এবং দেশের পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের দায়িত্বও থাকবে এই গ্রন্থাগারের।

এই উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৮৮,৯১,৪৯৯্ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই টাকার সাহায্যে নয়টি রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৯৬টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে; এবং ৫২টি জেলা গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। এই টাকার অর্ধেকেরও বেশী দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। বাকি টাকা দিতে হবে রাজ্যসরকারগুলিকে। এবারও পূর্বনির্দিষ্ট

পরিকল্পনা অনুসারেই উন্নয়নের কাজ করা হবে। ভারতের মোট ৩২০টি জেলার মধ্যে প্রায় একশ'টি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, অথবা স্থাপনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। ২২০টি জেলা গ্রন্থাগার, অবশিষ্ট রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হল দ্বিতীয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য উচ্চস্তরের অনেক কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হবে। তাদের জন্য দিল্লীতে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী ভারতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩২,০০০। এ-সব গ্রন্থাগারের মোট পুস্তকের সংখ্যা ৭১,০০,০০০। প্রতি বৎসর পাঠকরা ৩৭৭ লক্ষ বই লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়ে। বত্রিশ হাজার গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় ৫০ লক্ষ টাকারও কম। গ্রন্থসম্পদ বিচার করলে দেখা যায় প্রতি পঞ্চাশ জনের জন্য আমাদের মাত্র একখানি বই আছে; এবং প্রতি বৎসর কুড়ি জন লোক একখানি বই পড়ে। লাইব্রেরির জন্য প্রতি পাঁচ জন এক আনা ব্যয় করে। অর্থাৎ, লাইব্রেরি খাতে মাথাপিছু ব্যয় এক পয়সারও কম। আমেরিকায় পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থসম্পদ মাথাপিছু ১·২৪টি বই; প্রতি বছর গড়ে মাথাপিছু ৩·৩৭ খানি বই পড়ে সে-দেশের পাঠক। আমেরিকায় গ্রন্থাগারের জন্য মাথাপিছু ব্যয় হয় টা ৪·৫৫ পয়সা। ব্রিটেনের পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থসম্পদ বিচার করলে দেখা যায় সে দেশের মাথাপিছু বইয়ের সংখ্যা ১·১৫। গড়ে বৎসরে পাঠকরা ৭·৭ খানি বই পড়ে। পাবলিক লাইব্রেরির জন্য ব্রিটেনে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন টাকা।

উপরের তুলনামূলক হিসাব থেকে দেখা যাবে ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কত পিছিয়ে আছে। অথচ জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য ভারত সরকার একটি গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তার প্রধান সুপারিশ হলঃ

১। গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য পঁচিশ বছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। উন্নয়নের কাজ হবে ধাপে ধাপে।

২। সম্পত্তি করের উপর টাকায় ছয় নয়া পয়সা গ্রন্থাগার কর ধার্য করা হবে।

৩। গ্রন্থাগার করের পরিমাণ যথেষ্ট হবে না; সুতরাং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য করবেন।

৪। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করতে হবে।

— ভারতীয় প্রকাশন-শিল্প —

দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নয়নের প্রধান বাধা দু'টিঃ নিরক্ষরতা এবং ভারতীয় ভাষায় বইয়ের অভাব। অর্থ এবং কুশলী কর্মীরও অভাব আছে সত্য; সরকারের চেষ্টায় এ দুটির অভাব দূর হলেও উপযুক্ত বই পাওয়া না গেলে গ্রন্থাগার অচল হয়ে পড়বে। উপযুক্ত বইয়ের জন্য যোগ্য লেখকের প্রয়োজন। শুধু তা হলেই হবে না; প্রকাশন শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি না হলে ভালো বই পাওয়া কঠিন।

১৯১১—'১২ সালে ভারতে মোট ১১,৫৮৪ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে; এর মধ্যে য়ুরোপীয় ভাষায় বইয়ের সংখ্যা ১,৫৯৬ এবং ভারতীয় ভাষার বইয়ের সংখ্যা ৯,৯৮৮। ১৯৪০—'৪১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২,৮৪১ এবং ১৪,১১৭; মোট সংখ্যা ১৬,৯৫৮। ১৯৫৭—'৫৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে ডেলিভারি অব বুক্স্ (পাবলিক লাইব্রেরিস্) অ্যাক্ট অনুসারে মোট ২৯,২১৪ খানি বই পাওয়া গেছে। এই হিসাবের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত বইও ধরা হয়েছে। কিন্তু ১৯১১—'১২ ও ১৯৪০—'৪১ সালের সংখ্যার মধ্যে সরকারী পুঁথিপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ঐ বছর জাতীয় গ্রন্হাগারে কোন্ রাজ্য থেকে কত বই এসেছে তার হিসাব নীচে দেওয়া হলঃ

রাজ্য			বইয়ের সংখ্যা
আন্দামান	...	...	১
অন্ধ্র	...	...	১৩৯৫
আসাম	...	...	১৬৫
বাংলা	...	...	৩৬৭৯
বিহার	...	...	৫১২
বোম্বাই	...	...	৫৯৪৯
দিল্লী	...	...	৬৪৭৭
হিমাচল প্রদেশ		...	৩০
কেরল	...	...	১২৪৬
মধ্যপ্রদেশ	...	...	৩৯৯
মাদ্রাজ	...	...	৩৬৮১
মণিপুর	...	...	৩৭
মহীশুর	...	...	৯৯১
উড়িষ্যা	...	...	৪১৩
পাঞ্জাব	...	...	৬৬১
রাজস্হান	...	...	২২১
ত্রিপুরা	...	...	৪
উত্তর প্রদেশ	...	...	৩৩৫৩
মোট		...	২৯,২১৪

এই সব বইয়ের ভাষা বিশ্লেষণ করলে হিসাবটা এরূপ দাঁড়ায়ঃ

ভাষা			বইয়ের সংখ্যা
আসামী	...	...	৮৯
বাঙলা	...	...	২,১১৩
ইংরেজী	...	...	১২,০৩০
গুজরাটি	...	...	১,৪৮৪
পাঞ্জাবী	...	...	২৭৯
হিন্দী	...	...	৫,১৫১
কানাড়ী	...	...	৭২৪
মালয়ালাম	...	...	১,০৮৭
মারাঠী	...	...	১,৬৮১
উড়িয়া	...	...	২৯৬
তামিল	...	...	১,৮৭৪
তেলুগু	...	...	১,৩৬৭
সংস্কৃত	...	...	২১৮
উর্দু	...	...	৫৬১
অন্যান্য ভাষা	...	...	২৭৪
মোট		...	২৯,২১৪

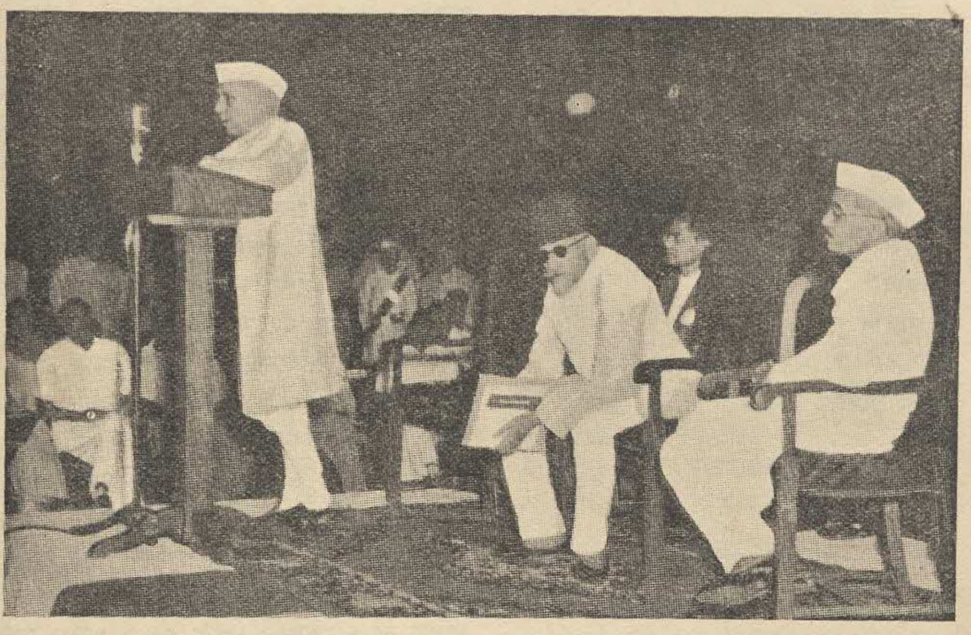
এ-সব বইয়ের বিষয়বস্তু বিচার করলে দেখা যায় যে, শতকরা কুড়ি ভাগ একেবারে বাজে বই বলে বাদ দেওয়া যেতে পারে; পঞ্চাশ ভাগ পাঠ্য-পুস্তক; বিশ ভাগ সাহিত্যবিষয়ক বই; বাকি দশ ভাগ অন্যান্য বিষয়ের বই। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সকল বিষয়ের বই প্রয়োজন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই না হলে জাতি গঠনের কাজ অগ্রসর হতে পারে না। আমরা বিদেশে প্রকাশিত ইংরেজী বইয়ের উপর নির্ভর করে আছি বলেই ভারতীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বই প্রকাশের তাগিদ অনুভব করি না। ভারতীয় ভাষায় যত বই প্রকাশিত হয় তাদের অধিকাংশই চিত্তবিনোদনের বই। ভারতে প্রতি বৎসর ৫০০/৬০০ অনুবাদ গ্রন্হ প্রকাশিত হয়; এদের মধ্যেও অধিকাংশ বই গল্প উপন্যাস।

ইংলন্ডে ও আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্রে) বাজারে সর্বদাই লক্ষাধিক বই (টাইটেল) কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে হিন্দী বই বাজারে বিক্রির জন্য মজুদ থাকে হাজার পাঁচেক; অন্যান্য ভাষার বই দু' হাজার থেকে এক হাজারের বেশী নয়। অথচ কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে সকল ভারতীয় ভাষায় মিলিত ভাবে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ বই প্রকাশিত না হলে আমাদের পক্ষে ইংরেজী ভাষা বিদায় দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিরাট কাজের দায়িত্ব নেবে কে? ভারতে সকল প্রকার প্রকাশকের সংখ্যা হাজার আটেক; কিন্তু প্রকাশন-শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ তুলনায় খুব কম এবং প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করবার ঝুঁকি নিতে অনেকেই অনিচ্ছুক। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য স্বাধীনতার পরে সরকার এগিয়ে এসেছেন। সরকারী উদ্যমের

প্রথম ফল ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রধান উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় সাহিত্যের মান উন্নয়ন করা, তাদের সমৃদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছেঃ (১) ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা; (২) বর্তমান শতাব্দীতে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পঞ্জী সাহায্যে এবং সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে ভারতীয় সাহিত্যের সংবাদ প্রচার করা ও জনসাধারণের মনে সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করাও অ্যাকাডেমির উদ্দেশ্য।

সাহিত্য অ্যাকাডেমি একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। অবশ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই এর প্রধান অবলম্বন। ৬৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সাধারণ পরিষদের উপর সাহিত্য অ্যাকাডেমির কার্যপরিচালনার ভার ন্যস্ত। সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু।



উদ্বোধন দিবসে প্রধান মন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু ভাষণ দিতেছেন

সঙ্কলন; (৩) এক ভারতীয় ভাষা থেকে অন্য ভারতীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ; বিদেশী ক্লাসিক্সের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ; (৪) মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ; (৫) পুরস্কার দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে ভারতীয় লেখকদের সহায়তা করা; (৬) বিদেশী ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ এবং ইউনেস্কোর সহিত এই উদ্দেশ্যে সহায়তা করা। সাহিত্য অ্যাকাডেমির এই হল মোটামুটি কর্মসূচী। এ-ছাড়া প্রদর্শনীর

সাহিত্য অ্যাকাডেমি এই ক'বছরের মধ্যেই অনেকগুলি অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

১৯৫৭ সালে ভারত সরকার একটি নতুন সংস্থা স্থাপন করেছেন। এই সংস্থার নাম ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে দেশে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা ট্রাস্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারত ও বিদেশের ক্লাসিকস্‌গুলি

আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করবার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। সুলভ মূল্যে উচ্চ মানের পুস্তক সরবরাহ করে গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যও ট্রাস্টের রয়েছে। এ-ছাড়া বিদ্বজ্জন সভা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদিত প্রকাশন পরিকল্পনায় ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অর্থসাহায্য করা হবে।

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ও ইংরেজী এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই দপ্তরের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা হল খন্ডে খন্ডে মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণ ইংরেজী ও হিন্দী রচনাবলীর প্রকাশ।

তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম এবং কানাড়ী ভাষায় উচ্চমানের বই সস্তায় প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে "সাদার্ন ল্যাঙ্গোয়েজেস্ বুক ট্রাস্ট" স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে প্রকাশন-শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে।

বয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত বই রচনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। এই ধরণের বইয়ের লেখকদের পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করা হয়। শিশু-সাহিত্য উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের লেখকদের রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই পুরস্কারের মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। সাহিত্য অ্যাকাডেমি এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যও লেখকদের পুরস্কৃত করে সৎ-সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করছেন।

—সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র—

ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া এতদিন সম্ভব ছিল না। ভারত সরকার ১৮৬৭ সালের প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুক্স্ অ্যাক্ট সংশোধন করে প্রত্যেক পত্রিকার প্রকাশককে এক কপি করে পত্রিকা রেজিস্ট্রার অব নিউসপেপারের দপ্তরে জমা দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই সব প্রাপ্ত পত্রিকার ভিত্তিতে পত্রিকার পরিসংখ্যান সংকলন করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারতে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মোট সংখ্যা ছিল ৬,৯১৮। কোন রাজ্যে কত পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার হিসাব নীচে দেওয়া হলঃ

রাজ্য			পত্রিকার সংখ্যা (দৈনিক ও সাময়িক)
অন্ধ্র	...	...	৩২২
আসাম	...	...	৪১
বিহার	...	...	১৮৪
বোম্বাই	...	...	১,৪৬৭
কেরল	...	...	২৯৬
মধ্যপ্রদেশ	...	...	২১৩
মাদ্রাজ	...	...	৬৭৭
মহীশূর	...	...	৩৪৩
উড়িষ্যা	...	...	১২৪
পাঞ্জাব	...	...	৫২৯
রাজস্থান	...	...	১৯৯
উত্তর প্রদেশ	...	...	৭৭৪
পশ্চিমবঙ্গ	...	...	১,০১২
দিল্লী	...	...	৬৯৮
হিমাচল প্রদেশ	...	...	৫
মণিপুর	...	...	২২
ত্রিপুরা	...	...	১২
	মোট	...	৬,৯১৮

নীচের তালিকা থেকে কোন্ ভাষায় কত পত্রিকা বের হয় তা পাওয়া যাবেঃ

ভাষা			পত্রিকার সংখ্যা
ইংরেজী	...	...	১,৩৯২
হিন্দী	...	...	১,২৬৩
আসামী	...	...	১০

বাঙলা	... ...	৪৯২
গুজরাটী	... ...	৪৫৬
কানাড়ী	... ...	২২৯
মালয়ালাম	... ...	১৭৭
মারাঠী	... ...	৩৭৪
ওড়িয়া	... ...	৭০
পাঞ্জাবী	... ...	১৩৩
সংস্কৃত	... ...	১০
তামিল	... ...	৩২৪
তেলুগু	... ...	২২৬
উর্দু	... ...	৫৬৬
দুই ভাষার পত্রিকা	...	৬৮২
বহু ভাষার পত্রিকা	...	৪২৪
অন্যান্য ভাষার পত্রিকা	...	৯০
মোট	...	৬,৯১৮

ভারতের এই সুবিখ্যাত জাতীয় গ্রন্হাগার যে যে স্হানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বেলভেডিয়ার ভবনে স্হানান্তরিত হয়, সে ইতিহাসও এখানে দেওয়া হইল:—

মেটক্যাফ হল (১৮৪৪—১৯২৩), এসপ্লেনেড (১৯২৩—১৯৪২), বেলভেডিয়ার (১৯৪৮......),

এই গ্রন্হাগারের প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে যাঁরা এর উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা গেল।

প্যারিচাঁদ মিত্র ১৮৪৮—১৮৬৬, হরিনাথ দে ১৯০৭—১৯১১, জে, এ, চেপমেন ১৯১১—১৯৩০, সুরেন্দ্রকুমার ১৯১৩—১৯৩৯, খান-বাহাদুর কে, এম্ আসাদুল্লা। আসাদুল্লা ১৯৩০—১৯৪৭, ইঁহারা পাঠাগারের উন্নতি-কল্পে এবং গ্রন্হাগারের শৃঙ্খলার জন্য যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন করেছিলেন তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হয়ে আছে। এ-কত বৎসর আগের কথা। এখন দিন দিন উন্নতির পথে চলেছে। সকল প্রকার দানের মধ্যে বিদ্যাদান—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। সে দানের যে সুন্দর ব্যবস্হা হচ্ছে তাহা আমাদের ভারতবাসীর গৌরবের ও গর্ব্বের বিষয়।

এত দিন পর্য্যন্ত একটি বিশেষ অভাব ছিল, জাতীয় পাঠাগারে একটি স্বতন্ত্র শিশু বিভাগের ব্যবস্হা। সম্প্রতি শিশু, বালক, কিশোরদের স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হওয়ায় সেই অভাব দূর হয়েছে। বর্ত্তমানে তাহাদের বসবার জন্য যেমন সুন্দর ব্যবস্হা হয়েছে তেমনি নানা বিষয়ের পত্র-পত্রিকা এবং প্রচুর পুঁথিপত্রের সমাবেশে উহাতে হয়েছে চিলড্রেনস লাইব্রেরী। নবপ্রতিষ্ঠিত চিলড্রেনস লাইব্রেরীতে (Children's Library) পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৬,০০০। বাংলা, ইংরাজী, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি ছয়টি ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক এখানে আছে। ছোটদের এই লাইব্রেরী ঘরটি অতি সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে। বসবার জন্য সুন্দর আসন এবং এমন ভাবে লাইব্রেরী। তৈরী করা হয়েছে যাতে বালকবালিকাদের আসা-যাওয়ার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়...... সহজ সুন্দর ভাবে চলাফেরা করতে পারে।

এই ছোটদের পাঠাগারে তাহাদের উপযোগী নানা জাতীয় চিত্তাকর্ষক পুস্তক সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কার্জটি বড় সহজ নয়। এ-প্রসঙ্গে বলা চলে—এক হিন্দী বইয়ের সংখ্যা হবে প্রায় ২,৫০০ তার বেশীর ভাগই হচ্ছে স্কুল পাঠ্য পুস্তক। ছোটরা তা ভালবাসে না! ইংরাজীর পরে বাঙ্গালা বই-ই এখানে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা চলিত গ্রন্হের সংখ্যা হবে প্রায় ১,২০০। বাঙ্গালা বইয়ের প্রচ্ছদপট, ছবি ইত্যাদি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-এবং বিজ্ঞান মন্ত্রী হুমায়ুন কবির ইংরাজী ১৯৬০ সালের ২২শে জানুয়ারী চিলড্রেনস লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন করেছেন। জাতীয় গ্রন্হাগারের আদর্শে আমরা আশা করি যে ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্রন্হাগারের সঙ্গেও এক একটি চিলড্রেনস লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হবে।

জন্তু জানোয়ার



জন্তু জানোয়ার সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের শেষ নাই। কিন্তু এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য। ক'টা জানোয়ারের নামই বা আমরা জানি? বম্বে "ন্যাচার্‌ল হিষ্টরিকাল সোসাইটী" থেকে প্রকাশিত "দি বুক অব ইন্ডিয়ান এনিম্যলস্‌" পুস্তকে মিঃ প্রেটার লিখেছেন 'এই ভারতের জঙ্গলে প্রায় পাঁচশত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জানোয়ার আছে। খুব আশ্চর্য হওয়ার মত সংখ্যা নয় কি? বনের জানোয়ারের কথা উঠলেই আমাদের মনে জাগে বাঘ, ভালুক, সিংহ, গন্ডার, হাতী, বাইসন, বন্য মহিষ, হায়না, বন্য বরাহ, শেয়াল প্রভৃতি। সকলে এত নাম ও জানে না। এ-প্রবন্ধেও দু'চারটী জানোয়ার সম্পর্কেই লেখা হচ্ছে। কিন্তু বন্য জানোয়ার প্রসঙ্গ লিখতে গেলেই বনের কথা মনে আসে। বলতে হয় বনের খবর।

আমাদের বাসগৃহের আশপাশে দু'চারটী গাছ-পালা আছে। রসাল ফলের জন্য, ছায়ার জন্য এবং আমাদের চোখকে আরাম দেওয়ার জন্যই ঐগাছ রোপণ করা হয়েছে। ওদের দেখতে আমাদের ভাল লাগে। ঋতুতে ঋতুতে ওদের পাতার রং বদলায়। বসন্তে ওদের পাতা ঝরে যায়।

আবার নূতন পাতা গজায়। পাতার সবুজ হালকা থেকে গাঢ়, পীত, লোহিৎ কত রং লাগে এদের নব পল্লবে। তার পর ফুল ফোটে। ফল ধরে। গাছের ডালে পাখী ডাকে। কী মিষ্টি তাদের কন্ঠ। কোয়েল, দোয়েল, বুলবুল, শালিক, চড়ুই, দুর্গা, টুনটুনী। এরা আমাদের প্রিয়ভাষী প্রতিবেশী। আমাদের আনন্দের জন্য প্রকৃতির চেষ্টার বিরাম নেই। এই প্রকৃতি দেবীকেও আমরা চিনিনা। তিনি নিত্যই আছেন কিন্তু অহরহই তিনি চোখের আড়ালে। মাথার উপরে আকাশ। আকাশে মেঘ আছে। ঝর ঝর্ শব্দে বৃষ্টি ঝরে। ছেলেরা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেঃ

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বাণ—"

সহরের আনাচে-কানাচে কয়েকটী মাত্র গাছ আমাদের এত আনন্দ পরিবেশন করে। এবারে বনের গাছ-পালার কথা ভাবা যাক্।

অরণ্যে কয়েকটী মাত্র গাছ নহে। দু'চার হাজার। দু'চার লাখ। তারও বেশী। অজস্র অসংখ্য গাছ। গাছে গাছে দুলছে লতা। তরু-লতার সন্নিবেশ নিবিড়। জটিল রন্ধ্রহীন। এর ফাঁক দিয়ে নজর চলেনা। আবার ফাঁকা ফাঁকা বনও আছে। সরল সুদীর্ঘ বিশাল মহীরুহ শ্রেণী। গাছে ফুল ফোটে, লতায় দোলে স্তবকে স্তবকে ফুল। গাছের ডালে পাখী গান করে। কত রকম পাখী। শুধু কোয়েল দোয়েল নয়। কত বর্ণে চিত্রিত কত বিচিত্র বিহঙ্গ কুল। তাদের কন্ঠে কত রকম বিভিন্ন বুলি। তাদের দেহে বিশ্বশিল্পীর কত চিত্রকলা। বনের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। ছড়ায় ফুলের গন্ধ। পুণ্য-গন্ধে বাতাস ভরপুর। সহরের দু'চারটী গাছ যদি আমাদের আনন্দ দেয় বনের হাজার হাজার লাখো লাখো পল্লবিত পুষ্পিত তরুরাজি আমাদের কত আনন্দ দিতে পারে? বসন্তের বনসভায় দাঁড়িয়ে মনের ভিতরে প্রশ্ন জাগে 'একসাথে কে সাজিয়েছে বনকে এমন বিচিত্র সাজে?' কোথা থেকে আসে এত রং! এত মিষ্ট কন্ঠ বিহঙ্গের! এমন উজ্জ্বল শ্যামল শোভা! বিমুগ্ধ ভক্ত কি এই শোভায় তন্ময় হয়ে ধ্যান নেত্রে দেখেছিলেন বিশ্বের রাখাল সেই নব ঘন শ্যামকে?

শোভা ও সঙ্গীত ছাড়াও অরণ্যের একটা মায়া আছে। যাদু আছে। সে আমাদের আকর্ষণ করে। প্রকৃতি দেহের চারু শিল্প আমাদের বিস্মিত করে। সে উদাস করে। বিবশ করে। বন ভ্রমণে প্রতি পদক্ষেপে বেড়ে যায় আনন্দ আর বিস্ময়। গভীর থেকে গভীরতর আনন্দ। গভীর-তর বিস্ময়। তাইত কবি গেয়েছিলেন—

'এখানে—শান্তি খেলে পুণ্য সনে
বনে যে সুখ মেলে তা মেলেনা রাজ সিংহাসনে।'

অরণ্যে মনুষ্য সমাজ নেই। বসতি নেই। তাই ভারতের মুনি-ঋষি তপস্বীরা এই বনে-জঙ্গলে গিরিগুহার নির্জ্জনে বসে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপলব্ধির জন্য ধ্যান করতেন। তাদের আহার ছিল বনের ফল। পানীয় ছিল বনিনির্ঝরিণীর সুশীতল জল। তাদের অন্তরে বিদ্বেষ ছিলনা। ছিল প্রেম। তাই তাঁদের দেখে মৃগকুল পালিয়ে যেতনা। বাঘ, ভাল্লুক তাদের ভয় দেখাত না। ঋষিদের অন্তরের অনাবিল প্রেম আকর্ষণ করত বন্য জানোয়ারদের। ঋষিরা ধ্যানস্থ হয়ে বুঝতে পারতেন চতুর্দ্দিকে প্রসারিত শাখা বটবৃক্ষের মূলে যেমন আছে একটী মাত্র বীজ এই বিপুল বিশ্বের সৃষ্টির মূলে আছে একই আত্মা। যাঁকে বলে পরমাত্মা। তিনিই বহুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত। ঋষিদের এই সত্যের উপলব্ধি সারা জগৎ সৃষ্ট জীব জন্তু বিহঙ্গের অন্তরে। আশ্চর্য্য নয় কি? এই পৃথিবীতে আরো বিস্ময় আছে। পরমাশ্চর্য্যের সন্ধান আজো মেলে নি!

এই অরণ্যে আরো রহস্য আছে। বাস করে অসংখ্য জন্তু জানোয়ার। বিদ্বেষ জর্জ্জরিত মানুষের সংসার থেকে দূরে। বহু দূরে। পাহাড় প্রাচীর বেষ্টিত অরণ্য-পুর এদের বাসস্থান। এরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করতে জানে না। ইট্, কাঠ, চুন, সুড়কির খবর এরা রাখে

না। প্রকৃতি দেবী এদের জন্য অরণ্যে তৈরী করে রেখেছেন অপূর্ব্ব আশ্রয়। অরণ্যে নিভৃত অন্তরাল আছে। সুস্নিগ্ধ ছায়া আছে। নির্জ্জন গিরিগুহা আছে। ধরিত্রী দেহে গহ্বর আছে। অরণ্যাচ্ছন্ন প্রস্তরময় নালা বা খাল-বিল আছে। এই সব তাদের বাস গৃহ। এই নিভৃত নিবাস গুলি দেখে মনে হয় প্রকৃতি দেবী নীড় রচনা করেছেন এদের জন্যই। আর আছে ঝরণার জল। হাতী, গন্ডার, হরিণ, বরাহ প্রভৃতি তৃণভোজী জানোয়ারদের জন্য আছে অপরিমেয় তৃণলতা। বাঘ, সিংহ, হায়না, শেয়াল প্রভৃতির জন্য আছে অগণ্য আরণ্য জন্তু। অনেক দায়িত্বহীন লোক আগুন দিয়ে বন পুড়িয়ে দেয়। একবার আগুন লাগলে মাসের পর মাস ধরে সেই আগুন জ্বলে। আগুন ছড়িয়ে যায় বন থেকে বনান্তরে। পাহাড়ের পাদমূল থেকে পাহাড় চূড়ার অরণ্যে। জানোয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়। বন নিঃশেষ হয়ে যায়। এই জানোয়ার তখন আহার অন্বেষণে বস্তি অঞ্চলে হানা দেয়। শস্যক্ষেতের ফসল উজার করে। গোশালার গোরু, মহিষ ধরে খায়। মানুষ খায়। অবিবেচক শিকারীরাও নির্বিচারে ব্যাঘ্রাদির ভক্ষ্য জানোয়ার হরিণ, বরাহ প্রভৃতি নির্বিচারে হত্যা করে। বাঘ, শেয়াল খাদ্যাভাবে গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে গৃহপালিত পশু খেতে আরম্ভ করে। যদি বনের তরুলতা, বনের ঘাস জঙ্গল অগ্নিসাৎ না হত তা হলে বন মৃগের খাদ্যাভাব হতনা। বাঘ আশ্রয়চ্যুত না হলে বনে তাদের ও খাদ্যাভাব হত না। মৃগ, বরাহ, হাতী, গন্ডার প্রভৃতি ঘাস জঙ্গল খেয়ে অরণ্যের অতিবৃদ্ধি দমন করে। বাঘ, লেপার্ড, সিংহ প্রভৃতিও আরণ্য জন্তু খেয়ে জন্তু জানোয়ারের অতিবৃদ্ধি সীমিত করে। ভারসাম্য বা ব্যালেন্স রক্ষা করে। মানুষের সমাজে রোগ, ব্যাধি, জল প্লাবন, অগ্নিদাহ, ভূমিকম্প প্রভৃতি এমনি ভাবে মানুষের অনাবশ্যক অতিবৃদ্ধি সীমায়িত ক'রে ভার সাম্য রক্ষা করে। প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত এই ভারসাম্য বিঘ্নিত করে মানুষের লোভ। তাদের অমানুষিক নির্ম্মমতা।

এমনি বেপরোয়া সৃষ্টির ধ্বংস ও নির্বিচার হত্যা আছে বলেই শিকারীর প্রয়োজন আছে। রাইফেল বন্দুকের প্রয়োজন আছে। বস্তিতে বস্তিতে বাঘের অত্যাচার, ফসলের ক্ষেত্রে ভাল্লুক, বন্য বরাহ আর হরিণের উপদ্রব। বাঘের কবলে গোরু, মহিষ ও মানুষের মৃত্যু শিকারীকে আকর্ষণ করে। বাঘ বিরাট বলশালী জানোয়ার। তার চেহারা ভয়ংকর। দন্ত ও নখরের শক্তি অপরিমেয়। তার কন্ঠে আছে বজ্রনাদ। মানুষ তার কাছে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ। তাই বাঘ মারতে মানুষকে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। অস্ত্র হাতে নিতে হয়। বন্দুক, রাইফেল, গোলাগুলি। নিজেকে আড়ালে রেখে দুর্জ্জয় রাক্ষসের বুকে গুলি নিক্ষেপ করতে হয়। এই দুরন্তের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান চলেছে যুগে যুগে। রামায়ণে দশরথের মৃগয়ার কথা আছে। কুরু বংশের রাজাদের মৃগয়ার উল্লেখ আছে মহাভারতে। আধুনিক যুগে ইউরোপ থেকে আগত শাসক-সম্প্রদায়ের অরণ্য শিকার ছিল বৃহত্তম ব্যাসন। প্রত্যেক ইংরেজ দেশ ত্যাগের পূর্ব্বে একটি সংকল্পকে সাদরে পোষণ করত। সে সংকল্প ছিল ভারতে অবস্থান কালে ব্যাঘ্র শিকার। অনেকের সংকল্প সার্থক হয়েছে। আবার কত ইংরেজ বাঘের কবলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে।

এই উপলক্ষে মনে পড়ছে এক ইংরেজ শিকারীর কথা। তিনি শিকার করতেন ভারতের বহু জঙ্গলে। উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে, আসামে, বিহারের হাজারীবাগ, রামগড়, সাসারাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য অরণ্যে। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। সাহস ছিল আরো বেশী। ছোটনাগপুরের অরণ্যাঞ্চলে তখন একটা মানুষ খেকো বাঘের দৌরাত্ম্য চলেছিল। কখন জানোয়ারভুক কোন্ বাঘটা হঠাৎ খাদ্যাভাবে মানুষ খেয়েছিল। মানুষ সহজ শিকার। মাংস তার সুকোমল। মানুষের স্বাদলাভ করে বাঘটা মানুষ ধরে খেতে সুরু করল। মানুষের অভাব নাই। তারা ক্ষেতে কাজ করে। বনে পাতা কুড়োয়। কাঠ কাটে। কাঠ কাটার শব্দ শুনে বাঘ এগিয়ে আসে। তারপর সুযোগ বুঝে কখনো গাছ থেকে কখনো বন পথে

বাঘ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরে তাকে মুখে করে নিয়ে যায় অরণ্যের জটিলতার ভিতরে। আত্মীয় স্বজন নিরুদ্দেশ লোকটির সন্ধানে বন খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ দেখ্‌তে পায় হয়ত হাতের টাঙ্গী, কাঁধের গামছা বা পরিধেয় বস্ত্রখন্ড। কখনো বা নিরুদ্দিষ্ট বিকালে একাকী কেউ বাহিরে যায় না। হাট বসে না। জলার্থিনী দলবেঁধে জল আনতে যায়। হঠাৎ পেছনের একটী নারী অন্তর্হিতা হয়। জলের ঘড়া মাটীতে গড়ায়। সঙ্গিনীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়। কেউবা হোচট খেয়ে নাক-মুখে রক্ত ঝরায়। তখন হয়ত অর্দ্ধ মাইল দূরে



বাঘ কামড়ে ধরে নিয়ে গেল

ব্যক্তির একখানা পা বা মাথাটা! তখন তাদের বুঝতে বাকী থাকেনা যে হরিচরণ জন্মের মত হারিয়ে গেছে। তাকে বাঘে খেয়েছে। তখন ওঠে আর্ত্তনাদ আর মর্ম্মভেদী কান্নার রোল। এই রোদন শেষ না হতেই খবর আসে হয়ত পাঁচ মাইল দূর থেকে। সেখানে রাম সখিয়াকে বাঘে নিয়েছে। উপদ্রবের সংখ্যা বেড়েই চলে। সকালে বনের আড়ালে সুকোমল মাংসভোজনের তৃপ্তি অনুভব করছে নর-খাদক বাঘ।

ইংরেজ শিকারী এলেন এমনি একটী অঞ্চলে। ছাউনী ফেলেছেন গ্রাম প্রান্তে একটী বট গাছের নীচে। মানুষ খেকো বাঘের আচরণ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। বাঘ সাধারণতঃ দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত। ঘটনার দিন অতি প্রত্যুষেই

খবর এসেছে এই গ্রামের সান্নিধ্যেই একজন দেহাতী যুবককে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। বেচারা ভোরবেলাতে মহুয়া কুড়োচ্ছিল। দুটী ঝুরি মহুয়াতে পূর্ণ হয়েছে। এবারে বাকী মহুয়া জড় করছিল একটী জায়গায়। হঠাৎ নিঃশব্দে কখন যে শমন এল তার পেছনে বিশ্বনাথ তা টের পায়নি। উপবিষ্ট বিশ্বনাথের ঘাড়ের উপরে যেন পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে! ঘাড়ের দুই পাশে



সাহেব উবু হয়ে দেখতেই তার মাথায় বজ্র পতন হল

লোহার গজাল ফুঁড়ে দিয়েছে! তার আর্ত্তনাদটী গলাতেই আট্‌কে গেল। ফুলের ঝুড়ি বয়ে নিতে আসছিল তার বৃদ্ধা পিসীমা। সে দেখলে শূন্যে ধড় ফড় করছে দুটো পা আগুনের মত একটা জানোয়ার অন্তর্দ্ধান করল বন পথে। পিসী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে। হতভাগ্য ছেলের মাকে বস্তির লোক ধরে রেখেছে সে ছুটে যেতে চাচ্ছে জঙ্গলে। বাঘের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

ইংরেজ শিকারী সদ্য সদ্য এই ঘটনার সংবাদে পুলকিত হলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হল। সঙ্গে যাবেন দুজন সহচর। একজন সাহেবের আগে। আর একজন থাকবেন তাঁর পেছনে। অগ্রবর্ত্তী লোকের হাতে বন্দুক (সটগান) অনুবর্ত্তীর হাতেও বন্দুক। মধ্যস্থলে সাহেবের হাতে ম্যানলিকার রাইফেল। বনের সমস্ত পথ জানা আছে অগ্রবর্ত্তী লোকটীর। বহু শিকারে সে শিকারীদের পথ দেখিয়েছে। বন্দুক ছুড়তে জানে। অনুচরটীও জানে। শুকনো পাতা বা বনপথে পাথরে রক্তের দাগ খুঁজে খুঁজে পার্টি এগিয়ে চলেছে, সাহেব জানেন আজ সকালের দেখা বাঘ বেশী দূরে যায়নি। প্রচুর মাংস খেয়ে জলের কাছাকাছি একটা জঙ্গলে সে লুকিয়েছে। সেখানে সে দুপুরের দিবানিদ্রায় মগ্ন। এই সন্ধানে সর্ব্বক্ষণ হুসিয়ার থাকা প্রয়োজন।

তীক্ষ্ন নজর আর তীক্ষ্ন কান। জঙ্গলে সামান্য আলোড়ন বা বন পথে জানোয়ারের পায়ের তলায় শুকনো পাতা ডাল ভাঙ্গার ক্ষুদ্র শব্দটুকু চোখ বা কান না এড়িয়ে যায়। বনপথে রক্তবিন্দু ছাড়াও বাঘের গতিপথ বুঝে নিতে অন্য অনেক সূত্র আছে। পায়ের নীচে একখানা উল্টানো পাথর খন্ড বাঘের সন্ধান দেয়। গাছের ডালে কাক বা শকুন বাঘের নিকট সান্নিধ্য জানিয়ে দেয়।

একটা নালার ধারে পাওয়া গেল একখানা গামছা। এবারে শিকারীরা আরও সতর্ক হয়েছে। অর্দ্ধ ক্রোশের বেশী তারা পায়ে চলেছে। ফাল্গুন মধ্যাহ্নের বন পথ। কিন্তু বনের শোভা দেখার ফুরসুৎ তাদের নেই। মাঝে মাঝে উবু হয়ে লতা পাতায় জটিল রন্ধ্র পথ তাকিয়ে দেখ্‌ছে। আরও দেখ্‌ছে কোথায় আছে জল। কাল এই বাঘ আর এ এলাকায় থাকবে না। হয়ত সে চলে যাবে দশ বিশ মাইল দূরে নূতন কোনো বস্তি অঞ্চলের অরণ্যে। কখন মধ্যাহ্ন গড়িয়েছে। অপরাহ্নের ছায়া পড়েছে বন-পথে। তথাপি শিকারীদের অগ্রগতির বিরাম নেই। সাহেব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর অর্দ্ধ ঘন্টার মধ্যে ছাউনীর দিকে এগিয়ে না গেলে বনে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। ঝোপ ঝাড়েও নজর চলবে না।

হঠাৎ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অনুচরের মুখ থেকে একটু অস্ফুট আওয়াজ হল। সে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। সাহেব উবু হয়ে দেখতেই তার মাথায় বজ্র পতন হল। বাঘের থাবা পড়েছে তার মাথায়। মুহূর্ত্তে বাঘ তাকে পেড়ে ফেলে চিবুচ্ছে তার ঘাড়ে। তার পরেই বাঘ অন্তর্ধান করল, সাহেবকে দূরে ফেলে দিয়ে। একটী বন্দুকের গুলি ছুটল সুমুখের লোকটীর হাত থেকে। বাঘ ততক্ষণে নিরুদ্দেশ। অচেতন সাহেবকে ধরাধরি করে আনবার চেষ্টা করতে সাহেবের প্রাণবিয়োগ হল। সূর্য্য তখন পাটে বসেছে। অন্ধকার আসন্ন। কেমন করে কি হল কেউ বুঝতে পারলে না। অনুচর বললে জঙ্গলের ভিতরে সে একটা আওয়াজ শুনে ছিল।

একদিনে দুইটী জীবন বিনষ্ট হল। অনুসন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে বাঘের এই অনাচারের কারণ মানুষ। বৃদ্ধ বয়সে শিকার ধরার সামর্থ্য হারালে বাঘ মানুষ খেতে সুরু করে। অসহিষ্ণু শিকারীর গুলিতে জখম বাঘও মানুষ খেকো হয়ে ওঠে। এরকম অজ্ঞ শিকারীর দেশে অভাব নাই। যারা বাঘ দেখতে পেলেই বেপরোয়া গুলি ছোঁড়ে। এই গুলিতে বাঘ কদাচিৎ মরে। যে বাঘ গুলি খেয়েও মরেনি সে বাঘ বস্তীবাসিদের পক্ষে মারাত্মক। এই আহত বাঘ বনের জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। তাই সুলভ শিকার মানুষ তার খাদ্য।

যে বাঘ মানুষ খেতে শেখেনি মানুষ সে বাঘকেও ক্ষমা করে না। কারণ দেখতে সে ভয়ঙ্কর। সংগ্রামে সে দুর্জ্জয়। তার শক্তিও অসাধারণ। বড় বড় জানোয়ার সে হত্যা করে খায়। ভয় না পেলে বা আক্রান্ত না হলে অ-নর খাদক বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে না। ইহার ভিতরে কোনো প্রতিশ্রুতি নাই। আশ্বাসও নাই। তাই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ বাঘকে শত্রু বলে জেনেছে। দুর্ব্বল ক্ষুদ্রকায় মানুষ বুদ্ধিবলে, কৌশলে বাঘ মারতে চেষ্টা করেছে। কখনো সে বাঘ মেরেছে কখনো বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে। তবু মানুষের ব্যাঘ্রের বিরুদ্ধে অভিযান আজো চলেছে।

প্রথম যুগে মানুষের অস্ত্র ছিল তীরধনুক, টাঙ্গী বল্লম প্রভৃতি। তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে পাহাড়ীরা বাঘ মারত। কিন্তু টাঙ্গী আর বল্লম নিয়ে বাঘের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ অসম্ভব। দৈবাৎ কে কবে ঘুমন্ত বাঘকে তরবারি বা খর্গের এক আঘাতে মেরেছে সে কথা স্বতন্ত্র। বনের বাঘ আর চিড়িয়াখানার জীর্ণশীর্ণ বাঘে অনেক তফাৎ। বাঘ সম্মুখে দাড়াঁলে গুলি করা নিষেধ। গুলির চেষ্টা করলে শিকারীর মৃত্যু অনিবার্য্য। শোনা গেছে, হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় শিকারীর হাতের বন্দুক খসে গেছে সুমুখে বাঘের আবির্ভাবে! বাঘের এই ভয়াল মূর্ত্তি ও পরাক্রম মানুষের পৌরুষকে আহ্বান করেছে যুগে যুগে। তাই বাঘও আছে শিকারও আছে।

বাঘের সমান অথবা হয়ত বাঘের চেয়েও বলশালী জানোয়ার আছে সিংহ। এক সময় উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচুর সিংহ ছিল। তারা নিঃশেষ হয়েছে শিকারীদের অবিমৃষ্যকারিতায়। এখনও তিন শতাধিক সিংহ সংরক্ষিত আছে জুনাগড়ের গীর জঙ্গলে। এই ভারতীয় সিংহ আফ্রিকার সিংহের মত আকারে বড় নহে। ভারতীয় সিংহ অপেক্ষাকৃত ছোট। লম্বায় দশ ফুটের চেয়ে কিছু কম। ভারতীয় রয়াল বেঙ্গল টাইগারের গড় পড়তা দৈর্ঘ্য ঐ একই। কোনো কোনো বাঘের দৈর্ঘ্য ১০ই ফুট বা সামান্য বেশীও দেখা যায়। আফ্রিকান সিংহ দৈর্ঘ্যে ১০ই ফুটেরও কিছু বেশী। বাঘ ও সিংহের স্বভাব আচার ও আচরণ শিকার ধরার পদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে বাঘ বাস করে গহন বনে। বনের স্নিগ্ধ ছায়ায়। সিংহ বিচরণ করে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। ঘুমোয় বৃক্ষ-ছায়ায়। উভয়ের জীবন কাল বা পরমায়ু একই রকম। বিশ থেকে পঁচিশ বছর এদের জীবনের মেয়াদ। সিংহের কেশর আছে। পুরাণোক্ত ঋষিদেরই মত দেহের স্থানে স্থানে এবং লাঙ্গুলের অগ্রভাগে দীর্ঘ রোমাবলী আছে। কিন্তু বাঘের দেহ নিটোল, সুডৌল। দেহের রোমাবলী হ্রস্ব।

একবার একজন আমেরিকান যুবকের সঙ্গে লেখকের আলোচনা হচ্ছিল ফটো এনলার্জমেন্ট সম্পর্কে। কোনো রকমে তিনি জানতে পারলেন লেখক শিকারী। হঠাৎ যুবকের মুখের আলো যেন নিভে গেল। তিনি বিষাদ-গ্রস্ত হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। লেখক অপ্রস্তুত। আমেরিকান যুবক কি বৈষ্ণব? খানিক পরে যুবক ধীরে ধীরে বললেন:—"আমার বাবা শিকারী ছিলেন। তিনি শিকার করতেন আফ্রিকায়। অনেক সিংহ তিনি মেরেছেন পায়ে চলে। তারপর এল সেই শেষের দিন।" যুবকের কন্ঠস্বর বিচলিত হল। একটা দীর্ঘশ্বাসে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল। তারপর বললেন "হাঁ শেষের দিন। আমার মায়েরও সেই শেষ দিন।"



যুবক বললেন—আমার পিতা সিংহকে গুলি করলেন

অনিরুদ্ধ শ্বাসে বল্‌লাম—কি হল?

যুবক বললেন: আমার পিতা সিংহকে গুলি করলেন। অব্যর্থ গুলি। সিংহটা পড়ে গেল। বাবা আবার রাইফেল তুলেছেন। হঠাৎ আড়াল থেকে বাবার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল একটা সিংহী।

বাবাকে ক্ষত-বিক্ষত করে সিংহী চলে গেল। ঘটনা ঘটল আমার মার চোখের সম্মুখে। মা পড়ে গিয়েছিলেন অচৈতন্য হয়ে। যুবক আবার নিশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন—মার যখন হুঁস হল, বাবা তখনো মরেন নি। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। মাকে একটী কথা বলার জন্যই যেন তখনো বেঁচে ছিলেন—"ডার্লিং অনেক শিকার করেছি এই বনে। আমার আর বেশী বাকী নেই। চোখে অন্ধকার নাম্‌ছে। আমার মৃত্যুর পরে আমার দেহ খন্ড খন্ড করে যে সব বনে আমি শিকার করেছি সেই বনে বনে ছড়িয়ে দিও।"

বাবা চোখ বুজলেন। তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ল।

"আর মা? মা সেই দিন থেকে পাগল হয়ে গেলেন। আজো তিনি তেমনি আছেন। মাঝে মাঝে দু-একদিন একটু ভাল থাকেন। আবার সেই শেষ দিনের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর মনে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।"

আমি নীরব। যুবকও বাক্যহারা। এক-সময়ে বললেন: "আপনি শিকার ছেড়ে দিন।"

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন "শিকারে যান কেন?" শিকারে কি বিপদ নেই? বিপদ? হাঁ বিপদ আছে বই কি? চৌধুরী সাহেব কি ভাবতেন বিপদ নেই? বিপদ আছে। তিনি বাঘের হাতেই প্রাণ দিলেন। তবু শিকারী কেন বনে যায়? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়? এ কথার জবাব দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে?

বাঘের সমগোত্রীর আর একটী জানোয়ার আছে ভারতের সর্ব্বত্র। শিকারী চিতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। বেঁচে আছে প্রচুর সংখ্যায় চিতাবাঘ নাম যার লেপার্ড বা প্যান্হার। টাইগারের মত এদের দেহ রেখা বা ষ্ট্রাইপ্‌সে চিত্রিত নহে। এদের সর্ব্বদেহে ফুলের মত চাকা চাকা ছাপ। এই জন্য এদের "গুল বাঘও" বলে। এদের স্বভাব টাইগারেরই মত। শিকার ধরার পদ্ধতিও একই। তবে টাইগারের মত গহন বনে এরা বাস করেনা। পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলের আশ-পাশের অগভীর ঝোপ-ঝাড়ে এরা বাস করে। গৃহস্থের গোরু বাছুর ছাগল ভেড়া এদের খাদ্য। মানুষের গতিবিধি আচার আচরণ এরা জানে। তাই মানুষকে এরা ভয় করে না। লেপার্ড টাইগারের চেয়ে বেশী হিংস্র। এরা হত্যার আনন্দেও হত্যা করে বিনা প্রয়োজনে। নরখাদকে পরিণত হলে এই বাঘ সে অঞ্চলের দারুণ বিভীষিকা। শুধু পথেঘাটে নহে। এরা ঘরের মধ্য থেকে মানুষ মুখে করে নিয়ে পালায়। টাইগারের চেয়ে লেপার্ড আকারে ছোট। তার চোখ দুটী ক্ষুদ্র। হ্রস্ব, কর্ণ লেপার্ডের সাবলীল প্রগতি বিস্ময়-কর। একবার ঝোপ ঝাড়ের ভিতরে গা ঢাকা দিলে জঙ্গল পিটিয়েও এদের বের করা দুঃসাধ্য। এদের বর্ণকে বলা হয় সংরক্ষক বর্ণ। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলে টাইগারই হোক আর লেপার্ডই হোক এরা জঙ্গল থেকে স্বতন্ত্র এরূপ মনে হয় না। লেপার্ডের হিংস্রতা এবং এই সংরক্ষক বর্ণের জন্য শিকারীদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ বিশেষ বিপজ্জনক। লেপার্ডের ডাক টাইগার বা সিংহের মত গর্জ্জন নহে। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি করাত দিয়ে যখন চেরা হয় তখন করাতের ওঠা নামায় যে রকম শব্দ হয় তেমনি ওদের ডাক। গভীর রজনীতে নিস্তব্ধ বনপথে অথবা গৃহস্থের আঙিনায় ওদের ডাক শ্রোতার হৃদয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

লেপার্ড বাঘের মতই সাঁতার কাটতে পারে। গাছে চড়তে পারে। টাইগার আরো বেশী ভারী। দেহের ওজন ৪।৫ মণ। ছোট গাছে ডাল ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে। কিন্তু লেপার্ডের দেহের ওজন ২½ মণ কি তিন মণ। সুতরাং মাঝারী গাছগুলিতে সে অনায়াসে উঠতে পারে এবং লুকিয়ে থাকে।

কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক বন্ধু পুলিশ অফিসার গ্রামে লেপার্ডের ক্রম-বর্দ্ধমান উপদ্রবের খবর পেয়ে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন একটী পুকুরের চারপাশের জঙ্গলে। জঙ্গল তেমন কিছু নয়। অধিকাংশ ভাঁট ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড় আছে। আর আছে জারুল, মাদার আর বেত গাছের ঝোপ। স্থানটী পূর্ব্ববঙ্গ। পুকুরে জল ছিল। একদিকের পাড় উঁচু। অন্য দিক

সমতল। পুলিশ অফিসার সঙ্গে এনেছেন কয়েকজন কনেষ্টবল। আর মজা দেখতে এসেছে একদল গ্রাম্য চাষী। এরা জঙ্গল পিটিয়ে বাঘ বার করবে। লোক সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাদের দিয়ে গোটা পুকুর ও বাগানে বেষ্টনী তৈরী হতে পারে। হয়েছিলও তাই। কিন্তু যত সংখ্যক লোকই বেষ্টনী তৈরী করুক না কেন বাঘ ইচ্ছা-করলে বেষ্টনী অতিক্রম করে দু-চার-দশ জনকে ঘায়েল করে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোচ্, বল্লম, যুথি, টেটা, কুড়ুল, রামদাও ও শক্ত বাঁশের ডান্টা হাতে নিয়ে যারা বাঘ মারতে এসেছে দলবল পুষ্ট হয়ে তারা বাঘকে বন্দী করে মনে করেছে বাঘের পটল তুলতে হবে। হৈ হল্লা চলছে। ঢোল ঢাক বাজছে।

হঠাৎ একটা আর্ত্তচীৎকার হোল "বাঘ!" ইনস্পেকটর বাবু বন্দুকে তখনো গুলি পোরেন নি। তিনি পুকুরের উচু পাড়টাতে উঠে পকেটে কার্টিজ হাতড়াচ্ছেন। ওদিকে আর্ত্ত লোকটীর চীৎকারে সন্ধানী দল এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল "মার মার"; বাঘ ক্রুদ্ধ হয়ে লাফিয়ে পড়ল ঠিক বন্দুকধারী অফিসারটীর সামনে। ঘটনাটী ঘটে গেল একলহমায় বিজুলীর বেগে। পুলিশ অফিসার বন্দুকে গুলি পুরে নিশানা নিয়ে অথবা বন্দুকটা কাঁধে রেখে ফায়ার করারও সুযোগ নেই। তিনি ছিলেন অসাধারণ জোয়ান। বন্দুকের ব্যারেলটা তিনি সবলে ঢুকিয়ে দিলেন বাঘের দেহে। তখন চলল দুই পক্ষে ঠেলাঠেলি। বাঘ বন্দুকের বাধা না মেনে দুই থাবায় জড়িয়ে ধরল শিকারীকে। আবার চলল ঠেলাঠেলি। শিকারী বাঘকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলে বাঁচতেও বা পারে। গ্রামের যে সকল জোয়ান সমবেত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই তখন পালিয়ে গেছে। দূর থেকে চীৎকার করছে দু'চারটী লোক। হঠাৎ শিকারী লাফ দিয়ে পড়লেন পুকুরের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। শিকারী ডুব দিয়ে পার পেলেন। রাত্রে শিকারীর জ্বর হল। মুখ, বাহুমূল এবং অন্যান্য কয়েকটা ক্ষতস্থান ফুলে উঠল। কিন্তু তিনি অদম্য। পরদিন অসুস্থ দেহে জঙ্গল খুঁজে তিনি বাঘটাকে গুলি করে মারলেন।

বাংলার গ্রামে গ্রামে, ভারতে গ্রামাঞ্চলে এমন ঘটনার অভাব নাই। তাই কলে-কৌশলে ফাঁদ পেতে খাঁচা তৈরী করে এদের বন্দী করার চেষ্টা হয়। কখনো চেষ্টা সার্থক হয়। কখনো দু'চার দশটী গ্রামবাসী জর্জ্জরিত হয় বাঘের তীক্ষ্ন দাঁত ও নখাঘাতে।

গ্রামাঞ্চলের লেপার্ডের নানা শ্রেণী আছে। খুব ছোট বাঘও দেখতে পাওয়া যায়। ধূসর দেহে কালো চাকা দাগওয়ালা বাঘও আছে। গ্রামাঞ্চলে এদের বলে "ল্যাকড়া" কেঁদো গোবাঘা এমনি বিভিন্ন নামে। যে লেপার্ড বা প্যন্হার পাহাড়ে বাস করে। তাদের দেহ বেশী মজবুত। পাহাড়ে, বন্ধুর আরণ্য-ভূমিতে ছুটোছুটি করে এদের দেহ হয় আরো সাবলীল। ছোট হরিণ, বরাহ, খরখোস, বানর, হনুমান এরা ধরে খায় কিন্তু বৃহদাকার শৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণ, বার-শিঙ্গার এরা স্বভাবতঃ বড় আক্রমণ করে না।

সময় সময় ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে। এই বিষয়ে আমাদের এক শিকারী বন্ধুর অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর।

হাজারীবাগের এক অরণ্য-সমাকীর্ণ অঞ্চলে বাঘের গমনাগমনের একটী তেমাথা পথের উপরে তিনি একটী মাচা তৈরী করে বসেছিলেন। নিকটেই একটী কিল হয়েছিল। অর্থাৎ একটা বন্য বরাহ নিহত হয়েছিল বাঘের হাতে। ঐ কিলটীতে বাঘ আর একবার ফিরে আসবে এই আশা করে শিকারী একটী বড় গাছের ডালে মাচা তৈরী করে প্রতীক্ষা করছিলেন বাঘের। মাচা তৈরী হয়েছিল সকালে। শিকারী বসেছেন দ্বিপ্রহরে। বেলা ২টায়। মাচায় আরোহণ করেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে মাচার শয্যাটী ওলট পালট হয়ে আছে। কোনো পুলিশ যেন খানা তল্লাসীর পরে সমস্ত জিনিষ তচ্ নচ্ করে রেখে গেছে। কাঠবিড়ালী দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো কাঠুরে কি অনধিকার চর্চ্চা করেছে? ভালুক কি গাছে চড়েছিল?

সকল শিকারী সমান হিসাবী বা সমান অনুসন্ধিৎসু নহে। কোনো সূত্র না পেয়ে খাঁচার শিকারী স্বচ্ছন্দ উপবেশনের ব্যবস্থা করলেন। আসবে। বন্দুকের আওয়াজ হলেও আসবে। শিকারী ছোট থলেটী খুলে চকোলেট খাচ্ছেন আর দেখলেন কাঠবিড়ালীর খেলা। দুটো কাঠ-



ডালের উপর শুয়ে আছে একটা লেপার্ড—নীচে বাঘ

বিড়ালী ছুটোছুটি করছে নীচে। কখনো ছুটে যাচ্ছে কিলটার কাছে। একরাশ মাছি ভন্ ভন্ করে উড়ে যাচ্ছে। শুকনো লতাপাতা দিয়ে ঢাকা থাকলেও একটা দিক ছিল অনাবৃত হয়ত

একটী পাহাড়ী অনুচর আছে সঙ্গে। কত রাত্র জেগে থাকতে হবে বলা যায় না। দূরে লোকজন প্রতীক্ষা করছে নিরাপদ স্থানে। শিকার শেষে হুইসেল শুনলেই তারা আলো নিয়ে এগিয়ে

কুতুহলী কাঠবিড়ালীদেরই কীর্ত্তি। হঠাৎ একটা কাঠবিড়ালী ছুটে গাছে চড়েছে। আর্দ্ধেকটা উঠেই টিক্ টিক্ করে ডাক্‌ছে সাথীকে। সাথীও ছুটে এসে গাছে চড়ল। শিকারী দৃষ্টি ঘুরিয়ে এই কৌতুক দেখছে ও উপভোগ করছে। কাঠবিড়ালীকে অনুসরণ করে শিকারীর দৃষ্টি হঠাৎ এক জায়গায় আট্‌কে গেল। মাথার উপরে একটা জায়গায় গাছের তিন খানা ডাল মিলেছে। উপবেশনের স্থান হিসাবে চমৎকার। কিন্তু ঐ ডালের উপরে কে? মানুষ? ওর মৎলব কি? না মানুষ নয়। শিকারীর দৃষ্টি স্থির হয়েছে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে। ডালের উপরে শুয়ে আছে একটী লেপার্ড। মনে হচ্ছে দ্বিপ্রহরে সে আশ্রয় নিয়েছিল। শিকারীর আবির্ভাবে অবরোহণের চেষ্টা হয় নি। লেপার্ডকে দেখে মনে হচ্ছে সে নীচের দিকেই তাকিয়ে আছে। লেপার্ডটী নীচের কিল থেকে যে খানিকটা আত্মসাৎ করেছে তাতে সন্দেহ নাই। কিলের অধিকারী টাইগারের ভয়ে সশঙ্কে চৌদিকে তাকিয়ে সে খানিকটা খেয়েছে তারপরে পালিয়েছে?

অতি সন্তর্পণে শিকারীর দৃষ্টি নেমে এল নীচের দিকে। আবার বিস্ময়! বিস্ময় ও সঙ্কট হাত ধরাধরি করে এসেছে শিকারীর মুন্ডপাত করতে। নীচে কিলের পাশে বসেছে টাইগার! চতুর্দ্দিকে ভয়াল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করছে আততায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর বেয়াদবি। কিল যে অনধিকারীর দন্ত স্পৃষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কে সে অনধিকারী? তাকে পেলে বাঘ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

• শিকারীর মাথার উপরে বাঘ। সে হিংস্র এবং ধূর্ত্তের চূড়ামণি। অদ্ভুত বলশালীও সে। আর নীচে অরণ্যরাজ ক্রুদ্ধ নেত্রে খুঁজছে অবিমৃষ্যকারী জানোয়ারকে। শিকারীর সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। পাহাড়ীটা ঘুমুচ্ছে। তার নিদ্রিত থাকাই মঙ্গল। কিন্তু যদি তার নাক ডাকে তা হলেই বিপদ। শিকারী কম্পিত হৃদয়ে স্মরণ করছে ভয়হারী মধুসূদনকে। রাইফেল তুলতে চেষ্টা করা বিপজ্জনক। বাঘের সন্ধানী-দৃষ্টিতে ধরা পড়বে সে প্রয়াস। লেপার্ড কি আচরণ করবে জানেন পশুপতি!

বিশ মিনিট কাল! জীবনে এমন বিশ মিনিট আর আসে নি! বিশ ঘন্টার আতঙ্ক ভোগ করেছে শিকারী বিশ মিনিটে!

শিকারী বসে আছে পাষাণ মূর্ত্তির মত। বাঘটা কিল এখনো ছোঁয়নি। পূর্ব্বের স্থান বদল করে একপাশে বসেছে। হয়ত তার কাণে একটী গোপনচারী জানোয়ারের পদধ্বনি বেজেছে। হঠাৎ একটা জানোয়ার বুঝি জঙ্গল কেটে-কুটে পালাল। একটুখানি রুষ্ট গর্জ্জন বেরোল বাঘের মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল সেই দিকে। আর লেপার্ড? সেদিকে আর তাকানো যায় না। ওটা যদি লাফিয়ে পড়ে মাচার উপরে তাহলে আর রক্ষা নাই। সে ভক্ষ্য হবে বাঘও লেপার্ড দুজনেরই।

গাছটা একটু কাঁপছে। শিকারী রাইফেলটী ধরে আছেন দৃঢ় হস্তে। লেপার্ডটা বোধ হয় নামছে। ওটা নেমে কি মাচায় আসবে? না সে আসবে না। বাঘের অনুপস্থিতিতে সে টাইগারের দৃষ্টি থেকে পালাবে। সে নিজেও সঙ্কটাপন্ন। মুহূর্ত্তে তার চোখে পড়ল বাঘ যেদিকে ছুটেছে লেপার্ড তার অপর দিকে অবতরণ করে ঝোপের ভিতর মিলিয়ে গেল।

সেদিন শিকারীর আর শিকার হল না। পাহাড়ীটা ঘুম থেকে উঠেছে। হাঁকাহাঁকি করছে করছে দূরের সঙ্গীদের। একটা রাইফেলের আওয়াজ করলেন শিকারী। বাঘটাকে দূরে রাখতে। লোকজন এলে তিনি ফিরে গেলেন তাঁবুতে। সেখানে চা টোষ্ট আছে। আর বন-মুরগীর কাটলেট। মধুসূদন আজ জান রক্ষা করেছেন।

দীর্ঘ এবং কর্কশ ও ঘন রোমাবৃত ভালুক এক মূর্খ জানোয়ার। এরা সাধারণতঃ নিরামিষ-ভোজী। বনের কন্দ ও মূল এদের খাদ্য। কিন্তু পিপড়ের গর্ত্ত থেকে স্তূপীকৃত পিপড়ের ডিম, মৌচাকের পোনা সহ মধু এদের প্রিয় খাদ্য। কখনো কখন জীব হত্যা করেও এদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে দেখা যায়। দেহের আকারে ভালুকের

চোখ অতি ক্ষুদ্র। শ্রবণ শক্তি যৎসামান্য। কোনো ঘটনায় সন্দেহ উপস্থিত হলে শ্রবণ শক্তির অপ্রখরতা পূরণের জন্য ভালুক দুই পায়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে। অনেক সময়ে এই দন্ডবৎ নিরীক্ষণ ভালুকের পক্ষে মারাত্মক। ভালুকের কালো বা ধূসর রোমাবলীতে বুকের মধ্যস্থলে আছে ইংরেজী ভি (V) চিহ্নিত শাদা দাগ। শিকারীর পক্ষে ইহা উত্তম টার্গেট।

সন্ধ্যার প্রাককালে সে মহুয়া, ডুমুর, আক ক্ষেতের আক, পিপড়ের ডিম বা মধুচক্রের মধু খেয়ে নেমে আসে। আবার রজনীর শেষে সে আপন ঘরে ফিরে যায়। আপন ঘর কি? পাহাড়ের গুহা। পাথরের বড় বড় ফাটল বা দুই তিন পাথরের মধ্যবর্ত্তী শয়নোপযোগী স্থান।

বিরাট শক্তির আধার অপূর্ব্ব বলশালী এই ভালুক বা বনের মানুষদের 'ভালু' কাঠুরে



বাঘ শিকারের উপর পড়ে আছে

পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ভালুক দ্রুতবেগে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসে। ভালুকের পায়ে আছে ছোরার মত তীক্ষ্ন নখর। ঐ নখে পাহাড়, তৃণগুচ্ছ আকড়ে সে ছুটে যায়। তার ধাবনের পথে কোনো বাধা সে মানে না। গতি-পথে মানুষ এলে তার রক্ষা নাই। প্রতিদিন

কৃষকদের বিভীষিকা। বনের মানুষদের দেখেছি তারা বাঘের চেয়ে ভালুককে ভয় করে। বাঘের হাত থেকে বাঁচাও যেতে পারে। গাছে চড়ে প্রাণ রক্ষা হতে পারে কিন্তু ভালুকের পথ-রেখায় পা দিলে হয় ভালুকের আক্রমণে তার শোচনীয় মৃত্যু অথবা উৎপাটিত নাক চোক, কিম্ভূত

কিমাকার কবন্ধে পরিণত হওয়া। শক্তি পরীক্ষায় ভালুক বাঘের সঙ্গে সহসা হার মানে না। ভালুক বেপরোয়া অসমসাহসিক যোদ্ধা।

বাঘ লেপার্ডের মত নিশাচর জন্তু ভালুক। অরণ্য বিচরণে তার গতি অব্যাহত। কাউকে সে গ্রাহ্য করেনা। একটী বাঁশ লম্বালম্বি চিরে বেঁধে জুড়ে দিলে যেমন চেহারা হয় মুখখানা ওর তেমনি। ছুচোল। যেন একটা কামানের ব্যারেল।

ঐ ব্যারেলের মত চোঙ দিয়ে পাথুরে শক্ত জমি খুঁড়েও উইপোকা ও পিপড়ের গর্ত্ত থেকে তাদের রাশি রাশি ডিম নিশ্বাসের সাহায্যে মুখে পুরে খায়। এটাই এদের প্রোটিন খাদ্য। দু'চারটা রাইফেলের গুলিতে ওকে ঘাল করা যায় না, যদি না বুকে আর ঘাড়ে মোক্ষম রাইফেলের গুলি লাগে। দীর্ঘ কর্কশ রোমাবলীর জন্য ওর দেহে গুলি লাগেনা। লাগলেও ভীষণ গর্জ্জনে দুই হাত আরকোলা করার ভঙ্গীতে দুই পায়ে ছুটে আসে। পাহাড় অরণ্য ওর গর্জ্জনে কেঁপে ওঠে। শিকারী দিশাহারা হয়।

ভালুক গাছে চড়ে অনায়াসে। মহুয়া, ডুমুর প্রভৃতি বন্য বৃক্ষে গাছের সবর্বত্র দেখা যায় নখরাঘাত। বৃক্ষদেহ ক্ষত বিক্ষত। মগডাল-গুলিতে ক্ষত চিহ্ন। মনে হয় ভালুক শিশুরা তাদের জননীর সঙ্গে বৃক্ষারোহণ করে। হালকা দেহ নিয়ে মগডালের ডুমুরে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ভালুক আমাদের রামানুচর জাম্বুবান।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় ভালুক আছে। হিমালয়ে ব্রাউন ভালুক আছে। জাপানেও ব্রাউন ভালুক আছে। একটা চিড়িয়াখানায় সংপ্রতি জাপান থেকে এসেছে। মেরুদেশে শ্বেত ভালুক আছে। ছোট বড় কত জাতীয় ভালুক আছে।

হায়না এক অদ্ভুত জানোয়ার। লেপার্ডের চেয়ে ছোট অথচ প্রায় লেপার্ডের সমানই শক্তি-শালী, দৃঢ় এবং বিকট দন্তধারী হায়না। লেপার্ডের চেয়ে ছোট। কুকুরের চেয়ে বড়। কতকটা এলসেয়িন কুকুরের মত। এরা বাঘ ভালুকের জঙ্গলেই বাস করে। বাঘে মারা হরিণ শুয়োরের মাংস বা পচা মাংস চুরি করে খায়। অপরাধীর সাজা দেওয়া বড় শক্ত। জঙ্গলে আচ্ছাদন আছে এদের ক্ষিপ্রগতি পদ চতুষ্টয় আছে। এদের দুপাঁটী দাঁতে যে জোর আছে তাতে বড় জানোয়ার ধরে এরা চিবিয়ে হাড় গুড়িয়ে খেতে পারে। কিন্তু বড় জানোয়ার এরা ধরেনা। ছোট জানোয়ারেই এরা তৃপ্ত। হরিণ-শিশু, খরঘোস, ছাগল, ভেড়া ধরে খায়। দ্রুত কাজ শেষ করবার জন্য দুটী হায়না একসঙ্গেও চলে। গ্রামাঞ্চলেও এদের কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদের দেওয়া নাম হেরোল। তাদের বিশ্বাস দুটো হেরোল একটা বড় ভেড়াকে ধরে টেনে দু'টুকরো করে দু'জনে দু'খন্ড নিয়ে পালায়। মানুষকে এরা আক্রমণ করেনা। তবে শিশুদের মুখে করে নিয়ে ভোজনের অনেক ঘটনা আছে। লক্ষ্ণৌতে হায়নার উপদ্রবে গ্রামাঞ্চলে ত্রাসের অবধি ছিল না। কলিকাতার উত্তর সীমান্তের কলোনীতেও হায়নার উপদ্রব দেখা গিয়াছিল। খাদ্যের অভাবে এরা যে গৃহস্থের আঙ্গিনা অতিক্রম করবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

হাতী ও গন্ডার চিড়িয়াখানাতেই দেখা যায়। জলপাইগুড়ি আসাম প্রভৃতি যে-সকল অঞ্চলে অথবা নেপালে যেখানে এরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। সে-জঙ্গলে সকলে প্রবেশ করতে পারে না। হাতী গন্ডার 'রোগ' হয়ে না গেলে ওদের শিকারও নিষিদ্ধ। অরণ্যের এই দুই অতিকায় জানোয়ার মানুষের লোভ ও ব্যসনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিন্তু এখনো আছে। ইহাদের সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকার প্রভূত অর্থব্যয় করছেন। শুধু হাতী ও গন্ডার কেন? প্রত্যেকটী জানোয়ার আমাদের অরণ্যের সম্পদ ও সৌন্দর্য্য। এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানে সহায়ক।

হাতী ও গন্ডার নিরামিষভোজী। এরা জানোয়ার মেরে খায় না। বনের গাছ পালা পাতা এদের খাদ্য। পোষা হাতী দিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে খেদা করে হাতী ধরা হয়। পোষ মানানো হয় বহুশ্রমে। তখন মানুষের বহু কাজে হাতীর ব্যবহার হয়। বড় বড় বন যখন কাটা হয়, কাটা গাছটাকে বনের ভিতর থেকে বের করে আনতে হাতী ছাড়া কাজ চলেনা।

এদের বুদ্ধি আছে অসাধারণ, শক্তিও

অসাধারণ। গাছটাকে ঘন দ্রুমরাজীর মধ্য থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এরা যে কৌশলে এবং অমিত শক্তিতে বার করে আনে আমাদের কাছে তাহা



বিনা সংকেতে মুহূর্ত্তে হাতী তার শুঁড়দিয়ে বন্দুকটা আমার.........হাতে পোঁছে দিল

প্রকান্ড বিস্ময়। ক্ষুদ্র দুটী চোখে ওরা অনেক কিছুই দেখে আবার হয়ত অনেক কিছুই দেখে না। বন থেকে ধরে এদের প্রথম যখন আনা হয় তখন শিক্ষা গ্রহণে এরা সহজে অনিচ্ছুক। গর্জ্জন করে বিরক্ত প্রকাশ করে। শেষে বশ্যতা স্বীকার করলে মানুষের অতি হিতকারী জানোয়ারদের অন্যতম হয়ে ওঠে। রাজকীয় মিছিলে সালংকার হস্তীযূথ অপূর্ব্ব শোভা। অরণ্য শিকারে হস্তীর প্রয়োজন এবং দক্ষতা

অপরিসীম। মনে আছে দুর্গম বনরাজিতে আচ্ছন্নঃ হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বত শৃংগে যেখানে মানুষ আরোহণ করতে পারেনা সেখানে হাতী মাথার উপরের ডাল ভেংগে মোটা মোটা অতিকায় লতাগুল্ম ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে খাড়া এবং ঢালু পর্ব্বত গাত্রে আরোহণ করছে আমাদের পিঠে-নিয়ে। আবার পা দিয়ে পর্ব্বতের ঢালু দেহের পাথরের ভার সহনশীলতা পরীক্ষা করে সন্তর্পণে উপর থেকে নীচের সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। একবার আমার হাতের বন্দুকটি হঠাৎ হস্ত-স্খলিত হয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিল। বিনা সংকেতে মুহূর্ত্তে হাতী তার শুঁড় দিয়ে বন্দুকটা ধরে আমার হাতে পেঁাছে দিল। ওদের ভাষা স্বতন্ত্র কিন্তু মাহুতের শিক্ষায় ওরা আমাদের কোনো কোনো শব্দার্থ আয়ত্ত করে নেয়। অনেক কর্ত্তব্য ওরা অভ্যাসে বুঝতে পারে। মানুষের এত হিতকারী মহাবলশালী ঐরাবতও মানুষের লোভ ও হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। ইহার ফলে হাতী ও গন্ডার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গন্ডার আমাদের সংসারের কোনো কাজে ব্যবহার হয়না বটে কিন্তু অরণ্যের সম্পদ সে এবং আমাদের বিস্ময় ও রহস্যের উপাদান। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপাদান।

হরিণ সকলেই চেনে। চিড়িয়াখানায় হরিণের সংখ্যাই সমধিক। এই তৃণভোজী সুদর্শন জানোয়ারটী সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করে। শিশু ও বালক বালিকারা একে পাতা খাইয়ে আনন্দ লাভ করে। এরা তৃণভোজী নিরীহ জানোয়ার। এদের বাঘে খায়, লেপার্ডে খায় মানুষও ওদের মেরে খায়। এদের নালিশ জানাবার অভিভাবক নেই। আদালত কাছারিও নেই। এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। বিস্ময়ভরা বিশাল চোখে রেখে অরণ্য শোভা, দেখে কৃষক ও কাঠুরেকে। অথবা কি যে দেখে কে তার খবর জানে। প্রকৃতির অবোধ শিশু। এদের গতি ও চাঞ্চল্যে স্ফুরিত হচ্ছে এদের অফুরন্ত প্রাণবন্যা। বিস্ময় ও কৌতূহল এদের সর্ব্বাংগে। একটু হাত বুলুলে একটু আদর করলে এর আনন্দের অবধি থাকে না। বন এদের বাসভূমি। অরণ্যের ছায়া এদের আশ্রয়। শিশু হরিণ মার সংগে নেচে নেচে বন ভ্রমণ করে। মার দুধ খায়। ক্রমে বনের লতা পাতা ভোজন করে। তারপর একদিন দুরন্ত রাক্ষস, বনের বাঘ এসে একে গ্রাস করে। হয়ত একে অথবা তার জননীকে। কোনো নালিশ নেই। প্রতিকার নেই। বাঘের কাছে অথবা শিকারীর গুলিতে জীবন বিসর্জ্জন। এই তার পরিণতি।

কত রকম হরিণ আছে। কত বিচিত্র তাদের শিং। বিভিন্ন তাদের রং। ব্রাউন দেহের উপরে সাদা সাদা গোল দাগ। চিত্র হরিণ বা স্পটেড ডিয়ার। এদের সৌন্দর্য্য অপরূপ। ব্রাউন ডিয়ার (কাটরা) নামক হরিণ, নীল গাই, বার শিংগা, চিকারা, কৃষ্ণসার, জলাভূমির হরিণ, মূষিক হরিণ, সবরকম হরিণের বর্ণনা করা এখানে অসম্ভব। কিন্তু এই হরিণ এবং বিহংগ-সমাজ যা আমাদের সর্ব্বদা নজরে আসছে, অহোরহ আনন্দ দিচ্ছে মন ভোলানো দুঃখ ভোলানো সংগীতে সে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও সম্পদ। এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সৌন্দর্য্যের খাতিরে, বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য। আমাদের জ্ঞানভান্ডারে নব নব তথ্য সঞ্চয়ের জন্য। সৃষ্টির সুষম মাধুর্য্যের জন্য এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

এ সবই ত' হল আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের কথা। সে প্রয়োজন ত অসংখ্য। কতজন লোক খবর রাখে যে পাখীকুল যদি না থাকত আমাদের গাছগুলি শুকিয়ে যেত। ক্ষেতের ফসল উজার হয়ে যেত। মানব সমাজ লুপ্ত হয়ে যেত ধরা পৃষ্ঠ থেকে। কীট-পতংগই পাখীর প্রধান খাদ্য। কীট দষ্ট হয়ে গাছ মরে যায়। পাখী খুটে খুটে এই পোকা খায়। ফসলের ক্ষেতে নষ্ট করে কীট পতংগে। পাখীরা এসে ঐ কীট পতংগ খেয়ে ফেলে। তাইত আবার ক্ষেতে ফলে ধান—ফলে গম। আরো কত রকম সবজী।

কে বাঁচাবে এই জানোয়ার কুলকে? কে বাঁচাবে এই পক্ষী সমাজ কে? আমরা না আর কেউ? আমাদের ভাবনা আজ পংগু। আমরা

প্রত্যেক ব্যাপার রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। আমাদের রাষ্ট্র যে আমাদেরই সমষ্টি। আমাদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্র হয় না। স্বাধীন ভারত এই জন্তু জানোয়ার আর বিহঙ্গ সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে কত আইন প্রণয়ন করেছেন। বোর্ড গঠন করেছেন। অধিক সংখ্যক বনভূমি সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করেছেন। পাহারা রেখেছেন জানোয়ার ও পাখীর উৎসাদন নিবারণ করতে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে এই বোর্ডের কাজ সার্থক করবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

কত জানোয়ার লুপ্ত হয়ে গেছে ধরা পৃষ্ঠ থেকে। কত পাখী দুর্ঘট হয়েছে। এদের নূতন করে সৃষ্টি করার ক্ষমতা মানুষের নাই। যারা আজও আছে তাদের হত্যা নিয়ন্ত্রিত করে তাদের বংশ ধারাকে রক্ষা করা এই বোর্ডের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সংরক্ষণ শুধু কি বোর্ডের কর্ত্তব্য? শিক্ষা ও সংস্কৃতি অভিমানী মানুষের কি কোনও কর্ত্তব্য নাই? তাঁরা যদি উদাসীন থাকেন আইন নিস্ফল। বোর্ড অক্ষম। বন সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য গত দশ বছরে বন মহোৎসব পালিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বছরে বছরে ইহা সম্পন্ন করতেন। যাঁরা চিন্তাশীল এবং দরদী তাঁদের প্রয়াসের অন্ত নেই। অপরের কাছে ইহা অনাবশ্যক এবং উপহাসের সামগ্রী! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

আমাদের দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে জীব-জন্তুর সমাদরের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, পৃথিবীর অষ্ট কোন্ 'অষ্ট হস্তী, সিংহবাহিনী শ্রীদুর্গার সিংহ, বিষ্ণুর অবতার। রামায়ণে হনুমান জাম্বুবান রামচন্দ্রের মিত্র। নকুল যুধিষ্ঠিরের শাস্ত্র শিক্ষক। শুক-শারী কৃষ্ণ কথা বলি। তাদের খবর রাখে। শৃগাল মহাদেবের অনুচর। বরাহ কৃষ্ণের অবতার। হরিণের সঙ্গে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রম্মার নাম জড়িত। প্রাচীন গ্রন্থে জানোয়ারদের এই মর্য্যাদা দান বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ। প্রকৃতি দেবী স্বাভাবিক ভাবে এদের নিয়ন্ত্রিত করছেন সৃষ্টির হিতের জন্য। নিঃশেষের জন্য নহে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হলেই আসে বিপর্য্যয়। সংহার কর উপদ্রবকারিকে। নিশ্চিহ্ন করোনা তাদের যারা সৃষ্টি রক্ষণে নিযুক্ত বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট হয়ে। নিশ্চিহ্ন করোনা মধুশ্রাবী কন্ঠ বিহঙ্গ সমাজকে। শকুনের ও কাজ আছে। মহৎ কর্ত্তব্য মড়ার ভাগার সাফ করে তারা মনুষ্য সমাজকে বাসোপযোগী করে। এরাও প্রকৃতি নিযুক্ত ধাঙগর। এদের নিঃশেষ করলে জনসমাজ পরিণত হবে ভাগাড়ে। আমাদের স্বাধীন ভারতের বন ও পশুপক্ষী সংরক্ষণ বিভাগ এই আবেদন জানিয়েছে ভারতের সুধী সমাজের কাছে। ইহাই ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি। দুই সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে প্রস্তর স্তম্ভে, পাহাড়ের গাত্রে এই উপদেশ ও অনুশাসন ক্ষোদিত ছিল। তখন অভক্ষ্য জানোয়ার ছিল অবধ্য। আরো অবধ্য ছিল বাদুড়, গন্ডার, শজারু, কাঠবিড়ালী, বারশিঙ্গা হরিণ, ব্রাহ্মিনী ষাঁড়। আরো কত চতুষ্পদ জন্তু। কতজন জানেন মৌমাছি, প্রজাপতি না থাকলে গাছে ফল ফলত না?

প্রকৃতি দেবীকে আমরা জানি না। আমরা দেখি তাঁর বিধান। তাঁর কারুশিল্প। তাঁর চিত্রাঙ্কন। আমাদের চতুর্দ্দিকে তরুলতায় স্নিগ্ধ পল্লব। চোখ জুড়ানো শ্যাম শোভা। পল্লব দলকে অলঙ্কৃত করেছে পুষ্পরাশি। কি অপূর্ব্ব তাঁর সুগন্ধ। ফুলের অন্তরে আছে মধু। বাতাস বয়ে নিয়ে যায় বনগন্ধ। পুষ্পের সুরভি। কত বিহঙ্গ গান করে গাছের ডালে ডালে। মনে প্রশ্ন জাগে কেন্? কেন এই আয়োজন? কেন এত শোভা এত গন্ধ? কেন বায়ু? কেন পিপাসার বারি আছে ধরা বক্ষে! কেন চন্দ্র সূর্য্য? কেন মেঘ? কেন বৃষ্টি? আমরা এই সকল দেখে কারণ বুঝতে পারি। আর কিছু না হোক বুঝ্তে পারি এই সৃষ্টিতে আছে স্নেহ, আছে প্রেম। আছে আত্মায় আত্মায় নিগূঢ় বন্ধন। এই সৃষ্টি ধ্বংসের জন্য নহে। এ-সৃষ্টি আমাদের অনুভাবনীয়, অনুধাবনীয়, সংরক্ষণীয়। বিনাশের মধ্যে আছে সৃষ্টি। পুরাতনের মধ্যে নূতন। এতে বিনাশও আছে। কিন্তু তা পূরণের ব্যবস্থাও আছে। ইহাই জগতের রীতি।



আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।



বাংলার অগ্রগতি

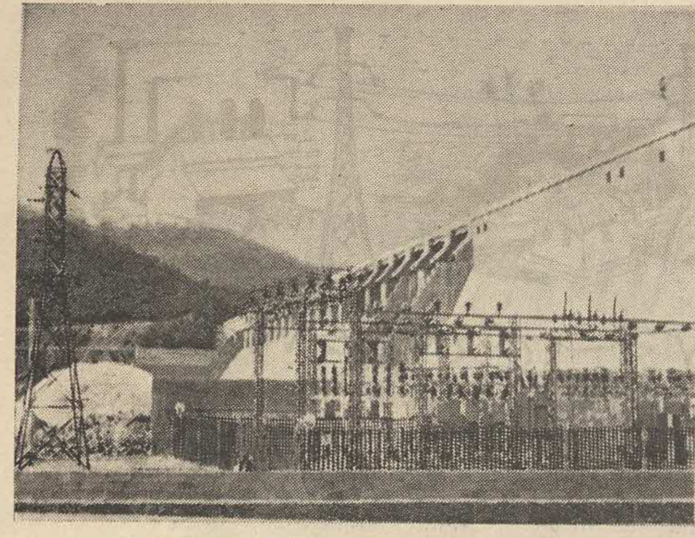
'স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অগ্রগতি' এই বিষয়ে কিছু লিখতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু লিখতে হচ্ছে 'স্বাধীনতার পর পশ্চিম বঙ্গের অগ্রগতি' সম্পর্কে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ভারতের খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে। পশ্চিমে পাঞ্জাবের খানিকটা অংশ যেমন পাকিস্তানে চ'লে গিয়েছে, পূর্বে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশও তেমনি আমরা হারিয়েছি। নিজেরা আজ বাঙালী ব'লে পরিচয় দিতে পারলেও, বলতে হচ্ছে পশ্চিমবাংলা বা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী আমরা।

এখন কথা হ'লো, দেশ স্বাধীন হবার আগে আমাদের যে অবস্থা ছিল, এখনও কি আমরা সেই অবস্থার মধ্যেই প'ড়ে আছি? না, এগিয়ে গেছি অনেক দূর? অনেক দূর এগিয়ে না গেলেও, খানিক দূর যে এগিয়ে গেছি তাতে কোনো ভুল নেই।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তন হ'লো ৩৩,৯৪৯ বর্গমাইল; আর লোকসংখ্যা দু' কোটি তেষট্টি লক্ষের ওপর। বিহারের মানভূম ও পূর্ণিয়া জেলার যে-অংশ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এসেছে, তার ফলে আয়তন ও লোকসংখ্যাও কিছুটা বেড়েছে আগেকার চেয়ে। নইলে, স্বাধীনতালাভের সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন যেমন ছিল ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ছিল, দু' কোটি আটচল্লিশ লক্ষের কিছু বেশি, আজও প্রায় তেমনি থাকতো। পশ্চিমবঙ্গে এখন শহর রয়েছে ১১৫টি। আর, গ্রাম? সে তো অনেক। তা, কম করেও ৩৮,৭০১টি গ্রাম হবে। এ-বিষয়ে কোনো ভুল নেই যে, আয়তনের তুলনায় আমাদের লোকসংখ্যা খুবই বেশি। এক কলিকাতা শহরেই লোক আছে পঁচিশ লক্ষের ওপর।

দেশ স্বাধীন হবার পরেই দেশের জাতীয়-সরকার ঠিক করলেন, দেশের সবরকম উন্নতির জন্যে উঠে প'ড়ে লাগতে হবে। কারণ, দেশ যদি না সব দিক থেকে বড় হয়, তাহ'লে জাতিও কোনদিন বড় হ'তে পারবে না। ইংরেজ-রাজত্বে আমাদের তো দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না, এখনও যদি আমরা সেই অবস্থার মধ্যে দিন কাটাই, তাহ'লে স্বাধীনতা পেয়ে লাভ হ'লো কি? অভাবের কি অন্ত আছে আমাদের? দরিদ্র দেশের অধিবাসী আমরা। ফসলের অভাব, কাপড়-চোপড়ের অভাব। তার ওপরে দেশের অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানে না, গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার অভাবে কত লোকই না রোগে ভোগে বা মারা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তাঘাট নেই, যা-ও বা আছে তাও খুব ভালো নয়। আর, সবার ওপরে রয়েছে বেকার-সমস্যা। অর্থাৎ, রোজগার নেই অসংখ্য মানুষের।

এই সব কথা চিন্তা ক'রেই ভারত-সরকার একটি পরিকল্পনা-কমিশন বসালেন, দেশের কয়েকজন অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিয়ে। দেশের উন্নতির জন্য এই পরিকল্পনা-কমিশন প্রতি পাঁচবছরের মেয়াদে যে কর্মসূচি ঠিক ক'রে দিলেন, সেই অনুসারে এখন সারা ভারত জুড়ে



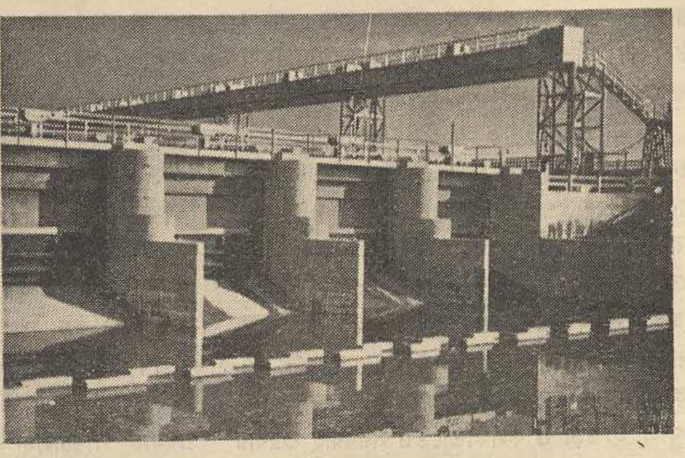
ময়ূরাক্ষী জলাধার বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

গঠনমূলক নানারকম কাজ চলেছে। প্রথম পাঁচ-বছরের জন্য যে পরিকল্পনা ঠিক হয়, অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তার মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেছে ১৯৫৫-৫৬ সালে। তারপর থেকে কাজ চলছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে। এর মেয়াদ শেষ হবে ১৯৬০-৬১ সালে। অর্থাৎ, ১৯৬১ সালের ৩১-এ মার্চ।

এবারে দেখা যাক্, পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ-বছরে পশ্চিমবঙ্গে কী কী কাজ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পাঁচবছরেই বা কী ধরণের কাজ হচ্ছে বা হবে। প্রথমেই আসে কৃষির কথা। কারণ, খাদ্যশস্যের অভাব আমাদের বহুদিন থেকেই চ'লে আসছে। স্বাধীনতালাভের পরেও বহু-দিন পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমাদের চাল, গম, এ-সব আমদানি করতে হয়েছে। চাষ-বাসের উন্নতির জন্য তাই প্রথমেই নজর দেওয়া হয় ভালো সার তৈরি ক'রে জমিতে ব্যবহারের জন্য তা কৃষকদের মধ্যে বিলি করা, সেই সঙ্গে উন্নত জাতের শস্যবীজ বিতরণ, জমিতে জলসেচ, আর আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাসের ব্যবস্থা করা। এতে ক'রে ফল পাওয়া গেছে খুবই। কারণ, পরিকল্পনার প্রথম পাঁচবছরে পশ্চিমবঙ্গে বাড়তি খাদ্যশস্য ফলেছে ২৫ লক্ষ টন। এই সময়ে বর্ধমান, মালদহ, কল্যাণী ও ফুলিয়ায় চারটি নতুন শস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়েছে; আর তা থেকে আট হাজার টনের বেশি উন্নত জাতের শস্য-বীজ উৎপাদন ক'রে তা বিলি করা হয়েছে দেশের কৃষকদের মধ্যে। তাছাড়া, চাষের জমিতে ভালো সারও ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ লক্ষ আঠাশ হাজার টন। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেমন ক'রে চাষ-আবাদ করা যায়, সেই পদ্ধতি দেখাবার জন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষি-প্রদর্শনীকেন্দ্রও খোলা হয় ২,৪০১টি। এতে ক'রে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা আজ অনেক বেশি ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে। দেশে পতিত ও অনাবাদী জমির আয়তনও বড় কম নয়। প্রায় ৯২ হাজার বিঘা



পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করছে



তিলপাড়ার বারাক

পতিত জমি উদ্ধার ক'রে তাতেও চাষের ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন, ২৪-পরগণা জেলার সোনারপুর-আড়পাঁচ পরিকল্পনা। এক সময় সোনারপুর-আড়পাঁচের যে বিস্তীর্ণ এলাকা বছরের প্রায় বারমাসই জলের তলায় ডুবে থাকতো, এখন আর সেখানকার সব জায়গায় জল দাঁড়ায় না, সেখানে ফসলও ফলে আশাতীত ভাবে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও হয়েছে বহু রকম। ছোটখাটো প্রায় তিন হাজার সেচ-পরিকল্পনা ছাড়া, বড় বড় দুটি সেচ-পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

এই বৃহৎ দুটি সেচ-পরিকল্পনা হ'লো—'দামোদর নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা,' আর 'ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনা'। দামোদর-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভারত-সরকার, আর ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা কার্যকরী ক'রে তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার। দুরন্ত দামোদর-নদের বন্যার কথা কারও কাছে অজানা নয়। এক সময় ছিল, যখন প্রায় প্রত্যেক বছরেই দামোদরের বন্যায় বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা একেবারে ভেসে যেত, অসংখ্য লোক হ'তো গৃহহীন, আর শস্যের যে কী পরিমাণ ক্ষতি হ'তো তা কল্পনাও করা যায় না। এখন আর কিন্তু সে অবস্থা নেই। দামোদরের ও তার শাখা নদীগুলির বিভিন্ন জায়গায়,—যেমন, তিলাইয়া, বোকারো, পাঞ্চেট্, মাইথন ও দুর্গাপুরে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, জলাধার সৃষ্টি হয়েছে, খাল কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে চাষের জমিতে, আবার বাড়তি জলও বের ক'রে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। এতে ক'রে বিহারের যেমন উপকার হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গও তেমনি উপকৃত হচ্ছে নানা ভাবে। ময়ূরাক্ষী জলাধার-পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ায় উপকার হয়েছে আরও অনেক। মশান্-জোড়ে 'কানাডা বাঁধ' নামে ২,০৬৭ ফুট লম্বা একটি বাঁধ তৈরি ক'রে বিরাট এক জলাধার যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি বীরভূমের সিউড়ি শহরের কাছে তিলপাড়ায় তৈরি করা হয়েছে একটি জলপ্রবাহ



শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হাতে কলমে কাজ শিখছে বাঙালী ছেলেরা

নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র। এতে ক'রে বছরে প্রায় আঠার লক্ষ বিঘা খারিপ ও তিন লক্ষ ষাট হাজার বিঘা রবিশস্যের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই ধরণের বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা শুধু যে সেচ-ব্যবস্থারই সুবিধা ক'রে দেয় তা নয়, এতে ক'রে জলবিদ্যুৎশক্তিও উৎপাদিত হয়। দামোদর-পরিকল্পনায় যেমন দুর্গাপুরের পাওয়ার-স্টেশন থেকে বর্ধমান ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় আজকাল বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে, শহরে ও গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। শুধু বর্ধমান ও বাঁকুড়াই নয়, দামোদর-পরিকল্পনার বিদ্যুৎশক্তি হুগলি, হাওড়া ও কলকাতাতেও সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। যে-সব জায়গা দিয়ে এই বিদ্যুৎ-শক্তি প্রবাহিত হবে, সে-সব জায়গার নানা রকম শিল্প-সংস্থাও যে এতে ক'রে উপকৃত হবে তা বলাই বাহুল্য। ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনায় মশান্‌ জোড়েও একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আর তা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে বিহারের দুম্‌কা অঞ্চলে, আর বীরভূম জেলার নানা জায়গায়।

কৃষির পরেই শিল্প। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত কুটিরশিল্প ও ছোটখাটো শিল্পের ওপরেই জোর দেওয়া হয়। মূলধন দিয়ে যেমন বিভিন্ন শিল্প-সংস্থাকে সাহায্য করা হয়, তেমনি শিল্প-বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থাও করেন রাজ্যসরকার। তাছাড়া, কুটিরশিল্পজাত জিনিসপত্রের বিক্রির ব্যবস্থাও হয় ব্যাপকভাবে। এই দিক থেকে প্রথম পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মাদুর-শিল্প, খাদি-শিল্প, গুড়-শিল্প, হাতে তৈরি কাগজ-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। অনেকগুলি নতুন শিল্পকেন্দ্রও খোলা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। আর, বড় বড় শিল্পসংস্থার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে দুর্গাপুরের লোহা ও ইস্পাতের কারখানা এবং বিরাট এক কোক্‌চুল্লি। প্রথমটি পরিচালনা করছেন ভারত-সরকার এবং দ্বিতীয়টি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার। দুর্গাপুরের লোহা ও ইস্পাত কারখানার প্রাথমিক বহু কাজই শেষ হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হবে। এই কারখানা স্থাপিত হওয়ায় দেশের ইস্পাত উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বাড়বে আমাদের জাতীয়-সম্পদ। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপুর কোকচুল্লির কাজ এখন চল্‌ছে পুরোদমে। এখানে শুধু কোক্‌ ও গ্যাসই উৎপাদিত হবেনা, বাড়তি আরও অনেকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হবে।

তারপর, শিক্ষা। শিক্ষার দিক থেকে আমরা যে এতকাল খুব পেছনে প'ড়ে ছিলাম সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখনও শতকরা মাত্র ২৪ জন লোক লিখতে পড়তে জানে এই রাজ্যে। এই অবস্থার যাতে দ্রুত উন্নতি হয়, সেজন্য আজ চেষ্টার অন্ত নেই। তাই আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। বহু নতুন স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছে এই রাজ্যে, বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষারও উন্নত-



কামারহাটি নারী শিল্পাগার

তর ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমশ বহুমুখী-বিদ্যালয়ে পরিণত করা হচ্ছে। এতে ক'রে ছেলেমেয়েরা অষ্টম শ্রেণীর পড়া শেষ ক'রেই নিজেদের সহজাত আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুসারে যে কোনো বিষয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। বয়স্করাও যাতে লেখাপড়া শিখতে পারেন সেজন্য পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে পাঁচশ'টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় দেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং সেই সব কেন্দ্রের প্রায় একচল্লিশ হাজার বয়স্ক নরনারী এখন ভালো ক'রেই লিখতে পড়তে জানেন। ২৪-পরগণা জেলার বাণীপুরে যে জনতা-কলেজটি খোলা হয়েছে, গ্রাম্য নেতাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে তা উল্লেখযোগ্য। বাণীপুরের সাহিত্য-শিক্ষণকেন্দ্র এদেশে অভিনব। জনতা-কলেজ আরও একটি খোলা হয়েছে। সেটি রয়েছে দার্জিলিঙের কালিম্পঙ্ শহরে। ১৯৪৯ সালে রাজ্য-সরকার ঠিক করেন যে, ছয় থেকে এগার বছরের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বিনা খরচায় নিম্ন বুনিয়াদী মানের শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৫ সালের মধ্যে ৬৪০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে দেশের বহু জায়গায় ছেলেমেয়েদের বিনা খরচায় লেখাপড়া করবার সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ ও সহযোগিতারও অন্ত নেই। শিবপুর ও যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দু'টিও সম্প্রসারিত হয়েছে। আর তার ফলে কারিগরী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধাও এখন পাওয়া যাচ্ছে আগেকার চেয়ে অনেক বেশি। এতকাল এদেশের উচ্চবিদ্যালয়গুলির শিক্ষাকাল ছিল দশ বছর; অর্থাৎ দশম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ ক'রে ছেলেমেয়েরা ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিত। এখন সেই শিক্ষাকাল আরও এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সেই একাদশ-শ্রেণীতে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের কোনো কোনো পাঠ্যবিষয় পড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর কলেজে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দু'বছরের জায়গায় তিন বছর ধ'রে ডিগ্রী কোর্সের পড়াশোনা করবে। আই-এ, বা আই-এস্-সি, বা আই-কম পরীক্ষা আর থাকবে না। এ-দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একেবারে নতুন পদ্ধতি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যান্য অভাব ও অসুবিধাগুলিও যাতে দূর হয় তার জন্যে আরও অনেক প্রস্তাব আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর, গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের দিকেও আমরা যে খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছি তাতে ভুল নেই। ১৯৪৮ সালে যেখানে এ-রাজ্যে প্রতি হাজারে কম ক'রে আঠার জন লোক নানা রোগে ভুগে মারা যেত, ১৯৫৬ সালে সেখানে মৃত্যুহার



হরিণঘাটায় উৎপাদিত দুধ বোতল ভর্ত্তি করা হচ্ছে

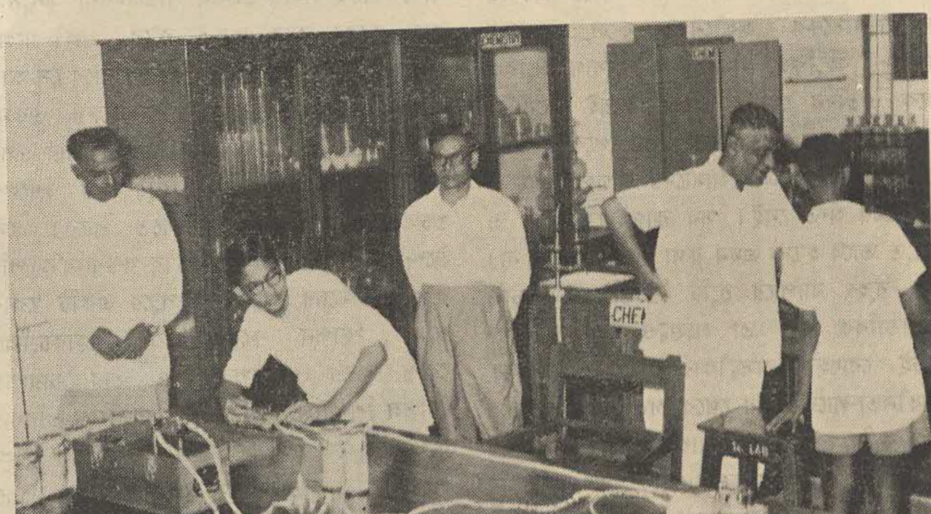
ক'মে দাঁড়ায় হাজারে মাত্র আট জন। দেশ স্বাধীন হবার সময়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে যেখানে রোগীশয্যা ছিল তের হাজারের কিছু বেশি, এখন সেখানে রোগীশয্যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ঊনিশ হাজার। ১৯৪৮ সালে যেখানে মাত্র তিনটি গ্রাম্য-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল, আজ সেখানে গ্রাম্য-স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে প্রায় তিন শ'। ফলে, আগেকার মতো গাঁয়ে-ঘরে আর মহামারীর প্রকোপ দেখা যায় না; অন্তত, মহামারীর আকারে কোনো রোগ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বার আগেই তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া, ম্যালেরিয়া-রোগ তো এখন দেশ থেকে প্রায় লোপই পেয়েছে বলতে হবে। ১৯৪৬-৪৭ সালে যেখানে রাজ্য-সরকার থেকে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মাথাপিছু খরচ করা হ'তো মাত্র পনের আনার কিছু বেশি, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেখানে খরচ করা হয়েছে তিন টাকা দশ পয়সার মতো। তাছাড়া, আগেকার তুলনায় দেশে এখন ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, চিকিৎসা বিষয় নিয়ে নিত্য নতুন গবেষণাও চলেছে। গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলতেও স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন বোধকরি দেশের সমাজসেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রেড্‌ক্রশ।

এ-কথা খুবই সত্যি যে, গ্রামের উন্নতি ছাড়া কোনো দেশের সত্যিকারে উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ, দেশের বেশির ভাগ লোকই বাস করে গ্রামে। আমাদের দেশ সম্পর্কেও সেই একই কথা। গাঁয়েঘরে এতকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যাতায়াতের বড় অসুবিধা ছিল। এখনও অনেক গ্রামে ভালো রাস্তাঘাট নেই, যানবাহনেরও অভাব। সুখের কথা এই, রাজ্য-সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে এ-বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তার ফলে, প্রায় দু'হাজার মাইল নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে গ্রাম ও শহরতলীতে। তাছাড়া, বহু পুরোনো রাস্তা মেরামত করাও হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সড়ক তৈরি হয়েছে কলিকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। একে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জাতীয়-রাজপথ। এই পথে যে-সব জায়গায় নদী-নালা, পার হতে হবে, সে-সব জায়গায় হয় সাঁকো আছে, নয়তো যানবাহন সমেত পারাপারের জন্য রয়েছে খেয়ার ব্যবস্থা। কলিকাতা ও কোচবিহার শহরের পরিবহন ব্যবস্থা এখন তো সরকারের হাতে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে বড় বড় সড়ক বা ভালো রাস্তা রয়েছে সেখানে এখন বে-সরকারী বাস চলাচল করে আগেকার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু, সব জায়গাতে যে বাসের অভাব মিটেছে এমন কথা বলা যায় না। আশা করা যায়, এ-বিষয়ে যে-সব অভাব ও অসুবিধা আছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা সময়ে, তা আরও অনেক দূর হবে।

দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন করাই হ'লো যে-কোনো জাতীয়-সরকারের প্রধান লক্ষ্য। ভালোভাবে খেয়ে প'রে যেমন লোকে-বাঁচতে চায়, তেমনি চায় ভালো একটা আশ্রয় বা বাসস্থান। এ-আশা সবাই করে। আর, এ-আশা এমন কিছু অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতও নয়। এই বাসস্থানের সমস্যাও আমাদের একটা বড় সমস্যা, কি শহরে, কি গ্রামে। রাজ্য-সরকার এ-বিষয়েও যে মনোযোগ দিয়েছেন, তার প্রমাণ পাই যখন দেখি তাঁদের উদ্যোগে কলিকাতা-শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ-নির্মাণের ব্যাপক কাজ চলছে। ১৯৫৭-সাল অবধি রাজ্য-সরকার কম ক'রে তিনশ'টি একতলার ও ১২৮টি বহুতলার বাড়ি নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন শ্রমিক-সাধারণের জন্য। বিভিন্ন কলোনিতেও প্রায় পাঁচশ' বাড়ি তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। তাছাড়া, কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ইম্প্রুভ্‌মেন্ট ট্রাস্টও সাধারণ নাগরিক ও শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর অট্টালিকা নির্মাণ ক'রে বাসগৃহের সমস্যা যে অনেকাংশে মিটিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। বস্তিবাড়িতে যাঁরা এতকাল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বছরের পর বছর কাটিয়ে এসেছেন, তাঁরা এখন কম ভাড়ায় পাকা বাড়িতে ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করবার সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কলিকাতা শহরে যাতে আর কোনো বস্তিবাড়ি না থাকে সে-দিকে দৃষ্টি রেখেই নতুন নতুন ঘর-

বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিতেও আদর্শ গ্রাম গ'ড়ে উঠ্‌ছে সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায়। কলিকাতা-শহরের অত্যধিক ভিড় কমাতে, নতুন একটা উপনিবেশও গ'ড়ে উঠেছে কাঁচড়াপাড়ার কাছে কল্যাণীতে। সেখানে সু-পরিকল্পিত উপায়ে বাড়িঘর তৈরি করা হয়েছে অনেক। সেই সব বাড়ি বিক্রি করাও হচ্ছে সুবিধাজনক শর্তে। তাছাড়া, নিজেদের রুচিমতো বাড়িঘর তৈরি করার জন্যও জমি বিক্রি করা হচ্ছে সেখানে। স্কুল, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, বেড়াবার জায়গা, ডাকঘর, বাজার, বৈদ্যুতিক আলো এ-সব তো আছেই, উপরন্তু যাতে সেখানে কতকগুলি সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করা যায়, তারও চেষ্টা চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে কল্যাণীতে যাতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায় তার প্রাথমিক কাজও এগিয়ে গেছে অনেকটা। কল্যাণীতে যদি ছোটখাটো বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা গ'ড়ে ওঠে, তা'হলে কল্যাণীর প্রতি অনেকেরই যে আকর্ষণ বাড়বে তাতে ভুল নেই। আশা করা যাচ্ছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ফুরোবার আগেই কলিকাতা ও কল্যাণীর মধ্যে অনেকগুলি বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল করবে। তাহ'লে কল্যাণী থেকে কলিকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করবার আর কোনো বিশেষ অসুবিধাই থাকবে না।

স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে যে-সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, তার মধ্যে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন সমস্যাই প্রধান। আজ পর্যন্তও এ-সমস্যার কোনো সুষ্ঠু সমাধান হয়েনি। শুধু জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর আর কিছু আর্থিক সাহায্য দিলেই তো উদ্বাস্তু-দের পুনর্বাসন হয় না। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তারা যাতে রোজগার ক'রে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেইরকমের অর্থনীতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ১৯৫৭ সালের ৩১-এ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৩২লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। এঁদের জন্য বাড়িঘর চাই, কাজকর্ম জোগাড় ক'রে দেওয়া চাই—এক কথায় এ'রা যাতে



রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশনের বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ

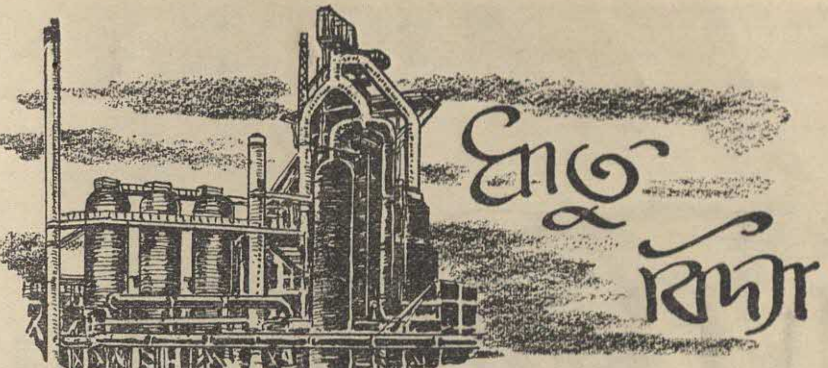
ক'রে আবার নতুন ভাবে জীবনযাত্রা শুরু করতে পারেন তার সকল দায়িত্ব জাতীয়-সরকারের উপর। কাজেই, এ-ব্যাপারে শুধু রাজ্য-সরকারকেই বিব্রত থাকতে হচ্ছে না, ভারত-সরকারকেও এ-বিষয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সরকারী হিসেব থেকে জানা যায়, এ-পর্যন্ত মাত্র ১১ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও ২১ লক্ষ লোকের পুনর্বাসন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে এমন জায়গা-জমি খুব বেশি নেই, যাতে ক'রে এত লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এই রাজ্যেই হ'তে পারে। তাই, বিহার, উড়িষ্যা এবং ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করছেন ভারত-সরকার। তাছাড়া, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও উড়িষ্যার সম্মিলিত একটা এলাকায় দন্ডকারণ্য নামে যে জায়গা রয়েছে, সেখানে যাতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সুবন্দোবস্ত হ'তে পারে, সে-বিষয়েও সরজমিনে কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

দীর্ঘকাল ধ'রে আমরা বাস ক'রে এসেছি বিদেশী-শাসকের অধীনে। ফলে, আমরা নিজেদের বহুকিছু ন্যায়সঙ্গত সুযোগ সুবিধা থেকে এতদিন কেবল বঞ্চিত হয়েই এসেছি। তাই, স্বাধীনতা লাভ করবার পর থেকে, দেশকে পুনর্গঠন করবার জন্য আমাদের আগ্রহ, উদ্যম ও পরিশ্রমের অন্ত নেই। সব কাজই যে, দ্রুত ও নিখুঁত ভাবে হ'চ্ছে এমন কথা কেউই বলেন না। আর, বৃহৎ ব্যাপারে ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। তা সত্ত্বেও, এ-কথা আজ কেউই বোধহয় অস্বীকার করবেন না যে, স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে গত কয়েক বছরের মধ্যে, কৃষি, সেচ, শিল্প, ব্যবসায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও পরিবহণ এবং সমাজ-জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্রে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গও তেমনি পিছিয়ে নেই।

স্বাধীন-ভারতের লক্ষ্য হ'লো এক সমাজ-তান্ত্রিক কল্যাণময় রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলা। সেই আদর্শের কথা মনে রেখেই এদেশে এপর্যন্ত দু'টি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে জাতীর আয় বাড়াবার দিকে, অবিলম্বে দেশে বুনিয়াদী-শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনের জন্য, আর, সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান শিল্পের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। তা'ছাড়া, দেশের বহু লোকের চাকুরি বা কাজের সংস্থান ক'রে দেওয়া এবং দেশের লোকের মধ্যে জাতীয় আয় ও সম্পদ সমান ভাগ ক'রে দেওয়াও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার আরও দু'টি প্রধান লক্ষ্য।

এখনে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হরিণঘাটার উৎপাদিত দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র, কামারহাটির নারী শিল্প-শিক্ষালয় এবং রহড়ার রামকৃষ্ণমিশনের বহুমুখি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের কার্য-প্রণালী জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে-টাকা খরচ হবে, তার পরিমাণ হ'লো ১৫৩ কোটি টাকারও বেশি। এই সময়ের মধ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গেই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হবে। আর তাতে ক'রে, পল্লী-বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলের রূপই যে বদ্‌লে যাবে সে-আশা আমরা করতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র খনিজ সম্পদ্ হ'লো কয়লা। এই কয়লার ওপরে নির্ভর ক'রে এ-রাজ্যে বহুরকমের শিল্পের প্রচলন ও প্রসার করা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই রাজ্য-সরকার দ্বিতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা সময়ের মধ্যে দুর্গাপুরে একটি 'কোক-চুল্লি' স্থাপন করেছেন। ঐ কোকচুল্লিকে কেন্দ্র ক'রে দুর্গাপুরে ও তার চারপাশে বিভিন্ন শিল্প গ'ড়ে উঠছে। তার ফলে, ভবিষ্যতে দুর্গাপুর যে এই রাজ্যের বিরাট একটি শিল্প-শহরে পরিণত হবে সে-আশাও আমরা করতে পারি। তাছাড়া কল্যাণীকেও একটি শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গ'ড়ে তোলবার এক পরিকল্পনা আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আরও যে-সব কাজ করা হবে তা হ'লোঃ খাদ্যশস্য, আখ ও পাটের উৎপাদন...... সেচের ও বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা।

ধাতু বিদ্যা



মানব-সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়। এখনকার দিনে বিভিন্ন ধাতুর আর্থিক ও কার্যকরী মূল্য কাহারো অজানা নাই। স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কোথা হইতে কী ভাবে বিভিন্ন ধাতু আসিল। ভারতবর্ষেরই বা ধাতুশিল্পের কতখানি অবদান! বহু গবেষণা গ্রন্থ ও পুরাণো ধ্বংসাবশেষ হইতে ভারতীয় ধাতুশিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ আমরা পাই। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ ১৫০০ বছর পূর্বের এইরূপ একটি কীর্ত্তি। ধাতুর উৎপাদন ও ব্যবহার আমাদের দেশে বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

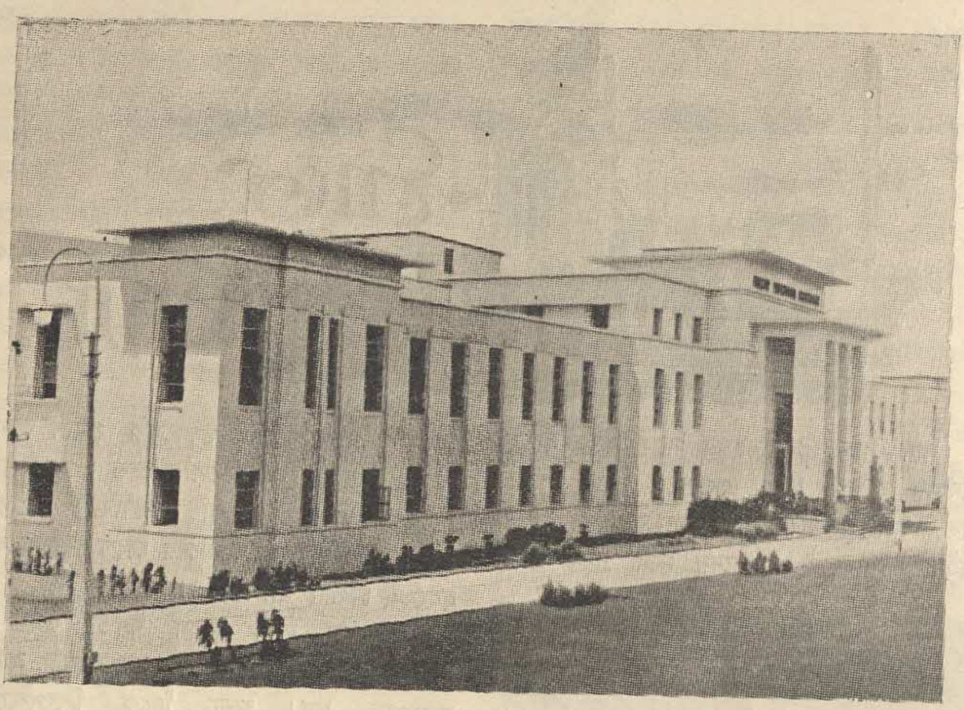


দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ—(১৫০০ বছর পূর্বের)

কালক্রমে নানা কারণ বশতঃ এই সব ধাতুর উৎপাদন কৌশল ভারতবর্ষ হইতে লুপ্তপ্রায় হয়। অন্য দিকে শিল্পযুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলি ধাতু শিল্পের ক্ষেত্রেও উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয়। বর্ত্তমান যুগে কোন দেশের শিল্পোন্নতির মান নির্দ্ধারিত হয়, সেই দেশের লৌহ ও লৌহজাত সামগ্রীর উৎপাদন ও তাহাদের ব্যবহার হইতে। কয়েক দেশের এক বৎসরের মাথা পিছু লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারের হার নীচে দেওয়া হইলঃ

যুক্তরাষ্ট্রে	১২৩৭ পাউন্ড
যুক্তরাজ্য	৬২৮ „
অষ্ট্রেলিয়া	৫৬৭ „
ফ্রান্স	৩৩২ „
রাশিয়া	৩০৯ „
ইটালি	১৩৭ „
ভারতবর্ষ	১১ „

উপরের হিসাব ১৯৫০ সালের। এরপরে রাশিয়ার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষও প্রায় বর্ত্তমানে ১৯৫০ সালের প্রায় দুই গুণ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে অন্ততঃ ৩।৪ গুণ হইবে। এইসব হিসাব



ভারতের জাতীয় ধাতুশিল্প গবেষণাগার—জামসেদপুর

হইতে শিল্পজগতে ভারতের স্থান কোথায় বোঝা মোটেই শক্ত নয়। এর মূল কারণ হিসাবে আমরা অক্ষমতার চেয়ে পরাধীনতাকেই দায়ী করিব বেশী। ভারতীয় লৌহ-শিল্পের গোড়াপত্তন হইয়াছিল জামসেদজী টাটার প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান জামসেদপুর সহরে। এই কারখানা স্থাপনের সময়ে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার উৎসাহদানে কার্পণ্যই করিয়াছিল বলা চলে। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে অবশ্য ইংরেজ সরকার এই দেশে লৌহ-শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে উহা প্রসারের অনুমোদন করেন। আমাদের জাতীয় সরকার গঠনের পর হইতে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতিও প্রসারের প্রকৃত প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। বলাবাহুল্য, ধাতুশিল্প এবং বিশেষ করিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে প্রকৃত স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসার লাভের পরিকল্পনার পূর্বে আমাদের দেশের বিভিন্ন ধাতুশিল্পের অবস্থার এখানে একটু আভাস দেওয়া যাউক।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পঃ—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বিহার প্রদেশের জামসেদপুরে অবস্থিত টাটা আয়রণ এ্যান্ড ষ্টীল কোম্পানী এবং পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের নিকট বার্ণপুরে অবস্থিত ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী। ইহারাই বেশীর ভাগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ছিল। টাটা কোম্পানীর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৭৫০,০০০ টন ও Indian Iron & Steel Co,র ২৫০,০০০। এছাড়া মহীশূর রাজ্যের ভদ্রাবতীতে অবস্থিত মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্ক্‌স বাৎসরিক ৪০,০০০ টনের মত উৎপাদন করিত, উৎপাদনের ক্ষমতা কম হইলেও এই শেষোক্ত কারখানার একটা বিশেষত্ব ছিল। লৌহ উৎপাদনে খনিজ কয়লা ব্যবহার না করিয়া এই কোম্পানী কাঠ-কয়লা ব্যবহারে খানিকটা বিশেষ ধরণের লৌহ প্রস্তুত করিত।

তাম্রঃ—তাম্র প্রস্তুত আমাদের দেশে একমাত্র বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলার ঘাটশিলাতেই হইয়া থাকে। ইন্ডিয়ান কপার করপোরেশন

এর মৌভান্ডারস্হিত কারখানাতে এই ধাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার তাম্র বেশীর-ভাগই কাঁসা, Bronze ও Brass পিতল তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সব অঞ্চলে বহু পূর্বে স্হানীয় পদ্ধতিতে তাম্র তৈরীর প্রমাণ রহিয়াছে।

সীসা ও দস্তাঃ—এই ধাতু দুইটি আমাদের দেশে একসঙ্গেই খনিতে পাওয়া যায়। যদিও বর্ত্তমান যুগে ১৯৪২—৪৩ সালের পূর্বে আমাদের দেশে কোনও সীসা প্রস্তুত হইত না, এই ধাতুর খনি অঞ্চলের নিকটে পুরাণো ধবংসাবশেষ হইতে ৩০০।৪০০ শত পূর্বেও আমাদের দেশে সীসা উৎপাদনের প্রমাণ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সীসার উৎপাদন হইয়া থাকে উদয়পুরের অন্তর্গত—জওয়ার খনি হইতে। এই ধাতু-দ্বয় সংমিশ্রিত আকর (Ore) হইতে সীসা ও দস্তার ভাগ আলাদা করা হয় এবং দস্তার অংশ জাপানে চলিয়া যায় এবং সেখান হইতে দস্তা তৈরী হইয়া আবার আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে। সীসার অংশ ধানবাদের কাছে টুন্ডুতে ভারতীয় মেটাল করপোরেশানের কারখানায় সীসা ধাতুতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৬—'৫০ সাল পর্য্যন্ত এখানে বৎসরে মাত্র ১৫০০ টন, সীসা উৎপাদন হইত। সমগ্র ভারতের প্রয়োজনের ইহা সামান্য অংশ মাত্র।

স্বর্ণঃ—স্বর্ণের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উৎপাদন মহীশূর রাজ্যের কোলার স্বর্ণ খনি হইতে। বৎসরে ১৭০,০০০ আউন্স মাত্র। ইহা ছাড়া কুটির শিল্পের মত কোন কোন অঞ্চলে এখনও গ্রাম্য লোকেরা সামান্য স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই মূল্যবান্ ধাতুর উৎপাদন ক্ষমতা আমাদের দেশে প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ মাত্র।

অঞ্জনক (antimony):—বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশে এই ধাতুর আকর এন্টি-মনি সালফাইড প্রসাধনের কাজে 'সুরমা' নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই ধাতুর অবশ্য অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবহার রহিয়াছে। ১৯৩৯—৪০ হইতে এই ধাতু চিত্রাল রাজ্যের Star Metal Refinery'র কারখানায় উৎপাদিত হইতেছে। এই ধাতুটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু এবং আমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে।

এ্যালুমিনিয়ামঃ—২য় মহাযুদ্ধের শেষভাগে দুইটি কারখানা আমাদের দেশে প্রথম এই ধাতু উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। এই কারখানা একটি পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের কাছে জেকেনগর-এ অবস্হিত। অপরটি বিভিন্ন ভাগে বিহার প্রদেশে মুরি, কেরালার আলওয়ে এবং কলিকাতার কাছে দমদমে অবস্হিত। সম্প্রতি উড়িষ্যার অন্তর্গত হিরাকুঁদে এই কোম্পানীর আরও একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রথম অবস্হায় এই ধাতুর উৎপাদন খুবই কম ছিল। ১৯৫৩—৫৪ সালে বৎসরে ৪,০০০ টনের নীচে ছিল।

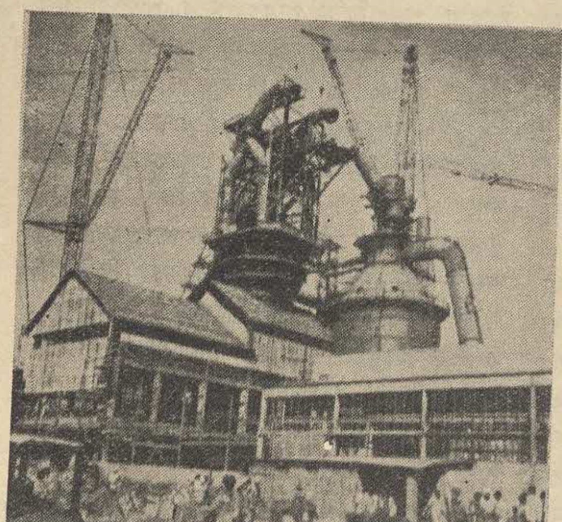
এই সব ধাতু ছাড়া মেঙ্গানীজ ধাতু-পূর্ণ খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ভারতের বাইরে নানা দেশে রপ্তানি হইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ধাতুশিল্পের অগ্রগতি হইয়াছে আশানুরূপ। ভবিষ্যৎ প্রসারের যে পরিকল্পনা তৈরী হইয়াছে তাহাও আশাপ্রদ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শতকরা ৪৫ ভাগের উপর ব্যয়ভার ন্যস্ত হইয়াছে ধাতুশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য। তৃতীয় পরিকল্পনার খস্ড়া এখন প্রস্তুত হইতেছে, এবারেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মত ধাতুশিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইবে নিঃসন্দেহ। পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু সম্পন্ন হইলে ১৫।২০ বৎসরের ভিতরে আমরা ধাতুশিল্পের ক্ষেত্রে কোন কোন শিল্পোন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশকে ছাড়াইয়া যাইব আশা করা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক-গুলি ধাতুর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। যে কয়েকটি ধাতুর আকর (Ore) আমাদের দেশে অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, এ্যালুমিনিয়াম, Thorium ও Titanium-এর নাম করা যাইতে পারে। এছাড়া Chromium Beryllium, সীসা, দস্তা Uranium, Vanadium ও তাম্র

মোটামুটি কাজ চলিবার মত পরিমাণ আছে বলিয়া মনে হয়। যে ধাতুগুলি সত্যিই অ-পরিমিত তাদের মধ্যে পারদ, **Nickel, Tin, Cobalt,** স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রভৃতির নাম করা চলে। প্রধান ধাতুগুলি সম্বন্ধে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

জামসেদপুর

লৌহঃ—ভারতীয় লৌহের আকর পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আকরদের মধ্যে স্থান পায়। পরিমাণ ও আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্তই রহিয়াছে। পরিমাপ অনুযায়ী ৮,০০০ কোটি টনের উপরে। প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যাপ্রদেশ, ও মাদ্রাজেই বেশীর ভাগ অবস্থিত। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের লৌহের উৎপাদন এতকাল বিশেষ নৈরাশ্যজনক ছিল। যদিও প্রথম পরিকল্পনার শেষে লৌহের উৎপাদন বাৎসরিক ১৫ লক্ষ টনের মত হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ভিতরে ৬০ লক্ষ টন বাৎসরিক উৎপাদন হইবে। আমাদের ঐ সময়কার প্রয়োজন ইহাতেই মিটিবে। এরূপও আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে ১৯৭০—৭৫ সালের ভিতরে ২ হইতে ২১/২ কোটি টন পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইবে বর্ত্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াও ও কয়েকটি নতুন কারখানা স্থাপন করিয়া। টাটা কোম্পানী সম্প্রতি কারখানা প্রসারিত করিয়াছে ২০ লক্ষ টন উৎপাদনের জন্য। **Indian Iron & Steel Co,** করিতেছে ১০ লক্ষ টনের জন্য। এছাড়া সরকারের প্রচেষ্টায় ৩টি নতুন কারখানার কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এদের একটি উড়িষ্যা প্রদেশের রাওরকেলাতে। অন্য ২টির একটি মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে। বাকী কারখানাটি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে স্থাপিত হইতেছে। প্রত্যেকটি কারখানাতে বর্ত্তমানে বাৎসরিক ১০ লক্ষ টন লৌহ এবং ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকিবে। রাওরকেলা ও দুর্গাপুরের কারখানা ভবিষ্যতে ২০ লক্ষ টন এবং ভিলাই কারখানাতে ২৫ লক্ষ টনের ব্যবস্থা হইবে। এইসব কারখানা-গুলি বহুলাংশে বৈদেশিক অর্থ ও কারিগরী বিদ্যার (Technical) সাহায্যেই সম্পন্ন হইতেছে যেমন রাওরকেলার কারখানা প্রধানতঃ জার্ম্মানী, ভিলাই রুশিয়ার ও দুর্গাপুর যুক্তরাজ্যের।



রাউরকেলার ব্লাস্ট ফার্ণেস

এখানে বলা প্রয়োজন আমাদের দেশের লৌহশিল্পের প্রসারের প্রধান প্রতিবন্ধক অপরিমিত লৌহউৎপাদনের উপযোগী কয়লা। ভারতীয় কয়লার অতি অল্প-পরিমাণই লৌহশিল্পে ব্যবহারের উপ-যোগী। সম্প্রতি নানা পদ্ধতিতে এই অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও হইবে।

লৌহশিল্পের প্রসঙ্গে অন্য ধাতু সহযোগে উন্নততর ইস্পাত (Alloy Steel) সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এই ধরণের ইস্পাত আমাদের দেশে অতি অল্পই তৈরী হয়। বিভিন্ন শিল্পে ইহার প্রয়োজন বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াই প্রকৃত পক্ষে মিটাইতে হইতেছে। মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, জাহাজ,

হইতেছে। মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, জাহাজ, প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিতে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক দ্রব্যাদিতে বিভিন্ন রকমের Alloy Steel-এর ব্যবহার। এই বিষয়ে শিল্পপতিদের ও সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সরকার ২টি কারখানার সম্প্রতি অনুমোদন করিয়াছেন। একটি সরকারের নিজস্ব—বাৎসরিক ৫০,০০০ টনের উপযোগী ও অন্যটি সম্ভবতঃ বেসরকারী হইবে।



ব্লাস্ট ফার্ণেস—টাটানগর

মেঙ্গানিজঃ—মূল ধাতু ভাবে ইহার কোন ব্যবহার নাই তবে অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে Alloy ভাবেই ইহার ব্যবহার। ইস্পাত-শিল্পে এই ধাতুর একটি প্রধান ব্যবহার রহিয়াছে। সাধারণ ইস্পাত বা অন্য ধাতু সহযোগে উন্নততর ইস্পাত (Alloy Steel) উৎপাদনে ইহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার জন্য এই ধাতুর আকর ভারতবর্ষ হইতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। ইস্পাত-শিল্পে এই ধাতু লৌহের সংমিশ্রণে মিশ্রধাতু ভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে আকর হইতে (Ore) এই Ferro-Manganese প্রস্তুতের চেষ্টা কিছুদিন যাবৎ চলিতেছে। উড়িষ্যার অন্ধ্র ও মহীশূর প্রদেশে কয়েকটি কারখানায় যথেষ্ট পরিমাণ Ferro-Manganese উৎপন্ন হইতেছে। ইহার পরিমাণ এখনই আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়া বাইরে রপ্তানী করার মত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই জাতীয় কারখানা আরও স্থাপিত হইবে। এখানে বলা প্রয়োজন আকর রপ্তানীর চেয়ে Ferro-Manganese রপ্তানী অনেক বেশী লাভজনক।

এ্যালুমিনিয়াম:—এই ধাতু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। ইহার ব্যবহার মূল ধাতু ও মিশ্রধাতু (Alloy) দুই ভাবেই। ইহার বিশেষত্ব হাল্‌কা ওজন ও উজ্জ্বল বর্ণ। এই উজ্জ্বল বর্ণ বজায় রাখার ক্ষমতাও এই ধাতুর রহিয়াছে। এই ধাতুর ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশে এই ধাতুর উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে অপর্য্যাপ্ত আকর

(Ore) রহিয়াছে। উৎপাদনে সহায়ক কোন কোন দ্রব্যের অভাব থাকিলেও এই ধাতুশিল্পের আমাদের দেশে উজ্জ্বল ভবিষ্যত রহিয়াছে। এ্যালুমিনিয়ামের আকর দেশের সর্ব্বভাগেই বিস্তৃত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজনের (বাৎসরিক ২৫,০০০ টন) সামান্য কম উৎপাদন হইলেও আশা করা যায় শীঘ্রই প্রয়োজন মিটাবার মত অন্ততঃ উৎপাদন হইবে। হয়ত ভবিষ্যতে রপ্তানী করার মতও কোনদিন উৎপাদন হইতে পারে। বর্ত্তমানে, এই ধাতু বৎসরে ১৭,৫০০ টন উৎপন্ন হয়। গত কয়েক বৎসরের ভিতরে এই ধাতু উৎপাদনের কারখানাগুলির প্রসার লাভের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে উড়িষ্যা প্রদেশের হীরাকুঁদে বৎসরে ১০,০০০ টন এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কারখানা একটি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত Mettur-এ এবং উত্তর-প্রদেশের অন্তর্গত Rihand-এ, বৎসরে ১০,০০০ টন করিয়া আরও ২০,০০০ টনের উৎপাদন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোড়ার দিকে সম্পন্ন হইবে। প্রতিদিনই আমাদের এ্যালুমিনিয়মের বিভিন্ন চাহিদা বাড়িতেছে। আশা করা যাইতেছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিতরে এই ধাতুশিল্পের আরও অনেক সম্প্রসারণ হইবে।

তাম্র:—ভারতে তাম্র ধাতুর ভবিষ্যত সম্বন্ধে সঠিক বলা শক্ত। ঘাটশিলার সন্নিকটে মশাবনি খনির উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নূতন খনি কয়েকটির খোঁজ অল্পদিনে পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের কোথাও কাজ আরম্ভ হয় নাই। রাজস্থানে ক্ষেত্রী, বিহারে হাজারীবাগে, উত্তর প্রদেশে, গাড়োয়ালে, অন্ধ্রতে অনন্তপুর ও নেলোর জিলায় তাম্রের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে রাজস্থান ও ক্ষেত্রীতে বৎসরে ১০,০০০ টন, উৎপাদনের উপযোগী আর একটি কারখানা স্থাপিত হইবে। বর্ত্তমানে ঘাটশিলার উৎপাদন হয় মাত্র ৭,৫০০০ টনের মত বাৎসরিক। ইহাছাড়া বৈদ্যুতিক কাজের উপযোগী তাম্র বর্ত্তমানে দেশে তৈরী হয় না। রাজস্থানে একটি নতুন কারখানাতে এবং ঘাটশীলা কারখানাতে এই উত্তম শ্রেণীর তাম্র প্রস্তুতের কথাবার্ত্তা ও চলিতেছে। এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছান সম্ভব হয় নাই।

Thorium:—এই ধাতুর ব্যবহার প্রধানতঃ আণবিক শক্তির উৎপাদনে। আণবিক শক্তির উৎপাদনের গুরুত্ব বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বজনবিদিত। এই ধাতু ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল ভাগে সমুদ্রের বালির সঙ্গে মোনাজাইট (Monazite) নামে এক প্রকার বালুকণা ভাবে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতীয় Monazite-এর Thorium-এর ভাগ অন্য দেশের তুলনায় কিছু বেশী। ১৯৫২ সাল হইতে কেরালার অন্তর্গত Alwaye শহরে Indian Rare Earths Limited নামে একটি সরকারী কারখানায় এই Monazite হইতে Thorium প্রস্তুত হইতেছে এবং Atomic Energy Commission ইহা গ্রহণ করে এই কারখানা হইতে। আণবিক শক্তির ভবিষ্যত এই কারণে আমাদের দেশে আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

Titaniun:—এই ধাতুটি ধাতুজগতে নূতন, ইহাকে অনেকে Wonder-metal বা অভিনব ধাতু নামে আখ্যা দিয়াছে। ইহাও হাল্‌কা ধাতুর গোষ্ঠীর অন্তর্গত। মূল ধাতু-ভাবে এবং অন্যধাতুর সংমিশ্রণে ইহার ব্যবহারের ভবিষ্যত সম্ভাবনা প্রচুর। বর্ত্তমানে ইহার উৎপাদন ব্যয়সাধ্য বলিয়া বহুল ব্যবহার হইতেছে না। এই ধাতুর আকর (Ore) ilmenite আমাদের দেশে প্রধানতঃ মালাবার ও করমন্ডল উপকূলে-ভাগে সমুদ্র তীরের বালির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই ধাতুর উৎপাদন হইতেছে না। তবে প্রভূত চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে এ-ধাতু কাজে লাগানো যাইতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় এই ধাতু উৎপাদনের কারখানা আমাদের দেশেও স্থাপিত হইবে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে উপরে যে ধাতু-শিল্প কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে বলা হইল সেগুলি

হইল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মূল ধাতু উৎপাদন কেন্দ্র। এগুলি ছাড়াও এই সব কেন্দ্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিল্প যাহারা এই সব ধাতু হইতে নানাবিধ দ্রব্য উৎপন্ন করে, ধীরে ধীরে তাহা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং অনেক নতুন শিল্পের প্রসার সম্ভব হইবে। এই সব শিল্প বৈদেশিক রপ্তানী হইতে বহুল পরিমাণে পরিপুষ্ট হইত বা এখনও হইতেছে এবং বলা বাহুল্য এইরূপ পরিস্থিতি কখনই কোন শিল্পের পক্ষে কল্যাণপ্রদ নয়। এদের মধ্যে রেলওয়ে ইঞ্জিন ও রেলওয়ের প্রয়োজনীয় অনান্য সামগ্রী। মোটরগাড়ী, জাহাজ, কৃষি-উৎপাদনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের কারখানাগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সর্ব্বশেষে ধাতু ও ধাতুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে যুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের দেশে যে সব শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার তৈরী হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ধাতুশিল্প প্রসারের প্রতি শিল্পপতিদের এবং সরকারের দৃষ্টি পড়ে এবং অল্প কয়েক বৎসরের ভিতরে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ধাতুবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় এবং শীঘ্রই আরও কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হইবে। সরকারের প্রচেষ্টায় Council of Scientific & Industrial Research কর্ত্তৃক বিহার প্রদেশের জামসেদপুর শহরে National Metallurgical Labortary স্থাপনও ধাতুশিল্প প্রসার ও উন্নতির একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই গবেষণাগারে জাতীয় ধাতুশিল্পের বিবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে বহুবিধ গবেষণা হইয়া থাকে এবং অনেক উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই গবেষণাকেন্দ্র ছাড়াও সমগ্র দেশে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র ও কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে ধাতুবিষয়ক গবেষণা হইয়া থাকে। এখানে বলা আবশ্যক যে ধাতুশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা আমাদের দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে একেবারে হইত কি না সন্দেহ।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে ধাতু-শিল্পের ভবিষ্যৎ আমাদের দেশে উজ্জ্বল নিঃসন্দেহ। অদূর ভবিষ্যতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বহুধাতু ও ধাতুজাত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ-ভাবে এই দেশে প্রস্তুত করিতে পারিব এবং সম্ভবতঃ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করিতে সমর্থ হইব। নির্ম্মাণ-কৌশল ও পদ্ধতিও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় কোন অংশে কম উন্নত থাকিবে না।



দুর্গাপুর প্রথম ব্লাস্ট ফার্ণেস ও তিনটি সেড তৈরীর কাজ চলিতেছে

ভিলাই মধ্যপ্রদেশের ছিল একটি অজ্ঞাত পল্লী। বনজঙ্গলবেষ্টিত আদিবাসীদের অধ্যুষিত স্থান—এক শুভ প্রভাতে নবরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—খ্যাতিমান্ বিপুল শ্রম-শিল্প কেন্দ্র। বিগত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখ ভিলাই পল্লী নির্ব্বাচিত হইল। স্থান নির্ব্বাচন সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এবং বিশেষজ্ঞেরা ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে ভিলাইতে শ্রমশিল্প-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন এবং এক শুভ-দিনে শুভক্ষণে ভিলাইতে দ্বিতীয় ষ্টীল প্লেন্ট (Second Steel Plant) প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এখানে পর্য্যবেক্ষকগণ দেখিলেন প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল (Raw materials) প্রচুর পরিমাণে জল এবং শিল্পসংস্থানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য এবং যাতায়াতের সুবিধার (Communication) এবং রেলগাড়ীর সুযোগ মালচলা-চলের সুগম পথ ও যানবাহনের সুবিধা দেখিয়া—এই স্থানটিকেই কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। দি হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড (The Hindusthan Steel Limited, A Government of India undertaking) ভারতসরকার ইহার পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং ভিলাই স্টীল প্রোজেক্ট (Bhilai Steel Project) নামে ইহার কর্ম্মচালনা আরম্ভ করিলেন।

ভিলাই দ্রুগ (Drug) জেলার অন্তর্গত। মধ্যপ্রদেশের এই ক্ষুদ্র পল্লী বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শ্রেষ্ট লৌহশ্রমশিল্প কেন্দ্র। একদিনকার স্বপ্ন আজ প্রত্যক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার কর্ম্মীদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। মধ্যপ্রদেশ সরকারের তান্ডুলা (Tandula) এবং গোন্ডালি (Gondali) বৃহৎ জলাধার (Tank) হইতে এখানে জলসরবরাহের সুব্যবস্থা আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণাণ (সহ-রাষ্ট্রপতি), শ্রীজবাহরলাল নেহেরু, (ভারতের প্রধান মন্ত্রী), সর্দ্দার শরণ সিং (ষ্টীল, মাইনস এবং ইন্ধন সংগ্রহকারী মন্ত্রী), শ্রী টি, বি, কৃষ্ণনামাচারী (পূর্ব্বতন আয়রণ ও ষ্টীল মন্ত্রী)। রবিশঙ্কর শুক্লা (ভূতপূর্ব্ব মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী) শ্রীজবাহরলাল নেহেরু এবং সোবিয়েৎ মন্ত্রী মিঃ নিকিতা ক্রুশেচভ—১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মিলিত হইয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

১৯৫৬ সালে ভারতীয় এবং সোভিয়েৎ রুশের ইঞ্জিনীয়ারগণ মিলিত হইয়া ভিলাই—এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্ম কেন্দ্র এবং যন্ত্রপাতি গড়িয়া তোলেন এবং বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করেন।১৯৫৬ সাল হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। দেখা যায় তন্ডুলা খালটি ভিলাইর মধ্য-দিয়া প্রবাহিত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই পারে বিরাট শিল্প কেন্দ্র এবং নাগরিকসমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজহারা (Rajhara) পাহাড় হইতেই মৃত্তিকা মিশ্রিত লৌহধাতুপিন্ড (Iron-Ore) সংগৃহীত হয়। দিন দিনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিলাইর নাম প্রচারিত হইতেছে।



কোক চুল্লীর সারি, ভিলাই—পেছনে ব্লাস্ট ফার্ণেসের ও কারখানার অন্য অংশ দেখা যাইতেছে



মহাকাশে অভিযান



মহাশূন্যে অভিযান

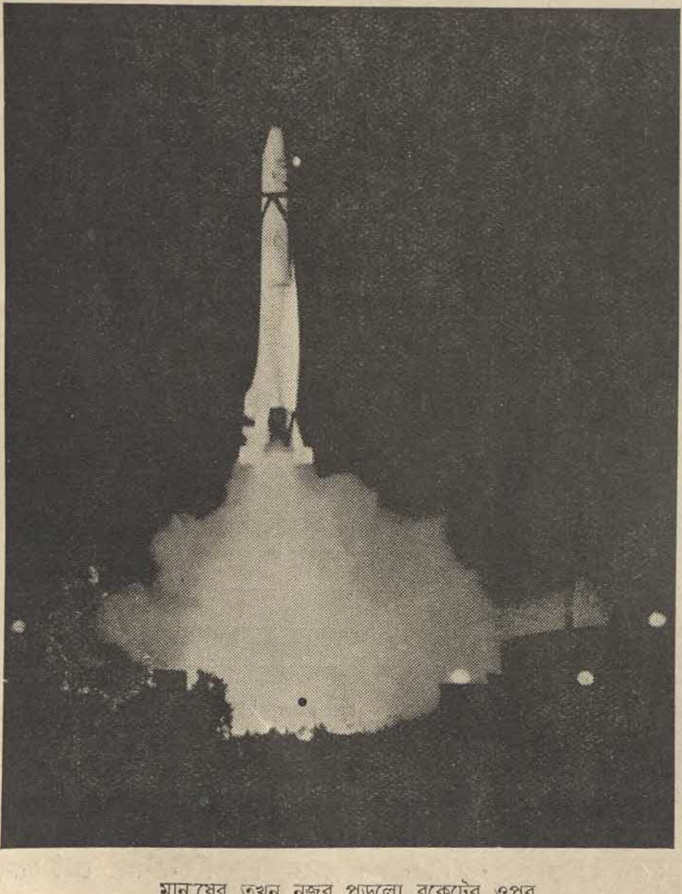
পাখীদের আকাশে উড়তে দেখে মানুষও আকাশে ওড়বার জন্যে চিরকাল একটা অত্যুগ্র বাসনা মনে মনে পোষণ করে এসেছে। কিন্তু বহু যুগ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সে তার বাসনা চরিতার্থ করবার কোন উপায়ই উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয় নি। এই রঙীন কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে না পেরে পৌরাণিক কাহিনী, গল্প ও রূপকথার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করবার চেষ্টা করে' মানুষ কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেছে। কিন্তু এতে মানুষের আকাশ-বিহারের বাসনা অবদমিত হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর অদম্য হয়েই উঠেছে।

অবশেষে আঠারো'শ শতাব্দীতে মানুষ বেলুনে চড়ে আকাশ-বিহারের স্বপ্ন সার্থক করে তোলে। এই প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মানুষ আরও উন্নত ধরণের বেলুন তৈরী করে এবং নকল ডানা ব্যবহার করে আকাশ-ভ্রমণের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু বেলুনে চড়ে আকাশ-বিহার মোটেই সুখকর নয়। তাছাড়া বেলুনের গতিবিধি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না—বায়ু-প্রবাহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। মানুষ কিন্তু এতেও নিরস্ত হলো না, উদ্ভাবন করলো সে বিশাল আকৃতির ধাতুনির্মিত বেলুন এবং তার নিয়ন্ত্রণ কৌশল। আকাশ-বিহারে সাফল্য লাভের ফলে মানুষের মনে মহাকাশে পাড়ি দেবার কল্পনা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ক্রমশঃ জানা গেল, পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বায়ুমন্ডল ক্রমশঃই হাল্কা হয়ে গেছে এবং এই বায়ুমন্ডলের বিস্তৃতি ২০০-২৫০ মাইলের বেশী নয়। তারপর বাতাসের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে; আছে কেবল অসীম শূন্য। কাজেই বাতাসে ভর করে পৃথিবীর বাইরে শূন্য-লোকে পরিভ্রমণের কল্পনা তখনকার মত চাপা পড়ে গেল। কিন্তু মানুষ চিরকাল চুপ করে থাকতে পারে না। সে আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাতাসের চেয়ে অনেক ভারী, ধাতুনির্মিত আকাশ-যানে চড়ে মানুষ ইচ্ছামত আকাশে উড়ে বেড়াতে সক্ষম হলো।

অবশেষে আকাশে ওড়বার ব্যাপারে এই ভারী আকাশ-যান বা এরোপ্লেনই একাধিপত্য বিস্তার করলো। এরোপ্লেনের দৌলতে একদিকে যেমন মানুষের গতিবেগ বেড়ে গেল অসম্ভব রকম, অপর দিকে তেমনই তার পক্ষে অনধিগম্য বা দুরতিক্রম্য বলে কিছুই রইলো না। মানুষ কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হলো না—তার আশা অনেক। সে চায় মহাশূন্যের পথে পাড়ি জমাতে—পৃথিবীর বাইরে গ্রহ-নক্ষত্রগুলিতে উপস্থিত হয়ে তাদের বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে। পৃথিবীর বুকে অবস্থান করেই মহাশূন্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে সে এ-পর্যন্ত অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সে আর কতটুকু! অজানার তুলনায় অতি নগণ্য অংশ মাত্র। তবুও যতটুকু জানা গেছে তাথেকেই বোঝা গেল, মহাশূন্য অভিযানে এরোপ্লেন তার কোন কাজেই আসবে না। কারণ এরোপ্লেন চলে বাতাসের মধ্যে ডানায় ভর করে এবং এর ঊর্ধ্বগতিও সীমাবদ্ধ ১৫—২০ মাইলের বেশী নয়। শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন জেট-প্লেন

আরও উপরে উঠতে সক্ষম হলেও তাকে কোন না কোন রকমে বাতাসের উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই মহাশূন্য পরিক্রমায় উৎসাহী মানুষের নজর পড়লো তখন রকেটের উপর। জেট-প্লেন তার জ্বালানীর অন্যতম উপকরণ অক্সিজেন সংগ্রহ করে বাতাস থেকে, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়; কিন্তু রকেট স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাকে বাইরে থেকে জ্বালানীর কোন উপকরণই সংগ্রহ করতে হয় না। কাজেই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা রকেটের উন্নতিসাধনে তৎপর হয়ে উঠলেন। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে জার্মেনীর ভি-টু রকেট। মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত জার্মেনীর এই রকেটের প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার কথা মানুষ কোন কালেই বিস্মৃত হবে না।

যাহোক, যুদ্ধশেষে জার্মেনীর ভি-টু রকেট মিত্র-শক্তির হস্তগত হয়। মহাশূন্যে পাড়ি দেবার বাহনস্বরূপ এই ভি-টু রকেটই প্রথম পথ-প্রদর্শক। এই ভি-টু রকেটের নির্মাণ-কৌশল অনুসরণে রাশিয়া ও আমেরিকায় মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে সক্ষম একাধিক পর্যায়ের রকেট তৈরীর চেষ্টা চলতে থাকে। ১৯৪৯ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকায় ভি-টু রকেটের সাহায্যে একটি কর্পোর্যাল রকেটকে উধর্বাকাশে প্রেরণ করা হয়। ভি-টু যে পর্যন্ত উঠে তার যাত্রা শেষ করলো, কর্পোর্যালের সেখান থেকে যাত্রা সুরু হলো। এ ব্যবস্থায় রকেটের পাল্লা আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে চেষ্টা চলতে লাগলো। অবশেষে ১৯৫৭ সালে মানুষের মহাশূন্য অভিযানের প্রাথমিক সাফল্য সূচিত হলো।



মানুষের তখন নজর পড়লো রকেটের ওপর

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর—বিংশ শতাব্দীর একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন রাশিয়াই সর্বপ্রথম রকেটের সাহায্যে ২৩″ ব্যাসের একটি শিশুচন্দ্রকে ৫৬০ মাইল উর্দ্ধে প্রেরণ করে। সেখানে এই শিশু-চন্দ্রটি ঘন্টায় ১৭,০০০ মাইল বেগে ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। এই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে স্বয়ং-ক্রিয় ব্যবস্থায় প্রেরিত রেডিও-সঙ্কেত থেকে মহা-শূন্যের কিছু কিছু অজ্ঞাত তথ্যও জানা গেছে। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই রাশিয়া আবার আর একটি শিশুচন্দ্রকে রকেটের সাহায্যে ৯৫০ মাইল উর্দ্ধে কক্ষপথে স্থাপন করে। এই দ্বিতীয় শিশুচন্দ্রটির মধ্যে লাইকা নামে একটি কুকুরকেও

পাঠানো হয়েছিল। কুকুরটি অবশ্য বেশী দিন বেঁচে থাকেনি বটে, কিন্তু এ-থেকে ঊর্ধ্বস্তরে জীবন্ত প্রাণীর অবস্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির বিষয় জানা সম্ভব হয়েছে। আমেরিকাও তিন পর্যায়ী কম্পাউন্ড রকেটের সাহায্যে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী সাতটি ক্ষুদ্রকায় উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরণ করেছে। রাশিয়াও আরও কয়েকটি উপগ্রহকে মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে। এ-ছাড়া ১৯৫৯ সালের বিভিন্ন সময়ে রাশিয়া ও আমেরিকা লক্ষাধিক মাইলের ও ঊর্ধ্বে রকেট পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। যাহোক, দিনের পর দিন রকেটের যেরূপ উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞানীরা রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশে মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সক্ষম হবেন। অবশ্য রকেটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এজন্যে পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যের বিচিত্র পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করতে হবে।

পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে মানুষ যে আজ কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সাফল্য অর্জন করেছে তা কেমন করে সম্ভব হলো, সে কথা বুঝতে হলে রকেট এবং মহাশূন্যের অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। সাধারণ আকাশ-যানের মত রকেটের পিছনেও রয়েছে দীর্ঘদিনের বিস্তৃত ইতিহাস। মোটামুটিভাবে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলছি। আমাদের দেশের হাউই সবার কাছে পরিচিত। খুব সম্ভব বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে হাউই-এর অনুকরণেই প্রথম রকেট নির্মিত হয়েছিল। আধুনিক রকেটের আদিম সংস্করণ যে সর্বপ্রথম চীন দেশেই উদ্ভাবিত হয়েছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে চীনারা আক্রমণকারী মোঙ্গলদের এই 'উড়ন্ত অগ্নি', অর্থাৎ রকেটের সাহায্যেই পর্যুদস্ত করেছিল। ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে চীনাদের তৈরী সেই আদিম রকেট ইউরোপে পৌঁছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যুদ্ধাদির বিবরণে এসব রকেট ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। শোনা যায়, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই ব্যবহার করে ইংরেজ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। সে সময়ে একজন ইংরেজ লেফটেন্যান্ট ভারতীয় হাউই-এর কার্যোপযোগিতা দেখে উন্নত ধরণের হাউই উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত হাজার হাজার হাউই ব্যবহার করে বৃটিশ নৌ-বাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। তারপর দূরপাল্লার কামান আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যুদ্ধের ব্যাপারে হাউই-এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

চারদিক আবদ্ধ, বারুদভর্তি হাউই-এর খোলে অগ্নিসংযোগের ফলে বিপুল আয়তনের উচ্চ চাপের গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং আবদ্ধ খোলের চতুর্দিকেই প্রচন্ড চাপ দেয়। এর ফলে খোলটা ফেটে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ছিট্‌কে পড়ে। কিন্তু খোলের একদিকে যদি সরু একটা ছিদ্র রাখা যায় তবে সেখান দিয়ে প্রচন্ড বেগে গ্যাস বেরিয়ে যেতে থাকে, তার ভিতরকার গ্যাসের ঊর্দ্ধ চাপের দরুন হাউইটা প্রচন্ড বেগে বিপরীত দিকে ছুটে যায়। মহাশূন্যে পরিভ্রমণের জন্যে এই প্রণালীতেই প্রথম রকেট তৈরী হয়েছিল, হাল্কা অথচ দৃঢ় ধাতুর খোলের মধ্যে পৃথক আধারে অক্সিজেন ও কামানের বারুদ ভর্তি করে। বায়ুশূন্য স্থানে এরূপ রকেট চলবার পক্ষে কোনই অসুবিধা নেই; কারণ জ্বালানীর জন্যে তাকে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে হয় না। তাছাড়া ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুশূন্য স্থানে বাতাসের ঘর্ষণজনিত কোন বিরাট বাধার সম্ভাবনা না থাকায় রকেটের গতিবেগ বৃদ্ধির পক্ষে কোন অসুবিধাই ঘটে না। কিন্তু ক্রমশঃ বুঝা গেল, কঠিন ইন্ধন-চালিত রকেট মহাশূন্য ভ্রমণের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। কাজেই রকেটের জ্বালানী-সমস্যাই প্রবল হয়ে উঠলো।

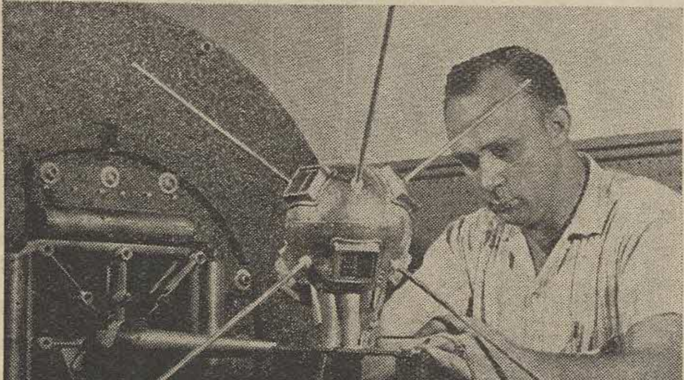
রুশ-বিজ্ঞানী জিয়োলকোভ্‌স্কিই ১৯০৩ সালে সর্বপ্রথম মহাশূন্য যাত্রায় রকেট ব্যবহারের কথা প্রকাশ করেন। বায়ুশূন্য স্থানে রকেটই চলতে সক্ষম—এ-কথা তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে প্রমাণিত করেন। এর পরে মহাশূন্য

ভ্রমণ সম্বন্ধে আরও অনেকে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ১৯১৯ সালে আমেরিকার আর. এইচ. গডার্ডের বারুদ চালিত রকেট সম্বন্ধে গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হয়। পরে তিনি দেখেন, তরল ইন্ধন-চালিত রকেট ছাড়া মহাশূন্য পরিভ্রমণে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

১৯২৬ সালে তাঁর তরল জ্বালানী-চালিত রকেট সর্বপ্রথম আকাশ-পথে ভ্রমণ করে রকেটে-বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এই রকেটে জ্বালানী হিসাবে পেট্রোলের সঙ্গে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়েছিল। জ্বালানী পোড়বার সময় প্রচন্ড উত্তাপ সৃষ্টির ফলে মোটর গলে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই মোটর ঠান্ডা রাখবার জন্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে নানা রকমের রকেট তৈরী হতে লাগলো। কিন্তু সত্যিকার কার্যোপযোগী রকেট তৈরী হলো জার্মেনীতে, হিটলারের আমলে। হিটলারের আমলে রকেট-বিজ্ঞানী ওবার্থের ছাত্র ফন ব্রাউন জার্মেনীর রকেট সংক্রান্ত পরীক্ষা-কেন্দ্রের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে তিনি এ-থ্রি নামে ২৫ ফুট লম্বা একরকম রকেট তৈরী করেন। এ-থ্রি রকেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, গতিপথে দিক পরিবর্তন না করে যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে, তার জন্যে এতে জাইরোস্কোপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ-থ্রি রকেট ৪০,০০০ ফুট উপরে উঠতে সক্ষম হয়। এর পরে ফন ব্রাউন আরও উন্নত ধরণের রকেট নির্মাণে ব্যাপৃত হন। এর ফলেই আবির্ভূত হয় বিখ্যাত ভি-টু রকেট। এই ভি-টু এক সময়ে যেমন বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, বর্ত্তমানে তেমনই আবার মহাকাশ ভ্রমণের বাহন-সমস্যা সমাধানের পথও প্রশস্ত করে দিয়েছে।

এদিকে গডার্ডও স্বাধীনভাবে উচ্চ গতিসম্পন্ন উন্নত ধরণের রকেট নির্মাণে সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৪০ সালে তিনি ভি-টুর অনুরূপ রকেট নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। ঊর্ধ্বাকাশে ভি-টুর গতিবেগ হতো ঘন্টায় প্রায় ৩৫০০ মাইল। যুদ্ধের সময় জার্মেনী এই ভি-টু-কে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করে। ভি-টু ৬০ মাইল উপরে উঠে ২০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে' শত্রুপক্ষের সহর-বন্দর বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল।

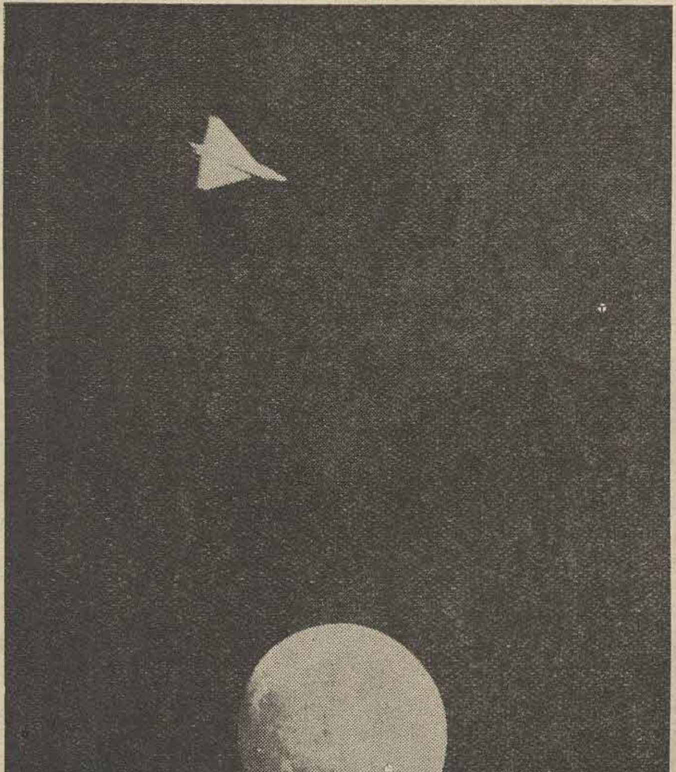
পূর্বেই বলা হয়েছে, যুদ্ধের পর অনেকগুলি ভি-টু রকেট মিত্রশক্তির হস্তগত হয়। তারা সেগুলিকে ভাগাভাগি করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগান। ফন ব্রাউনও অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীদের মত আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশেও জার্মেনীর অনেক বিজ্ঞানী আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। প্রধানতঃ এসব বিজ্ঞানীদের সহায়তায় রাশিয়া ও আমেরিকায় রকেট-বিজ্ঞান দ্রুত অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। উদ্ধ্বাকাশের



শিল্প-বিজ্ঞানী মেন্‌ট্রেলার ভেনগার্ড রকেটের দোদুলমান গতি বেগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা

অবস্থা পরীক্ষার জন্যে ভি-টু রকেট সোজাসুজি উপরে পাঠিয়ে দেখা গেছে—এই রকেট ১০৭ মাইল উপরে উঠতে পারে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, একটি রকেটের সাহায্যে এর চেয়ে দূরতর পথ অতিক্রম করা নানা কারণে অসুবিধাজনক। কিন্তু দুটি রকেট পর পর জুড়ে একটি নিঃশেষিত হওয়ার পর অপরটির বিস্ফোরণ ঘটাবার ব্যবস্থা করতে পারলে আরও বেশী দূরত্ব অনায়াসেই অতিক্রম করা যায়।

১৯৪৯ সালে একটি ভি-টু রকেটের সঙ্গে একটি কর্পোর‍্যাল রকেট জুড়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই ব্যবস্থায় ২৫০ মাইল ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব। মহাকাশ পরিক্রমায় রকেটের এই সাফল্য দেখে মানুষ চন্দ্রলোক, এমন কি—গ্রহান্তর পরিভ্রমণে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। কিন্তু চন্দ্রলোক বা কোন গ্রহে যেতে হলে পৃথিবীর বাইরে বিভিন্ন কক্ষে কতকগুলি উপগ্রহ স্থাপন করা দরকার। এগুলি হবে স্পেস-ষ্টেসন। হিসাব করে দেখা গেছে, ১১০০ মাইল ঊর্দ্ধে কোন বস্তু যদি সেকেন্ডে ৪½ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তবে সে আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না, চাঁদের মত নিয়মিতভাবে বরাবর সে পৃথিবীর চারধারেই ঘুরতে থাকবে। অবশ্য পৃথিবী থেকে বস্তুটির দূরত্ব আরও কম হলে তার গতিবেগও বেশী হওয়া দরকার। নচেৎ বস্তুটি বরাবর কক্ষপথে থাকবে না। কিন্তু কোন বস্তুকে অত উঁচুতে তুলতে হলে পর পর সংলগ্ন দুটি রকেটে কাজ হবে না। এর জন্যে দরকার হবে তিন পর্যায়ের রকেট। প্রথম রকেটটি কিছু দূরে উঠলেই জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রকেটটি সক্রিয় হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়টি আরও ঊর্ধ্বে উঠে তৃতীয় রকটটিকে চালু করে দিয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে। সাধারণতঃ তিনবার এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগেই রকেটকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছানো যেতে পারে। কিন্তু কেবল পৌঁছে দিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। রকেট অথবা রকেট-বাহিত বস্তুটিকে উপগ্রহের মত পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন



ইউ এস্ জেট-প্লেনের চন্দ্রের উপর পরিক্রমণ

করাতে হলে রকেটকে সোজা উপরে পাঠালেই চলবে না—তৃতীয় রকেটটির বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে জাইরোস্কোপ বা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমশঃ দিক পরিবর্তন করে পৃথিবীর সমান্তরাল অবস্থায় আনতে হবে; নচেৎ সে সোজাসুজি ঊর্ধ্বে চলে যাবে—উপগ্রহ সৃষ্টি হবে না। কথা হচ্ছে—এই কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে নিয়মিতভাবে ঘুরে বেড়াবে কেন? শূন্যমার্গে চন্দ্রের অবস্থিতি যে কারণে সম্ভব, কৃত্রিম উপগ্রহও সে ভাবে মহাশূন্যে অবস্থান করবে। সুতার একপ্রান্তে ঢিল বেঁধে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করলে সেটা আবার নীচে নেমে আসে; কিন্তু সুতার অপর প্রান্ত ধরে ঢিলটাকে ঘুরাতে থাকলে সেটা শূন্য পথে চারদিকে ঘুরতে থাকে। কেন্দ্রাপসারী শক্তি তাকে নীচে পড়তে দেয় না। অবশ্য পৃথিবীর আকর্ষণ ও ঢিলের গতিবেগ—এই উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটুলেই তবে ঢিলটা নির্দিষ্ট কক্ষে অবস্থান করবে। চন্দ্রলোক বা গ্রহান্তরে যেতে হলে দুটি উপায়ে সেটা সম্ভব হতে পারে। এক হলো—ঘন্টায় ২৪ থেকে ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারে, এরূপ রকেট তৈরী করা এবং অপরটি হলো—মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেস্-ষ্টেসন স্থাপন করা। প্রথম উপায়ে গ্রহান্তর যাত্রার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব নয়; দ্বিতীয় উপায়ে অনেকটা সম্ভাবনা দেখা যায়। এই জন্যেই মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। ঘন্টায় প্রায় ১৬০০০ মাইল বেগে ছুটে যে-কোন রকেট কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছুতে পারবে এবং প্রাথমিক চেষ্টায় এতে অনেকটা সাফল্য লাভও হয়েছে।



কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণকার্য চল্‌ছে

কম্পাউন্ড রকেটের সাহায্যে সর্বশেষ রকেটটির সম্মুখের দিকে রক্ষিত কৃত্রিম উপগ্রহটিকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহাশূন্যে নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। উপগ্রহটি তখন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। কাজেই সেটি ঘুরতে ঘুরতে একবার পৃথিবীর খুব কাছে আসে, আবার দূরে চলে যায়। কাছে আসবার সময় বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং উপবৃত্তাকার পথটি ক্রমশঃ বৃত্তাকার হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে গতিবেগ কমবার ফলে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উপগ্রহটি শেষ পর্যন্ত উল্কার মত জ্বলেপুড়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়। সম্প্রতি মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহের এই অবস্থাই ঘটেছে। তবে অদূর

ভবিষ্যতে স্থায়ী উপগ্রহ স্থাপন সম্ভব হবে বলেই মনে হয়।

মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করতে হলে তার আয়তন বেশ বড় করতে হবে। কিন্তু সেটিকে সম্পূর্ণরূপে একবারে উপরে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। কোন কোন পরিকল্পনা অনুসারে একে খন্ড খন্ড করে তৈরী করে উপরে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হবে। সুদক্ষ কর্মীরা রকেটের সাহায্যে সেখানে গিয়ে এই কাজ করবে। তাদের জন্যে বিশেষ রকমের পোষাক এবং অক্সিজেন ও রেডিও যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। উপগ্রহটার আকৃতি হবে মোটরের চাকার মত এবং সেটা থাকবে বাতাস-ভর্তি, আর বাইরে থাকবে নাইলনের আচ্ছাদন। কিন্তু মানুষকে মহাশূন্যে পাঠাবার আগে জীবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান করা দরকার। কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ এবং তাকে ঊর্ধ্বে প্রেরণের ব্যবস্থার মত এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানও সহজ ব্যাপার নয়। অথচ এসব সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে মহাশূন্যে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া মহাশূন্য যাত্রায় মানুষকে আরও অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—উল্কাপিন্ডের (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) সংঘর্ষ, নভোরশ্মির প্রভাব প্রভৃতি তো আছেই, তাছাড়া জ্বালানী সমস্যাটাও কম নয়। কিন্তু সমস্যা যতই থাক না কেন, সব কিছুরই সমাধান করে মানুষ যে একদিন মহাশূন্যে আধিপত্য বিস্তার করবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ ইতিমধ্যেই রকেট-বিজ্ঞানের এতটা অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে যে, সোভিয়েট রকেট ২,৪০,০০০ মাইল দূরে চন্দ্রপৃষ্ঠে গিয়ে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টা ২মিঃ ২৪ সেকেন্ডের সময় (মস্কো সময়) সোভিয়েট রকেট লুনিক-২ চন্দ্র-পৃষ্ঠে গিয়ে উপনীত হয়েছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্র-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে লুনিক-২-এর সময় লেগেছে প্রায় ৩৪ ঘন্টা।

তারপর আবার এই বছরেরই ৪ঠা অক্টোবর চন্দ্র ও পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রকেট লুনিক-৩-কে কক্ষপথে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের একদিকের পৃষ্ঠদেশই বরাবর দেখা যায়; অপর পৃষ্ঠ পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বদাই অদৃশ্য। চন্দ্রের এই অদৃশ্য পৃষ্ঠদেশের আলোক-চিত্র গ্রহণ করবার জন্যে ৩ নম্বর লুনিকে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা সন্নিবেশিত হয়েছিল। ৩ নম্বর লুনিক এই আলোক-চিত্র গ্রহণে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। ৭ই অক্টোবর তারিখে গৃহীত আলোক-চিত্রগুলিতে বিরাট একটা কালো গহবর এবং আরও প্রায় বারোটা ছোট ছোট কালো বিন্দু দেখা যায়। এগুলি বিভিন্ন আকারের আগ্নেয়গিরির মুখ।

২ নম্বর লুনিক চাঁদে পৌঁছাবার দিন কয়েক পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নেস্মেয়ানভ তাঁর ছাত্রদের বলেন—তোমাদের অনেকের জীবন-কালের মধ্যেই মানুষ চাঁদ এবং নিকটতম গ্রহ-গুলিতে যেতে পারবে বলেই মনে হয়। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রকেটটি চাঁদে গিয়ে পৌঁচেছে, তার মধ্যে যদিও অনায়াসে একটি মানুষের স্থান করা যেতে পারতো, তথাপি পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাড়ি জমা-বার আগে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। যদিও আড়াই-শ' মাইল ঊর্ধ্বে কুকুর পাঠিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে—তথাপি একথা সত্য যে, মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে ফিরে আসবার সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি। নিরাপদে চাঁদে অবতরণ করাও এক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে চন্দ্রগামী রকেটের গতিবেগ কমিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে রেট্রো-রকেট উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। রকেটটি পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময় বাতাসের ঘর্ষণে যাতে পুড়ে না যায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া আরও অনেক সমস্যা আছে, মানুষকে মহাকাশে প্রেরণ করবার পূর্বে সেগুলির পূর্ণ সমাধানের প্রয়োজন।

মহাকাশ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে রাশিয়া ও আমেরিকা একদল লোককে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছে। রুশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা

পরিষ্কারই বলেছেন যে, নিরাপদে ফিরে আসবার নিশ্চিত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষকেই মহাকাশে পাঠানো হবে না।

যাহোক, মহাশূন্য অভিযানে রকেটের যে-সব বিস্ময়কর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা খুব বেশী বিলম্বিত হবে না। মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার প্রধান অবলম্বন হবে মহাশূন্যযান। কিন্তু মহাশূন্য-যানকে যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানীর ভার বইতে হবে, সেটাই হলো গুরুতর সমস্যা। এ-প্রসঙ্গে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের কথাও উঠেছে। কিন্তু সেখানেও গুরুভার রিয়্যাক্টরের সমস্যা রয়েছে। সম্প্রতি কোন কোন সোভিয়েট বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম রশ্মির দ্বারা পরিচালিত ভবিষ্যৎ মহাশূন্য-যানের কথা বলেছেন। এই মহাশূন্য-যানের 'জেট' যদি গ্যাসের পরিবর্তে কোয়ান্টাম রশ্মি নিঃসরণ করে, তবে সে সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতি অর্জন করতে পারবে। এই কোয়ান্টাম রশ্মি হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের মৌলিক পদার্থ কণিকা। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে, মহাশূন্য-যানে ফটোন, অর্থাৎ দৃশ্য আলোকের কোয়ান্টা বা ইলেকট্রন শক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহৃত হবে। তত্ত্বগত হিসাব থেকে দেখা যায়—মহাশূন্য-যান পরিচালনে বেতার-তরঙ্গের কোয়ান্টা ব্যবহারই অধিকতর উপযোগী হবে। কিন্তু এর জন্যে কোয়ান্টাম মহাশূন্য-যানের উপযোগী বিশেষ ধরণের রিয়্যাক্টরের প্রয়োজন হবে।

আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরাও মহাকাশ যাত্রার বাহন হিসাবে আয়নচালিত রকেট-যান তৈরীর পরিকল্পনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। সাধারণ রকেট যেমন বর্ধিত আয়তনের গ্যাসের চাপে পরিচালিত হয়, পরিকল্পিত আয়ন-রকেটযানও সেরূপ গ্যাসের পরিবর্তে আয়নিত কণিকার চাপে মহাশূন্যের পথে এগিয়ে যাবে। আরোহীশূন্য আয়ন-চালিত যানে তথ্যসংগ্রহকারী যন্ত্রাদি চালু করবার জন্যে সৌরব্যাটারী বিদ্যুৎ-শক্তির যোগান দিবে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে মনুষ্যপরিচালিত মহাব্যোমযান প্রেরণ করা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও নির্ম্মাণ কার্য চালিয়ে আসছে। বিরাট আকার ও ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য পৃথিবী পরিক্রমায় কয়েকটন ওজনের স্পুৎনিককে কক্ষপথে স্থাপন সমর্থ শক্তিশালী পরিবাহী রকেটের সফল পরীক্ষা—মহাশূন্যদেশে বহুদূরগামী মনুষ্যচালিত মহা-ব্যোমযান নির্ম্মাণের ও পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

১৫ই মে, ১৯৬০ তারিখে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে এক পৃথিবী পরিক্রমারত মহা-ব্যোমযানকে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এই উপগ্রহযানটি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হিসাব অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২০০ মাইল (৩২০ কিলোমিটার উর্দ্ধে প্রায়বৃত্তাকারে এক কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে। ওই দূরত্বেই এই উপগ্রহযানটি উহার পরিবাহী-রকেটের শেষ পর্য্যায়টি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্ত্তমানে উহার পৃথিবী পরিক্রমার সময় হলো ৯১ মিনিট।

ভবিষ্যতের মনুষ্যবাহী মহাব্যোমযান যাহাতে সম্পূর্ণ নিয়মিত ভাবে ও নিরাপদে মহাশূন্যে উড্ডীন হয়ে আবার ফিরে আসতে পারে এবং মহাব্যোম যাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার যোগান দিতে পারে তা পরীক্ষার জন্য, নিখুঁত করে তুলবার জন্য এই পরীক্ষামূলক উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

অবশ্য বহির্মহাকাশে মানুষকে উড্ডয়নের জন্য প্রেরণ করার সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। প্রথম স্পুৎনিক্ ক্ষেপনকালে জেট-বিজ্ঞান যে অবস্থায় ছিল, তাহা হতে ইহাকে বহু গুণে উন্নীত করা হলে এবং বহু বিচিত্র বিজ্ঞানাদির বহুতর সমস্যার সমাধান করা হলে তবে এই মহা আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সম্ভব করে তোলার দিনটি নিকটতর করা সম্ভব হবে। এ-জন্য সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি তৈরি করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো মানুষেরা চাঁদে যাবে।



স্টুপিড

(একাঙ্কিকা)

[একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীতে ছেলেদের পড়িবার ঘর। বাড়ীর মেজো ছেলে বিমল টেবিলে বসিয়া কিছু লিখিতেছে। বিমলের বয়স বছর ষোলো। চেহারাটি আজ তাহার অতি মলিন। বিষণ্ণ দৃষ্টি। লিখিতে লিখিতে তাহার চোখে জল আসিতেছে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া আবার লিখিতেছে। মার্চ মাসের অপরাহ্ণ।

রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত শুনিয়া বিমল লেখাটি একটি বইয়ের মধ্যে লুকাইল। দরজা খুলিয়া দিলো। ঘরে ঢুকিল তাহার দাদা অমল। বয়স বছর আঠারো। বাহিরে যাইবার সাজে সজ্জিত। কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিতেছে।]

অমল।। ঘরে খিল এঁটে একলা বসে কি করছিস?

বিমল।। কবিতা লিখছি।

অমল।। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করলে কবি হওয়া যায় বুঝি? নে, ছাই-পাঁশ আর লিখতে হবে না। চল।

বিমল।। না।

অমল।। না মানে? আমার কথা শোন। চল। সতুদের বাড়ী চা খাবার নেমতন্ন। তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।

বিমল।। সতু পরীক্ষায় পাশ করেছে। দশজনকে নিয়ে ফূর্তি করতে সে পারে। আমি স্কুল ফাইনাল পাশ করতে



আমার কথা শোন্। চল্।

পারিনি। লোকের কাছে মুখ দেখাতে আমি পারবো না।

অমল।। তোর মাথা খারাপ হয়েছে বিমল। আই. এস-সি পরীক্ষায় আমি প্রথম

বার ফেল করিনি? মার কাছে সে কি বকুনি। বাবা তো বাড়ী থেকেই বের করে দেন আর কি। তোর তো ভাগ্যি ভালো—তাঁরা দু'জনেই আজ হরিদ্বারে বসে তীর্থ ধর্ম করছেন। যখন ফিরবেন একেবারে মুনি-ঋষির মতো মন নিয়ে ফিরবেন, কিছু বলবেন না তোকে। কেন ভেবে মরছিস। জামাটা গায়দে। আয়।

বিমল।। [চীৎকার করিয়া উঠিল], আমি যাবো না।

অমল।। ও, ঘরে বসে বসে বুঝি কাঁদবি? হ্যাঁ, চেহারাটা বেশ কাঁদো কাঁদোই হয়েছে। দাঁড়া আমি তোর একটা ফটো নিচ্ছি। ফেল করলে চেহারাটা কেমন হয় স্টাডি করা যাবে।

[সকলের ছোট ভাই কমলের প্রবেশ]

কমল।। আমার ফটো নেবেনা দাদা?

অমল।। না। তুই তো আর ফেল করিস নি।

বিমল।। ফটো যদি নাও, জানবে এই আমার শেষ ফটো।

অমল।। ও। সুইসাইড করবি বুঝি? কি জানি বাবা! থাক।

কমল।। সুইসাইড কি দাদা?

অমল।। তুই তো আর ফেল করিস নি। সে তোর না জানলেও চলবে। বাড়ীতে থাকবি। খবরদার বেরুবি নে। আমি এলাম বলে।

[ঘড়ি দেখিয়া] এই যাঃ! তিনটে বেজে গেলো।

[অমল বাহিরে চলিয়া গেল]

কমল।। ক্যারাম খেলবি ছোড়দা?

বিমল।। না।

কমল।। ও বাড়ীর মধুদাও তো ফেল করেছে। কিন্তু খেলছে তো?

বিমল।। তুইও যা, গিয়ে খেল।

কমল।। না বাপু, আমি যাবোনা। বড়দা জানলে মেরে ফেলবে। আমাকে বার বার বলে গেছে তোর কাছে থাকতে।

বিমল।। যা বলছি।

কমল।। আমি যাবো না।

বিমল।। [চীৎকার করিয়া] গেলি?

কমল।। কোথায় যাবো?

বিমল।। তোর মধুদার কাছে। খেলতে।

কমল।। না। মধুদা ফেল করেছে। আমি ওর সাথে খেলবো না।

বিমল।। আমিও তো ফেল করেছি। তবে আমার সাথে খেলবি কেনো?

কমল।। তুমি আমার লক্ষ্মীদাদা। তাই খেলবো।

বিমল।। [ক্ষীণ হাসি হাসিয়া] ও। আয় কাছে আয়। [কাছে আসিয়া] আমার ক্যারামবোর্ডটা তুই নিবি?

কমল।। তুমি দেবে না। পল্টু আর আমি একদিন খেলছিলাম, তুমি দেখতে পেয়ে কি বকুনি না আমাকে দিলে।

বিমল।। পল্টুর সঙ্গে খেলছিলে বলে বকেছিলাম। ভারি ঝগড়াটে ছেলে পল্টু। তোকে একদিন কেমন মেরেছিলো মনে নেই? ওর সঙ্গে কখনো খেলবি নে তুই। খেলবি টুনুর সঙ্গে। টিয়ার সঙ্গে। এ্যাটমের সঙ্গেও খেলতে পারিস।

কমল।। কি খেলবো ছোড়দা?

বিমল।। কেন? ক্যারাম। ক্যারামবোর্ডটা তোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা আজ থেকে তোর।

কমল।। আ—মা—র?

বিমল।। হ্যাঁ।

কমল।। আমাকে তুমি একেবারে দিয়ে দিলে?

বিমল।। হ্যাঁ।

কমল।। বাবা কিছু বলবে না?

বিমল।। আমি ক্লাস এইট থেকে ফার্স্ট হয়ে নাইনে উঠেছিলাম বলে বাবা এটা আমাকে প্রাইজ দিয়েছিলেন। এবার আমি ফেল করেছি তুই পাস করেছিস। এটা আমার রাখা আর চলে না। এটা এখন তোকেই মানাবে ভালো। লক্ষ্মী ভাইটি আমার,

কখনো ফেল কোরোনা। যাও, বোর্ডটা নিয়ে যাও। টুনুদের বাড়ী গিয়ে খেলো।

কমল।। আঃ! কি মজা। কিন্তু ছোড়দা। কি করে যাই?

বিমল।। কেন রে? কি হয়েছে?

কমল।। [চারদিকে চাহিয়া দেখিয়া] কাউকে বলবে না?

বিমল।। না।

কমল।। তুমি নাকি আজ বিষ খাবে। বড়দা তাই আমাকে সব সময় তোমার কাছে থাকতে চুপি চুপি বলে গেছে। বড়দা এখুনি ফিরবে, তারপর আমি যাবো।

বিমল।। বড়দা তোকে এই কথা বলে গেছে?

কমল।। হ্যাঁ। কাউকে বলতে মানা করে গেছে।

বিমল।। তবে আমায় বললি যে?

কমল।। তুমি যে আমাকে খুব ভালোবাসো ছোড়দা।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

কমল।। তুমি বিষ খেওনা ছোড়দা। বিষ খেলে নাকি লোকে বাঁচেনা।

বিমল।। কী বোকা তুই। এঘরে কোথায় বিষ দেখছিস যে আমি খাবো? বড়দা ঐ কথা বলে তুই যাতে খেলতে না যাস্ তাই করে গেছে।

কমল।। ভারি চালাক বড়দা না?

বিমল।। সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। যা তুই বোর্ডটা নিয়ে টুনুদের বাড়ী খেলতে যা।

কমল।। তুমি এখানে একা বসে থাকবে?

বিমল।। না না একা থাকবো কেন? তুই বরং টুনির দিদিমণিকে পাঠিয়ে দে। মণিকে গিয়ে বল, এখুনি যেন আসে। তুই তাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে খেলতে বসবি। কেমন?

কমল।। আচ্ছা। [কমল সানন্দে বোর্ডটি লইয়া চলিয়া গেলো]

[বিমল আবার লিখিতে সুরু করিল। কিন্তু প্রায় তখনই বালক ভৃত্য পাঁচুর একগ্লাস দুধ লইয়া প্রবেশ।]

পাঁচু।। ছোটবাবু, দুধ খাও।

বিমল।। আজ দুধে কতোটা জল দিয়েছিস?

পাঁচু।। তোমার ওই এক কথা ছোটবাবু, জল দিয়েছি। কতবার হলপ করে বলেছি দুধে আমি জল দিই না।

বিমল।। আজও হলপ করছিস?

পাঁচু।। হ্যাঁ। কেনো করবো না।

বিমল।। হলপ করে মিথ্যে বললে মরে নরকে যেতে হয় জানিস?

পাঁচু।। হ্যাঁ, বুড়োরা তাই বলে শুনি।

বিমল।। কথাটা তুই মানিস?

পাঁচু।। বুড়োরা বলে—মানতেই হয়।

বিমল।। নরক মানিস?

পাঁচু।। খুব খারাপ জায়গা। ভারি অন্ধকার। চারদিকে সব যমদূত। হাতে তাদের ডাঙ্গস্। কেবলি ঠ্যাঙায় শুনি।

বিমল।। কেন ঠ্যাঙায়?

পাঁচু।। পাপ করেছো, ঠ্যাঙানি খাবে না?

বিমল।। দুধে জল মিশোলি তুই আর আমি করলাম পাপ?

পাঁচু।। [সজোরে] আমি দুধে জল মেশাই না ছোটবাবু।

বিমল।। [চীৎকার করিয়া] আমি নিজের চোখে দেখেছি একদিন। আর তুই কিনা হলপ করে বলিস দুধে জল মেশাস না। এতবড় পাপ করিস?

পাঁচু।। হ্যাঁ, তুমি দেখে ফেলেছিলে একদিন। তবে মিথ্যে বলবো না ছোটবাবু মিথ্যে বলে আমি পাপ করবো না। আমি দুধে জল মেশাই না। জলে দুধ মেশাই। আমার বাবা আমাকে এই পথটা বলে দিয়েছে। রাগ করলে ছোটবাবু?

বিমল।। [হাসিয়া] না না, সত্যি কথা বললে রাগ করবো কেনো? কিন্তু পাঁচু,

বল দেখি, জলেই বা দুধ মেশাস কেনো?

পাঁচু।। তুমি বলেই বলছি আমি বড়ো দুঃখী বাবু। এমনি করে যে দুধটা বাঁচাই তাতে আবার জল মিশিয়ে চুপি চুপি পাশের বাড়ী বিক্রি করে দিই। তাতে যে পয়সা হয় সেটা বাবার হাতে দিয়ে দিই। তাতেই আমার মায়ের চিকিৎসা হয়। মা আমার মরো মরো ছোটবাবু।

বিমল।। হুঁ।

পাঁচু।। বুড়ো বাপ ও বসে নেই। উদয়াস্ত খাটছে। তাতেও যদি ভাত না জোটে আমাদের চুরি চামারি করতেই হবে। পেটের ক্ষিধের তো আর জাত নেই। কি বলো ছোট-বাবু।

[মণির প্রবেশ]

ওরে বাবা মণিদি যে। দুধ খাবেন মণিদি। নিন।



নোটটা আমি তোকে দিলাম

বিমল।। [চটিয়া গিয়া পাঁচুকে] তুই এখান থেকে গেলি?

পাঁচু।। মিথ্যে বললেও চটবেন, সত্যি বললেও চটবেন। যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যম]

বিমল।। না দাঁড়া। কাছে আয়।

পাঁচু।। ও বাবা মারবেন না কি?

বিমল।। তোকে এক পুরস্কার দেবো। মণি, এক মিনিট বোসো। প্লিজ।

[ড্রয়ার খুলিয়া তাহা হইতে পাঁচ টাকার একখানি নোট বাহির করিল]

পাঁচু।। এই সেই নোটটা। সেই পাঁচ টাকার নোটটা। মনে পড়ছে?

পাঁচু।। সত্যি বলছি ছোটবাবু ও নোটটা আমি তোমার ঘরে কুড়িয়েই পেয়েছিলাম। তোমার জলপানি বাঁচিয়ে ঐ পাঁচটা টাকা তুমি জমিয়েছিলে। সিনেমা দেখতে। এটা জেনেশুনেও আমি চুরি করতে পারি ছোটবাবু? এত-দিন হয়ে গেলো আজো তোমার সে সন্দেহ গেলো না?

বিমল।। খবরদার আর একটি কথা বলবিনে। নোটটা আমি তোকে দিচ্ছি।

পাঁচু।। দিচ্ছো?

বিমল।। হ্যাঁ, দিচ্ছি। এ রেখে আর আমার কোনো লাভ নেইরে পাঁচু। সিনেমা দেখা আর আমার হবে না। আমি ফেল করেছি। যা নিয়ে যা।

পাঁচু।। বাঁচালে ছোটবাবু। আজ তবে মাকে ডাক্তার দেখাবো। চাঁদির জুতো মেরে ব্যাটাকে ঘরে আনবো। না, না, মা-যে উঠতে পারে না, চলতে পারে না। দুধটা? তোমরা কেউ খাবেনা? তবে কি—

বিমল।। ওটা তুই খেয়ে ফেল্

পাঁচু।। এ দুধ আমার মুখে রুচবে না ছোটবাবু। যা করবার আমি করছি।

[প্রস্থান]

বিমল।। তবু ভালো তুমি এলে।

মণি।। এ কথা বলছো কেন বিমলদা।

বিমল।। তুমি পাশ করেছো, আর আমি—

মনি।। হ্যাঁ, তুমি ফেল করেছো। কিন্তু তাতে এই হয়েছে বিমলদা আমিই যেন ফেল করেছি। কেবলই মনে হচ্ছে অপরাধটা যেনো আমার। কিন্তু সত্যিক তাই? পরীক্ষার আগেও তুমি সিনেমা দেখেছো। আমি কতো নিষেধ করেছি। তুমি শোনো নি। এ নিয়ে একটা চিঠিও লিখেছিলাম তোমাকে। আমাকে দেখিয়ে সেটা ছিঁড়ে ফেলেছিলে তুমি।

বিমল।। হ্যাঁ, ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, সেজন্য নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে হচ্ছে আজ। যাক সে কথা।

[ঘড়ির দিকে তাকাইয়া]

এই যাঃ! বারবেলা পড়ে গেলো। আর আমার সময় নেই।

মণি।। কোথায় যাচ্ছো? এই বারবেলায়?

বিমল।। ওঃ তুমি জানোনা তাই। বারবেলাতেই হয়েছিলো নাকি আমার জন্ম। আর তাই করবার মতো কিছু করতে হলে আমি বারবেলাতেই করি। মণি, আমি এখন যাবো। কিন্তু যাবার আগে তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে।

মণি।। কি?

বিমল।। আমার এই কলমটা তুমি দেখে বলেছিলে, এমন কলম আমাকে কেউ দেয়না বিমলদা। কলমটা আজ আমি তোমাকে দিচ্ছি। তোমাকে নিতেই হবে।

মনি।। না, না, সে কি!

বিমল।। আমার বড়ো ইচ্ছে তুমি এই কলমটা নাও।

মনি।। ছিঃ, লোকে কি বলবে?

বিমল।। তোমাকে নিতেই হবে মণি।

মণি।। না, বিমলদা। তা হয়না। তুমি কি দিয়ে লিখবে?

বিমল।। আমি আর লিখবো না।

মণি।। তার মানে?

বিমল।। আমি বলেছি আমি আর লিখবো না। আমার শেষ অনুরোধ কলমটা তুমি নাও মণি।

মনি।। কিন্তু এমন করে তুমি এ কথা বলছো কেনো? আমি নেবো না।

বিমল।। নেবে না?

মণি।। না।

বিমল।। ও, তুমি ভাবছো আমি কেনো দিচ্ছি, [হাসিয়া] তুমি পাশ করেছো তাই দিচ্ছি।

মনি।। কিন্তু ও কলম নিলে আমি ফেল করবো।

বিমল।। [আর্তনাদ করিয়া উঠিল] আ— [তৎক্ষণাৎ ড্রয়ার খুলিয়া একটি শিশি বাহির করিল।]



এই আমি বিষ খেলাম

একটু আগে তোমার কথা শুনে ভেবেছিলাম না, মরবো না, আমি বাঁচবো। আবার পড়াশুনো করবো। ভেবেছিলাম তোমার কথাই শুনবো মণি। কিন্তু তোমার ঘৃণা আমাকে বাঁচতে দিলো না। তাই আমি বিষ খেলাম।

[শিশি হইতে গুড়া মুখে ঢালিল। বিমল পড়িয়া গেল এবং তাহার হাত হইতে শিশিটি গড়াইয়া গেল।]

মণি।। [আর্তনাদে] বিমলদা। [শিশিটা তুলিয়া লেবেল পড়িয়া দেখে] এ কী পটাশিয়াম—? [অমলের প্রবেশ]

অমল।। কিছু ভয় নেই মণি। ওটা আমার ফটোগ্রাফির পটাশিয়াম ব্রোমাইডের শিশি। কিন্তু ভাইটির মতি-গতি বুঝে আগেথেকেই আমি প্রস্তুত ছিলাম তা খেয়ে তোমার বিমলদা এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে, নাক ডেকে ঘুমুবে। এই স্টুপিড। কী মনে হচ্ছে?

বিমল।। মনে হচ্ছে সত্যি আমি একটা স্টুপিড। [উঠিয়া দাঁড়াইল] কাউকে কিছু বোলোনা বড়দা, তোমার পায়ে পড়ছি। আর মণি, প্লিজ,...। এখন থেকে দেখবে আমি ভীষণ পড়ছি। যতদিন না আবার পাশ করছি সিনেমা আর দেখবো না।

[সকলের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। এক দেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্বন্ধে গ্রহণ করে, সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানব-সাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানবজাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না। আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।......

বিপুল মানবশক্তি বাংলাসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে। এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণসঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার। আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙালিদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অন্নধ্বংস করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালিদের মধ্য হইতেই চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানব-প্রেমে বাসভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্ত ভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই। সকলেই আপন-আপন আহ্নিক তর্পণ ও চন্ডীমন্ডপাদি লইয়া ছিল, তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

"মার খেয়েছি না হয় আরও খাব,
তাই বলে কি প্রেম দিবনা? আয়।" চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ

জ্ঞানের আলো



(একাঙ্কিকা)

[রামমোহন রায় তাঁর বাসায় বসে আছেন। তিনি কি যেন লিখে চলেছেন, আর তাঁর প্রীতিভাজন একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছেন]

রামমোহন।। দেখ রমেন, তোমরা দেশের যুবক-সম্প্রদায়, তোমরাই ত' দেশের প্রকৃত শক্তি। তোমরা যদি গড়ার কাজে মন দাও, তবে আমাদের মাতৃ-ভূমিকে তৈরী করতে ও খুব বেশী সময় লাগবার কথা নয়।

রমেন।। আমাদের কথা কে শুনবে দাদা? আমাদের না আছে অর্থ, না আছে প্রতিষ্ঠা। দেশের সত্যিকারের বিদ্বান লোকেরা যদি একাজে এগিয়ে আসেন, তাহলে আমরা পেছন পেছন পথ চলতে পারি।

রামমোহন।। দেখ ভাই রমেন, সমস্ত ভারতবর্ষ আমি ঘুরে দেখেছি। যেভাবে মানুষ তীর্থ-পর্যটন করে, আমি সেই মনোভাব নিয়েই আমার মাতৃভূমিকে দেখেছি। কিন্তু কি দেখলাম জানো? কী শোচনীয় কুসংস্কার, কী মূর্খতা, কী অন্ধ-বিশ্বাস! অন্য সব কথা ছেড়ে-দিলেও......একথা কোন মতেই ভুলতে পারিনা যে, গোটা দেশটা অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হবে।



গোটা দেশটা অন্ধকারে ডুবে রয়েছে

পারবে তোমরা তরুণেরা সেই জ্ঞানের আলো জ্বালতে?

রমেন।। আপনার কাছে বসে, আপনার মুখের কথা যখন শুনি, তখন মনে হয়, আমরা ছোট নই, আমরা তুচ্ছ নই। আমরা ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করতে পারি।

রামমোহন।। ঠিক তাই ভাই। মানুষের ইচ্ছে শক্তিটাই হচ্ছে আসল কথা। ভালো কাজ শুভ কাজ আমি করব, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা যদি করি, তবে কোনো মহৎ ব্রতই পৃথিবীতে অসম্পূর্ণ থাকবে না।

রমেন।। আচ্ছা দাদা, আপনার বাড়ীতে সবাইকে নিয়ে আপনি যে এক আলোচনা-সভা বসিয়েছেন, এতে তো কারো আপত্তি থাকবার কথা নয়। লোকে এর বিরুদ্ধে কেন কুৎসা রটাচ্ছে?

রামমোহন।। আসল কথাটা কি জানো, ভাই? শ্যাওলা রয়েছে যে পুকুরে, সেখানে যদি কেউ সংস্কারের জন্যে জলে নামে, তা'হলে ব্যাঙগুলো মনে করে, সব পুরোণো নিয়ম বুঝি বাতিল হয়ে গেল! তাই তারা প্রাণপণে গ্যাঙর-গ্যাঙ সুরু করে দেয়। আমি যে সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলছি। ......তাই সনাতনীদের যত রাগ আমার ওপর। কিন্তু উদারবান লোকেরও ত' অভাব নেই আমাদের দেশে। এই ধরো না কেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়-চৌধুরী তেলিনী-পাড়ার অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ্ ডেভিড হেয়ার, ভূকৈলাসের কালীশংকর ঘোষাল, খ্রীশ্চান পাদরী অ্যাডাম্......এরা সকলেই আমায় সমর্থন করেছেন।

রমেন।। আচ্ছা দাদা, শুনেছি আপনি অনেক ভাষা শিক্ষা করেছেন। আমি ত' এখনো ছাত্র। তাই কিছুতেই ভেবে পাইনে এত ভাষা আপনি কি করে শিক্ষা করলেন। আমার জানতে ভারী ইচ্ছে হয়।

রামমোহন।। সে গল্প শুনতে চাও বুঝি? আচ্ছা তোমায় বলছি। ভাষা শিক্ষার নেশাটাও বড় কম যায়না। দেখেছ ত' আমাদের দেশে অনেক লোক অনেক রকম নেশা করে। কেউ তামাক খায়, কেউ সারাদিন ধরে শুধু পানই চিবুচ্ছে। কারো আফিং না হলে চলেনা। কেউ মদ খায়। কেউ খায় গাঁজা। ছেলেবেলা থেকেই আমার নেশা ছিল ভাষা শিখবার।

রমেন।। কত বয়স থেকে আপনি শিখতে সুরু করলেন?

রামমোহন।। খুব ছেলে বয়সে আমি রামায়ণ মহাভারত পড়তে শিখি। আমার বাবা হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব। আর আমাদের বংশ হচ্ছে জমিদার বংশ। বাড়ীতে পূজো-পাবর্বণ লেগেই থাকতো। আমি যখন বাংলা ভাষাটা বেশ আয়ত্ত করে ফেললাম, তখন বাবা আমায় কাশী পাঠিয়ে দিলেন সংস্কৃত পড়তে! কয়েক বছরের মধ্যে আমি একেবারে পন্ডিত হয়ে উঠলাম!

রমেন।। তারপর?

রামমোহন।। তারপর বাবা ফার্সী শেখবার জন্যে আমায় সোজা পাঠিয়ে দিলেন পাটনায়। ফার্সী ভাষাটাও আমার বেশ ভালো লাগত। এত তাড়াতাড়ি সে ভাষা শিখে ফেল্লাম যে, ওখানে আমার নামই হল 'মৌলভী রামমোহন'......

রমেন।। হা-হা-হা! ভারী হাসির কথাত'। আপনার নাম হয়ে গেল মৌলভী রামমোহন! তারপর আবার কোথায় কার কাছে শিক্ষা পেলেন?

রামমোহন।। শিক্ষার যেটুকু বাকি ছিল, সেটা শেষ করলাম পালপাড়া গ্রামের নামকরা অধ্যাপক নন্দকুমার কাব্যালঙ্কারের কাছে এসে। পরে আমার এই অধ্যাপক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামে বিখ্যাত হয়েছেন।

রমেন।। এত গেল দেশী শিক্ষা। কিন্তু আপনি এমন ভাল ইংরেজী শিখলেন কোথায়?

রামমোহন।। আমার সব কথা বুঝি তুমি জেনে নিতে চাও? আচ্ছা তাহলে বলছি শোন। এক সময় জন ডিগ্‌বী নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের সংগে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়। তাঁর কাছ থেকে আমি জীবনে যে উপকার পেয়েছি, সেকথা কোনদিনই ভুলতে পারবো না। এই ডিগ্‌বী আমাকে তাঁর দেওয়ান করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবহার করতেন সব সময় বন্ধুর মতন। একদিন ডিগ্‌বী আমায় বল্লেন, রামমোহন, ইংরেজী ভাষা না শিখলে তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ইংরেজী আমায় ভালো করে শেখাবে কে? ডিগ্‌বী বল্লেন, বেশ ত', আমিই তোমায় ইংরেজী শেখাবো। পরে এই ডিগ্‌বীই আমায় বলেছিলেন, রামমোহন, তুমি ইংরেজের মতোই ইংরেজী শিখে ফেলেছ!

রমেন।। আপনার মতো যদি আমার নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা থাকত, তবে আমিও অনেক ভাষায় কথা বলতে পারতাম।

রামমোহন।। চেষ্টায় কি না হয় বল? শুধু মনের জোর থাকা দরকার। (বাইরের থেকে একটা লোক ঢুকে বল্লে)

লোক।। বাবু কাগজ......

রামমোহন।। দেখত রমেন কি কাগজ এল।

রমেন।। এ হচ্ছে সনাতনী দলের কাগজ। [কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। হঠাৎ একদিকে দৃষ্টি পড়তে চীৎকার করে উঠল] ব্যাটাদের কান্ড দেখেছেন?

রামমোহন।। কি ব্যাপার?

রমেন।। আপনার নামে ছড়া ছেপেছে। কিন্তু লেখক হিসেবে কারো নাম ছাপা নেই!

রামমোহন।। (হেসে) গালাগালি দিলে বুঝি নাম প্রকাশ করতে হয়? আচ্ছা তুমি ছড়াটা পড়, শুনি।

রমেন।। অতি বিশ্রী ভাষা!

রামমোহন।। তা হোক। গালাগালির ভাষা অমনিই হয়।

রমেন।। তা হলে শুনুন,

"ব্যাটার সরাই মেলের কুল,
ব্যাটার বাড়ী খানাকুল,
ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল
ওতৎসৎ বলে ব্যাটা
বানিয়েছে ইস্কুল।।"

রামমোহন।। হা-হা-হা! চমৎকার ছড়া বেঁধেছে ত'! কষ্ট করে আর অভিধান দেখে মানে বের করতে হবেনা!

রমেন।। আপনি হাসছেন দাদা?

রামমোহন।। এতেও যদি হাসি না পায়, তবে বুঝতে হবে রামমোহনের দুর্দিন সত্যি ঘনিয়ে এসেছে।

[একজন ডাকপিয়নের প্রবেশ]

ডাকপিয়ন।। বাবু কাগজ আছে......

রামমোহন।। আবার কাগজ এল, রমেন। এরা লোক মারফৎ পাঠায় নি। পয়সা খরচ করে ডাকটিকিট কিনে পোষ্টাপিসে ফেলে দিয়েছে। দেখ, এরা আবার কি লিখল।

[রমেন কাগজ নিয়ে খুলে চোখ বোলাতে লাগল]

রমেন।। এরা সনাতনী নয়। এরা হচ্ছে শ্রীরামপুরের ক্রীশ্চান মিশনারীর দল। কসে গালাগালি দিয়েছে আপনাকে। আপনি সর্বধর্ম্ম

সমন্বয় করতে বলেছেন, তাই এদের এত রাগ।

রামমোহন।। ঠিক কথা! ঠিক কথা! এত বড় অন্যায় কথা আমি বলেছি! এর জন্যে গালাগালিত' আমার পাওনাই রয়েছে।

রমেন।। কিন্তু এই নিছক গালাগালি ত' আপনার প্রাপ্য নয়। সবাই আপনাকে ভুল বুঝছে।

রামমোহন।। আসল কথাটি কি জান, রমেন? অজ্ঞানতার অন্ধকারে সবাই ডুবে রয়েছে। তাই একচক্ষু হরিণের মত নিজের ধর্মটাকেই বড় বলে দেখছে। সব ধর্মের কথাই এক। সব ধর্মই মানুষের হিতের কথা বলেছে। আমি হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, ক্রীশ্চানের ধর্মপুস্তক পড়েছি। সেখানেত' কোন কলহ নেই! সব ধর্মই সকলের শুভ চায়। আমিওত' সেই কথাই বলতে চাই। আসল কথাটা কি জানো রমেন, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। তখন আর মানুষের মনে এতটুকু অন্ধকার থাকবে না।

রমেন।। ঠিক কথা দাদা। কিন্তু আজ যে আপনার কোথায় যাবার কথা আছে! নতুন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আলোচনা সভা রয়েছে।

রামমোহন।। ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ রমেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড ইষ্ট আজ তাঁর বাড়িতে একটি আলোচনা-সভায় ডেকেছেন্। কলকাতায় একটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে সর্বদলের একটি আলোচনা সভা বসবে। পরিকল্পনাটা অবশ্য আমারই।

রমেন।। সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। নইলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে এমন করে কে আর মাথা ঘামাচ্ছে বলুন? একদিকে দেশের সনাতনী দলের সঙ্গে আপনাকে লড়তে হচ্ছে, অপরদিকে দেশের রাজশক্তির সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হচ্ছে।

রামমোহন।। আমার হয়েছে, সেই রূপকথার গল্পের মতো অবস্থা! জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ! কাকে সামলাই বল?

রমেন।। না দাদা, আর দেরী নয়। আপনি তৈরী হয়ে নিন। নইলে আপনার যেতে বিলম্ব হলে হয়ত আলোচনা-টাই ভেস্তে যাবে!

রামমোহন।। হ্যাঁ, এক মিনিটের মধ্যেই আমি তৈরী হয়ে আসছি, তুমি একটু বস।

[রামমোহন পাশের ঘরে চলে গেলেন। রমেন বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে লাগল। এমন সময় বাইরে ঘোড়ার আওয়াজ শোনা গেল। সেই শব্দ এসে ঘরের সামনে থামল। একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে ভেতরে ঢুকলেন]

ভদ্রলোক।। মাপ করবেন। এটা কি রামমোহন রায়ের বাড়ী?

রমেন।। হ্যাঁ। আপনি বসুন।......কিন্তু তিনি যে এক্ষুনি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

ভদ্রলোক।। দেখুন, আমি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের বাড়ী থেকে আসছি।

[হঠাৎ রামমোহনের প্রবেশ]

রামমোহন।। কি আশ্চর্য! আমি যে তাঁর বাড়ীতে যাব বলেই রওনা হচ্ছি।

ভদ্রলোক।। হ্যাঁ, সেই জন্যেই তিনি আমায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

রামমোহন।। কেন? সেই আলোচনা-সভা কি আজ বসবে না? বাতিল হয়ে যাচ্ছে?

ভদ্রলোক।। প্রধান বিচারপতি একটি খুব

জরুরি খবর আপনাকে জানাতে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রামমোহন।। [রমেনের দিকে তাকিয়ে] ও আমার ছোট ভাই। আপনি কথাটা বলতে পারেন।

ভদ্রলোক।। ধন্যবাদ। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন যে দেশের সনাতনী দল শেষ মুহূর্তে খবর পাঠিয়েছেন, রামমোহন রায় যদি এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জড়িত থাকেন, তবে তাঁরা কেউ চাঁদা দেবেন না। এই খবর পেয়ে প্রধান বিচারপতি হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন! তিনি বুঝতে পারছেন না যে, আজ আলোচনা সভা তিনি বন্ধ করে দেবেন কিনা!

রামমোহন।। না-না-না। আপনি প্রধান বিচারপতিকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলকাতায় কলেজ স্থাপন করা। আমি না থাকলে যদি সনাতনী দল অর্থ সাহায্য করেন, তবে আমি নিশ্চয়ই দূরে থাকবো। ম্যানেজিং কমিটিতেও আমার নাম প্রস্তাব করার প্রয়োজন নেই। এই কথাই আপনি তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন!

ভদ্রলোক।। ধন্যবাদ! আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। [প্রস্থান]

রমেন।। [অবাক হয়ে] আপনার পরিকল্পনা, আর আপনি তাতে থাকবেন না, দাদা?

রামমোহন।। তুমি আশ্চর্য হচ্ছ রমেন? আসল কথাটা কি জান? এ হচ্ছে আমার জ্ঞানের আলো জ্বালানোর তপস্যা। আমার সঙ্গে রেষারেষি করেও যদি সনাতনীরা ভালো কাজে অর্থ সাহায্য করেন তবে আমার দেশেই ত' প্রদীপ জ্বলবে। কে সলতে পাকালো, কে তেল ঢেলে দিল, তাই নিয়ে যদি আজও আমরা মারামারি করি, তবে প্রদীপ জ্বলবে কবে? কবে অন্ধকার দূর হবে? Let there be light!

[ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল, শুধু রামমোহনের মুখের ওপর একটি নীল আলো জ্বলতে লাগল।]



না—না—না নিশ্চয়ই হবে

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য



সাহিত্যে যুগের বিভাগ করা খুব শক্ত। আধুনিক বলে কোন যুগের বর্ণনা করা যায় না, কারণ প্রত্যেক জীবন্ত সাহিত্যই চলমান এবং সে জন্যই আধুনিক। পাশ্চাত্ত্য অর্থাৎ ইয়োরোপ ও আমেরিকার মানুষ বর্ত্তমানে এত বেশী জীবন্ত ও গতিশীল, তাদের মনের বিকাশ এত সূক্ষ্ম ও বিচিত্র যে তাদের সাহিত্যেও সেই গতি ও বৈচিত্র্য খুব ফুটে উঠেছে। সময়ের খরস্রোতে একটির পর একটি ভাবধারা নূতন রূপে বা নূতন প্রবাহে জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও কোন ঘাটে নঙ্গর বাঁধতে দিচ্ছে না।

তবু এই প্রবন্ধে যতদূর সম্ভব সর্বাপেক্ষা আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সমস্ত ভাবধারা বা প্রভাব গত বিশ্বযুদ্ধের সংহারলীলা সত্বেও এখনো সাহিত্যে প্রচলিত রয়েছে তাদের কথা একেবারে আনকোরা না হলেও এখানে বাদ দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি। এত ছোট প্রবন্ধে বিরাট্ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সব চেয়ে বড় ভাবধারা বা সব চেয়ে নামী সাহিত্যিক সবার কথাও বলা সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও উপন্যাস

বর্ত্তমান বাংলার মত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে উপন্যাসই সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রিয় ও প্রচলিত। সেজন্য প্রথমেই উপন্যাসের কথা আলোচনা করা হল। ঊনিশ শতকে যখন উপন্যাসের পরিপূর্ণ যৌবনকাল ছিল বলে মনে করা হয় তখনো শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের যে দার্শনিক ভিত্তি ছিল তার পরিবর্ত্তন হতে আরম্ভ করে। মানুষের নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসের মূল শিথিল হতে আরম্ভ করার ফলে সমাজের চাপ, মনের অব-চেতন দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মানুষের মনে অনেক রকম চিন্তা জাগায়। সেজন্য উপন্যাস সহজ সরল কাহিনী হিসাবে রচিত হওয়ার যুগ শেষ হয়ে গেল। অথচ উপন্যাস নিশ্চয়ই কাহিনী। তাই কাহিনীর কাঠামোর পরিবর্ত্তন হল। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের দুটি অমর উপন্যাস জার্মান টমাস ম্যানের বাডেনব্রুকস ও ফরাসী রোম্যাঁ রলাঁর জ্যাঁ ক্রিস্তফ্ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও রুচির পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও এখনো এত বেশী প্রিয় যে এ-দুটি বইয়ের উল্লেখ এখানে করতে হবে। এ-দুটিতেই উপন্যাসের ধারা যে নতুন গতিপথে প্রবাহিত হবে তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। ভদ্র মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ক্ষয়ের কাহিনী এবং তারই মধ্য থেকে শিল্প সৃষ্টির রূপ টমাস ম্যান দেখিয়েছেন। ম্যানের চোখে ক্ষয়ের শেষ পরিণতি হচ্ছে শিল্পের দৃষ্টি এবং ক্ষয়কেও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে অনেক সাহিত্যিক এই ক্ষয়কে কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু তার আড়ালে যে সৃষ্টির বীজ আছে তার বিকাশকে উপেক্ষা করেছেন মনে হয়। রোম্যাঁ রলাঁর পূর্ণ দৃষ্টি ছিল শিল্প সৃষ্টির দিকে। তাঁর বিরাট উপন্যাসের নায়ক একজন সঙ্গীতশিল্পী, তার মনের বেদনার মধ্যে রূপ পেয়েছে একটি সুস্থ সমাজের প্রতিনিধি, দুস্থ মানবতার প্রতীক নয়। এই কথাটি বার বার এখানে বলার উদ্দেশ্য এই যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শক্তির উৎস হচ্ছে গঠন-মূলক জীবনী শক্তি। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ

যাকে বলেছে মানুষের প্রাণশক্তি তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের অমর উপাদান।

বর্ত্তমানে কিন্তু এই প্রাণশক্তিতে সন্দেহের আভাস দেখা দিয়েছে। বছর ত্রিশ চল্লিশ আগেই বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান ঔপন্যাসিক কাফকা দেখান যে একাকী মানবের জীবন হচ্ছে একটী দুঃস্বপ্ন, বহু অনর্থে ভরা। আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস হারাণোর ফলে এই রকম ভয় আর আশাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। দুটি বিরাট বিশ্বযুদ্ধ এই ভাবধারাকে আরো বেশী প্রবল করে তুলেছে। জার্মানীতে আর্ণল্ড ডজাইগ, চেকোস্লোভাকিয়াতে জারোস্লাভ হাসেক, ইটালীতে ইটালো স্বেভো মানুষের এইরকম দুঃখজনক পরিণতির ছবি এঁকেছিলেন।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগৎ দুঃখজনক পরিণতিতে এসে থেমে থাকতে চায় না। সেজন্য সে জগতে আশা না খুঁজে পেলে নিরাশাকেও বরণ করে নেয় না। মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কথা নেই। আগে যদি প্রাণ বাঁচে তার ওপর নির্ভর করে মন ফুলের মত মঞ্জুরিত হবে, আত্মা ফলের জন্য সাধনা করবে। এগজিষ্টেনশিয়ালিজম্ অর্থাৎ অস্তিত্ববাদের উপর নির্ভর করে যে বর্ত্তমান যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য গড়ে উঠছে তার মূল তত্ত্বকথা বোধ হয় এই। এখনো এর প্রকৃত মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ হয়নি বলে 'বোধ হয়' কথাটি ব্যবহার করা হল। অবশ্য এই ভাবধারা যুদ্ধের আগেই ইয়োরোপীয় বিশেষ করে ফরাসী চিন্তাশীলদের মনে এসেছিল। এই ভাবধারা আমাদের প্রচলিত সাধারণ নৈতিক এবং চরিত্র সম্বন্ধীয় রীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। উদাহরণ হিসাবে আঁদ্রে জিদের দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের কথা ধরা যাক। 'লে কেভ দা ভাতিকান' অর্থাৎ ভাটিকানের গুহা বইয়ের কাহিনীর পরিণতি হচ্ছে একটি নিরীহ অপদার্থকে চলতি ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া; এই অসৎ কর্মের পিছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ এই উদ্দেশ্যহীন কাজ করবার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস গড়ে উঠেছে। কিন্তু জিদের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস লা পোর্ত এত্রোৎ অর্থাৎ 'তোরণটি সোজা' বইতে একটি মেয়ে রীতিনীতি বজায় রাখতে গিয়ে প্রেমকে বিসর্জন করল। ফ্রাঁসোয়া ম্যরিয়াক বা আদ্রে মালরুর উপন্যাস ও পাপ আর অপরাধের ছবি আঁকার পটুতার জন্য বিখ্যাত। জ্যাঁ পল সার্তরও এই ভাবধারার একজন বিশিষ্ট লেখক। যুদ্ধোত্তর বা যুদ্ধের সময়কার ইয়োরোপের সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে এই রকম নিরাশা আর পাপের অথবা নীতিহীনতার পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা করা স্বাভাবিক; কিন্তু একথা বার বার মনে হয় যে সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ হিসাবে এই ধরণের উপন্যাস নিশ্চয়ই আকর্ষণীয়, কিন্তু এগুলিতে টলষ্টয়ের উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তির' মধ্যে একটি যুগের বিশ্লেষণের চেয়েও বড় যে সর্বকালীন উপাদান আছে তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

টলষ্টয়ের দেশেও মানুষের দুঃখের ভিত্তিতে এই শতাব্দীতেও মহৎ সাহিত্য রচনা হয়েছে। গর্কীর বইতে রুশিয়ার বিপ্লবকালের যে ছবি আছে, তার সার্থকতাকে প্রমাণ বা প্রদর্শন করবার জন্য বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে। মাইকেল শলোখফ, ইলিয়া এহরেনবুর্গ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখক ওই বিরাট দেশের ও বাহিরে পাঠকদের হৃদয় জয় করেছেন। এদের রচনার মধ্যে নিজের দেশের নূতন মতবাদের সমর্থনের চেষ্টা আছে বলে অনেকে অনুযোগ করেছেন, কিন্তু সৃষ্টিধর্মী মানস ও প্রতিভাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অন্যপক্ষে দুটি সাম্প্রতিক বই বিশ্বের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন এনেছে। 'নট বাই ব্রেড য়্যালোন' অর্থাৎ শুধু খাবার দিয়ে জীবন ধারণ করা যায় না এই নামের একটি উপন্যাসে রুশ রাষ্ট্র ও রাজনীতির কাঠামোকে উপন্যাসের মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়েছে। তার চেয়ে বেশী প্রবল প্রতিবাদ রূপ পেয়েছে বোরিস পাস্তারনেকের জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো'তে। এই বিরাট উপন্যাস লেখকের নিজের দেশে ও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি এবং বিদেশে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা খ্যাত নোবেল পুরস্কার পাওয়ার

পরেই বইটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ নিয়ে এত বেশী বাদানুবাদ হয়েছে যে সাহিত্য-মূল্য ছাড়াও শুধু সে জন্যই হয়ত সাহিত্যের ইতিহাসে বইটি স্থান পেয়ে যাবে। পাসতারনেকের কবিত্ব প্রতিভাও অসাধারণ।

আরো একটি রুশ সাহিত্যিক নবোকফ আমেরিকায় লিখিত তার নূতন উপন্যাস 'ললিতা'র কল্যাণে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বইটির রুচি ও নীতি নিয়ে ভীষণ তর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং ইংলন্ডের মত উদার মতবাদের দেশেও বইটির আমদানী বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু সে নিয়ে সে দেশে সাহিত্যিকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলছে।

সাহিত্যিকের স্বাধীনতা সম্ভবত চিরকালই আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু গত কয়েক-বছর এই আলোচনা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছে। রুশিয়াতেও তাশকেন্টে আফ্রিকা ও এশিয়ার সাহিত্যিকদের সম্মেলনে এ-নিয়ে আলোচনা ও বাদানুবাদ হয়। সদ্য স্বাধীনতা পেয়ে অনেক দেশের সাহিত্যিক অনুভব করেছেন যে রাজনীতির দিক দিয়ে স্বাধীনতা না থাকলে সাহিত্য রচনা আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে। অন্য-পক্ষে এই তর্কও উঠেছে যে স্বাধীন দেশেও যদি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীন মত গড়ে উঠতে না দেওয়া হয় তাহলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা হতে পারে না। এ-মতবাদের স্বপক্ষে কেহ কেহ রুশিয়ার প্রতি ইঙ্গিতও করেছেন। আমাদের দেশের প্রতিনিধিরা কিন্তু এই মতও প্রচার করেছেন যে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখনও আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয়েছে।

অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা পরাধীনতা সাহিত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি করতে পারে না—যদি সাহিত্যিকের মনের স্বাধীনতা থাকে, যদি তার সৃষ্টির পথে রাজনীতি কোন বাধা না দেয়। ইংলন্ডে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ জীবনের স্বাধীনতার ফলে সাহিত্যের প্রবাহ খুব খরস্রোতে বয়েছে। দল বা রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে বই প্রকাশে কোন বাধা নেই এবং পৃথিবীর সবদেশেরই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া সম্ভব। ইংরেজী উপন্যাস গত ত্রিশ বছরে আশ্চর্য্যরকম বিভিন্ন বিচিত্র রূপ নিয়েছিল। একদিকে গলসাওয়ার্দি প্রশান্ত ভাবে স্নিগ্ধ ভাষায় ফরসাইট সাগার মত বিরাট উপন্যাস সমষ্টি লিখেছেন; অন্যদিকে লরেন্স মনের বিপুল ও নিষ্ঠুর বিশ্লেষণ করে, দুর্নীতিকেও শিল্পের আবরণে সাহিত্যে আসন দিয়ে সমানে ঝড় তুলে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সমরসেট মম আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'অব হিউম্যান বন্ডেজ'এ মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতাকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়েছেন। আলডুস হাকসলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে প্রবৃত্তি আর যুক্তির দোটানায় দিশেহারা মনের ছবি এঁকেছেন।

রিয়েলিজম অর্থাৎ বাস্তবতার চিত্র আঁকতে গিয়ে ল্যাটিন দলীয় দেশ গুলির উপন্যাসে সামাজিক অবনতি ও দারিদ্র্যের ছবি খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। স্পেনে ক্যামিলো জ্যোসে চেলা, ইটালীতে আলবার্টো মোরাভিয়া প্রভৃতি ঔপন্যাসিক এ-বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অবশ্য স্পেনে বহু বছর ধরে মহিলা ঔপন্যাসিকরা মিষ্টি মিষ্টি উপন্যাস লিখে বার্ষিক পুরস্কার পেয়ে এসেছেন। স্প্যানিশ আমেরিকার গদ্য সাহিত্য মোটামুটি ইয়োরোপীয় ছাঁচেই এখনো ঢালা আছে। শুধু দারিদ্র্য আর অনগ্রসর সমাজের সংকীর্ণতার উপর দৃষ্টি কিছু বেশী।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গদ্যসাহিত্যে 'আমেরিকান শীল' অর্থাৎ মার্কিণ পটভূমিকা খুব প্রবল ভাবে ফুটে উঠেছে। নূতন জীবনী-শক্তি সম্পন্ন অল্পবয়স্ক দেশের সাহিত্যের পক্ষে এটা খুব স্বাভাবিক। তার ফলে শুধু কাহিনীর বৈচিত্র্য নয়, মনের বিশ্লেষণও এই সাহিত্যে প্রচুর। ভাষার কারুকার্য্য যে কতখানি শিল্প-কলার স্তরে উঠে গেছে তা গত কয়েক বছরের টাইম প্রভৃতি জন সাধারণের প্রিয় সংবাদ পত্রিকা পড়লেই বুঝা যায়। আপটন সিনক্লেয়ার বা সিনক্লেয়ার লুইসের খবরে সমৃদ্ধ উপন্যাসের পরে এখন হেমিংওয়ের সাম্প্রতিক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'বুড়ো আর সমুদ্রে'র ছোট্ট পরিধি কিন্তু বিরাট মনের বিশ্লেষণ বিশেষ

ভাবে নজরে পড়ে। নিত্য গতিশীল আমেরিকান জীবনের পরিবর্ত্তনের মত তার সাহিত্যের বিষয়-বস্তু আর বর্ণনা ভঙ্গি দুয়েতেই পরিবর্ত্তন এসেছে।

রেডিয়ো, সিনেমা আর টেলিভিসন আমেরিকায় এখন আলো বাতাসের মত সাধারণের ভোগ্য আর সহজ প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। ইয়োরোপের অনেক দেশ সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে। কয়েক বছর আগে পাশ্চাত্ত্য জগতের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সাহিত্য পত্র টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেন্টে একটি আশংকা প্রকাশ করা হয় যে এই বিজ্ঞানের দানগুলির কল্যাণে মানুষ সহজে ও বেশী আনন্দের সঙ্গে ভোগলাভের পথ পাবে এবং সেজন্য বই পড়ার রেওয়াজ কমে যাবে। পড়া একটা বিলাসিতায় পরিণত হবে, ঠিক যেমন ইংলন্ডে ঘোড়া চড়া একটী বনিয়াদী বিলাসিতা। কিন্তু ইউনেস্কোর প্রকাশিত পরিসংখ্যানে এরকম কোন ভয়ের চিহ্ন এখনো দেখা যায় নি। তবে সাহিত্যের রূপান্তর অবশ্যই হচ্ছে। বেতার নাট্য আর টেলিভিশন এত বেশী জনপ্রিয় যে নাট্যকার যখন নাটক লেখেন তখন এই দুই যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমের দিকে তার লক্ষ্য যদি বা না থাকে, পরে অর্থাৎ নাটক সফল হলে এদের উপযোগী করে তাকে ভেঙ্গে গড়ে নিতে হবে। পেশাদার নাট্যশালা পশ্চিমে খুবই সফল এবং সেজন্য শুধু মঞ্চের উপযোগী নাটক লিখতে পশ্চিমের নাট্যকার মোটেই কুন্ঠিত হন না। নতুন নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা পেশাদার নাট্যকারকে অতিক্রম করে "লিটল থিয়েটার মুভমেন্ট" আশ্রয় করে সমগ্র জাতির জীবনকে প্রভাবান্বিত করছে। প্রতি কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ অফুরন্ত। ইউজেন ওনীল আমেরিকার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নাট্যকার, কিন্তু নানা পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি উন্নতির পথে এগিয়ে যান। সমরসেট মম ইংলন্ডের মাটিতে মনকে পরিপুষ্ট করে সারা বিশ্বের পরিবেশে তার নাটকগুলির ঘটনা সৃষ্টি করেন। বার্ণার্ড শ'র মত যুগান্তকারী প্রতিভা বর্ত্তমানে কোন পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারের মধ্যে পাওয়া যাবে না কিন্তু নোয়েল কাউয়ার্ড বা টেনেসী উইলিয়ামসের মত প্রভৃত জনপ্রিয় নাট্যকারের অভাব নেই। এদের মধ্যে দুটি নূতন বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার মত। খুব প্রত্যুৎপন্নমতি আর পালিশকরা কথোপকথনে বর্ত্তমান নাটক পুরাতন নাটককে সম্পূর্ণরূপে হার মানিয়েছে। তা ছাড়া দিলখোলা হাস্যরসের বা কৌতুকের ফোয়ারা ছোটাতে এগুলি অসামান্য ভাবে সফল হয়েছে।

নাটক

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্ত্য নাট্য-রচনার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এসে গেছে বহু নাটক মিউজিকাল অর্থাৎ সঙ্গীত বহুল ভাবে রচিত হয়। অনেক প্রচলিত বা বিখ্যাত পুরাণো নাটককে সঙ্গীত বহুল ভাবে নূতন করে গড়ে নেওয়া হচ্ছে। এ-সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় উদাহরণ গত দু তিন বছরের মধ্যে দেখা গেল। বার্ণার্ড শ'র বিখ্যাত গুরু গম্ভীর কিন্তু মানবতার রসে পূর্ণ নাটক 'পিগম্যালিয়ন' পাঠ্য নাটক হিসাবে যত জনপ্রিয় হয়েছিল মঞ্চে তা হয় নি। কিন্তু সেই একই কাহিনীকে বিশেষ অদল বদল না করে 'মাই ফেয়ার লেডি' নামে একটি সংগীত বহুল নাটকে পরিণত করা হয়েছে এবং এর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা নাট্যজগতে চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে।

গীতি-কবিতা

স্বভাবতই গীতি কবিতারও সৃষ্টি খুব বেড়ে গেছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটি মূল ভাবধারা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের বদলে, পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক; এই সম্পর্কের বিশ্লেষণে দেখান হয়েছে যে "পুরাণো কালের বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুরোণো ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ মানুষের মনে আদিকাল থেকে যে ভক্তি ভাব রয়ে গেছে তাকে তৃপ্ত করবার মত কোন নতুন ভগবানকে বিজ্ঞান আর বাস্তবতা সৃষ্টি করতে পারে নি।" এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমেরিকার মত বাস্তবধর্মী আর সাংসারিক মাপকাঠিতে সবচেয়ে বেশী সফল দেশেও তাদের শ্রেষ্ঠ

রচয়িতাদের মধ্যে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মধ্যেই ভালবাসা দিয়ে গড়ে নেওয়া আর রহস্যময়তার মধ্যে ডুবে যাওয়ার উদাহরণ দেখা যায়।

সঙ্গীত

গীতিকবিতা আর সঙ্গীতের আদর ওদেশে অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। একটী সামান্য উদাহরণ ধরা যাক। কয়েক বছর আগে একজন তরুণ তার পুরাণো কলেজে বেড়াতে এসেছিল। বেড়াতে বেড়াতে সে কলেজের মাঠে শুয়ে গুণ গুণ করতে লাগল। মনের খুশীতে তার গলায় গান এসে গেল। 'ষ্টার ডাস্ট,' তারার গুড়ো গানটির নাম। তার কয়েকটি লাইনের ভাবানুবাদ হচ্ছে এই ঃ

কাননে দেওয়াল পাশে
যেথায় উজলি রহে তারা
তুমি বাঁধা বাহু পাশে,
রূপকথা গাহে পাপিয়ারা,
স্বরগের গান ওঠে
যেথায় গোলাপ ফোটে,
বৃথা স্বপ্ন দেখি হায়,
নিতি রহ এ হিয়ায়,
তারার গুড়ায় গান ভরে
প্রেমের স্মৃতির আখরে।

এই একটি গীতি-কবিতার রেকর্ড থেকেই সেই ছাত্রটি এযাবৎ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রয়্যালটি পেয়েছে। সঙ্গীতের রূপে কবিতা যে টেলি-ভিসনেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ চারদিকে।

কবিতা

কে বলে পশ্চিমের বাস্তববাদীও যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রবে ব্যস্ত জীবন থেকে কবিতা শুকিয়ে লোপ পেয়ে যাচ্ছে?

বরং এমন সন্দেহ কেউ কেউ করেন যে যদিও উপন্যাস সাহিত্য শিল্পের সবচেয়ে কম বয়সী রূপ হয়ত টেলিভিসন ও টেলিভিসনের পর্দায় দেখান সিনেমার প্রকোপে ব্যবসাদারী উপন্যাস পর্য্যন্ত পিছু হটে যাবে। এমন কি নাটকও যদি কবিতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে না এগোয় তাহলে জনপ্রিয় পাইকারী হিসাবে রচিত হাল্কা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার কাছে তাকেও মাথা নীচু করতে হবে। এ কথা যারা বলেন তারা মনে করেন যে বার বার পাঠ করতে হয় ও সমস্ত কিছু থেকে মনকে সরিয়ে এনে পাঠ করতে হয় বলে গানের মত, ছবির মত কবিতারও একটি শাশ্বত বাণী থাকবে। অর্থাৎ কবিতাই নাকি সাহিত্যের মধ্যে ভবিষ্যতের সব চেয়ে আশাপ্রদ রূপ।

কিন্তু পশ্চিম জগতে এবং আমাদের দেশেও কবিতার পাঠক সংখ্যা কম। তবুও যে পাশ্চাত্ত্য কবিতা নূতন রূপে নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে তাতেই তার প্রাণশক্তির পরিচয় পাই। বিখ্যাত ইংরেজ কবি (জন্ম আমেরিকায়) ইলিয়টের কবিতার মধ্যে পাই "তাদের অশ্রু-জল যাদের স্বপ্ন কঠিন বাস্তবের হুকুম মানে না"। স্পেন্ডার মানুষের হৃদয় বৃত্তির উপর এত ভরসা রাখেন যে আশা হয় প্রকৃতির রূপ, মানুষের প্রীতি আবার হয়ত যন্ত্রসভ্যতা আর গতির আবেগ থেকে মানুষের আকাঙ্খাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। কবি অডেন শ্রেণীবিভাগে খন্ডিত সমাজের মূলে কবিতা দিয়ে যেন কুঠারাঘাত করতে চান। স্পেনে রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ম সত্ত্বেও বন্‌সনো, ওটেরো হিয়েরো প্রভৃতি তরুণ কবি আন্তরিক সরলতা ও গভীর অনুভূতি মত কবিতা লিখছেন। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে চিলির কবি নেরুডা, আর্জেন্টিনার কবি মলিনারি, মেক্সিকোর কবি অক্টাভিয়ো পথ কবিতার নূতন পথ খুলে দিচ্ছেন। স্পেনের কবি জুয়ান হিমেনেথ নির্বাসনে থেকে সম্প্রতি তার গাধার সঙ্গে মনের কথা কইছেন এমন ভাব দেখিয়ে যে কাব্য রচনা করেছেন তা বছর আগে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রবন্ধ সাহিত্য এত বিশাল আর জ্ঞান-বিজ্ঞান গভীর তথ্য-কথায় সমৃদ্ধ যে তার পরিচয় এখানে দেওয়া

সম্ভব নয়। প্রবন্ধ সাহিত্যের সম্মান ও প্রবন্ধ বইয়ের প্রচার পশ্চিমে খুব বেশী।

আত্মজীবনী

আত্মজীবনী বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে—বিশেষ করে যদি সে জীবনী বিখ্যাত লোকের ঘটনা বহুল জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী হয়। চার্চিল নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে অনেকে অনুযোগ করেছিলেন যে তিনি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলেই তাঁর রাজনীতিক গুরুত্বের জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চার্চিলের আত্মকথা ও মহাযুদ্ধের ইতিহাস, যে ইতিহাসের সঙ্গে তিনি নিজে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, এদের মত এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাবার বই ক'টি লেখা হয়েছে? মাত্র সম্প্রতি গত মহাযুদ্ধের একজন প্রধান নায়ক মন্টগোমারী তার স্মৃতিকথা লিখে সাহিত্য-জগতে তোলপাড় এনেছেন। তার কাহিনী এত বেশী দামে এবং এত বেশী সংখ্যায় বিক্রী হয়েছে যে চার্চিল তাকে ঠাট্টা করে বলেছেন,—তুমি জীবনকে এখনো খুব চড়া দামে বিকোচ্ছ। যুদ্ধ সাহিত্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বই ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ। ফরাসী ভাষায় বর্ত্তমান ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের আত্মজীবনী একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ঘটনা।

কিন্তু প্রচ্ছন্ন আত্মজীবনীও খুব জনপ্রিয় এবং বিশ্বসাহিত্যে অমরস্থানের অধিকারী হতে পারে। পাস্তেরনাকের উপন্যাস ডক্টর জিভাগো এরকম একটি বই। আত্মজীবন ও দেশের জীবন সঙ্গে মিশ খেয়ে গিয়েছে। নিজের আশা ও আশাভঙ্গ দেশের পটভূমিকায় দেশাত্মার মুখপাত্র হয়ে উঠেছে।

ভ্রমণ কাহিনী

ভ্রমণ কাহিনীও একরকমের আত্ম জীবনী—সমসাময়িক ও ক্ষণিক এবং দেশকালের সীমায় আবদ্ধ জীবনী। পাশ্চাত্য দেশে দেশভ্রমণেরও য়্যাডভেঞ্চারের রেওয়াজ খুব বেশী বলে এই জাতীয় বইয়ের মধ্যেও স্থায়ী সাহিত্য পাওয়া যায়। দুর্গম বা অজ্ঞাত পরিবেশে রচিত বই অন্তত সাময়িক ভাবে আলোড়ন আনে। বছর দুই আগে 'তৃতীয় নয়ন' নামে তিব্বত ও লামাদের অলৌকিক ক্ষমতার পটভূমিকায় একটি ইংরেজের লেখা বই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছদ্মনামী ও সম্ভবত তিব্বতীয় কোন লামার রচনা বলে প্রথমে মনে করা হয়। পরে আসল লেখককে ইংলন্ডে আবিষ্কার করা হয়। এই বৃটিশ নূতন লেখক ধরা পড়ে ভাঙ্গলেন কিন্তু মচকালেন না। অর্থাৎ তিনি বললেন যে ওই নিষিদ্ধ রহস্যময় দেশে কোন লামা তার কপালের মাঝখানে তৃতীয় নয়ন ফুটো করে খুলে দিয়েছিলেন এবং সেই শিবনেত্রের দৃষ্টিতে তিনি এই কাহিনী উদ্ঘাটিত করেছেন।

পূর্ব ইউরোপের বিখ্যাত লেখক কোয়েস্টলার এককালে তার জীবনস্মৃতিমূলক 'মধ্যাহ্নে আঁধার' বইটিতে কম্যুনিষ্ট রাজনীতিক মতবাদের অন্তরালের কাহিনী বর্ণনা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর নূতন বই 'ঘুমিয়ে হাঁটে যারা' তাদের কাহিনীও একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বই যদিও এটি মূলত বিশ্বরহস্য নিয়ে লেখা।

ছোট গল্প

পাশ্চাত্ত্য ছোট গল্পের সম্বন্ধে এই ছোট প্রবন্ধে কিছু বলার বেশী স্থান নেই। তার প্রধান কারণ এই যে বিশেষত ইংলন্ড ও আমেরিকায় ছোট গল্পের রেওয়াজ খুব কমে গেছে। অজস্র ছোট গল্প লেখা হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি সবই সচিত্র বা মেয়েদের হাল্কা পত্রিকার জন্য। রঙ রস শিল্প চরিত্র বিশ্লেষণ সবই সেখানে হাল্কা হওয়া দরকার। এমন কি প্রকাশ-করাও খুব বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের খাতিরে ছাড়া তার নিজের গল্প সংগ্রহও প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখান না। বিখ্যাত ও বিতর্ক-মূলক বেষ্ট সেলার উপন্যাস 'ললিতা' প্রকাশের আগে নবোকস্কের কোন ছোট গল্পই ইংরেজীতে

প্রকাশিত হয় নি। রাতারাতি নাম হয়ে যাবার পর তার কুড়িটি রসোত্তীর্ণ গল্প সবে প্রকাশিত হল। যে সাহিত্য গত কয়েক দশকের মধ্যে সমরসেট মমের ছোট গল্পের মত গল্প প্রকাশ করেছে সে সাহিত্যের পক্ষে গল্পের প্রীতি থাকা সত্ত্বেও এরকম উদাসীনতা আশ্চর্য্যজনক। অবশ্য ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে রুশিয়া ও ফ্রান্সে ছোট গল্পের আদর ও শিল্পের উৎকর্ষ এখনো অনেকটা বজায় আছে। একথা অনেকে মনে করেন যে হাল্কা ও ক্ষণিকের পড়ার জন্য কেনা পত্রিকায় প্রথমে বের হয় বলে ছোট গল্প সমজদার পাঠকের নজরে পড়তে চায় না। অনেকটা সেজন্য ক্ষমতাশালী সাহিত্যিকরাও উপন্যাসের মধ্যেই বেশী আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু আধুনিক সব চেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস আয়তনে প্রায়ই বড় ছোট গল্পের মত হয়ে এসেছে। এতে প্রমাণ হয় যে মানুষের হাতে সময় কম বলে সে বিরাট উপন্যাস পড়তে চায় না অথচ ছোট গল্পের মধ্যেও তার পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। সে জন্য সে উপন্যাসের শিল্পচাতুর্য্য প্রায় বড় গল্পের মধ্যেই আঁটিয়ে নিতে চায়।

শিশু-সাহিত্য

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিশু-সাহিত্য একটী নতুন মোড় নিয়েছে। আমাদের দেশে এবং পশ্চিমেও বয়স্করাই শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনা করে থাকেন। শিশু ও কিশোররা তাদের মনের প্রথম জাগ্রত সাহিত্য রচনার ইচ্ছাকে ডায়েরী বা স্কুলের খাতার মধ্যেই গোপন করে রাখে। কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকায় বর্ত্তমানে অল্প বয়সেই অনেকের সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ বইয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সে প্রতিভা স্বীকৃতও হচ্ছে। সম্ভবত বেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা ও নানা বিষয়ে বৃহত্তর জ্ঞান লাভের ফলে প্রতিভার প্রকাশ অল্প বয়সেই হতে সুরু করেছে।

ফরাসী দেশে সাহিত্যের আদর এত বেশী যে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার খবর হিসাবে সাহিত্য সেখানে রাজনীতিকেও হঠিয়ে দিতে পারে। সেই দেশে সম্ভবত এই শতাব্দীর অন্যতম বিস্ময়কর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে আট বছরের বালিকা মিনু দ্রুয়ের কবিতার মধ্যে। ফরাসীতে মিনু 'কথার মানে বেড়াল ছানা। এই বাচ্চার দর্শটি কবিতা আর দর্শটি গদ্যকাব্য চিঠি নিয়ে প্রথম বইটি ১৯৫৫ সালে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় সাড়া পড়ে যায়। প্যারিসে দৈনিক পাঁচ লক্ষ সংখ্যা বিক্রয়ের কাগজ 'লে ফিগারো' প্রথম পৃষ্ঠায় এই বইটিকে উচ্ছ্বসিত ভাবে অভিনন্দন জানায়। ফরাসী একাডেমীর সভ্যরা সমান ভাবে তার প্রশংসা করেন। তার একটি কবিতার ভাবানুবাদঃ

শাদা পথ,
কোথায় চলেছ তুমি?
তুমি শুধু একটা প্রসারিত বাহু—
সুদূর প্রসারিত—যা আমায় ডাকছে
কাছে আসতে,
আরো কাছে,
সেই বালাটির কাছে
যা ওই শেওলা-দাঁড়ি-গজানো সাঁকোটা
পরিয়েছে তোমার মণিবন্ধে।

এই কবিতাগুলির স্বতস্ফূর্ত্ত আবেদন, আবেগভরা রূপক দেখে এগুলি সত্যই এই বালিকার রচনা কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেন যে বাচ্চা মেয়েটির পুতুল নিয়ে খেলায় ব্যস্ত থাকা উচিত। তার উত্তরে মিনু বলেছিল যে "পুতুলরা সবাই প্রাণ হীন, জ্যান্ত পৃথিবীতে আমার কি আর কিছু করবার নেই?"

মিনুর আরেকটি কবিতার নমুনাঃ

গাছ

একটী আগোছাল শিশুর আঁকাঃ
বড় গরীব সে
পারেনি রঙীন খড়ি কিনতে,
তার ইস্কুলের ম্যাপ আঁকার খড়ির
শেষ বাদামী টুকরো গুলো দিয়ে
হিজিবিজি এঁকেছে সে।
গাছ, আমি এলাম তোমার কাছে,

সান্ত্বনা দাও আমাকে
আমি শুধু আমি বলে।

ফ্রান্সের লেখক গীতিকার ও সুরকার সংঘের সভ্য হিসাবে মিনুকে যখন গ্রহণ করা হল তখন এই বিস্ময়কর প্রতিভাকে আবার যাচাই করা হয়। একটি ঘরে একা রেখে কয়েকটি বিষয়ে ওকে কবিতা লিখতে দেওয়া হয়। মাত্র পচিশ মিনিটে আটত্রিশ লাইনের একটি সুন্দর কবিতা মিনু প্যারিসের আকাশ সম্বন্ধে রচনা করে সবাইকে অভিভূত করে দেয়। তারপরে টেলিভিসনেও সে সকলের চোখের সামনে খুব তাড়াতাড়ি লন্ডন সম্বন্ধে একটি প্রকান্ড কবিতা রচনা করে।

বেলজিয়ামের য়্যান বোদার্ত চতুর্দশী। কিন্তু সে 'নীল কুকুর ও অন্যান্য গল্প' নামে একটি বিস্ময়কর গল্পের বই রচনা করেছে। যখন সে স্কুলে থাকে না অথবা বাড়ীতে পড়াশোনা করে না তখনি সে জঙ্গলে চলে যায়। সেখানেই তার গল্পের মশলা সংগ্রহ করে। ঈশ তাথেকে থার্বার এমন কি চলচ্চিত্রকার ওয়াল্ট ডিসনী পর্য্যন্ত সব শিশু গল্পকারই নীতি-কথা মূলক গল্প লিখেছেন। কিন্তু বোদার্ত সত্য সত্যই শিশু সাহিত্যিক। সে নীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার গল্পগুলি মনের ছোট ছোট বাসনা খেয়ালকে ঝলমলে রূপ দেয়; কবিতার সৌন্দর্য্যে ভরে দেয়। আন্তরিকতাই হচ্ছে তার গল্পের মূল সৌন্দর্য্য। একটা নীল পারিয়া কুকুর জনহীন রাস্তায় ঠান্ডায় বরফে মরে যাচ্ছে; মরতে মরতে সে খুসী হয়ে গেল যখন তার মনে হল যে রাস্তার বরফে তার গা এমন ভাবে ঢেকে যাচ্ছে যে সে সুন্দর শাদা কুকুর নয় বলে কেউ আর এখন তাকে ছোট নজরে দেখবে না। তার আরেকটা গল্পে একটি কোলে রেখে খেলা করার মত ছোট কুকুর রাতে খেতে আসার সময়কার বিশেষ পোষাক পরে এসে এমন কান্ড করল যে সকলে হেসেই অস্থির।

পাশ্চাত্ত্য জগতে শিশু-সাহিত্যের এইটি বিশেষত্ব যে শিশু মনের পরিচয় ও লীলা সেই বয়সীদের লেখনী থেকেই সবাই পেতে চায়। আমেরিকা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত এরূপ একটি সংগ্রহে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জিন ষ্ট্যাফোর্ডের ছয় বছর বয়সে রচিত এই কবিতাটি আছেঃ

কংকর, কংকর, মাটির উপরে
শুয়ে আছ নিরাপদ নির্ভরে;
তোমারে দেখায় কেন যেন তুমি মরা,
কারণ কি এই যে তুমি শির-হারা?

বিশ্ববিখ্যাত কবি ইলিয়টের সাতবছর বয়সে রচিত জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী উল্লেখযোগ্য।

এদের চেয়ে একটু বেশী বয়সের অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সের উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর প্রথম উপন্যাস "বজুর ট্রিসট্রেস' অর্থাৎ সুপ্রভাত বেদনাবিষাদ প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কপি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রী হয়ে যায়। মূল ফরাসী ভাষায় বইটি অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিন লক্ষ কপি ও ইংরেজীতে প্রথম সংস্করণ এক লক্ষ কপি বিক্রী হয়ে যায়। এই কিশোরীর অন্যান্য বইও প্রায় সমান ভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। ফ্রান্সে আরো একটি ষোড়শী কিশোরী এবং আমেরিকাতে দুটি অষ্টাদশী কিশোরী উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছেন। এদের বইয়ের মধ্যে অনেকটাই অকালপক্কতার স্বাদ পাওয়া যায়। অনির্দিষ্টের অজ্ঞাতের প্রতি আকর্ষণ, দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখ বিলাস এই জাতীয় সাহিত্যকে কিশোর কিশোরীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। পরিণত বয়স্ক ঔপন্যাসিক হেমিংওকে একটি মত প্রচার করেছেন যে যা করলে আনন্দ অনুভব করা যায় তাই ভাল। এই মূল্যায়নকে এই অপরিণত বয়স্ক লেখক লেখিকারা শক্তিশালী রচনায় অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত করে নিয়েছেন। এরা বলেন যে যদি কোন কিছু অনুভব করা যায় তাই ভাল। শূন্যতা, বেদনা, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হাহাকারে মনকে ভরে রাখার মধ্যে অনুভব ও আদর্শের দিক দিয়ে দেউলিয়া হবার ভাব এই সাহিত্যে খুব প্রকট। এই সাহিত্য মানুষের মনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যাবে

কি না সন্দেহ; কিন্তু বর্ত্তমানে এর প্রচারকে অস্বীকার করা যায় না।

সাহিত্যের এই সাময়িক হাল্কা উচ্ছ্বাস সংরক্ষণশীল সমাজকে আঘাত করছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বর্ত্তমানে রক য়্যান্ড রোল নামে যে ঘুরতাই দোদুল দোলন নাচ পশ্চিমে চালু হয়েছে তার সঙ্গে তাল রেখে শুধু যে চটুল ছন্দের গান তৈরী হচ্ছে তা নয়, তাদের মতবাদকে কেন্দ্র করে ছোট গল্প ও উপন্যাসও রচনা হচ্ছে। একটা য়্যামেরিকান গানের উদাহরণ;

ও গো পঞ্চদশীর মা,
এই কি হ'ল ঠিক?
এত জলদি ভুললে নাকি
নাচতে তুমি ঘূর্ণি পাখী
প্রেম্‌সে অনিমিখ?
এই কি হল ঠিক?

এই গানটিতে বাপ মার বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর সুস্পষ্ট। বহু গল্প উপন্যাসও এই সুরে লেখা হচ্ছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য স্রষ্টাদের মহত্তর প্রতিভা এই হাল্কা সাহিত্যে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। যারা চিন্তাশীল বিদ্রোহী তারা যুদ্ধের ভাঙ্গন ধরা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাচ্ছেন তাও সুসাহিত্য সৃষ্টি করবে। দি য়্যাংগ্রি ইয়ং মেন, অর্থাৎ রুষ্ট তরুণদল স্রষ্টা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

এই স্রষ্টা তরুণদলের প্রশস্তি করেই এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করা উচিত। সাহিত্য চিরকালের জিনিষ, একই জিনিষ বার বার বলা হয়েছে সাহিত্যে, কারণ সেই বক্তব্য বিষয়টি চিরনূতন; শেকসপীয়রের ভাষায় চিরসবুজ। আমাদের দেশের কিশোরদের পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে হচ্ছে। অবশ্য এই ছোট পরিসরে সব কথা লেখা হয় নি; এমন কি সবচেয়ে বড় কথা ও সাহিত্যিকরাও হয়ত কিছু কিছু বাদ গেছেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিশালতা ও বৈচিত্র্যই তার প্রধান কারণ।

● ● ●

অনেকের মতে রাশিয়ার বিপ্লবই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের জীবনে দুঃখ এনেছে। জিভাগোর বাবা আত্মহত্যা করেছেন; তার মা যক্ষ্মায় মারা গেছেন। কোমারোস্কোভ লারা ও তার মার জীবনে সর্বনাশ এনেছে। এ-সবই বিপ্লবের পূর্বে ঘটেছে এবং বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত তার জের চলেছে।......দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মনে হচ্ছে রাশিয়ার দুঃখ এতদিনে ঘুচল, মনে হচ্ছে, "freedom of the spirit was there, that....the future had almost become tangible".

......উপন্যাসে যে-সব মানবিক অনুভূতির কথা ছড়িয়ে আছে তা পরিশিষ্টে চব্বিশটি কবিতার মধ্যে আরো সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়।

ডক্টর জিভাগোর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ হল মানুষ ও প্রকৃতির জন্য দরদ। "ডে-ব্রেক' কবিতায়" তা প্রকাশ পেয়েছে।

I feel for each of them
As if I were in their skin,
I melt with the melting snow,
I frown with the morning,
In me are people without names,
Children, stay at homes, trees,
I am conquered by them all
And this is my only victory.

—শীলভদ্র



পাটের কথা

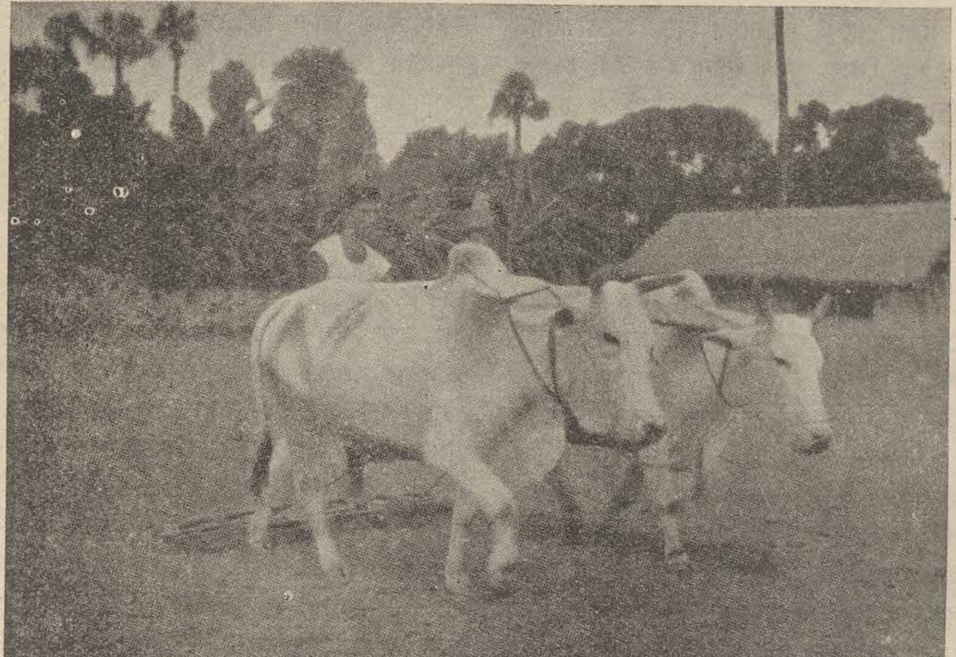
আমাদের দেশে এমন লোক খুবই কম আছেন যিনি পাটের তৈরী চট বা থলে দেখেন নি। শুধু আমাদের দেশই বা কেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আজকের দিনে পাটের চট বা থলে নানা কাজে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। পাটের কল বসবার বহু আগে থেকেই আমাদের দেশে হাতে চালান তাঁতে পাট থেকে কাপড় বোনা হত এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত জিনিস বিদেশে চালান যেত। তখনকার দিনে কি পরিমাণ কাঁচা পাট বা পাটজাত দ্রব্য বিদেশে যেত তার সঠিক হিসাব আজ পাওয়া না গেলেও ১৮২৮ সালে দেখা যায় যে, প্রায় দশ লক্ষ পাটের থলে বিদেশে গিয়েছে।

পাটের আদি বাস কোথায় ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকেই না পাটের ব্যবহার চলে আসছে! আগেকার দিনে পাটের পাতা নানা রোগে ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া পাটের আঁশ দিয়ে নানারকম দ্রব্য তৈরী হত। 'নলিতা' নামে পাট তখন প্রচলিত ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন তখন নানাদেশের রাজাদের নিকট থেকে নানারকম উপঢৌকন এসেছিল—এ-সবের মধ্যে পাটের জিনিষপত্তরও ছিল। মনুতেও পাটের তৈরী দ্রব্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাতন গ্রীসেও পাটপাতার ব্যবহার জানা ছিল এবং পাটচাষের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ আছে। বাইবেলে পঞ্চাশ ষাট রকমের পাটের উল্লেখ আছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে নানা কাজে পাটের ব্যবহার জানা থাকলেও তারপর কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত পাটের সম্বন্ধে তেমন কোন খবর জানা যায় না। বহুল পরিমাণে আমাদের দেশে পাটচাষ আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। পাটের ইংরেজী নাম 'জুট' (Jute)। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শিবপুরের বাগানে পাটের চাষ হত। এখানে উড়িষ্যাদেশের বহু মালী কাজ করত। এরা পাটকে জুটের মত একটা শব্দ দিয়ে অভিহিত করত। কোম্পানীর সাহেবরা ঐ থেকেই পাটের নাম 'জুট' দিয়ে দিল। সে যাই হোক্, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের দেশ থেকে প্রচুর কাঁচা পাট যুক্তরাজ্যে চালান হতে থাকে। ডাঃ রক্সবার্গ ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে স্কটল্যান্ডের ডান্ডিতে ফ্লাকস্ বা তিসির আঁশ থেকে সুতা কাটা বা কাপড় বোনার কলে পাট থেকে কাপড় বোনার চেষ্টা চলে। পরীক্ষায় দেখা গেল, এ-সব যন্ত্রে শুধু পাট এককভাবে ব্যবহার করা যায় না। কাজেই তিসির আঁশের সঙ্গে পাট মিশিয়ে তা থেকে সুতা কাটা ও কাপড় বোনা চলতে লাগল। কিছুদিন পর অবশ্য

তিসির চর্বি থেকে তৈরী তেল মিশিয়ে শুধু পাট থেকেই কাপড় বোনা সম্ভব হল এবং ১৮৩৩ সালে সর্বপ্রথম শুধু পাটের চট বাজারে বেরোল। প্রথম দিকে নানা কারণে পাটের তৈরী কাপড় লোকে তেমন আমল দেয় নি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে লোকে চট নানা কাজে ব্যবহার করতে সুরু করে দিল। ফলে আমাদের দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাট ডান্ডিতে রপ্তানী হতে লাগল। যন্ত্রের সাহায্যে পাট থেকে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার কাজে আমাদের বাংলা দেশও পিছিয়ে রইল না। ১৮৫৫ সালে জর্জ অকল্যান্ড নামে এক নীলকর সাহেব শ্রীরামপুরে একটি পাটের কল স্হাপন করলেন। এরপর ১৮৫৯ সালে বরাহনগরে সর্বপ্রথম পাট থেকে চট বোনার কল বসান হল। এ-কলটিতে ১৯২ খানা যন্ত্রচালিত তাঁত ছিল। তারপর একে একে অনেকগুলো পাটের কল স্হাপিত হল এবং এর অধিকাংশই হ'ল কলকাতা ও তার আশে পাশে। ১৮৭৯ সালে মোট ২১টি পাটের কলে সাড়ে পাঁচ হাজার তাঁত ছিল আর এ-সব কলে কাজ করত ৩৯ হাজারের মত লোক। কিন্তু ১৯৪৫ সালে এ-সংখ্যা দাড়াল ১১১টি কলে, ৬৮ হাজার তাঁতে আর তিন লাখের উপর লোকে। বর্তমানে আমাদের দেশে মোটের উপর ১১২টি পাটের কল আছে। এর মধ্যে ১০১টি রয়েছে আমাদের পশ্চিম বাংলায়, বাকী কলগুলোর মধ্যে বিহারে ৩টি, উত্তর প্রদেশে ৩টি, মাদ্রাজে ৪টি এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি কল আছে। তাঁতের সংখ্যা ৭২ হাজারের মত।

পাট দু'রকমঃ (১) তোসা বা বগী পাট; এর বৈজ্ঞানিক নাম করকরাস্ অলিটরিয়াস্ আর (২) সাদা বা তিতা পাট, বৈজ্ঞানিক নাম করকরাস ক্যাপসুলারিস্। সাদা পাটের বীজের রং ধূসর, ফল হয় গোল আকারের। পাতার আস্বাদ



পাটের জমি তৈরি—ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়া হচ্ছে

তেতো, আঁশ বা তন্তু যা পাওয়া যায় তার রং হয় সাদা বা ঘি রং এর। তোসা পাটের বীজের রং নীলাভ সবুজ, ফল লম্বা এবং পাতার আস্বাদ তেতো নয়। তোসা পাটের পাতা এ-জন্যে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর আঁশ হয় লাল রং এর, কখনো কখনো ঘন ধূসর রং এর। অবশ্য পাটের রং খুব খারাপ হওয়ার জন্যে পাট পচান জলও অনেক পরিমাণে দায়ী। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বেশ পরিষ্কার জলে যত্ন সহ-কারে পাট পচালে পাটের রং খুব ভাল হয়। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্থানের ময়মনসিং এবং নারায়ণগঞ্জের পাটের এত নামডাক। এ দু'রকম পাটের মধ্যে আবার দু'টি বিভাগ রয়েছেঃ (১) আগুলিয়া বা আশু ফসল (early variety) ও (২) নাবী ফসল (late variety)। সাদা পাটের আশু ফসলের মধ্যে আউসা ও আর-২৬ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তোসা পাটের নাবী ফসলের মধ্যে দেশী, নলিতা, চিনসুরা গ্রীন ইত্যাদি আর সাদা পাটের মধ্যে দেশওয়াল, হেউতি, ফানডুক, ডি-১৫৪ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন পাটচাষী তার জমিতে কোন্ প্রকারের পাট বপন করে আশানুরূপ ফসল তুলতে পারবে সেটা বিশেষভাবে নির্ভর করে স্থানীয় আবহাওয়া, জমিতে সারের ব্যবহার, আগাছা পরিস্কার, ফসলকে নানা রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা প্রভৃতি কতগুলো ব্যাপারের উপর।

পাটচাষের জন্য আদ্র আবহাওয়া, মাঝারী উত্তাপ ও পলিমাটী বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলার আবহাওয়া সেদিক দিয়ে একেবারে আদর্শস্থানীয়। পশ্চিমবাংলার কোন কোন অংশে দেশবিভাগের আগে অল্প-সল্প পাট চাষ হত। কারণ, আগেই বলেছি পাট চাষের স্বাভাবিক সুবিধাগুলো পূর্ববাংলায় বর্তমান। কিন্তু দেশবিভাগের পর ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় যখন খুবই কম হ'য়ে গেল তখন পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে নানাভাবে পাটচাষ বাড়ান হ'য়েছে।

পাট চাষ করতে হলে সাধারণতঃ জমি তৈরী করার পর কিছু গোবর ও খৈল সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে উৎপাদন বাড়ে সত্যি, কিন্তু আমাদের দেশের চাষীরা কোন্ প্রকার সার ব্যবহার সাধারণতঃ করে না। এরপর বিঘা প্রতি সাড়ে তিন থেকে পাঁচ সের বীজ হাত দিয়ে ছড়িয়ে বোনা হয়। পশ্চিমবাংলায় এপ্রিল-মে মাসে পাট বোনা হয়, কিন্তু বিহার ও আসামে মার্চ-এপ্রিল মাসই বীজ বোনার প্রশস্ত সময়। দিন সাতেকের মধ্যেই কচি সবুজ পাটের চারা-গুলো মাথা তুলে ওঠে; এ-সময় চাষীকে বিশেষ সাবধানে ফসলের তদারক করতে হয়। দুর্বল ও অপ্রয়োজনীয় চারাগুলো তুলে ফেলে দিয়ে প্রতি দু'টি চারার মধ্যে ৫ ইঞ্চির মত জায়গা ফাঁক দিতে হয়। বেশী ফাঁকা জায়গা থাকলে বহু ডালপালা বেরোয়, ফলে পাটের পরিমাণ বেশ কম হয়। তাছাড়া এ-সময় বিশেষ যত্ন সহকারে আগাছা পরিস্কার করে দেয়া বিশেষ প্রয়োজন। পাটগাছের নানারকম রোগব্যাধি বা পোকামাকড়ের আক্রমণ যাতে না হয় তার জন্যেই বিশেষ সাবধান থাকতে হয়। তিন-চার মাসের মধ্যেই পাট কাটার উপযুক্ত হয়। পাটগাছে যখন ফল ধরে সেই সময়ই পাট কাটার উপযুক্ত সময়। গাছগুলো কেটে দু'তিন দিন জমির উপর একটু শুকিয়ে নিতে হয়; এতে করে পাতাগুলো বেশীর ভাগ ঝরে পড়ে। এরপর আটি বেঁধে পাটগাছগুলো জলে পচাতে হয় ১০ থেকে ২৪ দিন পর্যন্ত। পাটগাছের গা থেকেই আঁশ বেরোয়। কাজেই পাটকাঠি থেকে পাট জলের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিয়ে ধুয়ে শুকোতে দিতে হয়।

এই-ই হল মোটামোটি পাটচাষের কথা। আমাদের দেশের চাষীরা এমনিভাবেই পাটের চাষ করে থাকে বটে, কিন্তু এতে করে বিঘা প্রতি পাটের উৎপাদন অনেক কম হয়, আঁশও হয় বেশ নিকৃষ্ট ধরণের। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উন্নত পদ্ধতিতে পাটচাষ করবার ব্যবস্থা বেশ সাফল্য-মন্ডিত হ'য়েছে। এ-ভাবে পাটের চাষ করলে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বাড়ে, আঁশও হয়

ভাল। কাজেই পাটচাষী বেশী দাম পেতে পারে এ-পাট বেচে।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশে ১১২টি-পাটের কল আছে। এ-কলগুলো চালু রাখতে হলে বছরে কমছে কম গড়ে প্রায় ৬০ লক্ষ বেল বা গাঁইট পাটের দরকার। এক গাঁইট পাটের ওজন প্রায় ৫ মণ। দেশবিভাগের আগে অবশ্য কোন ঝামেলা ছিল না। কিন্তু দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু সমস্যার সঙ্গে পাটের সমস্যাও একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল আমাদের দেশের পক্ষে। কারণ ভারতের পাট-চাষের জায়গাগুলোর বেশীর ভাগ পড়ল পাকিস্থানে, আর পাটের কলগুলো সবই পড়ল ভারতীয় ইউনিয়নে। সে-সময় আমাদের দেশে পাট উৎপন্ন হ'য়েছিল ১৭লক্ষ গাঁইট্ মাত্র। বাকী পাটের জন্য তাই আমাদের নির্ভর করতে হত পাকিস্থানের উপর। সুতরাং নানাভাবে পাটচাষ বাড়ান চলতে লাগল। বর্তমানে আমাদের দেশের উৎপন্ন পাট দিয়ে আমাদের পাটকলগুলোর চাহিদা পুরোপুরিই মেটান সম্ভব হচ্ছে। দেশ-বিভাগের সময় আমাদের দেশের ছয়লাখ একর জমিতে পাটচাষ হত, আর আজ হচ্ছে প্রায় ১৭লাখ একর জমিতে। পাটচাষের জমি বেড়েছে সত্যি, কিন্তু উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করতে পারলে আরও কম জমিতে আরও বেশী পাট আমরা পেতে পারি। বর্ত্তমানে প্রায় ৫০লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হচ্ছে ভারতবর্ষে।

কাজেই জমির ফসল বাড়াতে হলে আমাদের ৪টি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবেঃ (১) ভাল-জাতীয় বীজ ব্যবহার, (২) উপযুক্ত পরিমাণে সার ব্যবহার, (৩) সারিতে বা লাইন ধরে পাট বোনা এবং বিশেষ ধরণের যন্ত্র দিয়ে নিড়েন দেয়া এবং (৪) পাটের নানা রোগ ও কীট-শত্রুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা।

সাধারণতঃ পাট-চাষীরা তাদের জমির কিছুটা পাট রেখে দেন বীজ সংগ্রহের জন্যে। অবশ্য তাদের বিবেচনায়, যে বীজের ফলন ভাল তা থেকেই বীজ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এভাবে



তৈরি জমিতে হাতে ছড়িয়ে বীজ বোনা হচ্ছে

বীজ সংগ্রহ করলে সব সময়ই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, সেজন্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা-জাতিয় উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একমাত্র উন্নত ধরণের পাটের বীজ ব্যবহার করে একর প্রতি পাটের ফলন শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত বাড়ান সম্ভব হ'য়েছে। আমাদের দেশে একর প্রতি ১৩/১৪ মণের বেশীর পাট হয় না। ভাল বীজ বপন করে একর প্রতি ২৪/২৫ মণও পাট পাওয়া যেতে পারে।

ভাল বীজের পর আসে সার ব্যবহারের কথা। পাটের জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সার ব্যবহার করলে পাটের ফলন বাড়ে। জমি তৈরী করার সময় একর প্রতি ৪০ থেকে ৮০ মণ পচা সার ব্যবহার আর চারাগুলো একটু বড় হলে একর প্রতি ২৫ থেকে ৫০ সের এমোনিয়াম ফসফেট জমিতে দিলে সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়। একর প্রতি ১মণ ১০সের এমোনিয়াম্ সালফেট ব্যবহার করে পাটের ফলন ৩ মণের উপর বেড়ে যেতে দেখা গেছে। আগেই বলেছি, জমি তৈরী হলে হাতে ছড়িয়ে বীজ বোনা হয়। এভাবে বীজ বুনলে বীজের অপচয় হয় এবং ফলন হয় কম। খরচ পড়ে অনেক বেশী। তাই 'সিড ড্রিল' নামে একটি যন্ত্র দিয়ে বীজ বুনে চারা একটু বড় হলে 'হুইল হো' যন্ত্রের সাহায্যে আগাছা পরিস্কার করতে পারলে সবদিকেই সুবিধা। এ-ভাবে বীজ বুনে একর প্রতি ২ থেকে ৫ মণ ফসল বেশী পাওয়া সম্ভব।

অন্যান্য ফসলের মত পাটেরও নানা রোগ-ব্যাধি আছে। আর আছে নানা কীটশত্রু। এদের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে না পারলে পাটচাষীর লোকসান অনিবার্য। পাটের নানারোগের মধ্যে শিকড়পচা রোগ, ডাঁটাপচা রোগ ইত্যাদি প্রধান। কীটশত্রুদের মধ্যে ঘোড়া পোকা, বিছা পোকা, কাতুরি পোকা, রসচোষা পোকা প্রধান। এসব রোগ ও কীটশত্রুদের থেকে ফসল রক্ষা করবার নানা ওষুধ বেরিয়েছে। উপযুক্ত সময় উপযুক্ত পরিমাণে তা ব্যবহার করতে পারলে খুব সুফল পাওয়া যায়।

চাষী ফসল উৎপাদন করে তা বিক্রী করবে আড়তদারদের কাছে। তারা আবার তা চালান দেবে বিভিন্ন পাটকলের নিকট। শেষ পর্যন্ত কলওয়ালারা পাট থেকে তাঁদের প্রয়োজনমত পাটের দ্রব্যাদি তৈরী করবেন। দেখা যাক তারা কি কি জিনিস কি ভাবে তৈরী করে থাকেন।

আমাদের দেশের পাটের কলগুলোতে যে সব দ্রব্যাদি তৈরী হয় তাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) হেসিয়ান—হাল্কা জাতীয় পাটের কাপড়, আমেরিকায় নাম 'বারলাপ্'। সাধারণতঃ ৪০ ইঞ্চি চওড়া এবং গজ প্রতি ওজন হয় ৭ থেকে ১২ আউন্স। বেশীরভাগ হেসিয়ান কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়। নানারকম জিনিসের ঢাকনা হিসেবেই এর ব্যবহার সব চাইতে বেশী। লিনোলিয়াম, কার্পেট ইত্যাদির তলাকার দিকটায় থাকে হেসিয়ান কাপড়। আমেরিকা আমাদের দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে হেসিয়ান কাপড় কিনে নেয়। তারপর তা থেকে তাদের প্রয়োজনমত থলে ইত্যাদি বানিয়ে নেয়।

(২) স্যাকিং—ভারী জাতীয় চট, বুনন হয় হেসিয়ান কাপড়ের মত প্লেন, কখনো বা টুইল। চওড়া বিভিন্ন রকমের, ওজন হয় গজ প্রতি ১২ থেকে ২০ আউন্স। আমরা অবশ্য পাটের কাপড়কেই চট বলে থাকি, তা সে হেসিয়ানই হোক্ বা স্যাকিংই হোক্। আমাদের কল-গুলোতে যে পরিমাণ স্যাকিং তৈরী হয় তা সবই নানাধরণের বস্তায় রূপান্তরিত হয়। এই বস্তা-গুলোই আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি, আবার বিদেশের বাজারেও এর খুব চাহিদা।

(৩) ক্যানভাস—খুব ঘনভাবে বোনা পাটের কাপড়। ৩৬ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের ওজন সাধারণতঃ ১৪ থেকে ২৪ আউন্স হ'য়ে থাকে। ক্যানভাসও নানা কাজে ব্যবহার হয়। ক্যানভাসের উপর বিটুমিনাস্ ইমালসন লাগিয়ে তৈরী হয় ত্রেপল। ত্রেপলের ব্যবহার বলে শেষ করা যায় না।

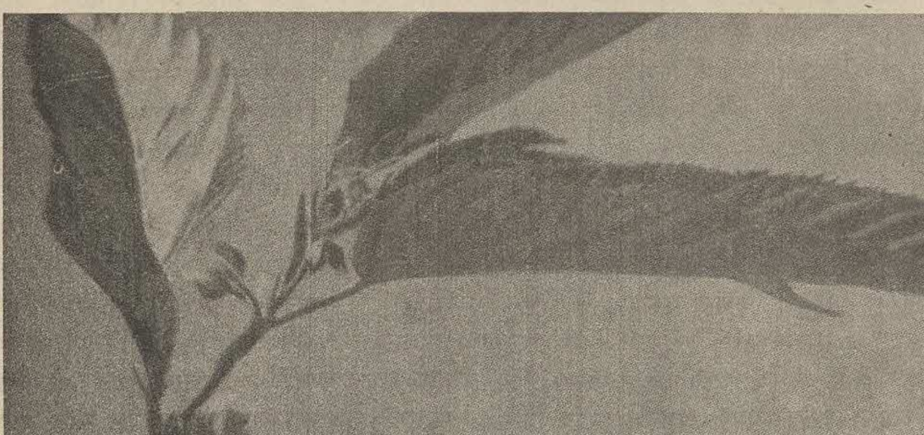
(৪) সুতা ও দড়ি—সুতাকাটা যন্ত্রে পাটের সুতো এবং অনেকগুলো সুতো একসঙ্গে পাকিয়ে

সুতলী বা টোয়াইন তৈরী করা হয়। নানাবিধ বাঁধাছাদার কাজে পাটের সুতোর জুড়ি মেলা ভার।

এ-ছাড়া, আমাদের দেশের বহুকলে কম্বল, কার্পেট, নানারকমের ফিতা, তুলা ও পাটের মিশ্রণে তৈরী ক্যানভাস এবং আরও বহুবিধ দ্রব্য তৈরী হয়ে থাকে।

এই তো গেল পাট দিয়ে যে সমস্ত দ্রব্য তৈরী হয় তার মোটামোটি হিসাব। কাঁচামাল পাটের কলে এলে প্রথমে তার থেকে ভালমন্দ বাছাই করা হয়ে থাকে। যে পাট যে কাজের উপযুক্ত তা সেই কাজে লাগাবার জন্যেই এ ব্যবস্থা। সাধারণতঃ ভালজাতীয় পাট দিয়ে হেসিয়ান, কার্পেট, ক্যানভাস প্রভৃতি তৈরী হয়, আর নিকৃষ্ট ধরণের পাট স্যাকিং তৈরীর কাজে লাগান হয়। এবারে ব্যাচিং তেল ছড়িয়ে দিয়ে পাটগুলোকে একটি যন্ত্রের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিতে হয়। এতে করে পাট খুব নরম হয়, পেঁজার কাজে সুবিধা হয়। এ-যন্ত্রটির নাম 'সফ্‌নার'। এরপর পাটগুলো পাঠাতে হয় কার্ডিং যন্ত্রে; এ-যন্ত্রটির কাজ পাটগুলোকে পিঁজে দেয়া। এরকম দু'টি যন্ত্রের ভিতর দিয়ে চালাবার পর আসে 'ড্রইং' যন্ত্রে। এ-যন্ত্র থেকে পেঁজা পাটগুলো সুন্দর ফিতার আকারে বেরিয়ে আসে। এরপর সুতোকাটা যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এ-কাজটি হ'য়ে গেলে মাড় লাগিয়ে তাঁতে চলে যাবে সুতোগুলো। তাঁতে কাপড় বোনা হবে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনি ভাবে। হেসিয়ান কাপড় হলে কাপড় সুন্দরভাবে ভাজ করে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে হবে, আর স্যাকিং কাপড় হলে তা দিয়ে দরকার মত থলে তৈরীর যন্ত্রে তৈরী হবে নানা ধরণের থলে।

আমাদের দেশে যে কলগুলো আছে তাতে বছরে গড়ে ১০লাখ টনের মত বিভিন্নরকমের



পাটের সুস্থ সবল তাজা পাতা

পাটের জিনিষ তৈরী হয়। উৎপন্ন মালের শতকরা ৯৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানী হয়। কিনে নেয় আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও আয়র্ল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান এবং আরও বহু দেশ। এককথায় বলা যায়, পৃথিবীর হেন দেশ নেই যেখানে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য কমবেশী না যায়। ভারতের উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্যের প্রায় আধাআধি মাল নেয় একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। এ সব মাল বেচে আমাদের দেশ প্রায় ১২০ কোটী টাকা পেয়ে থাকে। ভারতবর্ষের সমগ্র রপ্তানী বানিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ বিদেশীমুদ্রা আহরণ করা হয় একমাত্র পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে। পাটশিল্প দিয়ে ভারতসরকার যে পরিমাণ বানিজ্যশুল্ক পায় তার পরিমাণ প্রায় ৭ থেকে ৮ কোটি টাকার মত। তাছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বহু লক্ষ লোক পাটশিল্পের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে। এক কথায় বলা যায়, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো পাটশিল্পের উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

আগেই বলেছি, ভারতের সব প্রদেশে পাট-চাষ সম্ভব নয়, অনেক চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। যে কয়টি প্রদেশে পাটের চাষ হয় তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পশ্চিমবাংলার। সমগ্র-ভারতে উৎপন্ন পাটের প্রায় আধাআধি পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে। পশ্চিমবাংলার সব জেলাতেই পাটচাষ সম্ভব হলেও ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, জলপাইগুড়ি, মালদহ, এবং নদীয়া জেলায়ই উল্লেখ করার মত পাট চাষ হ'য়ে থাকে। কোন জায়গায় পাট উৎপন্ন হলেই শুধু হয় না সে জায়গায় পাট পচানোর জলেরও সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার। কলিকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে তোসা জাতীয় যে পাট উৎপন্ন হয় তা 'দেশী পাট' নামে ব্যবসায়ীদের নিকট পরিচিত। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলের পাটের রং হয় কালচে রং এর, এ-পাটের নাম 'শ্যামলা পাট'। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'য়েছে যে, শ্যামলা রং এর জন্যে পাট পচানো জলই বিশেষভাবে দায়ী।

পশ্চিমবাংলার পর নাম করতে হয় আসামের। আসামের কোন কোন অঞ্চলের পাট এত উন্নত-শ্রেণীর যে, কি রংএ, কি অন্যান্য গুণে এ-পাট পূর্বপাকিস্থানের ময়মনসিং এবং ঢাকাজেলার 'জাট' জাতীয় পাটের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে। সমগ্র ভারতে উৎপন্নপাটের প্রায় চারভাগের ১ ভাগের বেশী পাট পাওয়া যায় আসাম প্রদেশ থেকে। তাছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান থেকেও প্রচুর পাট পাওয়া যায়।

অনেকের ধারণা ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাট চাষ হয় না। ধারণাটা ভ্রান্ত। তবে দেশ বিভাগের পূর্বে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান মিলে যে পরিমাণ কাঁচা পাট উৎপাদন করত তার পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় এত বেশী ছিল যে, অন্যান্য দেশের পাট উৎপাদনের পরিমাণ হিসেবের মধ্যে তেমনভাবে বিবেচিত হত না। অথচ পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে পাটজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা। তাছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েছে পাটের কল বর্ত্তমান। এ-সব দেশ তাদের প্রয়োজনমত কাঁচা পাট কিনে নেয় বর্তমানে পাকিস্থান থেকে; দেশবিভাগের আগে নিত ভারতবর্ষ থেকে। বিদেশ থেকে কাঁচা পাট কিনে পাটের দ্রব্যাদি তৈরী করতে স্বাভাবিকভাবেই এদের খরচ বেশী পড়ে। কাজেই সে-সব দেশে পাট উৎপাদনের চেষ্টা যে চলবে তা খুবই স্বাভাবিক। এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, পাটচাষের জন্যে ঠিক যেরকম আবহাওয়া, মাটি, জল ইত্যাদি দরকার তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তেমন বর্তমান নেই একমাত্র ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের কতকাংশ ছাড়া। দেশবিভাগের পর আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে পাটচাষের যথেষ্ট চেষ্টা হলেও সব প্রদেশে পাটচাষ করা সম্ভব হয় নি।

নানারকম অসুবিধা সত্ত্বেও পৃথিবীর যে সব দেশে পাটচাষ করা হ'য়েছে বা চেষ্টা হ'য়েছে তারমধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় রাশিয়ার।

উজবেকিস্হান অঞ্চলে ১৯৩৯ সাল থেকেই পাটচাষের চেষ্টা চলছে। দেখা গিয়েছে, এখানে একর প্রতি তিন গাঁট পাট উৎপন্ন করা সম্ভব। এ-পাট লম্বায় প্রায় ১১ ফুট পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ। অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড অঞ্চল, ইন্দোচীন, চীনের মাঞ্চুরিয়া, থাইল্যান্ড, মিশর, পেরু, বৃটিশগায়না, প্যারাগুয়ে, বার্মা, ফরমোজা প্রভৃতি দেশে কমবেশী পাট চাষ হয়ে থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল প্রদেশে প্রচুর পাট চাষ হয়। ১৯৪৭ সালে ৮ হাজার টন পাট এখানে উৎপাদিত হ'য়েছিল। ১৯৫৬ সালে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার টন। আমাজান অঞ্চলের পাটচাষীরা শীঘ্রই ১ লক্ষ টন পাট উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে বলে প্রকাশ।

আর্জেন্টিনার কোন কোন অংশের আবহাওয়া অবিকল পশ্চিম বাংলার মত। এখানেও প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়।

পার্বত্যদেশ নেপালেও পাটচাষ সম্ভব। এখানকার উৎপন্ন পাট ভারতীয় তুলনায় কোন অংশে হীন নয়। ১৯৫১ সালে নেপাল থেকে যে পরিমাণ পাট আমাদের দেশে এসেছিল তার পরিমাণ ২৭ হাজার গাঁইটের কিছু উপর।

ভারতবিভাগের পূর্বে পূর্বপাকিস্হান ভারতেরই অংশবিশেষ ছিল। তখন ভারতের পাটচাষের জমির অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গে। এখানকার উৎপাদিত পাট অতি উচ্চশ্রেণীর হয়ে থাকে তা আগেই বলা হয়েছে। পাকিস্হানে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫৫ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদিত হচ্ছে। তাছাড়া পাকিস্হানে ইতিমধ্যে কয়েকটি পাটের কল স্হাপিত হ'য়েছে। এ-সব কলের চাহিদামত পাট রেখে পাকিস্হান তার কাঁচা মাল রপ্তানী করে বিদেশের বাজারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাটচাষ হলেও ভারত ও পাকিস্হান ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সমগ্র জগতে মোট ফলনের



পাটের উৎকৃষ্ট ফসল

শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র। ১৯৫৫ সালে পৃথিবীর উৎপন্ন কাঁচা পাটের পরিমাণ ছিল ১১২ লক্ষ গাঁট, আর এর শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগই উৎপন্ন হয়েছিল ভারত ও পাকিস্থানে।

আমাদের দেশের পাটসমস্যা সমাধানের জন্যে পাটের মত কতগুলো আঁশের উপর একসময় খুবই নির্ভর করতে হ'য়েছিল। এ-সব দ্রব্যের মধ্যে মেস্তার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেস্তা দেখতে অবিকল পাটের মত, পাটের সঙ্গে মিশিয়ে অনায়াসে পাটকলে ব্যবহার করা চলতে পারে। তা'ছাড়া পাটের চাইতে মেস্তার চাষ অনেকাংশে সহজও বটে। পাটগাছ থেকে যেমন-ভাবে পাটের আঁশ বের করা হয় মেস্তা থেকেও অবিকল তেমনিভাবে আঁশ বের করা হয়। মেস্তাও পাটের মত বর্ষাকালে চাষ হয়।

বিভিন্ন প্রদেশে বা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মেস্তা বিভিন্ন নামে পরিচিত। মাদ্রাজে বিমলি-পাটম, বোম্বাইতে অম্বাড়ি, বিহারে অম্লপটুয়া, উড়িষ্যায় কউরিয়া প্রভৃতি নামে মেস্তা অভিহিত হ'য়ে থাকে। মেস্তা চাষের ব্যাপারে অন্ধ্র প্রদেশই বিশেষ অগ্রণী। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১৫ লক্ষ গাঁট মেস্তা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবাংলার পর মেস্তা চাষের ব্যাপারে অন্ধ্র, বোম্বাই, বিহার, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশের নাম করা যেতে পারে। আমাদের দেশের পাটকলগুলোতে ব্যবহার ছাড়া কিছু পরিমাণ মেস্তা বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে।

বোঝা গেল, পাট থেকে বহু জিনিসপত্তর তৈরী হয় এবং তা দিয়ে আমাদের দেশের প্রচুর টাকা আয় হচ্ছে, কিন্তু পাট থেকে যে-সব আবর্জনা পাওয়া যায় তাও কিন্তু ফেলে দেয়া হয় না। পাটের আবর্জনার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে পাটকাঠী বা পাকাঠীর কথা। পাটকাঠীগুলো অবশ্য জ্বালানী হিসেবে বা বেড়া দেয়ার কাজে ব্যবহার হ'য়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি এ-থেকে চমৎকার কাগজ তৈরী করা সম্ভব হ'য়েছে। এ দিয়ে আরও বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করার চেষ্টা চলছে।

কাঁচা পাট যখন কলে ব্যবহার করা হয় তখন পাটের গোড়ার থেকে কিছুটা অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। এগুলো সাধারণতঃ আবর্জনা হিসেবে গণ্য হত। তাছাড়া পাটের কলে প্রচুর পরিমাণে টুকরো টুকরো আঁশ, কাঠির টুকরো অংশ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এ-সব আগে মিলের বয়লারে জ্বালান হত। কিন্তু আজকাল এ সব আবর্জনা দিয়েও অতি চমৎকার সব জিনিস তৈরী করা সম্ভব হ'য়েছে। পাটের আবর্জনা ছাড়া পাটের আর একটি মজার ব্যবহার আছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাটকে ঠিক পশমের মত একটা পদার্থে পরিণত করা হয়। তারপর এ-থেকে কম্বল এবং কিছু পরিমাণে পশমের সঙ্গে মিশিয়ে সুন্দর সোয়েটার তৈরী করার পশমে রূপান্তরিত করা যায়।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। পাটের বিভিন্ন ব্যাপার সম্বন্ধে গবেষণা চালাবার জন্যে আমাদের দেশের সরকার বহু টাকা খরচ করছেন। দেশ-বিভাগের সময় যখন পাটের ঘাটতি পড়ল দেশে তখন ভারতসরকারের উদ্যোগে কৃষিবিদরা এগিয়ে এলেন এ-সমস্যা সমাধানের জন্যে। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। ফলে আজ আমাদের দেশ পাটের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাটচাষীরা গায়ের রক্ত জল করে পাট উৎপাদন করেন, কিন্তু নানা অসুবিধার জন্যে তারা সব সময় আশানুরূপ দাম পান না তাঁদের ফসলের জন্যে। সরকার এ-দিকটাও দেখছেন। পাট-জাত দ্রব্যের ব্যাপারে বিশ্ববাজারে ভারতের সুনাম আছে। সে-সুনাম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাছাড়া প্রতিযোগিতায় যাতে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য হটে না যায় সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। গতানুগতিক চট্ বা থলে ছাড়া যাতে পাট দিয়ে নানারকমের দ্রব্যাদি তৈরী করা যেতে পারে, পাটের আবর্জনা যাতে ভালভাবে ব্যবহার করা যায় এবং পাটের ভেতরে বিজ্ঞানের কোন রহস্য রয়েছে এ-সব দিকে গবেষণা চালাবার জন্যেও রয়েছে সরকারী গবেষণাগার। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পাটের মধ্যে রয়েছে ঠিক তুলার মত একটা পদার্থ। পাটের আঁশগুলো আকারে খুবই ছোট। কিন্তু বাড়ী

তৈরী করতে যেমন ইটগুলো সিমেন্ট বালি দিয়ে জুড়ে দেয়া হয় ঠিক তেমনি পাটের ছোট আঁশ-গুলো সিমেন্টের মত একটা পদার্থ দিয়ে জোড়া লেগেই পাটের লম্বা লম্বা আশ পাওয়া যাচ্ছে। তুলোর মত যে জিনিসটি রয়েছে তার বৈজ্ঞানিক নাম 'আলফা—সেলুলোজ' আর সিমেন্টের কাজ করছে যারা তাদের বলা হয় হেমি-সেলুলোজ ও লিগনিন্।

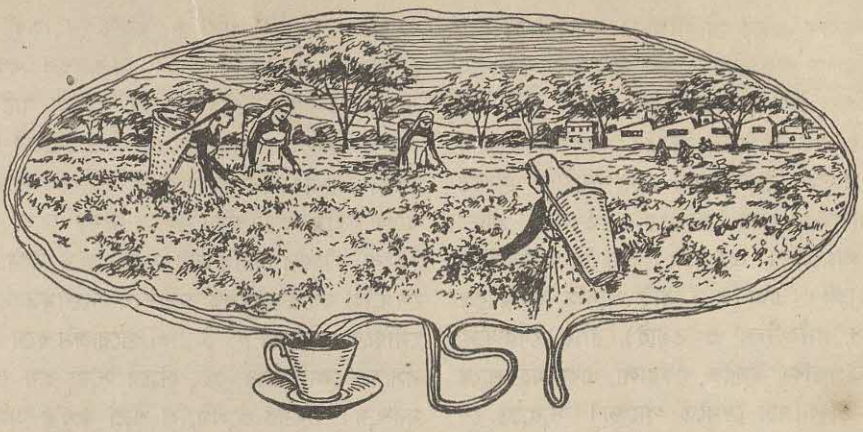
অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকরা ঠিক করেছেন যে, পাটের আঁশের মধ্যে নিম্ন-লিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি আছেঃ

আলফা সেলুলোজ	শতকরা	৬১ ভাগ
লিগনিন	"	১১.৫ "
ছাইজাতীয় পদার্থ	"	১.৫ "
প্রোটীনজাতীয় দ্রব্য	"	১.০ "
হেমি সেলুলোজ	"	২৪.০ "

এরাই সব মিলেমিশে তৈরী করেছে পাটের লম্বা লম্বা আঁশ। পাটের ক্ষুদ্র টুকরোগুলোকে বলা হয় মৌলিক তন্তু; এর দেয়ালে থাকে আঁশাণু (fibrils)। পাটগাছ যখন বাড়তে থাকে তখন আস্তে আস্তে এই কোষগুলোর ভেতরে লিগনিন এবং অন্যান্য কঠিন আবরণের দ্রব্যাদি জমতে থাকে। আঁশাণুগুলোই এখানে ইটের কাজ করেছে আর লিগনিন ও হেমি-সেলুলোজ করেছে সিমেন্ট বালির কাজ। তৈরী হ'য়ে এমনিভাবে পাটের লম্বা আঁশ।

পাট বা পাটজাত দ্রব্য 'ব্লিচিং' করলে একদম সাদা হ'য়ে যায়। এতে করে পাটের দ্রব্যাদিতে অন্য কোন রং লাগাতে সুবিধা হয়। নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে ব্লিচিং করা হ'য়ে থাকে। এছাড়া, পাটের দ্রব্যের একটা বিশেষ দোষ আছে। ভিজে আবহাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি পাটজাত দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়। পাটজাত দ্রব্যকে এ দোষ থেকে মুক্ত করতে হলে কোন কোন বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থের দ্রবনে চুবিয়ে নিয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

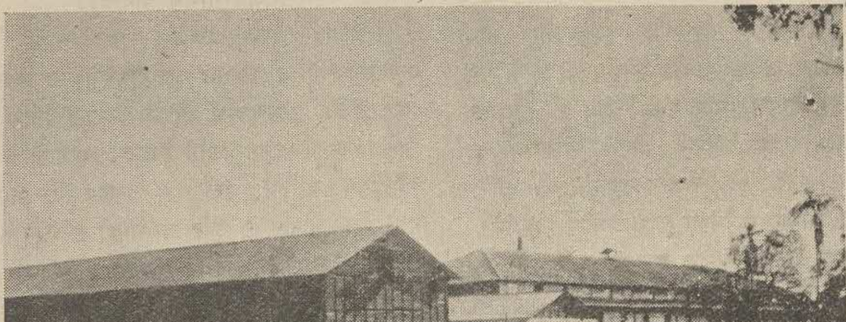
'শ্যামলা' পাটের কথা আগেই বলেছি। এ পাট দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে খুব ভাল, অথচ রংটাই যাহোক একটু কালো। তাই বৈজ্ঞানিকরা খুব সামান্য খরচে এর রং উন্নত করবার উপায়ও বের করেছেন। তাছাড়া পাট থেকে সুতা কাটা এবং চট বোনার কাজে মিলগুলির রয়েছে দৈনন্দিন নানা-সমস্যা। তাই কিভাবে দিন দিন পাট-জাতদ্রব্যের উৎকর্ষ বিধান করা যায়, পাটের ব্যবহার কি ভাবে আরও বাড়ান যায়, তৈরী দ্রব্যাদির মান কি ভাবে সবসময় সঠিক রাখা যায়—এরকম বহু কাজে দরকার হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার। তাছাড়া পাটচাষের রয়েছে নানা সমস্যা। পাটের ফলন কেমন করে বাড়ান যায়, উৎপন্ন পাটের গুণ কি করে উন্নত করা যায়, পাটের নানা রোগ ব্যাধির আক্রমণ কি করে কমান যায় এ সব ব্যাপারের জন্যেও দরকার হয় বৈজ্ঞানিকদের। আমাদের দেশের সরকার পাট-শিল্পের সর্ববপ্রকার সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন বলে প্রায় বিশবছর আগে ভারতসরকারের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি নামে একটি বিভাগ খোলা হ'য়েছে। এ প্রতিষ্ঠান পাটের বিজ্ঞান ও পাট-শিল্পের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বহু বিষয় সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া কলকাতায় এদের চমৎকার একটি মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা রয়েছে বর্ত্তমান। এককথায় বলা যায় যে, কাচাপাট বা পাটজাত দ্রব্যের জন্য সমগ্র পৃথিবী যেমন ভারতেরই মুখাপেক্ষী তেমনি পাট শিল্পের নানা সমস্যা ও এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেও ভারতই অগ্রণী এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।



আমাদের দেশে অনেকেই তো চা পান করো। আবার অনেকেই নিশ্চয় বাবা-মায়ের চা পান করাও দেখেছো। কালো এক রকম পদার্থের উপর গরম জল ঢেলে দিলে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে সোনালী বর্ণের যে তরল পদার্থ হয় তাকে দুধ আর চিনি মিশিয়ে সুস্বাদু পানীয় রূপেই আমরা গ্রহণ করি—এ-কথাই তোমরা সকলে জানো। কিন্তু তোমরা কি জানো চা-তৈরীর গল্প?

পৃথিবীতে কি করে চা এলো তা আজও অপরিজ্ঞাত। চীন দেশেই নাকি সর্বপ্রথম এই চা দেখতে পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশ বণিকেরাই নাকি প্রথম দেখেন যে একরকম গাছ আছে যার পাতা দিয়ে সুস্বাদু পানীয় প্রস্তুত করা যায়। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরুতেই বৃটিশ বণিকেরা চীন থেকে ভারতবর্ষে সেই চায়ের বীজ নিয়ে আসেন এবং এই ভাবেই চা-বাগিচা গড়ার কাজ আরম্ভ হয়।

প্রথমে ব্রহ্ম দেশ এবং আসামের উঁচু অঞ্চলে



চা-বাগানের ফ্যাক্টরি—গোপালপুর

পরীক্ষামূলক ভাবে চা-বাগিচার পত্তন করা হয়, পরে হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে এই বাগিচা তৈরীর কাজ চলে।

আর এই বাগিচা তৈরির সার্থকতা দেখে বৃটিশ সরকার ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে চা-উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রকার উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। এই ভাবে ভারতে চা-বাগিচার পত্তন হলো। এবং আজ তাই আসাম, উত্তর বঙ্গ (দুয়ারস, দার্জিলিং ও তরাই), রাঁচি, দেরাদুন, কাংড়া উপত্যকা, মাদ্রাজ, কেরালা, এবং মহীশূরে তোমরা চা-বাগিচা দেখতে পাচ্ছো। সুরুতে যে বাগিচার পরিমাণ ছিল সামান্য মাত্র আজ সেখানে সারা ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ একরেরও অধিক স্থান জুড়ে গড়ে উঠেছে বিরাট চা-বাগিচা।

চা-বাগিচায় বিপুল পরিমাণ শ্রমিক কাজ করে। এদের সংখ্যা এখন দশ লক্ষেরও বেশি। শুধু তাই না, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও পাকিস্তান যখন ভারতের অন্তর্গত ছিল তখন শেষোক্ত দুটি দেশে ভারতীয় শ্রমিকের সাহায্যেই সার্থকভাবে চা-উৎপাদিত হতো।

একটি দেশের ভাগ্য তার উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানী প্রভৃতি আরো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। রপ্তানীই হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান। কারণ, এই রপ্তানীর সাহায্যেই অন্য দেশ থেকে নিজের দেশে আসে প্রচুর অর্থ। এই অর্থ দিয়েই গড়া যায় নিজের দেশে অনেক কল-কারখানা। এবং এই কল-কারখানাতেই আবার তৈরী হয় আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

তোমরা হয়তো শুনে আশ্চর্য হবে যে, চা-ই ভারতবর্ষের বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। ভারতবর্ষ রপ্তানীর সাহায্যে বিদেশ থেকে প্রতি বৎসর যে ৬০০ কোটি টাকা আয় করে তার মধ্যে শুধু চা থেকেই আয় হয় ১২৫ কোটি থেকে ১৩০ কোটি টাকা।

এইবার আমি তোমাদের এই কালো বর্ণের চা কেমন করে তৈরি হয় সেই কথা শোনাবো।

চায়ের ঝোপ কেমন করে গড়া হয়ঃ

চা গাছের শুকনো পাতাই হলো চা নামক বস্তুটি। "দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির" কথা তোমরা শুনেছো নিশ্চয়। চা-গাছের ঝোপের মাথায় যে নরম পল্লব দেখতে পাওয়া যায় তাই দিয়েই তৈরি হয় চা। চায়ের বীজ থেকেই চায়ের ঝোপ জন্মে। বিশেষ ধরণের চায়ের গাছে চা-বীজ তৈরি করা হয়। গাছে যখন ফুল ফোটে কিংবা বীজের আর্বিভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন সেগুলি যাতে রোগের আক্রমণে সংক্রমিত না হয়, সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বসন্তে কোকিলের কুহু স্বরে সুরু হয় ফুলের মরশুম। চায়ের ফুলগুলি শুভ্র বর্ণের আর এর গন্ধও বেশ মিষ্টি। বীজগুলি ধীরে ধীরে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নভেম্বরে পরিপক্ক হয়ে উঠে। তারপর বীজগুলিকে গাছ থেকে চয়ন করে এনে একটি আর্দ্র গহবরে রেখে অন্ততঃ তিন দিন ধরে জল-সিঞ্চন করতে হয়। এর মধ্যেই তৈরি হয়ে যায় বীজ লালন-পালনের ব্যবস্থা। নার্শারীর মাটিকে চূর্ণ, শুষ্ক ও পরিষ্কার করে ১০০ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া এবং ২ ইঞ্চি উচ্চ একটি স্থানে রেখে দেওয়া হয় এই বীজগুলি।

লালন-পালন ব্যবস্থাঃ

এরপর অঙ্কুরোদ্গম সুরু হলেই বীজ-গুলিকে ঐসব লালন-পালনাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। অঙ্কুর-মুখটিকে নিচের দিকে দিয়ে নার্শারীর উপরের মাটি থেকে অন্ততঃ ½ ইঞ্চি পরিমাণ মাটির তলদেশে রেখে দেওয়া হয় সেগুলি। তারপর অভিজ্ঞা নারী শ্রমিকা ৫ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি দূরত্বে রোপন করে ঐ সব বীজ। এবং বীজ রোপনের পর মাটি দিয়ে তা আবার ঢেকে রাখা হয়। এই ভাবে বীজ বপনের পর প্রতিটি আলের উপর ঘাসের আচ্ছাদন বিছিয়ে জল ঢেলে সেগুলিকে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। একমাসের মধ্যেই এরপর ঘাসের আচ্ছাদন ভেদ করে সবুজ চারার রেখা ফুটে উঠতে থাকবে। এই সময় মাটির উপরের আচ্ছাদন সরিয়ে একপাশে ২ ফুট থেকে ২½ ফুট এবং অন্য পাশে ৩ ফুট থেকে ৩½ ফুট উঁচু করে অন্য আচ্ছাদন দিতে হবে।

কোনো কোনো জায়গায় শুধুমাত্র প্রবেশ দ্বার রেখে ৫ ফুট উঁচু করে পানের বরজের মত চারিদিক দিয়ে আচ্ছাদন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নার্শারীতে আগাছা জন্মালে সেগুলি বাঁশের সূচালো মুখ দিয়ে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে। নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে চারাগুলি রোপনের মত বড় হয়ে উঠে। এইবার চারা যেখানে রোপন করা হবে সে জায়গাটি খুব গভীর করে চষে, গুড়ো গুড়ো মাটি ছড়িয়ে, আগাছা সরিয়ে সমান করে রাখা হয়। তারপর সমপরিমাণ দূরত্ব মেপে মেপে চারা রোপনের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। চারা-রোপনের নানা রকমের পদ্ধতি আছে। কিন্তু বর্তমানে ঝাড় তৈরীর জন্য প্রতিটি চারা গাছকে ২ই ফুট দূরত্বে রোপন করার নীতি অনুসৃত হচ্ছে। প্রথমে সারি থেকে অন্য সারি দূরত্ব রাখতে হয় প্রায় ৫ ফুট। এই রোপন ব্যবস্থায় বেশ নিপুণতার প্রয়োজন। তাই এ-এক বিশেষ ধরণের কাজরূপে স্বীকৃত। চারার যতটুকু অংশ মাটির উপরে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণ নরম মূলের অংশ মাটির নিচে প্রোথিত হবে।

যদি নরম মূলকে অক্ষত না রেখে চারা স্থানান্তরিত করা হয় তবে পরবর্তীকালে ঝোপগুলি দুর্বল হয়ে যাবে। সেই জন্য চারার গোড়ায় মূলকে কেন্দ্র করে ২ ইঞ্চি থেকে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ মাটির বেষ্টনী রেখে অত্যন্ত চাতুর্য ও দক্ষতার সঙ্গে চারাটিকে তুলতে হয়। নারী শ্রমিকেরা হাল্কা কাঠের বাক্সে করে সযত্নে চারাগুলি একস্থান থেকে অন্য স্থানে মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যায়। তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় গভীরভাবে গর্ত্ত করে চারাগাছগুলো সাবধানে রোপন করতে হয়। মাটীর সঙ্গে কিছু পরিমাণ খৈল বা গোবর মিশিয়ে দিলে সারের কাজ ভাল হয়। চা-এর ঝোপ ছায়া খুব পছন্দ করে। সুতরাং চা-এর চারাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ৪০ ফুট দূরে দূরে শিরীষ জাতীয় গাছও লাগিয়ে দিতে হয়। ছায়ার জন্যে এ-গাছগুলো অবশ্য বেড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লাগে।

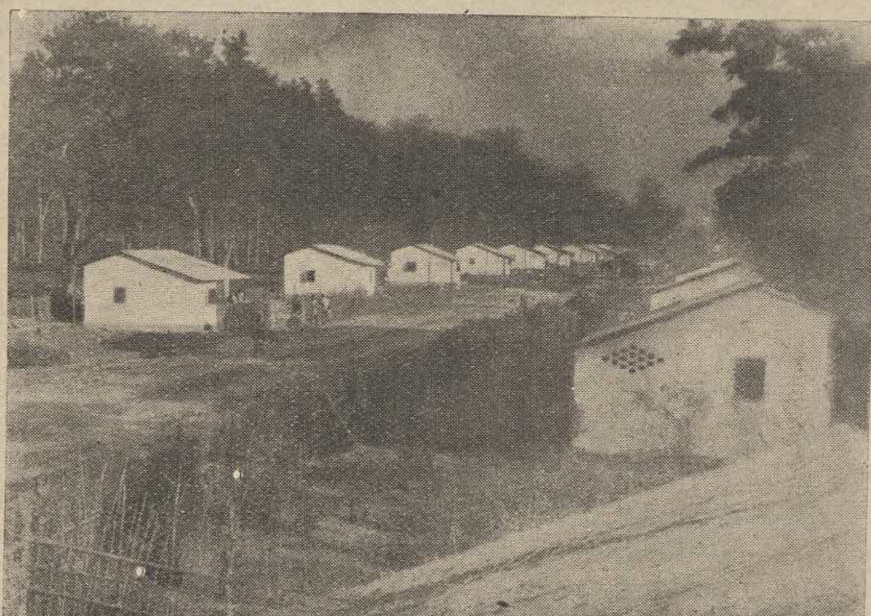
চা গাছের সারির মাঝে অন্যান্য রকমের ঝোপের চাষও সাময়িকভাবে করা হয়, যেমন অড়হর, কাউপিয়া, ধনচা প্রভৃতি। এগুলো খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং চা গাছের মূল দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

বছরের পর বছর চা-এর চারাগুলো বাড়তে থাকে। চার বছরের সময় এ-উচ্চতা প্রায় ৬/৭ ফুট হ'য়ে থাকে, কখনো বা বাড়তিটা একটু বেশীই হয়, তবে পাহাড়ে জায়গায় এটা একটু কমই হ'য়ে থাকে। দশ পনেরো বছরে এর উচ্চতা কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট পর্য্যন্ত হতে পারে। তবে চা উৎপাদনকারীরা ঝোপগুলোকে অতদূর অবধি বাড়তে দেয় না। ঝোপ যখন পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু হয় তখনই এগুলো কেটে ১৮ থেকে ২০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ছোট করে দেওয়া হয়। এই কেটে দেওয়ার নাম 'প্রুনিং'। এতে করে গাছ-গুলোতে বেশ ঝোপ হয় এবং সমস্ত গা থেকেই প্রচুর কচি পাতা বেরোয়। যদি গাছগুলো ছেটে ছোট করে না দেওয়া হয় তবে গাছগুলো থেকে কচি পাতা পাওয়ার পরিমাণ হয় কম; তাছাড়া অত উঁচু থেকে পাতা সংগ্রহ করা হয় অসম্ভব। এ-জাতীয় গাছকে আমরা বন্য চা-গাছ বলতে পারি। এগুলো দেখতে অনেকটা ম্যাগনোলিয়া ফুল গাছের মত হয়। ছেটে দেওয়া হয়ে গেলে বর্ষার দিনে ঝোপের সব জায়গা থেকে নতুন কচি পাতা গজাতে থাকে। নতুন পাতার একটা অংশ বাদ দিয়ে পাতা সংগ্রহ করবার টেবিল পেতে তার উপর নতুন পাতা সংগ্রহ করবার কাজ সুরু হয়। যদি প্রথমবার ২০ ইঞ্চিতে ছেটে দেওয়া হ'য়ে থাকে গাছগুলো তবে পাতা তোলার কাজ সুরু করতে হবে ৩২ ইঞ্চিতে। একই রকম উচ্চতায় পাতা তোলা হয় বলে চা-এর ক্ষেতে দেখতে হয় যেন সবুজ একখানা গালিচা। আগেই বলেছি, বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাতা গজাতে সুরু হয়, আবার বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে পাতা গজানোও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বর্ষাকাল ছাড়া বছরের সব সময়ই কিছু দিন পর পর এক এক দফায় নতুন পাতা গজায়। এমনিভাবে বছরে প্রায় পাঁচবার নতুন পাতা গজাতে পারে, প্রতি ১ থেকে দেড় মাস পর পর। চা ঝাড়ের সব জায়গা

দিয়েই যে সমানভাবে পাতা গজাবে তা নয়। ঝোপের মধ্য ভাগ থেকে পাতা বেরোয় সব চাইতে আগে, আর ধার থেকে বেরোয় সবচাইতে শেষে। এক ঝাঁক পাতা বেরিয়ে গেলে আর এক ঝাঁক পাতা বেরোনোর সময়ের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় বারের মত পাতা সংগ্রহ করতে হয়। তার মানে চাষের চাষে যারা নিযুক্ত তারা বছরে পঁচিশ থেকে ত্রিশবার 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' সংগ্রহ করবার সুযোগ পান।

চা-এর চাষের কতগুলো বিশেষ পদ্ধতি আছে। চা চাষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি দরকার হলেও জল যদি জমিতে জমে থাকে তবে তা চাষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। এ-জন্যে চা চাষের জমিতে জল নিষ্কাষণের ভাল ব্যবস্থা রাখা খুবই প্রয়োজন। যে জমিতে চা চাষ হচ্ছে সেখানে অন্ততপক্ষে তিনফুট গভীর নর্দ্দমার ব্যবস্থা রাখা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

চা ক্ষেতে উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্থার জন্যে যে অন্য জাতের গাছের প্রয়োজন হয়, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। এ-গাছগুলোর প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ। প্রধান কাজ হল চা গাছে এবং মাঠে যারা কাজ করছে তাদের জন্যে উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া যে সব অন্য জাতের গাছ লাগান হ'য়েছে তাদের মূল থেকে মাটির মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়। নাইট্রোজেন আবার গাছের একটি ভাল খাদ্য। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই চা ঝোপগুলো এ থেকে উপকৃত হবে। আবার শীতকালে শিরীষ গাছের পাতা ঝরে পড়ে মাটিতে; যেখানে তা পচে চমৎকার চাগাছের খাবারে পরিণত হয়। এটি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা আর কি! চা এর জমিতে সার ব্যবহার করাও বিশেষ প্রয়োজন। গাছের সবচাইতে ভাল খাবার হল 'সালফেট অব্ এমোনিয়া'। পচাত্তর হাজার টনের মত সালফেট অব্ এমোনিয়া ভারতে চা-এর জমিতে ব্যবহার করা হয় প্রতি বছরে। চা গাছের নানারকম রোগব্যাধি ও কীট-শত্রুর আক্রমণ হয় মাঝে মাঝে। চা উৎপাদনকারীকে এদিকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। চা-এর প্রধান কীট শত্রু হল 'লাল মাকড়সা'। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে এদের আগমন হয় মাঝে মাঝে;



শ্রমিকদের আধুনিক বাস-গৃহ—গোপালপুর

সমস্ত বাগান তখন লাল হ'য়ে যায়; সবুজের মধ্যে লাল যেন লিচুগাছের সবুজ পাতার মধ্যে লাল লিচুগুলি সব ঝুলে রয়েছে। উৎপাদনকারীকে বিশেষ সাবধানে এবং যত্নের সঙ্গে উপযুক্ত ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে এদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হয়। এ-ছাড়া গরু ভেড়া ছাগল থেকে চা ক্ষেত রক্ষা করবার জন্যে বাগানের চারদিকে ভালভাবে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রথম বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে কচি পাতা গজিয়ে উঠল চা ঝোপে। এবারে পাতা তোলার কাজ সুরু করা দরকার। বেতের ঝুড়ি পিঠে ঝুলিয়ে পাতার তোলার কাজে এগিয়ে আসে যারা তাদের অধিকাংশই মেয়েছেলে। দুপুর ও সন্ধ্যেবেলা ঝুড়িভর্ত্তি চাএর পাতা নিয়ে যায় তারা কারখানায়। সেখানে তা রীতিমত ওজন করা হয়। তারপর সুরু হয় কচি সবুজ পাতাগুলোকে সত্যিকারের চা (অর্থাৎ আমরা যা বাজারে কিনতে পাই) এ রূপান্তরিত করবার পদ্ধতি।

তোমরা বাজারে যে চা কিনতে পাও তা কালো রং এর। ওর ভেতরে গরম জল দিলেই কেমন সুন্দর রঙীন একটি পানীয় বেরিয়ে আসে। যে কচি পাতাগুলো সংগ্রহ করা হল সেগুলো নানারূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যেই অমনি রংএ পরিবর্তন করা হয়। কচি সবুজ পাতাগুলো প্রথমে বাঁশের মাচানের উপর চটের কাপড় ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে বা তারের র‍্যাকে শুকোতে দেওয়া যায়। এরকম শত শত মাচান থাকে এক একটি কারখানায়। তারের র‍্যাকগুলোর এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব থাকে ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি। শুকোনোর কাজের জন্যে যে প্রচুর জায়গার দরকার হয় তা বলাই বাহুল্য। একটি মাঝারী ধরণের কারখানায় যেখানে দৈনিক ২০০ মণ কাচা পাতা থেকে দৈনিক ৪০ মণ চা তৈরী হবে সে কারখানাটিতে শুধু এ কাজের জন্যে কমছে কম ১৬ হাজার বর্গ ফুট জায়গার দরকার। সে যাই হোক, পাতাগুলো এ অবস্থায় ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা থাকে। ফলে পাতার রস আপনা থেকে খানিকটা শুকিয়ে গিয়ে পাতা বেশ খানিকটা নরম হয়।

এর পরে পাতাগুলো পেষণীযন্ত্রে (বা রোলিং যন্ত্রে) পাঠান হয়। এ-যন্ত্রগুলো পেতলের বড় ড্রামের আকারে দেখতে। বড় একখানা পেতলের থালার উপর এটি অনবরত ঘোরে। ড্রামের গায়ে যে ঢাকনাটি আছে তা প্রয়োজনমত উপর নীচে সরান যায়। পেষণীযন্ত্র দু'রকমের হয়ে থাকে। এক রকমের যন্ত্রের ড্রামটি নিজে ঘোরে না, কিন্তু ভেতরকার টেবিলটা ঘোরে। অন্য ধরণের যন্ত্রের ড্রাম এবং টেবিল উভয়ই ঘোরে। এক একটি যন্ত্রে এক এক বারে ৪ মণের মত শুকনো পাতা ব্যবহার করা চলে। পাতাগুলো আধ ঘন্টার মত ঘোরান হলে যন্ত্রের থেকে বের করে নেয়া হয়। এলুমিনিয়ামের তৈরী ট্রলির সাহায্যে পাতাগুলো এবার 'সিফটার' নামক যন্ত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এ-যন্ত্রটি আসলে লম্বা ধাতুর তৈরী পাত; তার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র। এর উপর শুকনো পাতাগুলো রেখে যন্ত্রের সাহায্যে—জোরে জোরে নাড়াচাড়া করা হয়, ফলে ছেঁড়া টুকরো পাতাগুলো ছেদা দিয়ে নিচে পড়ে যায়। যে চা নিচে পড়ে গেল তাকে বলা হয় ধুলি বা গুঁড়ি চা। পাতের উপরে যে চা থাকে তাকে বলা হয় মোটা। ধুলি চা এবারে 'ফারমেন্টেসন' ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু 'মোটা' চা আবার পেষণী যন্ত্রে চালনা করা হয়। প্রথমবার পেষণীযন্ত্রে চায়ের উপর কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয় নি; কিন্তু দ্বিতীয়বারে রোলিং যন্ত্র ব্যবহার করবার সময় কিছু সময় পরপর চায়ের উপর চাপ আরোপ করা হয়। ফলে চা পাতাগুলো সমান ভাগে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়। তা ছাড়া পাতার গায়ে একটু পাকও পড়ে।

৩০ থেকে ৪০ মিনিট পেষণী যন্ত্রের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয়বার চালনা করবার পর বাছাইএর কাজ করা হয়। তারপর মোটা এবং ধুলি দুরকমের চা 'ফারমেন্টেসন্' ঘরে নিয়ে এলুমিনিয়াম বা দস্তার পাত বা শুধু মেজের উপর দু' ইঞ্চি পুরু করে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

ফারমেন্টেসনের ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। এ শুধু বাতাসের সঙ্গে চা-এর পাতাগুলোর যাতে ভালভাবে যোগাযোগ হয় তারই ব্যবস্থা। পাতার রসের সঙ্গে বায়ুর পুরোপুরি সংস্পর্শ লেগে একটা বিশেষ রকমের পরিবর্তন ঘটে যাতে করে চা পাতার রং আমরা যা দেখি ঠিক তেমনি হ'য়ে যায়। ফারমেন্টেসন কখন সুরু হবে তা চোখে দেখেই বোঝা যায়, কারণ তখন পাতার সবুজ রং তামাটে রংএ পরিবর্তিত হতে সুরু হয়। অবশ্য এ-পরিবর্ত্তনে কত সময় লাগবে সেটা নির্ভর করে পেষণী যন্ত্রের ভিতর দিয়ে কতবার চালনা করা হ'য়েছে তার উপর। তবে পেষণী যন্ত্রের ব্যবহার সুরু থেকে ফারমেন্টেস্‌ন শেষ হতে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় দরকার হয়। শীতল আবহাওয়ায় চার ঘন্টা পর্য্যন্ত সময় লাগতে পারে। রং এর পরিবর্তন হলে পর ধূলি ও মোটা উভয় প্রকার চাই শুকানোর যন্ত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। চা-এর কারখানায় এ যন্ত্রটিই হল সবচাইতে বড়। এর দু'টি অংশ—চুল্লী ও শুকানোর ঘর। চুল্লীকে ঘিরে অনেকগুলো নল থাকে। চুল্লীতে আগুন দিলে নলের মধ্যেকার বায়ু গরম হয়ে যায়। এ গরম বায়ু টেনে নিয়ে যাওয়া হয় শুকানোর ঘরে। এ-ঘরে বড় বড় থালায় ফারমেন্টেড্ চা ছড়িয়ে দিতে হয়। ঘরের হাওয়ার উত্তাপ থাকে দু'শ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। শুকানোর কাজটা পুরোপুরি একবারে করা হয় না। প্রথমবারে প্রায় বারো আনা কাজ এবং দ্বিতীয়বারে বাকী চার আনা শেষ করা হয়। এ জন্যে কমপক্ষে দু'টি শুকানোর ঘর প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় ঘরের উত্তাপ রাখা হয় ১৮০ ডিগ্রীর মত। দ্বিতীয়বার শুকানোর কাজ হয়ে গেলে চা তৈরী হ'য়ে যায় এবং ইচ্ছা করলে সে সময় গরম জলে চা ভিজিয়ে বেশ চমৎকার পানীয় পাওয়া যায়। তবে বাজারে চা পেতে হলে এখানেই চা কারখানার কাজ শেষ হয় না। আসল কাজ এখনো বাকী। চা ব্যবসায়ে গ্রেডিং বা সর্টিংএর অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের চা তার গুণানুসারে বাছাই করা একটি বিশেষ স্থান আছে। গুড়ো চা থেকে সুরু করে ১ ইঞ্চি লম্বা চা পাতা গুলোকে বিভিন্ন ভাগে বাছাই করা হয়। বাছাইএর কাজ হয়ে গেলে পর চা-কে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়, যেমন অরেঞ্জ পিকো,



চা বাগানের ভোজনাগার—গোপালনগর

গোল্ডেন অরেঞ্জ পিকো, ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ পিকো আরও কত সব নাম। এ-নামগুলো আসলে চা-এর বিভিন্ন আকারের জন্যেই।

চা গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত চা-এর নামও বিভিন্ন। চা গাছের কান্ড থেকে যে চা পাওয়া যায় তাকে বলে পাতা চা (লিফ্ গ্রেড), গাছের পাতার অংশ থেকে তৈরী চা-এর নাম ফ্যানিং গ্রেড, আর কান্ড এবং ভাঙ্গা অংশ থেকে সংগৃহীত চা-এর নাম ভাঙ্গা চা। সুতরাং পাতা চা-এর তিনটি ভাগ নিম্নলিখিতরূপঃ—

লিফ্ গ্রেড—ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ পিকো,
অরেঞ্জ এবং পিকো

ভাঙ্গা চা (ব্রোকেন গ্রেড)—ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো,
ব্রোকেন পিকো এবং
ব্রোকেন পিকো সুসং

ফ্যানিং গ্রেড—বি, ও, পি ফ্যানিংস্,
অরেঞ্জ ফ্যানিংস্
পিকো ফ্যানিংস্
ব্রোকেন পিকো ফ্যানিংস্

সবচাইতে ভাল চা-এর নাম ডাষ্ট এবং পিকো ডাষ্ট।

'পিকো', 'সুসং' প্রভৃতি কথাগুলোর মানে কি? আসলে এ-কথাগুলো চীনদেশীয়—'পেক-হো' মানে সরুপাতা (ফাইন লিফ্) আর 'সু সং' মানে মোটা পাতা (কোর্স লিফ্)। চীনদেশীয় এ-কথাগুলো থেকেই চাবাগানের বৃটিশ মালিকরা নামগুলো তৈরী করেছে।

এরপরে তোমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পার 'অরেঞ্জ' (কমলা) কথাটি ঢুকল কি করে চা এর মধ্যে? চা এর মধ্যে বা বিভিন্ন গ্রেডের মধ্যে কোন কমলালেবুর রস বা কমলা-লেবু রং মিশিয়ে দেয়া হয়েছে কি? না, এক-দম নয়। চা তৈরী করতে অন্য কোন বাইরের জিনিসই মেশান হয় না। মেশান একেবারে বেআইনী। আসলে কচি চা এর পাতাগুলোর রং একটু কমলা রং এর হয়ে থাকে। 'অরেঞ্জ' কথাটি এই জন্যেই চাপাতার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

বাছাই করার কাজ হ'য়ে গেলে বড় বড় প্লাইউডের বাক্সে বন্দী করা হল চা। পাঠান হল কলকাতায়।

তারপর?

শোন সেই কথা।

তুমি বাজারে গিয়ে চা-এর দোকানে চাইলে চার আউন্স চা, কেউ আট আউন্স আবার কেউ বা এক পাউন্ড। কিন্তু আগেই বলেছি বড় বড় প্লাইউডের বাক্সভর্ত্তি চা পাঠান হ'য়েছে কলকাতায়। ব্যাপারটা কেমন লাগছে। তাই না? সাধারণতঃ গ্রেডিং এর পর ১০০ বা ১২০ পাউন্ড চা এক এক বাক্সে ভর্ত্তি করা হয়ে থাকে। তিন পিস্ কাঠের তৈরী এ-বাক্সগুলোর ভেতরে থাকে এলুমিনিয়াম লাইনিং। এগুলো আকারে হয় সাধারণতঃ ১৯″ × ১৯″ × ২৪″ বা ১৬″ × ১৬″ × ১৮″ সাধারণতঃ ছোট আকারের চা ছোটবাক্সে আর বড় আকারের চা বড় বাক্সে ভর্ত্তি করা হয়। কারণটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না।

বিভিন্ন গ্রেডের চা এক গাড়ী সংগৃহীত হলে চা পাঠান হল কলকাতায় নীলামে চা বিক্রী করবার জন্যে। কলকাতা ডকে চা পৌঁছালে তা গুদামজাত করা হয় বিশেষভাবে তৈরী চা-এর গুদাম ঘরে। কলকাতায় যে রাখা হয় অন্য একটি গুদামে, নাম 'ট্রানজিট গুদাম'। কাষ্টমস্ এবং অন্যান্য ব্যাপার মিটে গেলে এ চা জাহাজে করে বিদেশে পাঠান হয়। কলকাতায় বিক্রির চা (যে বিশেষভাবে তৈরী গুদামে রয়েছে) চা-এর নির্দ্দিষ্ট দালালরা প্রথম পরীক্ষা করেন। এরা প্রতি বাক্সএর উপরে একটি গোল ফুটো করে তা থেকে কিছু চা বার করে নেন। ফুটোগুলো অবশ্য চাকতি দিয়ে ভালভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রতিবাক্স থেকে যে চা নেওয়া হয়েছে তা একসঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে সম্ভাব্য চা-ক্রেতাদের নিকট তা পাঠিয়ে দিতে হয়। অবশ্য এ-কাজটি করবার আগেই দালালরা চা-এর যতদূর সম্ভব বিবরণী ছাপিয়ে এবং তাদের সুবিধামত একটি নম্বর বসিয়ে তাদের ক্যাটালগে ছাপিয়ে দেন। চা-এর নমুনা সম্ভাব্য ক্রেতারা ভালভাবে পরীক্ষা করে নেন। এঁদের রয়েছে ভাল ভাল চা

পরীক্ষক। এরা চা-এর অন্যান্য গুণাগুণের সঙ্গে চা তৈরী করে খেয়ে দেখেন, চা এর আস্বাদ কেমন, গন্ধ কত মধুর! এ এক মজার চাকুরী। দিনে যে তাদের কত কাপ চা খেতে হয় তা বলার নয়। এঁদের রিপোর্ট অনুসারে ক্রেতারা চা-এর দাম ঠিক করেন। এদের মধ্যে আবার অনেকে আছেন যারা বিদেশী খরিদ্দারদের হয়ে এখানে কাজ করেন। এরা এরোপ্লেনে করে চা-এর নমুনা পাঠিয়ে দেন বিদেশী ক্রেতাদের নিকট। তাদের রিপোর্ট পেলে সকলে নিজের নিজের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে দাম ঠিক করে নেন। তা'ছাড়া প্রত্যেক দালালি প্রতিষ্ঠানেরও চা পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তারাও চা-এর একটা দাম ঠিক করে ক্রেতাদের জানিয়ে দেন। তারপর কলকাতার মিশন রোতে এবং লন্ডনের মিনসিং লেনে প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার নীলাম হয়। যাদের ডাক সবচাইতে বেশী হয় তারাই প্রয়োজন মত চা কিনে নেন। কমপক্ষে এক বাক্স এবং উপরে ১০০ বাক্স চা নীলামে কেনা চলে।

নীলাম হ'য়ে গেলে ক্রেতারা নিজের নিজের মাল তাদের নিজেদের গুদামে নিয়ে নেন। এখানে তারা বিভিন্ন বাগান থেকে কেনা চা তাদের সুবিধামত বাজার দর, চায়ের গুণাগুণ প্রভৃতি কতগুলো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে মিশিয়ে নেন। এ মেশান ব্যাপারটার নাম ব্লেন্ডিং। এটি একটি বিশেষ ধরণের কাজ। বড় বড় ব্যবসায়ীরা এ-কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু ছোটখাট ব্যবসায়ীরা হাতেই এ-কাজ করে থাকেন। মেশানোর কাজ সুরু হ'য়ে গেলে পর চা তার নিজস্ব বাগানের পরিচয় হারিয়ে কোন বিশেষ ব্যবসায়ীর নামেই পরিচিত হ'য়ে থাকে—যেমন ব্রুকবন্ড, লিপটন, তস্, কনোই ইত্যাদি। এরা তখন এক পাউন্ড, আধ পাউন্ড, চার আউন্স প্রভৃতির ছোট ছোট প্যাকেট নিজেদের নামে বাজারে চালু করেন। তুমি যখন দোকানে গিয়ে চা কিনছ তখন এই মিশ্রিত চাই তুমি পাবে, অমুক বাগানের চা তোমার চাই, এ চাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।

প্যাকেট করার ব্যাপারে আমেরিকা আবার এক ধাপ এগিয়ে গেছে। প্যাকিংএর প্রত্যেকটি কাজেই তারা যন্ত্রের সাহায্য তো নেয়ই, তাছাড়া খুব ছোট ছোট কাগজের প্যাকেটে অল্প পরিমাণ রেখে প্যাকেটগুলো সুতা বা কোন আঠার সাহায্য ছাড়াই বন্ধ করে বাজারে ছাড়ে। এ-জাতীয় কাগজের প্যাকেট ঠিক এক কাপ চা তৈরী করা যেতে পারে ঠিক তত পরিমাণ চা থাকে। এবারে যে ছোট প্যাকেটগুলো রেশমের সুতো দিয়ে বেঁধে বাজারে বিক্রী করা হল। এর এক প্যাকেট চা কিনে কাপে ঢেলে দাও, তারপর গরম জল ঢেলে চার পাঁচ মিনিট পর চমৎকার গন্ধযুক্ত পানীয় পাওয়া যাবে। পরিমাণ মত দুধ চিনি মিশিয়ে খেতে দাও; চমৎকার আস্বাদ পাবে। চা তৈরী করাটা নাকি একটা গুণের কাজ। আমেরিকানরা সে গুণটিকে যন্ত্র দিয়েই চালিয়ে নিচ্ছে। এ-ব্যাপারে তারা আরও অনেকটা এগিয়েছে। একটা যন্ত্রে এক পাউন্ডের মত চা রেখে দেওয়া হল এবং যন্ত্রের মধ্যে একটা নল দিয়ে জল ঢেলে দেওয়া হল পরিমাণ মত। যন্ত্রের একটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠে কিছু দুধ চিনি রাখা হল। একটি নিয়ে যন্ত্রের 'ট্যাপের' নীচে ধরে যন্ত্রটি চালিয়ে দাও। ব্যাস্, আর কিছুর দরকার নেই; এক কাপ গরম চা তুমি পেয়ে গেলে। যন্ত্রের মধ্যে আর একটি ঘর আছে। এর তলাকার নলের নীচে একটি গ্লাস ধরলে এক গ্লাস বরফঠান্ডা চা পেয়ে যাবে। আমেরিকানরা আবার ঠান্ডা চা-এর ভারী ভক্ত। আসলে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বেশ কড়া চায়ের লিকারে বরফ আর জল মিশিয়ে এ চা তৈরী করা হয়। গ্লাসে এক টুকরো লেবু মিশিয়ে নিলে তো আর কথাই নেই—গ্লাসের চায়ের আস্বাদ আরও বেড়ে গেল।

চা খাওয়ার আর একরকম পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। এর নাম 'সবুজ চা'। আমরা যে চা-এর কথা আগে বললাম তার নাম দেওয়া হল ধর 'কালো চা'। সবুজ চা-এর তৈরীর পদ্ধতি প্রায় কালো চা-এরই মত। এ-উপায়ে পাতা তোলা হয়ে গেলে পাতাগুলো তিন-চার মিনিট ফুটিয়ে

নিতে হয়। তারপর তা ঠান্ডা হলে দু'বার পেষণী যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালাতে হয়; এ-চা শুকোবার যন্ত্রে শুকিয়ে নিয়ে যে চা তৈরী হবে তাকে বলা হয় সবুজ চা। কারণ এ চা-এর রং ঠিক কালো হয় না, হয় অনেকটা সবুজ রং এর। গরম জলে ছেলে দিলে এ-চা থেকে খানিকটা হলদে রং এর লিকার পাওয়া যায়। পাকিস্হানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ভারতের কাশমীর অঞ্চল এবং আফগানিস্হানের লোকেরা এ-চা খুবই পছন্দ করে। এ-চা তৈরী হ'য়ে গেলে সাধারণ চা-এর মত দুধ চিনি মেশান হয় না, মেশান হয় একটু সোডা, একটু নুন ও একটু লেবুর রস। জাপানেও এই চা-এর খুব কদর আছে। জাপানীরা খাবারের সাথেই তা' পান করে থাকে। সবুজ চা তৈরীর ব্যাপারে জাপান বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। জাপানে কোন বাড়ীতে অতিথি এলে এক কাপ সবুজ চা দিয়ে আপ্যায়ন করবার রীতি আছে। ফরমোজা, হংকং, চীন এবং আফ্রিকার আলেজিরিয়ার অধিবাসীরা সবুজ চা খুব পছন্দ করে।

চা খাওয়ার পদ্ধতি বিভিন্নদেশে বিভিন্নরূপ। তিব্বতের লোকেরা কঠিন চা অর্থাৎ ইটের বা বলের আকারের চা খেয়ে থাকে। এ তৈরী করা হয় কালো চা-এর সঙ্গে গমজাতীয় কোন খাদ্যদ্রব্য মিশিয়ে বড় চকোলেট বা আপেলের আকারে তৈরী করা হয়। পানীয় তৈরী করবার সময় এ-থেকে এক টুকরো কেটে বাটীতে গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই হল। তবে সুবিধামত তার সঙ্গে মিষ্টি বা অন্য কিছু মিশিয়ে নিতে বাধা নেই।

তবে সাধারণতঃ চা এর সঙ্গে দুধ চিনি মিশিয়ে চা পানটাই সর্বাধিক প্রচলিত। তবে অনেকে আবার চা-এর গন্ধ যাতে নষ্ট হ'য়ে না যায় সেজন্য দুধ চিনি না মিশিয়েই চা পান করতে পছন্দ করেন। তবে আজকাল দুধ বাদ দিয়ে চিনি ও লেবু মিশিয়ে চা খাওয়াটা ক্রমে ক্রমে খুব চালু হচ্ছে। একজন দৈনিক গড়ে প্রায় দশ কাপ চা পান করে থাকে; কিন্তু একজন ভারতীয় ক' কাপ করে শুনবে? মাত্র আধ কাপ।

চা-এর গল্প এখানেই শেষ। খুব পরিশ্রমের পর এক কাপ চা শরীর মন জুড়িয়ে দেয়, কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। কোন উত্তেজনা হয় না।



ডুয়ার্স অঞ্চলে আধুনিক ধরণের হাসপাতাল



এ্যালুমিনিয়ামের কথা

এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী বাসনপত্র আজকাল প্রায় সব বাড়ীতেই ব্যবহার করা হয়। আগে যেখানে পিতল বা তামার পাত্রের চলন ছিল এখন এ্যালুমিনিয়াম্ ক্রমে ক্রমে তার জায়গা দখল করে ফেলছে। শুধু বাসনপত্র কেন, আরও অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা আজকাল প্রচুর।

এহেন দরকারী জিনিষ যে এ্যালুমিনিয়াম্—তার সম্বন্ধে স্বভাবতঃই লোকের মনে নানা কৌতূহল হতে পারে। জিনিষটা আসলে কি, কোথায় পাওয়া যায়, কি ভাবে পাওয়া যায় ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন মনে আসে।

পিতল বা তামার বদলে যখন ব্যবহার করা হচ্ছে তখন এ্যালুমিনিয়াম্‌ও যে একটা ধাতু এই রকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিকই তাই। তবে এ্যালুমিনিয়ামের বাংলা নাম কি? নাম শুনে তো মনে হচ্ছে ওটা একটা ইংরেজী শব্দ! ওর কি বাংলা নাম নেই? —যেমন 'কপার'-এর বাংলা তামা, 'সিলভার'-এর বাংলা রুপো, 'আয়রনে'র বাংলা লোহা সেই রকম। পিতল জিনিষটা মিশেল ধাতু, তবু তাও বাংলা কথা। ওর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ব্রাস্'। না, সত্যি এ্যালুমিনিয়ামের কোনও পৃথক্ বাংলা নাম নেই, কিংবা 'এ্যালুমিনিয়াম্' কথাটাকেই আমরা বাংলা করে নিয়েছি। এরকম বিদেশী শব্দ বাংলায় আরও অনেক এসেছে—যেমন কাগজ, দোকান, দরকার, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। 'বেঞ্চ'-কে আমরা বলি বেঞ্চি, 'আলমায়রা'কে আলমারী, 'হস্‌পিটাল'কে হাসপাতাল, 'ডক্টর'কে ডাক্তার।

কিন্তু ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আজকের আলোচনা নয়, আজকের আলোচনা এ্যালুমিনিয়াম্ নিয়ে। এ্যালুমিনিয়ামের বাংলা প্রতিশব্দ না থাকার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের দেশের লোকেরা আগে এ-ধাতুটির সঙ্গে একেবারেই পরিচিত ছিল না। জিনিষটা আধুনিক বিজ্ঞানের দান।

এ্যালুমিনিয়াম্ নামটা কি করে এল আগে সেটা বলে নি। কথাটা এসেছে প্রাচীন রোমান্‌দের কাছ থেকে। ইটালির আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে বহু দিন আগে এ্যালুমেন নামে একরকম জিনিষ পাওয়া যেত—যা নাকি রোমানরা ওষুধপত্রে আর রংএর কাজে প্রচুর ব্যবহার করত। কিন্তু জিনিষটা আসলে কি তা কেউ জানত না। এর বহু—বহু দিন পরে বিলাতের বিজ্ঞানীরা এই এ্যালুমেনের একটা নকল তৈরী করেন—মাটীর সঙ্গে এসিড মিশিয়ে, আর ঐ নকল এ্যালুমেনের নাম রাখেন এ্যালুমিনা। এ্যালুমেনের মত এই নকল এ্যালুমিনারও আসল উপাদান কি তা তখন পর্যন্ত জানা ছিল না।

তার পর এলেন স্যর্ হাম্‌ফ্রী ডেভি। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী-সমাজের তিনি তখন মাথা বলা চলে। রসায়ন বিজ্ঞানের বহু—বহু রকম আবিষ্কার করেছেন তিনি—জগৎযোড়া খ্যাতিও লাভ করেছেন। সেই ডেভি নামলেন এ্যালুমিনার রহস্য উদ্ধার করবার জন্য।

নানা পরীক্ষার পর তাঁর অভিমতও পাওয়া গেল। এ্যালুমিনা হচ্ছে একটা যৌগিক পদার্থ। অক্সিজেনের সঙ্গে একটি ধাতুর মিলনে এই জিনিষটি তৈরী হয়। কিন্তু কোন্ ধাতু? ডেভি সে ধাতু দেখাতে পারলেন না। বললেন, এ একটা

অজানা ধাতু, আজও এ ধাতু আবিষ্কার করতে পারে নি কেউ। কিন্তু এ ধাতু নিশ্চয়ই আছে, একদিন না একদিন একে খুঁজে পাওয়া যাবেই। এই অনাবিষ্কৃত ধাতুর একটা নামকরণও করে ফেললেন তিনি। এ্যালুমিনিয়াম্। অর্থাৎ এ্যালুমেনের অনুকরণে যেমন নাম দেওয়া হয়েছিল এ্যালুমিনা, তেমনি এ্যালুমিনা থেকে ওর নাম দেওয়া হ'ল এ্যালুমিনিয়াম্।

নামকরণ হয়ে গেল বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত ও ধাতু কারো চোখে দেখবার সুযোগ হ'ল না। ডেভি কিন্তু জোর দিয়ে বললেন, ও ধাতু নিশ্চয়ই আছে, আর ডেভির মত বড় পন্ডিত ব্যক্তি কখনও ভুল বলতে পারেন না এই বিশ্বাসে লোকে মেনে নিল তাঁর কথা। কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

ডেভি এ্যালুমিনিয়াম্ দেখে যেতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর অনুমান যে নির্ভুল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৮২৫ সনে। পর পর দু'জন বিজ্ঞানী সত্যি সত্যিই এই অজানা ধাতু আবিষ্কার করে ফেললেন ঐ বছর। প্রথমে ওয়র্স্টেডের, তারপর হ্বালার। ডেভির সম্মান রাখার জন্য এ্যালুমিনিয়াম্ নামটাই বহাল রাখা হ'ল এই নতুন ধাতুর।

আবিষ্কার হ'ল বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত এ্যালুমিনিয়াম্ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারেই সীমাবদ্ধ রইল। এ্যালুমিনিয়াম্ তৈরী করতে অসম্ভব খরচ পড়ত, আর যে উপায়ে তা তৈরী হ'ত তাতে পরিমাণের দিক্ দিয়েও সেটা পাওয়া যেত নাম মাত্র। ফলে এক সের এ্যালুমিনিয়াম্ যোগাড় করতে হলে অন্ততঃ হাজার তিনেক টাকা লাগত। কাজেই সাধারণ লোকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কোন্ গরজে?

এত অসম্ভব দাম, অথচ এ্যালুমিনিয়ামের মত সহজপ্রাপ্য ধাতুও পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। কোনও ধাতু তো দূরের কথা,—অক্সিজেন আর সিলিকন্ (বালির উপাদান) ছাড়া অন্য কোন মৌলিক পদার্থও পৃথিবীতে এত বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে নেই। পৃথিবীর ওপরকার আস্তরের তেরো ভাগের এক ভাগই হচ্ছে এই এ্যালুমিনিয়াম্। পাহাড়-পর্বত, ধূলোমাটি—সবেরই মধ্যে আছে এ্যালুমিনিয়াম্। এমন কি দামী দামী মণি-জহরৎগুলিও প্রায় সবই এই এ্যালুমিনিয়াম্ দিয়ে তৈরী; সঙ্গে অবশ্য অন্য জিনিষও মেশাল আছে। পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত—সবের মধ্যেই।

তবে? এত সহজপ্রাপ্যই যদি হয় এ্যালুমিনিয়াম্ তা' হ'লে এত দুষ্প্রাপ্য হ'ল কি করে? আর এত দীর্ঘ দিনই বা লাগল কেন ওকে খুঁজে বার করতে? কারণটা আর কিছুই না, এ্যালুমিনিয়াম্‌কে পৃথক্ করতে প্রচন্ড তাপের প্রয়োজন হয়। বৈদ্যুতিক চুল্লী ছাড়া ঐ রকম তাপ সৃষ্টি করা কষ্টকর। তা ছাড়া এ্যালুমিনিয়াম্ নিষ্কাশনের প্রক্রিয়ার মধ্যেও অনেক হাঙ্গামা আছে। এই সবের দরুণই এত কাছের জিনিষ পেতে এতদিন লেগে গেছে মানুষের।

আবার, এই সব কারণেই, এ্যালুমিনিয়াম্ আবিষ্কৃত হবারও বহুদিন পরে পর্যন্ত তা সর্ব-সাধারণের কোন কাজেই আসে নি। যিনি এ্যালুমিনিয়াম্‌কে প্রথম জনসাধারণের কাজে লাগাবার পথ খুলে দেন তাঁর নাম চার্ল্‌স্ হল্। বাড়ী আমেরিকায়।

হলের বয়স তখন মাত্র ২০-২১ বছর, ওবার্লিন কলেজের ছাত্র। একদিন ক্লাসে কেমিস্ট্রী (রসায়ন বিজ্ঞান) পড়ানো হচ্ছে। ধাতুবিদ্যা পড়াতে পড়াতে এ্যালুমিনিয়ামের কথা উঠল। অধ্যাপক বললেন, "ডেভির সেই এ্যালুমিনিয়াম্-এর আবিষ্কার হয়েছে বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওটা বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরীতেই বাঁধা পড়ে আছে। সাধারণতঃ ধাতু বলতে আমরা যে সব কাজের জিনিষ বুঝি, এ্যালুমিনিয়াম্ মোটেই তার মধ্যে পড়ে না। অথচ এর পেছনে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।" তার পর হেসে বললেন, "এ্যালুমিনিয়াম্‌এর অভাব নেই পৃথিবীতে। প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে নানা ভাবে, এখানে-সেখানে। যদি কেউ সহজ উপায়ে, অল্প খরচে, ব্যবসার উপযোগী করে এ্যালুমিনিয়াম্ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারে তা হলে সে পৃথিবীর একটা

মস্ত উপকার করবে। নিজে তো ধনী হবেই। তোমরা কেউ চেষ্টা করে দেখ না!"

কথাটা তিনি হাসির ছলেই বললেন, ছাত্রেরাও সেই ভাবেই নিল। কিন্তু হলের মনে কথাটা একটা দাগ রেখে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, "আমি এ কাজ হাসিল করব। আজ না পারি, ভবিষ্যতে পারবই—যদি আমার দৃঢ় সংকল্প থাকে।"

কলেজ থেকে বেরিয়েই হল্ গিয়ে ঢুকলেন পরীক্ষাগারে। অদম্য তাঁর সংকল্প, অসীম তাঁর উৎসাহ। দেখতে দেখতে ছ' মাস কেটে গেল। হল্ তখনও তাঁর সংকল্পে অটল। শেষে একদিন দেখা গেল, উপায় ধরা পড়েছে, সত্যি সত্যি কাজ হাসিল করে ফেলেছেন হল্। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ বছর।

কি ক'রে সম্ভব হ'ল? হল্ বক্সাইট নিয়ে কাজ সুরু করেছিলেন। বক্সাইট হচ্ছে একটা সহজলভ্য খনিজ পদার্থ, পৃথিবীর নানা জায়গায় পাওয়া যায়। এই বক্সাইটের উপাদান হচ্ছে এ্যালুমিনিয়াম্, অক্সিজেন আর জল। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বক্সাইট থেকে জলটা সরিয়ে ফেলে বক্সাইটকে সহজেই এ্যালুমিনা বা এ্যালুমিনিয়াম্ অক্সাইডে পরিবর্তিত করা যায়। এই এ্যালুমিনাকে তরল অবস্থায় আনা দরকার এবং তার জন্য চাই এমন কোন জিনিষ যার মধ্যে এ্যালুমিনা দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে। অনেক খুঁজেপেতে হল্ দেখলেন ক্রায়োলাইট্ নামে যে খনিজ পদার্থ আছে তার মধ্যে এ্যালুমিনাকে দ্রবীভূত করা যায়। এই ক্রায়োলাইটের মধ্যেও অবশ্য খানিকটা এ্যালুমিনিয়াম্ আছে আর আছে ফ্লুওরিন, সোডিয়াম ইত্যাদি। যাই হোক্, খানিকটা ক্রায়োলাইট্‌কে তাপে গালিয়ে তার মধ্যে এ্যালুমিনাকেও দ্রবীভূত করে নিয়ে যদি তার ভিতর দিয়ে জোর বিদ্যুতের স্রোত চালিয়ে দেওয়া যায় আর সমস্ত জিনিষটাকে খুব গরম করা যায় তা হলে এ্যালুমিনিয়াম্ অক্সাইড্ ভেঙ্গে গিয়ে তার ভিতরকার অক্সিজেন আর এ্যালুমিনিয়াম্ আলাদা হয়ে পড়ে এবং সে এ্যালুমিনিয়াম্‌কে তরল অবস্থায় কৌশলে পৃথক্ করে নেওয়া চলে। এজন্য প্রায় ৯৫০ ডিগ্রী উত্তাপের দরকার। তা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় ঐ উত্তাপ সৃষ্টি করা এমন কিছু কঠিন নয়। হল্ দেখলেন যে এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে প্রচুর পরিমাণ এ্যালুমিনিয়াম্ পাওয়া যেতে পারে।

হলের আবিষ্কারে চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তাঁর পরে আরও দু'-এক জন বিজ্ঞানী পৃথক্ প্রক্রিয়ায় এ্যালুমিনিয়াম্ উদ্ধারের উপায় বার করলেন। এঁদের মধ্যে হেরোল্ৎ নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এঁদের এই আবিষ্কারে দেখতে দেখতে বিজ্ঞান-জগতে একটা সাড়া পড়ে গেল। বহু-দিনের বহু চেষ্টায় খুঁজে-না-পাওয়া এই মূল্য-বান্ ধাতু হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে দেখে ব্যবসায়ীরা সহজেই এদিকে ঝুঁকে পড়লেন। যেখানেই সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায় সেখানেই এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা গড়ে উঠতে লাগল। প্রথম প্রথম অবশ্য এই সব কারখানায়ও এ্যালুমিনিয়াম্‌কে পরম মূল্যবান্ সামগ্রী মনে করে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা হ'ত। পরে, যখন অনেক জায়গায় জিনিষটা তৈরী হতে লাগল, তখন ওর দামও হু-হু করে কমতে লাগল। যে জিনিষ আগে এক সের যোগাড় করতে হলে তিন হাজার—সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়েও নাজেহাল হতে হ'ত, ১৮৯৫ সালে তার দাম হ'ল প্রতি পাউন্ড ২ পাউন্ড অর্থাৎ আমাদের হিসেবে প্রতি সের ৫০-৫২ টাকা। তারপর আরও—আরও কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমাদের দেশেই এ্যালুমিনিয়াম্ ৪-৫ টাকা সের দরে বিক্রী হয়েছে। এখন একটু বাড়লেও ৮-১০ টাকার বেশী নয়।

ধাতু হিসেবে এ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা এখন প্রচুর—কারণ, কবির ভাষায় এ্যালুমিনিয়াম্ হচ্ছে "নানাসদ্‌গুণবিভূষিতম্"—অনেক গুণ এ্যালুমিনিয়ামের। বেশীর ভাগ ধাতুই বেশ ভারী, কিন্তু এ্যালুমিনিয়াম্ সে তুলনায় খুবই হাল্কা। হাল্কা অথচ দিব্যি শক্ত। লোহার মত

ঢালাই করা যায়, লোহার মত বহু কাজে ব্যবহার করা যায়, অথচ লোহার মত মরচে ধরে না। সব সময়েই দিব্যি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে—সাদা ধব্‌ধবে চেহারা। পন্ডিতেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন বাতাসের সংস্পর্শে এলে এ্যাল্‌মিনিয়ামের ওপর একটা অতিসূক্ষ্ম পাৎলা অক্সাইডের পর্দা পড়ে আর তারই ফলে এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌ দীর্ঘকাল বাইরের ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করতে পারে।

এ-ছাড়া আরও অনেক গুণ আছে এ্যাল্‌মিনিয়ামের। কতকগুলি ধাতু আছে সেগুলি এমনিতে বেশ নিরাপদ কিন্তু অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে মিশে যে সব যৌগিক পদার্থ তৈরী

আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌ কাঁসা-পিতলকে সরিয়ে ফেলছে। শুধু বাসন-পত্র নয়, বোতলের ছিপি, চকোলেটের মোড়ক —এমনি ধারা কত খুঁটিনাটি ব্যাপারেই না আজ-কাল এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌ ব্যবহার করা হচ্ছে!

এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌কে সহজেই পিটিয়ে পাৎলা চাদর করা যায়, এ্যাল্‌মিনিয়ামের লম্বা নল বা সরু তার করতেও কোন কষ্ট হয় না। এ্যাল্‌মিনিয়ামের তৈরী বৈদ্যুতিক তার তাই আজকাল যথেষ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খুব সহজেই বয়ে যেতে পারে।



এ্যাল্‌মিনিয়ামের তৈরী মোটর ট্রাক্‌
মেশিন নয়, ট্রাকের আবরণ বা 'বডি' এই ভাবে তৈরী করে প্রচুর সুফল পাওয়া গেছে।

করে তার অনেকগুলিই মানুষের পক্ষে বিষাক্ত। এ্যাল্‌মিনিয়ামের এ দোষ নেই। এ্যাল্‌মিনিয়ামের এই সব লবণ বা যৌগিক পদার্থ সচরাচর বিষাক্ত হয় না—ফলে খাবারদাবার তৈরী করবার উপযোগী বাসনপত্র বানাতে হলে এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌ অতি উৎকৃষ্ট ধাতু। যে-সব খাদ্যসামগ্রী আজ-কাল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হয় তার বেশীর ভাগ জায়গায়ই এখন এ্যাল্‌মিনিয়ামের তৈরী পাত্র ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে যে হয় তা তো আমরা চোখেই দেখতে পাই। বিলেতে তো কাঁসা-পিতলের চলনই নেই—সব এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌।

এ্যাল্‌মিনিয়ামের গুঁড়োও আজকাল প্রচুর ব্যবহৃত হয় রংএর বাজারে। তিসির তেল বা ঐ জাতীয় তেলের সঙ্গে সূক্ষ্ম এ্যাল্‌মিনিয়ামের গুঁড়ো মিশিয়ে এই এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌-রং তৈরী হয়। সাদা, জ্বলজ্বলে রং—সূর্যের আলোয় সর্বদা ঝক্‌ঝক্‌ করে। কাজেই মোটরগাড়ী, ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি রং করতে এ-রংয়ের চাহিদা প্রচুর। আমাদের পরিচিত হাওড়ার পোলও এই এ্যাল্‌মিনিয়াম্‌ রং দিয়ে রাঙ্গানো হয়েছে। যারা কলকাতায় থাকো, দেখে থাকবে, কী ঝক্‌ঝকে এই রং! বস্তুতঃ ধাতুর তৈরী জিনিষ রং করতে এ রংএর জুড়ি নেই।

শুধু রং করার কাজেই নয়, এ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়ো আতসবাজীতেও ব্যবহার করা হয়। তোমরা কালীপূজোর সময় ইলেক্‌ট্রিক তুবড়ী জ্বলতে দেখেছ নিশ্চয়ই। কেউ কেউ হয়তো নিজেরাই ঐ রকম তুবড়ী বানাতে পার। ইলেক্‌ট্রিক তুবড়ীতে ইলেক্‌ট্রিসিটির কোন সম্পর্ক নেই—আছে এই এ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়োর। বারুদের সংস্পর্শে জ্বালিয়ে দিলে এই গুঁড়ো আগুনের ফুলকির মত জ্বল্‌জ্বলে চোখ-ধাঁধানো চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে আর মনে হয় যেন সাদা ইলেক্‌ট্রিক আলোর ফুল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে!

রাসায়নিকরা আরও নানান্‌ ব্যাপারে এ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়োকে কাজে লাগিয়েছেন। এ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়োর সঙ্গে লোহার মরচের গুঁড়ো মিশিয়ে থার্মিট্‌ নামে একরকম জিনিষ তৈরী করেছেন তাঁরা। এই থার্মিটকে একবার জ্বালিয়ে দিতে পারলে এত প্রচন্ড উত্তাপ



এই বিরাট বাড়ীর অনেকটা অংশই এ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে তৈরী। এজন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড এ্যালুমিনিয়াম্‌ ব্যবহার করতে হয়েছে।



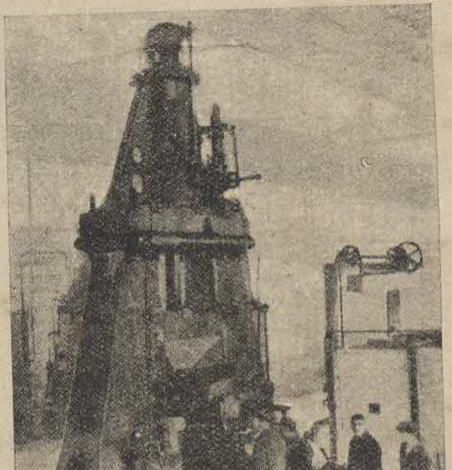
—এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী গীর্জার চূড়া—
চূড়ার প্রতিটি অংশ এ্যালুমিনিয়ামের ছুঁচাল খুঁটি দিয়ে তৈরী। এরকম দু'শ'র ওপর খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছে এই চূড়ায়।

বেরোতে থাকে যে লোহা প্রভৃতি অনেক ধাতুই তা সহ্য করতে পারে না—মুহূর্তে গলে যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় আগুনে বোমা বা ইন্‌সেন্‌ডিয়ারী বম্ব্‌ ব্যবহার করা হয়েছিল—অনেকেরই হয়তো মনে আছে। এই আগুনে বোমা তৈরী হ'ত থার্মিটের সাহায্যে। কারণ একবার জ্বলতে সুরু করলে এ-আগুন নেবানো বড় কষ্টকর,—সাধারণ জল বা আগুন-নেবানো গ্যাস (ফায়ার এক্‌স্‌টিংগুইশার) কোন কাজে আসে না ওতে। বাতাসের সাহায্য ছাড়াই এ-আগুন জ্বলতে থাকে আর সব কিছু পুড়িয়ে, গালিয়ে, লন্ড-ভন্ড করে দেয়। আগুনে বোমা ছাড়া অন্য বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করতেও বিজ্ঞানীরা এ্যালুমিনিয়াম্‌ ব্যবহার করেছেন। যেমন এ্যামোনাল্‌।

কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথী বা বিস্ফোরক হিসেবে নয়—জনকল্যাণকর কাজে এ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার সম্বন্ধেই বলি। আজকাল আমেরিকায় বাড়ীঘর তৈরীর কাজেও এ্যালুমিনিয়ামের ভীষণ চল হয়েছে। এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী ছাদ, এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী দরজা-জানালা, এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী সিঁড়ি—কিছুই বাদ যাচ্ছে না। লোহার বা অন্য ধাতুর বদলে হামেশাই এগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। দেখতেও এগুলি যেমন সুন্দর, মজবুৎও তেমনি, আবার মেরামত করতেও তেমনি খরচ কম। অনেকে আবার ঘরের আসবাবপত্র—চেয়ার, টেবিল, বুকশেল্‌ফ্‌, আলমারী প্রভৃতিও এ্যালুমিনিয়াম্‌ দিয়ে তৈরী করছেন। হাল্কা অথচ মজবুৎ এই সব আসবাব আমেরিকার নানা জায়গায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের দেশেও এর ব্যবহার দেখেছি। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এগুলিকে।

খাঁটি এ্যালুমিনিয়াম্‌ ছেড়ে এবার এ্যালুমিনিয়ামের "এ্যালয়"-এর কথা বলি। 'এ্যালয়' মানে মিশ্র ধাতু। অর্থাৎ এক ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতু (এক বা একাধিক) মিশিয়ে যে ধাতু তৈরী হয়। পিতলও এই রকম একটা 'এ্যালয়' বা মিশ্রধাতু—তামা আর দস্তা মিশিয়ে তৈরী। ঐ রকম জার্মান্‌ সিলভারও একটি,—তামা, দস্তা আর নিকেলের এ্যালয় (জার্মান্‌ সিল্‌ভারে কিন্তু এক ফোঁটাও সিল্‌ভার অর্থাৎ রূপো নেই!)। এ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অল্প মাত্রায় তামা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম্‌, ম্যাঙ্গানীজ, টিন, দস্তা (জিঙ্ক্‌) প্রভৃতি ধাতু মিশিয়ে এই সব এ্যালয় তৈরী হয়। উপাদান অনুযায়ী এক-একটা এ্যালয়ের এক-একটা বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন ধর, ডুর্‌-এ্যালুমিনিয়াম্‌, ম্যাগ্‌নেলিয়াম্‌, এল্‌-এইট্‌ ইত্যাদি। এই সব এ্যালয়ের গুণ শুনলে অবাক্‌ হতে হয়। খাঁটি এ্যালুমিনিয়ামে যে সব ত্রুটী ছিল—সব যেন দূর হয়েছে এই এ্যালয়গুলিতে। এদের সাহায্যে বিজ্ঞানীরাও অনেক অসাধ্য সাধন করছেন। এ-পর্যন্ত কলকব্জা তৈরীর ব্যাপারে লোহা বা ইস্পাতেরই ছিল একাধিপত্য, কিন্তু এ্যালুমিনিয়ামের এই সব এ্যালয় আস্তে আস্তে তাদের জায়গা দখল করে ফেলছে। মোটরগাড়ীর ভিতরকার কলকব্জা, বাইরের কাঠামো, রেল-এঞ্জিনের ভিতরকার নানা অংশ, রেলগাড়ীর কামরার বিভিন্ন অংশ, বসবার সীট্‌—সবই তৈরী হচ্ছে এ্যালুমিনিয়ামের এ্যালয় দিয়ে। আর এরোপ্লেনের তো কথাই নেই! ভারী লোহার চেয়ে হাল্কা এ্যালুমিনিয়াম-এ্যালয়ের তৈরী কলকব্জাই তার পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। এরোপ্লেনের প্রপেলার, এঞ্জিনের এটা-ওটা-সেটা, পেট্রোলের ট্যাঙ্ক, তা ছাড়া গোটা প্লেনটার বাইরেকার আবরণ—যাকে আমরা বলি "বডি"—এর সবই আজকাল প্রায় হাল্কা অথচ অসম্ভব মজবুৎ এ্যালুমিনিয়াম্‌-এ্যালয় দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে।

এ্যালুমিনিয়াম্‌ সবচেয়ে বেশী 'তৈরী' (যাকে



—চাপ দিয়ে এ্যালুমিনিয়াম্‌ এ্যালয়ের পাত যোড়া—
এ্যালুমিনিয়াম্‌ এ্যালয়ের ওপর প্রচন্ড চাপ দিলে একটার পর একটা পাত যুড়ে নেওয়া যায়। এরোপ্লেনের প্রপেলার এই ভাবে তৈরী করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ইঞ্চিতে ১৮,০০০ পাউন্ড চাপ দেওয়া চলে।

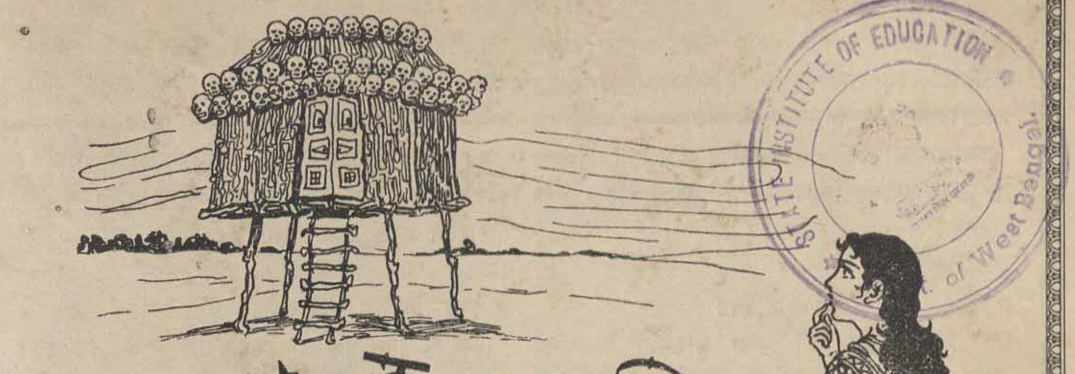
সাধুভাষায় বলা হয় 'নিষ্কাশন') হয় কোথায়? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই এদিক্ দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। জার্মেনী, ফ্রান্স এবং নরওয়েতেও প্রচুর এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এ্যালুমিনিয়াম্ তৈরী'র কারখানা প্রায় নেই বললেই চলে। এতদিন বিদেশ থেকে এ্যালুমিনিয়ামের চাদর আমদানি করে তাই দিয়েই এখানে এ্যালুমিনিয়ামের নানা সামগ্রী তৈরী করা হ'ত। কিছুদিন হ'ল আসানসোলের কাছে "এ্যালুমিনিয়াম্ কর্পোরেশন অব্ ইন্ডিয়া" নামে একটি প্রতিষ্ঠান বক্সাইট থেকে এ্যালুমিনিয়াম্ বার করছেন। ত্রিবাঙ্কুরেও ঐ রকম আর একটি প্রতিষ্ঠান,—ইন্ডিয়ান্ এ্যালুমিনিয়াম্ কোম্পানী—এ্যালুমিনিয়াম্ বার করার কারখানা বসিয়েছেন। এ্যালুমিনিয়ামের অন্যতম প্রধান আকর ("ওর্") হচ্ছে ব্যক্সাইট্। ভারতের বহু জায়গায় এই বক্সাইট্ পাওয়া যায়। রাঁচী, কাটনি, বেলগাঁও, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভূপালে যথেষ্ট পরিমাণ বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। বক্সাইট ছাড়া কেওলিন, ক্রায়োলাইট্, ফেল্স্পার প্রভৃতিও এ্যালুমিনিয়ামের আকর। বিজ্ঞানীরা বলেন, গ্রানাইট্ পাথরের ওপর জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আক্রমণে তা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে গিয়ে ফেল্স্পার প্রভৃতি আকর তৈরী করে।

কিন্তু এখানে এ্যালুমিনিয়াম্ কারখানা না বসার কোন কারণ নেই। এ্যালুমিনিয়াম্ সাধারণতঃ যে যে খনিজ-পদার্থ থেকে পাওয়া যায় তা আমাদের দেশেও যথেষ্ট আছে। তবে তা থেকে এ্যালুমিনিয়াম্ বার করতে হলে প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তির দরকার। সস্তায় প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে না পারলে তা লাভজনক হতে পারে না। আমাদের দেশে সর্বত্র তা এখনও সম্ভব হয় নি। সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায় যদি জলের স্রোত বা প্রপাতকে কাজে লাগানো যায়—যাকে বলে হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার। দেশের বহুমুখী উন্নতির জন্য যে-সব পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে অবশ্য এই ভাবে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও আছে।

আর একটা কথা। আগেই বলেছি, পৃথিবীর আস্তরে—ধুলোমাটির মধ্যে প্রচুর এ্যালুমিনিয়াম্ আছে। বিজ্ঞানীরা এখনও এই সব ধুলোমাটি থেকে সস্তায় এ্যালুমিনিয়াম্ উদ্ধারের উপায় বার করতে পারেন নি। যেদিন তা পারবেন সেদিন এ্যালুমিনিয়াম প্রায় মাটীর দরেই বিকোবে।

•• •• ••

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহুবিসদৃশ্য ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্দ্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখন্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারেনা। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে। কারণ পৃথিবী তাহা আকর্ষণ করে। কেন করে বিজ্ঞান এখনও ঠিক জানেনা। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড় পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। জড়ের সেই ধর্ম্মের নাম Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ। এই আকর্ষনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা law of Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে—ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্ম্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।—**পরশুরাম**



রূপকুমারী

।। এক ।।

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে এক রাজ্য ছিল—সেই রাজ্যে এক সওদাগর বাস করত। তার পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। সওদাগর আদর ক'রে তার নাম রেখেছিল 'রূপকুমারী'। মেয়েটির যখন মাত্র আট বছর বয়স, তখন তার মায়ের খুব অসুখ করল। অনেক চিকিৎসার পর শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। রূপকুমারীর মাও সে কথা বুঝতে পারলেন। একদিন চুপি চুপি তিনি রূপকুমারীকে কাছে ডাকলেন। তারপর বিছানার তোষকের তলা থেকে বার করলেন ছোট্ট একটা কাঠের পুতুল। সেটা রূপকুমারীর হাতে দিয়ে বললেন, রূপকুমারী মা আমার, আমি তোমাকে যা বলি তার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শোন, আর কোন কথা ভুল না, অথবা অমান্য করো না। আমি তো এ-জগৎ ছেড়ে চললুম। কিন্তু তোমাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি—তোমার ভাল হবে। আর ঐ যে ছোট্ট পুতুলটি দিয়ে গেলুম, ওটার মত অমূল্য জিনিস তুমি খুঁজে পাবে না। সব সময় ওটি তোমার নিজের কাছে রাখবে এবং কাউকে কোনদিন দেখিও না যেন। যখনই তোমার কোন বিপদ ঘটবে, অথবা দুঃখ পাবে মনে, তখনই একটা নির্জন স্থানে গিয়ে পুতুলটিকে কিছু খেতে দেবে আর জল পান করতে দেবে। তারপর তুমি ওর কাছে পরামর্শ চাইবে। অনেক কষ্টে এই কথা ক'টি বলে রূপকুমারীর মা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন, অনেক আদর করলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তার মায়ের প্রাণহীন দেহটা কেবলমাত্র পড়ে রয়েছে।

মা তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এ-কথা ভেবে রূপকুমারীর দুঃখের আর সীমা রইল না। সে তার মায়ের বিছানাটা আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। চোখে তার ঘুম নেই। এক সময় মায়ের দেওয়া পুতুলটার কথা তার মনে পড়ল। তখন সে রান্নাঘরে গিয়ে খুঁজে পেতে এক টুকরো রুটি আর একটু জল এনে খেতে দিল পুতুলটাকে। তারপর বলল, পুতুল ভাই, তুমি এইটুকু খেয়ে নাও তারপর আমার গভীর দুঃখের কথা শোনাব তোমাকে। মা তো আমাকে ফেলে চলে গেলেন এখন আমি কি রকম একলা, সেই কথা ভাবত একবার।

পুতুলটার চোখ দুটো জোনাকী পোকার মতো চিক্‌মিক্‌ করে উঠল। তারপর কেমন জীবন্ত হ'য়ে উঠল সে। একটুখানি রুটি আর জল খাবার পর সে বলল, কেঁদনা তুমি লক্ষ্মী বোনটি আমার রূপকুমারী। আমার কথা শুনে যদি তুমি চোখটি বুজে ঘুমিয়ে পড় তাহলে কাল সকালে উঠে দেখবে আজ রাত্রের দুঃখের বোঝা, অনেকখানি হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। তার কথা মতো রূপকুমারী তার নিজের বিছানায়

গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরে আপনা থেকে তার চোখের পাতা দুটি ঘুম-জড়ানো ক্লান্তিতে ভারী হয়ে এলো। পরদিন সকালবেলা যখন সে চোখ মেলে তাকাল তখন তার মনে হল, দুঃখের তীব্রতা আগের দিনের চেয়ে যেন অনেকটা কমে গেছে।

।। দুই।।

সওদাগরের স্ত্রী মারা যাওয়ায়, প্রথমটায় তার খুব দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। বছরখানেক পরে তিনি আবার বিয়ে করবেন মনস্থ করলেন। তাঁর জন্য কোথায় বেশ ভাল মেয়ে পাওয়া যায় তার খোঁজখবর চলল। এমন কি শক্ত ব্যাপার? কারণ তাঁর বিরাট বাড়ী আর অনেক টাকা পয়সা আছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া, বাগান পুকুর সবই আছে, তা ছাড়া সওদাগর নিজে অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। গরীব-দুঃখীকে দান ধ্যান করতে তাঁর জুড়ি আর কেউ ছিল না সে রাজ্যে। কাজেই অনেক ভাল ভাল এবং সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল তার বিবাহের জন্য। কিন্তু সওদাগর তাদের কাউকে পছন্দ করলেন না। একটি গরীব ঘরের বয়স্থা মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন ঠিক করলেন। সে সুন্দরী ছিল না কিন্তু ঘর সংসার দেখা শোনার ব্যাপারে সে ছিল পটু। সওদাগর ভাবলেন রূপকুমারীকে মানুষ করতে হবে তো—এই মেয়েটিই পারবে সে কাজ।

তারপরে বেশ ধুমধাম ক'রে সেই মেয়েটির সঙ্গেই সওদাগরের বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন পরে স্পষ্ট বোঝা গেল সওদাগর তা'র নতুন বউকে যেমন ভেবেছিলেন, মোটেই সে তেমন নয়। সওদাগরের বাড়ী আর টাকা পয়সার লোভেই সে তাঁকে বিয়ে করেছে। রূপকুমারীকে দু'চোখে দেখতে পারত না সে। তার গলার সুরটি ছিল যেমন কর্কশ, ব্যবহারও তেমনি নিষ্ঠুর। দেখতে দেখতে তার দুটি মেয়ে হলো। মেয়ে দুটির চেহারা যেমন বিশ্রী, গায়ের রঙটাও তেমনি কাকের মতো কালো। সকলেই রূপকুমারীর রূপের প্রশংসা করত। এই কারণে তার বিমাতা দিন দিন রূপকুমারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে লাগল। যত সব কঠিন পরিশ্রমের কাজ সব রূপকুমারীকে দিয়ে করাত। তাকে পরতে দিত যত ছেঁড়া আর ময়লা কাপড়। ভাবত, যে তাহলে হয়ত তার চাঁপার মতো রঙ, কালি হ'য়ে যাবে, অমন মেঘের মতো চুল শণের মত হবে। কিন্তু উল্‌টো ফল হল। তার নিজের মেয়েরা দিনকের দিন যত কদাকার আর কুৎসিত হতে লাগল, রূপকুমারী চাঁদের কণার মতো দিনে দিনে ততই রূপবতী হয়ে উঠতে লাগল। তার কারণ হল, যত কঠিন কাজই হোক তার সেই ছোট্ট, পুতুলটিই সব কাজ করে দিত। রূপকুমারীকে নিজে হাতে কোনদিনও কোন কাজ করতে হ'ত না। রাত্রে সবাই যখন গভীর ঘুমে মগ্ন তখন রূপকুমারী নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়ের আঁচলের গেরো খুলে পুতুলটিকে বার করত, তারপর কিছু খেতে দিয়ে বলত, আমার ছোট্ট পুতুল এই খাবারটুকু খেয়ে নাও। এরপর সে জিগ্যেস করত—কেমন করে আমি বিমাতার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাব? তৎক্ষণাৎ কাঠের পুতুলের চোখ দুটো হীরের মতো ঝিক্‌মিকিয়ে উঠত। জীবন্ত মানুষের মতো খাবারটুকু খেয়ে নিয়ে বলত কিচ্ছু ভেবোনা তুমি রূপকুমারী। আজকের রাতের মতো ঘুমিয়ে থাকো, কাল উঠে দেখবে সব কাজ ঠিক মতো হয়ে গেছে ভাবনার কিছু নেই। তার কথামতো রূপকুমারী যেই ঘুমিয়ে পড়তো অমনি পুতুলটি পরের দিনের যত কাজ সব সেরে রেখে আবার তার আঁচলের তলায় এসে কাঠের পুতুল বনে যেত।

।। তিন।।

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল। রূপকুমারী এখন বেশ বড় হয়েছে। সে রাজ্যের যত সব যুবক সকলেই রূপকুমারীকে বিয়ে করবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠল কিন্তু তার বোনেদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। এই সব দেখে শুনে তার বিমাতা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সময় সময় রূপকুমারীকে ধরে মারধোর

করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। যত দিন যায় ততই যেন রূপকুমারীর দেহে রূপের জোয়ার উথলে ওঠে।

এদিকে হল কি, সওদাগর তাঁর বাণিজ্যের কাজে অনেক দূর দেশে যাত্রা করলেন। বিদায়-কালে সকলকে ডেকে বললেন যে, তাঁর ফিরতে হয়তো অনেক দেরী হবে। তারা যেন সাবধানে থাকে। কাজ শেষ হলে অনেক ধন রত্ন নিয়ে ফিরে আসবেন তিনি। সকলকেই তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। রূপকুমারী তাঁকে যখন প্রণাম করল, তিনি তাকে আদর করলেন আর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর নিজের যাত্রা পথের দিকে পা বাড়ালেন।

সওদাগর যাবার পরদিনই রূপকুমারীর বিমাতা বাড়ীঘর বেচে দিয়ে সমস্ত টাকা পয়সা সোনাদানা নিয়ে লোকালয় ছেড়ে উঠল গিয়ে, বনের ধারের একটি কুটিরে। সেখানে জন-মানুষের সাড়া নেই, শব্দ নেই, নির্জন বন। তার নিজের মেয়েরা ঘর সংসারের কাজকর্ম করতো কিন্তু রূপকুমারীকে যত বাইরের কাজ সব করতে হ'ত। কোথায় কাঠ কুড়িয়ে আনা, বনের মধ্যে থেকে ফলমূল সংগ্রহ করা এই সব।

এখন হয়েছে কি, সেই বনের মধ্যে আর একটু দূরেই ভীষণ এক ডাইনীবুড়ি বাস করত। তার বাড়ীটা বেশ অদ্ভুত রকমের ছিল। গভীর বনের মধ্যে বিরাট এক প্রান্তর। তার ঠিক



ডাইনি বুড়ির অদ্ভুত ঘর

মাঝখানটিতে বকের ঠ্যাং-এর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাইনীবুড়ির বাড়ীখানি। তার দেওয়ালগুলো ছিল মানুষের হাত পায়ের হাড় গোড় দিয়ে তৈরী আর চালটা তৈরী মড়ার মাথা দিয়ে। সে একাই বাস করত সে বাড়ীতে। কোন লোক তার ধারে কাছে যেতে সাহস পেত না। কারণ মানুষের গন্ধ তার নাকে গিয়েছে কি, অমনি সে ঠিক খুঁজে পেতে তাদের ধরে নিয়ে টপাটপ গালে ফেলবে মুড়িমুড়কির মতো। রূপকুমারীর বিমাতা এই ডাইনীবুড়ীর কথা ভাল করেই জানত। আর সেই কারণেই রূপকুমারীকে যখন তখন কাজে অকাজে বনের মধ্যে পাঠাত। ভাবত কোন এক সময়ে সে ডাইনীবুড়ির কবলে পড়বে, আর ফিরতে হবে না—বেশ হবে! কিন্তু রূপকুমারীর কাঠের পুতুল তাকে সব সময়ে সাবধানে পথ চলতে নির্দেশ দিত। তাই রোজই সে কাঠকুটো ফলমূল নিয়ে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছত। তার বিমাতা তাই দেখে রাগে জ্বলে পুড়ে মরত।

।।চার।।

এক শীতের সন্ধ্যেবেলায় সওদাগরের স্ত্রী তার তিন মেয়েকে কাছে ডাকল। তারপর ওদের তিনজনকে তিনটি কাজ দিল। নিজের দুই মেয়ের একজনকে দিল একটা কাঁথা সেলাই করতে, আর একজনকে বলল একটা দড়ি পাকাতে। রূপকুমারীকে একটা ঝুড়ি বুনতে বলল। এক রাত্রের মধ্যেই তাদের এই সব কাজ শেষ করতে হবে। ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে, ঘরের আর সব আলো নিবিয়ে দিয়ে তাদের মা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এক ঘন্টা দু' ঘন্টা তিন ঘন্টা কাজ করবার পর ছোট মেয়েটি বলল, 'সলতেটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া যাক্' ব'লে যেমনি হাত দিয়েছে, অমনি দপ্ করে নিবে গেল প্রদীপ। আসলে তাদের মা আগে থেকেই শিখিয়ে রেখেছিল। তারপরে তারা দুই বোনে বলে উঠল "এখন কি হবে? ঘরে আগুন জ্বালাবার মতো কিছুই তো নেই অথচ আমাদের হাতের কাজও তো এখনও শেষ হয়নি। কাজেই বাইরে কোথাও থেকে এখন আগুন সংগ্রহ করে আনতে হবে। কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র সেই ডাইনীবুড়ির বাড়ী আছে। আমাদের মধ্যে কাউকে গিয়ে সেখান থেকেই আগুন নিয়ে আসতে হবে।

বড় মেয়েটি বলল, 'জানলা দিয়ে চাঁদের যে একটু একটু আলো আসছে, সেই আলোতে আমি তে বেশ সূঁচ দেখতে পাচ্ছি, তাই আমি বাপু যাচ্ছি না আগুন আনতে। ছোটটি অমনি বলল, 'হাতের আন্দাজে আমি অনায়াসেই দড়ি পাকাতে পারব, কাজেই আমিও যেতে পারব না আগুন আনতে'।

তারা বলল, 'রূপকুমারী, তোমার তো আলো না হলে ঝুড়ি বোনা শেষ হবে না, তাহলে তুমিই যাও সেই ডাইনিবুড়ির বাড়ী থেকে আলো আনতে।' এই না বলে, তারা দুই বোনে মিলে জোর করে ঠেলে রূপকুমারীকে বাড়ীর বাইরে বের করে দিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে বলল, 'যতক্ষণ না তুমি আগুন নিয়ে আসছ, ততক্ষণ আর বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দিচ্ছি না তোমাকে।'

রূপকুমারী দরজার চৌকাঠের ওপর বসল তারপর আঁচলের গেরো খুলে বার করল তার সেই ছোট্ট পুতুল, আর এক টুকরো রুটি। কখন কি বিপদ ঘটে, না ঘটে, তাই সে সব সময় কিছু না কিছু খাবার লুকিয়ে রাখত নিজের কাছে পুতুলকে দেবার জন্যে। সে বলল, পুতুল ভায়া, খেয়ে নাও তো এইটুকু। তারপর শোন আমার বিপদের কথা। এই নিশুতি রাত্রে এই বনের পথ দিয়ে আমাকে এখন যেতে হবে সেই ডাইনি বুড়ির বাড়ীতে, আগুন আনতে। আমার বড় ভয় করছে এই কথা ভেবে যে, সে যদি আমাকে খেয়ে ফেলে। আমি এখন কি করি,—সে কথা বলে দাও তুমি।

কাঠের পুতুলটি অমনি তার দিকে মিটিমিটি তাকাল। তারপর একটুখানি খাবার খেয়ে নিয়ে বলল। কিছু ভয় নেই তোমার। তোমাকে এরা যেখানে যেতে বলছে, নির্ভয়ে চল সেখানে। যতক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, ততক্ষণ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না—সেই ডাইনীবুড়ি।

রূপকুমারী আঁচলের খুঁটে আবার সেই পুতুলটি বাঁধলো তারপর নিবিড় অন্ধকার বন-পথ দিয়ে চলল সে।

কাঠের পুতুল যতই না কেন তাকে অভয় দিক, সে কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। একটু ক'রে পথ চলে, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। এই ভাবে সে কিছুদূর যখন এগিয়েছে হঠাৎ তার কানে এল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল যে একটি দুধ-সাদা ঘোড়া, পিঠে তেমনি সাদা পোষাক পরা সওয়ারী নিয়ে ঝড়ের বেগে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভোরের আলো দেখা দিল। রূপকুমারী আবার একটু পথ গিয়েছে আবার শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। এবার সামনে দিয়ে যে ঘোড় সওয়ার গেল তার ঘোড়াটিও যেমন রক্ত-জবার মতো লাল, তার পোষাকটিও তেমনি। সে চলে যাবার পরেই সূর্য উঁকি দিল আকাশের কোণে।

তারপর সারাটা দিন সে পথ ভুলে, বনের পথে পথে ঘুরে বেড়াল। কোন দিকে গেলে ডাইনীবুড়ির বাড়ীতে যাওয়া যাবে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না। অথচ পুতুলটাকে জাগিয়ে তুলবার মতো এক কণা খাবারও তার কাছে নেই। তেমনি ভাবে ঘুরে বেড়ান ছাড়া তার আর কোনও উপায় ছিল না।

।। পাঁচ ।।

যখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, সে এসে পেঁাছল এক বিরাট প্রান্তরে। রূপকুমারী দেখল, প্রান্তরের ঠিক মাঝখানটিতে বকের ঠ্যাং-এর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি কুটির। তার দেওয়ালগুলি সব মানুষের হাড়গোড় দিয়ে তৈরী, চালটি তৈরী মড়ার মাথা সাজিয়ে। ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল সেইখানে। আর সেই সময় কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে কালো পোষাক পরা একটি লোক চলে গেল তার সামনে দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁধার ঘনিয়ে রাত্রি নেমে এল। কিন্তু সেই কুটিরটার আশেপাশে তেমন অন্ধকার জমতে পারল না। কারণ মড়ার চোখ-গুলো থেকে ঠিক্‌রে পড়া আলোয় আলো হ'য়ে গেল সেইখানটা। এই সব দেখে রূপকুমারী ভয়ে জমে যেন পাথর হ'য়ে গেল। দৌড়ে পালিয়ে যাবার ক্ষমতাও রইল না তার। এবার সে যে ডাইনীবুড়ির আস্তানায় এসে পড়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না তার মনে।

এমন সময় সোঁ সোঁ করে ঝড় উঠল ভীষণ। থর থর করে মাটি কাঁপতে লাগল। মট্‌ মট্‌ করে ডালপালা ভেঙে পড়তে লাগল গাছের। একটা বিরাট ঢেঁকির ওপর চড়ে ডাইনিবুড়ি এসে উপস্থিত হল কুটিরের সামনে। ঢেঁকির ওপর বসে বসেই সে বলে উঠল—

ছোট্ট বাড়ী ছোট্ট বাড়ী,
ঘুরে দাঁড়াও ঢুকে পড়ি।

অমনি সেই বকের ঠ্যাং-এর ওপর সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে গেল আর বুড়ির সামনে একটা দরজা এসে গেল। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকবার আগে হঠাৎ ডাইনীবুড়ি পিছন ফিরে নিজের মনে বলে উঠলঃ কেমন যেন মানুষ-মানুষ গন্ধ পাই। রূপকুমারী খুব ভয় পেলেও, কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে বুড়ীর সামনে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বলল, দিদিমা আমি রূপকুমারী। আমার সৎ বোনেরা আপনার এখান থেকে একটু আগুন নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়েছে।'

ডাইনী বলল, 'বেশ তো। কিন্তু আগুন নিয়ে যাবার আগে আমার এখানে দু' একদিন তোকে থাকতে হবে, আর আমি যে সব কাজ বলব তা করতে হবে। যদি আমার কথা না শুনিস তাহলে রাত্রে অন্য কিছু না খেয়ে, তোকে খেয়েই পেট ভরবো। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে হেঁকে বললঃ দরজা খুলে যা শিগ্গির। ফট্‌ করে দরজা খুলে গেল। ডাইনীর পেছনে রূপকুমারীও ঢুকল তার ভেতর। অমনি ঝপ্‌ করে দরজাটা আপনা আপনি এঁটে বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই ডাইনীবুড়ি মেঝের উপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, 'আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। রাকের ওপর দেখ্‌ আমার জন্যে রান্না করা রয়েছে সব এনে দে এক্ষুনি। রূপকুমারী

তাড়াতাড়ি দেওয়ালে ঝোলান একটি মড়ার মাথার চোখ থেকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে নিল। তারপর তাকের ওপর থেকে ভাত তরকারী এনে সাজিয়ে দিতে লাগল ডাইনীর সামনে। তিনটে বড় বড় মানুষকে কেটে তরকারী রাঁধা হয়েছে। বুড়ী সেই সব হাড়গুলো কড়মড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খেল। খাওয়া শেষ হলে বললঃ আমার এখন বড় ঘুম পাচ্ছে—তাড়াতাড়ি শুনে নে তোকে কি কি কাজ করতে হবে। আমি কালকে সকালে বেরোবার আগেই যেন দেখতে পাই তুই আমার ঘরদোর উঠোন সব পরিষ্কার ক'রে ঝাঁট দিয়েছিস আর রান্না করে রেখেছিস আমার জন্যে। তারপর একবস্তা গম দিয়ে বলল, এগুলো সব একটা একটা করে বেছে রাখবি,—কাটি কুটি ধুলো বালি কিছু যেন না থাকে। আমার কথা সব মন দিয়ে শুনলি তো? সব কাজ যদি না করিস তো তোকে খেয়ে ফেলব।

এরপর ডাইনীবুড়ি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। রূপকুমারী ঘরের এক কোণে গিয়ে পুতুলটাকে কিছু খাবার দিল, তারপর চোখের জলে ভেসে বলল, পুতুল ভায়া, এখন আমি কি করি বলতো? এত কাজ আমি কি করে করি? পালিয়ে যাবারও তো উপায় দেখি না কোন। অথচ সব কাজ যদি না করে রাখি কালকে ডাইনী আমাকে খেয়ে ফেলবে। কি করবো আমি, তুমিই বলে দাও লক্ষ্মীটি। পুতুল বললে, কিচ্ছুটি ভেবো না তুমি। ভগবানের নাম স্মরণ করে আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়ো তুমি। তারপরে কালকে ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক আছে।

পরের দিন বেশ অন্ধকার থাকতেই রূপকুমারীর ঘুম ভেঙে গেল। সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকার ফিকে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মাথার চোখের আলোগুলোও ক্রমশ স্তিমিত হ'য়ে আসছে। তারপরেই দেখল সাদা পোষাক পরা লোকটিকে সেই সাদা ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে গেল কুটিরের দরজা দিয়ে। তারপরেই ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল বনের মাথায় মাথায়। মড়ার মাথার চোখগুলো সব নিবে গেল।

ডাইনীবুড়ি ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ঘর-দুয়ার পরীক্ষা করে দেখল ঠিক মতো ঝাঁটপাট দেওয়া হয়েছে কি না। খুব নিরীক্ষণ করে দেখেও কোথা থেকে একটা কুটি অথবা এক চিম্‌টি ধুলো পেল না। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে দেখে রান্না-বান্না সব শেষ। গমগুলো দেখল সবই ভাল ভাবে ঝাড়া বাছা হ'য়ে গেছে। খুবই অবাক হল ডাইনীবুড়ি। কিছুই বলতে পারল না সে রূপকুমারীকে। রূপকুমারী মনে মনে জানে যে কাঠের পুতুলই তাকে এই বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ডাইনী কোন খুঁত বার করতে পারল না দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এরপর দেখল যে লাল ঘোড়াটা তার সওয়ারীকে নিয়ে কুটিরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই সঙ্গে সূর্য উঠল। ডাইনীবুড়ি তিনটে তুড়ি দিতেই তার সামনে এসে হাজির হ'ল সেই ঢেঁকিটা। বুড়ি তার ওপর যেই বসল, অমনি হাওয়ার বেগে বনের মাথার উপর দিয়ে সাঁ সাঁ শব্দে সবেগে উড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে।

এরপর সারাটা দিন রূপকুমারী ঘুরে বেড়াল আর তার ছোট্ট পুতুলকে খুব আদর করল। দিনের রোদ্দুর পড়ে আসবার পর দেখল সেই কালো ঘোড়াটিকে ফিরে আসতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামল চারিদিকে। মড়ার চোখগুলো জ্বলে উঠল। তারপর ঝড় উঠিয়ে ডাইনীবুড়ি ফিরে এল ঘরে। রূপকুমারী তাড়াতাড়ি ক'রে বুড়ির খাবার সব গুছিয়ে দিল। খেতে বসল ডাইনী। খাওয়া শেষ হ'লে বলল, কাল যে সব কাজ করে-ছিলি সে সব করতেই হবে, এছাড়া ঐ সর্ষেগুলো সব একটা একটা ক'রে বেছে পরিষ্কার করে রাখবি। এই ব'লে এক ধামা ধুলোমাটি মেশান সর্ষে দেখাল তাকে। তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আবার সেদিনও রূপকুমারী একটু খাবার খেতে দিল কাঠের পুতুলকে, তারপর পরামর্শ চাইল তার কাছে। পুতুল বলল কালকের মতো

আজও তুমি ঘুমিয়ে থাক। কাল সকালে উঠে দেখবে সব ঠিক আছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে রূপকুমারী ঘুমিয়ে পড়ল।

আগের দিনের মতোই সব কিছু ঘটল। ডাইনীবুড়ি চলে গেলে আজও সে পুতুলটিকে অনেক আদর করল, চুমু খেল। সন্ধ্যের দিকে যখন সেই কালো ঘোড়াটি তার সওয়ারীকে নিয়ে ফিরল তখনই রূপকুমারী বুঝল যে ডাইনীর ফিরবার সময় হয়েছে। তখনই সে তার জন্য খাবার দাবার ঠিক্‌ঠাক্ করতে লাগল।

আবার সেই ভূমিকম্পের মতো মাটি কাঁপিয়ে, গাছপালা ভেঙে, ঝড় তুলে, ঢেঁকির পিঠে চ'ড়ে এল ডাইনিবুড়ি। পাঁচজন মানুষ খেতে পারে এত ভাত খেল বুড়ি একাই আর সেই পরিমাণে মানুষের মাংস। রান্না বেশ ভালই হয়েছে কাজেই ডাইনীও খেয়ে দেয়ে খুব খুশী। রূপকুমারী তার পাশটিতে বসে ছিল চুপটি ক'রে। তার দিকে তাকিয়ে বলল কিরে নাতনী, তুই বোবা না কি? কথা বলিস না কেন?' রূপকুমারী খুব বিনীতভাবে বলল, 'দিদিমা, অনেক কথাই আমার বলবার আছে কিন্তু আপনাকে কোন কথা জিগ্যেস করতে আমার বড় ভয় করে। আপনি যদি অভয় দেন তো বলি। ডাইনী বলল যা বলবার আছে বলে ফেল্। তবে সাবধান। তিনটির বেশি প্রশ্ন করলেই তুই একেবারে থুথুরে বুড়ি হয়ে যাবি। নে, এবার বল শুনি, কি বলতে চাস তুই।

রূপকুমারী তখন সাহস পেয়ে বলল, আচ্ছা দিদিমা, ঐ যে সাদা পোষাক পরা, সাদা ঘোড়ায় চড়া একটা লোককে দেখি, ও কে? ডাইনী রেগে উঠে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ও হল দিন। আমার ভৃত্য।'

রূপকুমারী ভয়ে ভয়ে বলল, 'লাল পোষাক পরে, লাল ঘোড়ায় চড়ে আর একজন যে যায়, সে কে?' ডাইনী আরও রেগে বলল, ও সূর্য। আমার ভৃত্য।

রূপকুমারী আবার বলল, সন্ধ্যে বেলায় যাকে দেখি, কালো পোষাক পরে, কালো ঘোড়ায় চড়ে, সে কে? বুড়ি বলল, 'রাত্রি, সেও আমার ভৃত্য। তারপর রূপকুমারী চুপ ক'রে আছে দেখে বলল, আর কি বলবি বল? এই ব'লে হাতে তিনটে তালি দিল। কোথা থেকে তিন জোড়া হাত এসে উপস্থিত হল। মুন্ডু নেই, দেহ নেই, শুধু তিন জোড়া কঙ্কাল সার হাত শূন্যে ভেসে আছে। ডাইনী বলল, এই হাত-গুলোর কথা কিছু জিগ্যেস করবি না কি? কিন্তু প্রথমেই যে ডাইনী তাকে তিনটের বেশী প্রশ্ন করতে বারণ করেছিল, সে কথা তার মনে আছে। তাই বলল, না দিদিমা, আমি আর কিছু জানতে চাই না।

ডাইনী 'যাক্, বেঁচে গেলি তুই। ওদের কথা যদি জানতে চাইতিস, তাহলে আর রক্ষে ছিল না তোর। এবার আমি তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক জবাব দিবি কিন্তু! রূপকুমারী ভয়েতে যেন কুঁকড়ে গেল। ডাইনী বলল, একলা তুই অত কাজ সব করলি কি ক'রে বলতো আমায়?' ভয় পেয়ে রূপকুমারী তার কাঠের পুতুলের কথা প্রায় বলেই ফেলেছিল আর কি। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, আমার মা স্বর্গে আছেন, তাঁরই আশীর্বাদে আমি সব কাজ করতে পারি। তার কথা শোনা-মাত্র ডাইনী চীৎকার ক'রে উঠল এই মুহূর্তে তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে। যাদের ওপর স্বর্গবাসীর আশীর্বাদ থাকে তেমন কাউকে আমি আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিই না। যা চলে যা বলছি। রূপকুমারী তক্ষুনি দৌড়ে দরজার কাছে চলে এল। ডাইনীবুড়ি চীৎকার করে উঠল 'দরজা খুলে যা। সেই দরজাটা সরে গেল অমনি সে দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সেটা। তারপর আগুন নিয়ে যাবার কথা মনে হতেই, সে করল কি, গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে কুটির চালের ওপর থেকে একটা মড়ার মাথা লাঠির আগায় তুলে, বাড়ী ফিরে চলল। মড়ার মুন্ডটার চোখের আলোয় বনের পথ আলোয় আলো হ'য়ে গেল। রূপকুমারী বেশ নিশ্চিন্ত মনে পথ চলতে লাগল।

বাড়ী পৌঁছতে প্রায় ভোর হ'য়ে এল। দরজায় ঘা দিতেই তার বোনেরা এসে দরজা খুলে

দিল। তাকে দেখে তারা আনন্দে কোলাহল ক'রে উঠল। কারণ এ দু'দিন আগুনের অভাবে তাদের আলো জ্বালানো তো দূরের কথা রান্না খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ আছে। এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার, নিকটের লোকালয় থেকে আগুন এনে যেই মাত্র তারা ঘরে ঢুকতে যাবে অমনি দপ্ করে আলোটি নিবে যাচ্ছে। দু' তিন বার এমনি করার পর হঁতাশ হ'য়ে পড়েছিল তারা। এমন সময় রূপকুমারী আসতেই তাদের আনন্দ আর ধরে না। সারাদিন খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব করে বেশ আনন্দেই কাটল তাদের। সন্ধ্যেবেলা একটা পিল্‌সুজের মাথায় মড়ার খুলিটা আটকে দিতেই তার চোখের আলোয় সারা ঘরটা আলো হ'য়ে উঠল। যখন তাদের গল্প বেশ জমে উঠেছে তখন দেখা গেল যে সেই মড়ার চোখ দুটো ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত গণ্‌গণে ভাঁটার মতো জ্বলে উঠল চোখ দুটো। রূপকুমারীর বিমাতা আর বোনেরা যেই সেদিকে তাকিয়েছে অমনি তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু রূপকুমারীর কিছুই হল না।

সকাল হ'তে রূপকুমারী মাটিতে একটা বড় গর্ত করে মড়ার মাথাটা পুঁতে দিল। তারপর কুটিরের দরজায় তালা লাগিয়ে কাছাকাছি যে গ্রামটি ছিল সেই দিকে চলল।

।।ছয়।।

গ্রামে একটি বুড়ি ছিল, তার কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। ভারী গরীব ছিল সে। তার



......মড়ার মাথা লাঠির আগায় তুলে বাড়ী চলল

কাছেই আশ্রয় নিল রূপকুমারী। বুড়ি তাকে খুব আদর যত্ন করতে লাগল। কিন্তু শুধু শুয়ে বসে খেয়ে ঘুমিয়ে রূপকুমারীর দিন আর কাটে না। তাই সে একদিন বুড়িকে বলল, 'ঠাকুমা, কুঁড়ের মতো বসে বসে আর তো পারি না। তুমি এবার যেদিন হাটে যাবে আমার জন্যে একটা চরকা আর কিছু তুলো কিনে এনো। আমি বসে বসে সুতো কাটবো। বুড়ি তাই করল। পরের দিন হাট থেকে কিনে আনল একটা চরকা আর কিছু তুলো। রূপকুমারী বসে বসে সুতো কাটে। সে সুতো যেমন সূক্ষ্ম তেমনি সরু। যখন অনেক সুতো কাটা হল সে বলল,—ঠাকুমা, এই সুতোগুলো তুমি হাটে তাঁতীদের কাছে বেচে দিও আর সেই পয়সায় আরো কিছু তুলো কিনে এনো। বুড়ি তখন সেই সুতোর বোঝা নিয়ে চলল হাটে। তাঁতীরা সেই সূক্ষ্ম সুতো দেখে বলল এমন চুলের মতো সূক্ষ্ম সুতোয় তো আমরা কখন কাপড় বুনিনি। এ আমরা নিতে পারব না। কি করা যায়? বুড়ি বাড়ী ফিরে সব কথা বলল রূপকুমারীকে। রূপকুমারীর তো ভারী মন খারাপ হ'য়ে গেল। কি করে, সাধারণ তাঁতে তো আর এমন সূক্ষ্ম সুতো বোনা যাবে না। অনেক দিন পরে মনে পড়ল তার পুতুলটাকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে, কিছু খাবার খেতে দিয়ে, সে তার কাছে পরামর্শ চাইল। পুতুল তখন তাকে সেই সরু সুতো বোনার উপযুক্ত একটা তাঁত বানিয়ে দিল। রূপকুমারী সেই তাঁতে এক মাস দু'মাস সারা-বর্ষাকাল ধরে বসে বসে কাপড় বুনল, নিজের হাতে কাটা সুতো দিয়ে। কাপড়টি এত সূক্ষ্ম হল যে তার হাতের আংটির মধ্যে দিয়ে গলে গেল। সেটা এমন সাদা আর হাল্‌কা হল যে, শরতের মেঘও তার কাছে হার মানল। বুড়ীকে ডেকে রূপকুমারী বলল, 'ঠাকুমা, কাপড় তো বোনা হয়ে গেছে এবার এটা তুমি হাটে গিয়ে বেচে এস। কিন্তু কাপড় দেখে বুড়ি বললে, এত সুন্দর সূক্ষ্ম কাপড় কেনার মতো ক্রেতা তো হাটে মিলবে না। তার চেয়ে কাল সকাল-বেলা আমি এটা নিয়ে যাব রাজবাড়ীতে—রাজাকে দেবার জন্যে।

পরের দিন সকাল হ'তেই বুড়ী সেই কাপড়-খানা নিয়ে চলল রাজবাড়ী। রাজা তখন পাত্র-মিত্র সভাসদদের নিয়ে বসে আছেন রাজসভা আলো করে। বুড়ি গিয়ে হাজির হল, আর সেই কাপড়খানা রাজাকে দিল। এমন সূক্ষ্ম কাপড় রাজা এর আগে দেখেন নি। কাজেই তিনি ভারী খুশী হয়ে বললেন, 'কত দাম এ কাপড়ের?' বুড়ি বলল, 'মহারাজ, এ আমার নাতনীর হাতে বোনা কাপড়। আপনাকে উপহার দিলুম।' রাজা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে, লোক দিয়ে বুড়ীর বাড়ীতে অনেক মণি-মাণিক্য পাঠিয়ে দিলেন উপঢৌকন হিসাবে।

কিছুদিন পরে বুড়ির বাড়ী রাজার লোক এসে হাজির। কি ব্যাপার? শোনা গেল, সেই কাপড় নিয়ে রাজা মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন। পোষাক তৈরীর জন্য তিনি সেই কাপড় যে দর্জিকেই দেন, কেউ পারে না—অত সূক্ষ্ম কাপড়ের পোষাক তৈরী করতে। শুধু সে রাজ্যেই নয়, আশেপাশের রাজ্য থেকেও বড় বড় দর্জিদের ডাক পড়ল কিন্তু তারা কেউই সে



পুতুলের কাছে—পরামর্শ চাইল

কাপড় কেটে পোষাক বানাতে সাহস করল না। অগত্যা রাজা ভাবলেন, যে বুনেছে সে নিশ্চয় পোষাকটিও তৈরী করতে পারবে—এই ভেবে লোক পাঠালেন বুড়ীকে ডেকে আনবার জন্যে। রাজামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে, হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটল সে রাজদরবারে। সব কথা শুনে সে বলল, 'মহারাজ আমি তো কিছু বলতে পারি না। কাপড় নিয়ে গিয়ে নাতনীকে দিই গে—সে যা পারে করবে।

বুড়ী সেই কাপড় এনে সব বৃত্তান্ত বলতে, রূপকুমারী বলল, 'আমি আগেই জানতুম যে এই পোষাকও শেষ পর্যন্ত আমাকেই তৈরী করতে হবে।' রোজ রাতজেগে প্রদীপের আলোয় বসে বসে সে পোষাক তৈরী করতে লাগল। পাঁচ দিনে পাঁচটি সুন্দর পোষাক তৈরী করে, বুড়ীকে দিয়ে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল সে গুলো তারপর খুশী মনে চুলটি বেঁধে, ভাল কাপড় পরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। কখন বুড়ি ফিরবে ব্যগ্র হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগল আর এসে কি বলবে, না বলবে মনে মনে সেই জল্পনা কল্পনা করতে লাগল।

এমন সময় রাজবাড়ী থেকে এক পাল্‌কী এল রূপকুমারীকে নেবার জন্যে। তারা এসে বলল, এমন সুন্দর যে কাপড় বুনতে পারে। পোষাক তৈরী করতে পারে, রাজা একবার তাকে নিজের চোখে দেখতে চান। রূপকুমারী তখন রাজবাড়ীর পাল্‌কীতে চড়ে চলল রাজার কাছে।

পাল্‌কী থেকে নামতেই রাজা রূপকুমারীকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। স্বয়ং এসে তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনের একধারে বসালেন। তারপর জানালেন যে রূপকুমারীকে তিনি বিয়ে করতে চান এবং সে-ই হবে তাঁর পাট রাণী। খুব জাঁকজমক করে রূপকুমারীর সঙ্গে রাজার বিয়ে হয়ে গেল।

কাঠের পুতুলটি সযত্নে নিজের কাছে সে রেখে দিল।



পাল্কি থেকে নামতেই রাজা রূপকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হলেন

নবযুগের কাব্য প্রবাহ



প্রাচীন সাহিত্যে কাব্য বা নাটকের প্রারম্ভে দেবতার মহিমা কীর্তনের রীতি ছিল—এই মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত সাহিত্যে 'নান্দী' নামে খ্যাত। অধুনা সাহিত্যে এই প্রাচীন রীতি বর্জিত কিন্তু ভিন্ন এক মঙ্গলাচরণ বাঙালী কবিদের অবশ্য পালনীয় কৃত্য; তা হল রবীন্দ্র-নান্দী। এই লোকোত্তর পুরুষ বাংলার কাব্য-ভুবনে প্রজাপতি ব্রহ্মার মহিমায় বিরাজ করছেন। আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ স্তুতি নিবেদন করেছেন। বাঙালী অগ্রজ কবিদের অন্যতম বিষ্ণু দে তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থে "তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ" (২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫) "রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল" শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্র-বন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

আশৈশব আলোয় যে রৌদ্রে খর আভায় পান্ডুর
নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাতুর
কখনও বা হর্ষময়, সাত কোটি সবাই অরুণ
এক সূর্য-রথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে;
আমরা কেমন ক'রে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাঁশি, কোন্ তূর্যের নির্ঘোষ
কবে বা কখন কিসে ক'রে দিল রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী
আমাদের সূর্য-দেখা সূর্যালোকে প্রত্যুষে প্রদোষে।

যিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের সাধনায় বাংলা সাহিত্যকে ষড়ৈশ্বর্যে মন্ডিত করেছেন, জাতির সত্তায় যিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকেও মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বের লেখা কবিতায় ত্রুটি স্বীকারের কন্ঠে বলতে শোনা গেল—

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।

সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।

("জন্মদিনে", ১০ সংখ্যক কবিতা
২১ জানুয়ারী, ১৯৪১ সকাল)

'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে' নতুন রকমের রসাস্বাদনের জন্য রসিকচিত্ত সর্বযুগেই প্রত্যাশী হয়—প্রতিভা-সম্পন্ন কবিশিল্পীরাই কেবল সে প্রত্যাশা পূর্ণ করতে সক্ষম হন। প্রতিভাকে তাই বলা হয়েছে নব নব উন্মেষ-ক্ষম। কবিতা বা সাহিত্যের বলার ভঙ্গি বা বিষয় বস্তুতে রূপান্তর সাধন প্রতিভাবানদের পক্ষেই সম্ভব।

সকল জীবন্ত সাহিত্যেই এই রূপান্তর সাধনের চেষ্টা যুগে যুগে ঘটেছে। অনেক সময় এই রূপান্তর এমন আশ্চর্য রূপ ধারণ করে যে তার ফলে সাহিত্যে বা কাব্যে ঘটে বিপ্লব। এ-কথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে আধুনিক ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে ইংরেজ-সংস্পর্শের ফলে। সেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিতর দিয়ে সেদিনকার ভাঙনধরা স্বদেশী সমাজ এক নতুন চিত্তসম্পদের আস্বাদ পেয়েছিল, যার মধ্যে বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিচিত্তের বিকাশের ইঙ্গিত ছিল। সেই সংস্পর্শ ও ভিন্ন ভাবধারার সংঘাতেই বাংলা সাহিত্য বা কাব্যের জগতে রূপান্তর ঘটল, যাকে বলা যেতে পারে 'নবজন্ম'।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেই নবজন্ম ঘটেছিল উনিশ শতকে। তার-ই পরিণত রূপ আমরা দেখছি এই শতকে। উনিশ শতকে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এই নবজন্ম সম্ভব করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত—রীতির দিক থেকে যিনি বিদেশী কাব্য থেকে নিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর ও চতুর্দশপদী (সনেট)। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রসঙ্গে মাইকেলের নাম এল এই কারণেই যে কাব্য কোনো নাম-পরিচয়হীন বিষয় নয়—ব্যক্তির মত সাহিত্যেরও একটি পিতৃপরিচয় আছে। এই শতকের কাব্য পূর্বশতকের কাব্যেরই সন্তান। উনিশ শতকের আধুনিক কাব্যের প্রধান ঋষি ছিলেন মধুসূদন। মধুসূদনের সম্ভাবনাকে আরও আশ্চর্য পরিণতির দিকে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪১ সালের সাতই অগাস্ট তারিখে একাশী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নব নব প্রকাশ ও পরীক্ষার তাঁর বিরাম ছিল না। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সাল—এই দশককে আধুনিক বাংলা কাব্যের স্মরণীয়তম দশক বলা যেতে পারে। এ-যুগে আধুনিক কাব্যের রূপ-নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের দান ছিল অপরিমেয়। আধুনিকেরা হার স্বীকার ক'রে তাঁকে মানলেন 'সর্বাধুনিক' বলে। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, আধুনিকেরা রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারকেই বহন ক'রে নেবার গুরু দায়িত্ব পেয়েছেন।

কাব্যের বা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধারাবাহিকতা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। অন্যদিকে নতুনের যোজনা না হলে কাব্য শুধু মাত্র অতীতেরই পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়াবে—সাহিত্যের আনন্দের ভোজ রসজ্ঞকে তৃপ্তি দেবে না। এই দৃষ্টিতে দেখলে একদিকে যেমন আজকের কবিতা রবীন্দ্রনাথের মহৎ উত্তরাধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী হবেনা অন্যদিকে তেমন এই উত্তরাধিকারকে নবতর সংযোজনার দ্বারা সমৃদ্ধ-ও সে করবে। সে-ই হবে নতুন যুগের কবিদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব—আর এই ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়াকেই যাঁরা স্বকীয়তা মনে করবেন তাঁরা ব্যর্থ হবেন অনিবার্যরূপে।

কাব্য-বিচারে আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। একদিক থেকে দেখলে মানুষের গভীরতম অনুভূতির বিষয়গুলি—যেমন ভালবাসা, দুঃখ-শোক, আশা-আনন্দ—সর্বদেশে সর্বকালে মূলত এক; অন্য দিকে কবি যে যুগে ও সময়ে বাস করেন তদানীন্তন ঘটনা বা অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না। একদিকে তা হলে রয়েছে সে-ই সব অনুভূতি যা চিরন্তন, অন্যদিকে স্থানীয় বা সাময়িক বিষয়। মহৎ বা শ্রেষ্ঠ কবিরাই সাময়িক ঘটনাতে আবদ্ধ থেকেও চিরন্তন মূল্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। অনুভূতি-গ্রাহ্য প্রধান বিষয়গুলির চিরন্তনত্ব সত্ত্বেও এক যুগের কাব্য থেকে আর এক যুগের কাব্যকে যে আমরা আলাদা ক'রে চিনে নিতে পারি, তার প্রধান কারণ দুটি—প্রথম, বহিরঙ্গ বা কাব্যরূপের পার্থক্য যা প্রকাশিত কবিতার ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে—দ্বিতীয়, অন্তরঙ্গ বা মেজাজের পার্থক্য যা প্রকাশিত কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে।

উপরের কথাগুলি মনে রাখলে এই প্রবন্ধের আলোচনার ধারা বুঝতে সহজ হবে। আলোচনা আরম্ভের পূর্বে সমসাময়িক স্বর্গত কবিদের সশ্রদ্ধ স্মরণ আবশ্যিক হবে। কবি-প্রয়াণের সংবাদে দুজনের তিরোধান মর্মান্তিক। নিষ্ঠুর নিয়তি আধুনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য কবি জীবনানন্দ দাশকে আমাদের ভিতর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর কলকাতায় ট্র্যাম দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আঘাত পান এবং ২২শে অক্টোবর শম্ভুনাথ হাসপাতালে মারা যান। দ্বিতীয় শোকোদ্দীপক ঘটনা কবি কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু। ১৯৪৭ সালের মে মাসে আশ্চর্য প্রতিশ্রুতিশীল এই কবি মাত্র একুশ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে মৃত্যু বরণ করেন।* এ

*গত ২৫শে জুন, ১৯৬০ সালে মস্তিস্কের রক্তক্ষরণে কবি সুধীন্দ্রনাথের লোকান্তরের ঘটনাও অতীব শোকাবহ। এই প্রবন্ধ রচিত হবার কালে তিনি জীবিত ছিলেন।

ছাড়া পরিণত বয়সে প্রয়াণ ঘটেছে যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮—১৯৪৮) মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২) এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (জুন ১৮৮৭—সেপ্টেম্বর ১৯৫৪)। আর একটি ঘটনা মৃত্যু অপেক্ষাও করুণ ও মর্মস্পর্শী। 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলাম আজ জীবিত থেকেও স্মৃতি-বুদ্ধি-শক্তিহীন এবং কবি হিসাবে মৃত।

এবারে কথারম্ভে বিশ শতকের গোড়ার দুই দশকের সংক্ষিপ্ত কাব্যকাহিনী নেওয়া যেতে পারে। শতাব্দীর প্রথম এই দুই দশককে (১৯০০—১৯১৯) প্রায় সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত যুগ বলা চলে। এ-যুগের খ্যাত-অখ্যাত সকল কবিকেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষছায়াতে নিজ নিজ চরিত্র অনুযায়ী বিকশিত হতে দেখি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিসমাজের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২), মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯)।

এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমে রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় আধুনিক কাব্যের কয়েকটি লক্ষণের সূচনা দেখা দিয়েছিল—যেমন সমাজ-সচেতনতা, মানবতার জয়ঘোষণা, বাস্তবমুখিতা ইত্যাদি—কিন্তু নানা কারণে সেগুলি সার্থক হয়ে ওঠেনি। ছন্দের নানা পরীক্ষা ও আঙ্গিকের বিচিত্র অনুশীলনের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ খ্যাত এবং এই শতাব্দীতে আধুনিকতার যাঁরা অগ্রনায়ক—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার নজরুল ইসলাম—তাঁদের উপরে এবং কিছু পরিমাণে পরবর্তী 'কল্লোল'—গোষ্ঠীর কবিদের উপরেও তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (১৯২০—২৯) আধুনিকতার ভিত্তিভূমি যে তিন জন কবি রচনা করলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মরীচিকা"য় আমরা যেন রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র এক কবি-কন্ঠের সন্ধান পেলাম—শাণিত ব্যঙ্গের তীক্ষ্নতায়, ভাব ও রসের নতুনত্বে যিনি একটি গ্রন্থেই খ্যাত ও চিহ্নিত হয়ে গেলেন। ক্রমে এক-ই সুরের কাব্যগ্রন্থ "মরুশিখা" ও "মরুমায়া" প্রকাশিত হল। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় আনুষঙ্গিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাপিয়ে উঠেছে দুঃখের তীব্র রূপ এবং "দুঃখবাদী" কবি নামে তিনি আখ্যাত-ও হয়েছেন। "বহ্নিস্তুতি" দিয়ে যখন তিনি কাব্যের আরম্ভ করেন—

শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।
(মরীচিকা)

তখন "দুঃখের বিশ্বরূপ ও তার ছলনাময় মূর্তি" আমাদের মনের চোখে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। পরবর্তী যুগের কবি গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—"যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রতিভূ, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।......

সব ক-টা জানলা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন তিনি নজরুল ইসলাম। নজরুলের ছিলো দৃপ্ত কন্ঠস্বর, অব্যবহিত আঘাতের শক্তি, তাই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই আজ উজ্জ্বলতম সেতু বলে মনে হয়। কিন্তু এই শতকের তৃতীয় দশকে যে-কবিরা যুবক কিংবা কিশোর ছিলেন, তাঁদের নতুন কাব্য ইঙ্গিত পেয়েছিলো আরো দু-জন অগ্রজ সমসাময়িকের কাছেঃ তাঁরা মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

......আমরা "কল্লোলে"র অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হয়ে শুনছি (মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ) 'বিস্মরণী'র বড়ো—বড়ো তাল, ঢেউয়ের মত গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে—সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে সুর ক'রে গোরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মত সুর।" ('কবিতা' আশ্বিন, ১৩৬১)।

শতাব্দীর পরবর্তী দশক (১৯৩০—৩৯) আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের বহু স্মরণীয় কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ এই দশকে রচিত ও প্রকাশিত। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিকতা এই দশকেই স্পর্শগ্রাহ্যরূপে রূপ-পরিগ্রহ করল। বাংলা কবিতার যথার্থ সুরবদল ঘটে এই দশকেই। নানা বিচিত্র কন্ঠ শোনা গেল এবং অনাস্বাদিতপূর্ব ভাব ও রসের সন্ধান মিলল। বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা-পত্রিকা ত্রৈমাসিক "কবিতা'র আবির্ভাব এই দশকের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। আজ অবশ্য বাংলা ভাষায় একাধিক কবিতা-পত্র—'একক', 'কৃত্তিবাস', 'শত-ভিষা'—প্রকাশিত হচ্ছে; কিন্তু পঁচিশ বছর আগে শুধু কবিতা নিয়ে পত্রিকা-প্রকাশ অভাবিত ছিল। 'কবিতা'-পত্রের বিশেষ উল্লেখের এই কারণেও প্রয়োজন যে, আধুনিক বাংলা কাব্যের বিবর্তনের ধারা অনেকখানি এই পত্রে গ্রথিত আছে। 'কবিতা' পত্রের আবির্ভাবের কয়েক বছর আগে থেকেই আর একটি সাহিত্য-পত্রিকাকে সাহিত্যে আধুনিকতার আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত দেখি। সেটি হল 'পরিচয়'। আলোচ্য দশকে এই পত্রিকার ভূমিকাও ছিল অসামান্য। এই দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলিকেই বাঙালী কাব্যানুরাগী পাঠক বহুদিন মনে রাখবে—তাদের উল্লেখ এখানে সঙ্গত হবে—জীবনানন্দ দাসের (১৮৯৯—১৯৫৪) 'ধূসর পান্ডুলিপি' (১৯৩৬); সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-৬০) 'অর্কেষ্ট্রা' (১৯৩৫) 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭); অমিয় চক্রবর্তীর (জন্ম ১৯০১) 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯); প্রেমেন্দ্র মিত্রের (জন্ম ১৯০৪) 'প্রথমা' (১৯৩২); বুদ্ধদেব বসুর (জন্ম ১৯০৮) 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭); বিষ্ণু দে-র (জন্ম ১৯০৯) 'চোরাবালি' (১৯৩৮); সমর সেনের (জন্ম ১৯১৬) 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭)।

এ-যুগের কবিতার মূল সুর বা বিশিষ্ট লক্ষণ কি এক কথায় তা নির্দেশ করা যায় না। কোনো একটি লক্ষণকে যদি আমরা বড় ক'রে দেখি তা' হলে সমগ্র ভাবে এ-যুগের কাব্যকে আমরা বুঝতে অক্ষম হব। সেদিন, অর্থাৎ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে—এমন-কি পরবর্তী কালেও—এ-কবিতা নিয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে; এ-যুগের কবিরা যেমন নিন্দিত তেমন প্রশংসিত-ও হয়েছেন এবং এখন তাঁরা স্বীকৃতি-ও লাভ করেছেন। এ-যুগের কবিতা যে সব কারণে নিন্দিত হয়েছিল, এখানে তার তিনটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) এই কাব্য দুরূহ ও দুর্বোধ্য; (২) দেশের মাটি ও স্বদেশী ঐতিহ্য থেকে এ-কাব্য বিচ্ছিন্ন; (৩) সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রচলিত আদর্শ এ-কাব্যে অনুপস্থিত—সে আদর্শকে এ-কাব্য আঘাত-ও করেছে নির্মম ভাবে। এ কয়েকটি কারণই আংশিক ভাবে সত্য। বিষ্ণু দে-র কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'এ বুঝিয়ে দিতে পারো তো শিরোপা দেবো' (বুদ্ধদেব বসু—'সব পেয়েছির দেশে')। অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন এ-কবিতার ভাষা 'আধুনিক বাঙালীর ভাষা নয়; কাব্যে অরুচির এ হল প্রথম কারণ।' (কবিতা, বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা—বৈশাখ, ১৩৪৫)। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যও দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। অবশ্য এঁদের সব কবিতার বিরুদ্ধে বা সাধারণভাবে সমগ্র আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভি-যোগ অচল। অন্য দু'টি অভিযোগ সম্পর্কে বলা চলে যে নতুন সুর আবিষ্কারের উৎসাহে অনেক সময় বেড়া ভাঙার প্রয়োজন অনুভূত হয়; কাব্যের পরিধি বাড়ানোর জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধা-চারণের-ও যুক্তি থাকে। তাতে পরিণামে বাংলা কবিতা লাভবানই হয়েছে।

এ যুগের কবিতার একটি প্রধান সুর বিদ্রোহের—কোনো ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ ব্যক্তিগত ('বন্দীর বন্দনা'—বুদ্ধদেব বসু) কোথাও বা সামাজিক ('কয়েকটি কবিতা'—সমর সেন), কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থায় কবির অবিশ্বাস কিন্তু ভবিষ্যতের কোনো আশা-স্বপ্ন না থাকায় তাতে শুধু নৈরাশ্যের সুরই বেজেছে যেমন সুধীন্দ্রনাথে—

মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
(নরক—ক্রন্দসী)।

এ বিদ্রোহ ছিল একদিকে প্রচলিত কাব্যরীতির (রবীন্দ্র ঐতিহ্য) বিরুদ্ধে; অন্যদিকে সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে—যেখানে এ কাব্য আধুনিক মনের ও যুগের ছবি বহন করছে। এ-যুগ (প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী) ছিল আশাভঙ্গের। আশা-ভঙ্গ-জনিত মনোভাবে—ক্লান্তি, অভাব, নৈরাশ্য—মানুষ তখন পীড়িত। ঐ বিড়ম্বিত অভিজ্ঞতার যুগে কবির পক্ষে অভ্যস্ত সুরে সুললিত পদ-রচনা করা সম্ভব ছিলনা। এই অবস্থায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণায়, বিশ্বাসে (আধ্যাত্মজীবনে বা ঈশ্বরে বা অন্য অন্য কিছু মতাদর্শে) অনেক কবি আস্থা হারিয়েছেন—কিন্তু নৈরাশ্য বা অবিশ্বাসই এ-কাব্যের একমাত্র সুর নয়। নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস যেমন আধুনিকতার লক্ষণ, আশাবাদ ও বিশ্বাস তেমন আধুনিকের আশ্রয় ও অবলম্বন। এ-যুগের কবিতা নিয়ে প্রথম যে কাব্যসংকলন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (আধুনিক বাংলা কবিতা—জুলাই ১৯৪০) তাতে প্রথমোক্ত সম্পাদক আধুনিক বাংলা কবিতার লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন —"কালের দিক থেকে (প্রথম) মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত অথবা মুক্তি-প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গ্রহণ করেছি"। চোদ্দ বছর পরে (মার্চ্চ, ১৯৫৪) এই বইয়ের নতুন সংস্করণ বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনি বললেন "সহজ দৃষ্টিতে যেটুকু চোখে পড়ে তা এইঃ এই কবিরা নতুন সুরে এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর। এ'রা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র ভাবে নতুন।" রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তি'কে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ না ব'লে, 'নতুন সুরে'র কথা বলা অনেকখানি সঙ্গত মনে হয়।

আধুনিক কবিদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত এ-কথা স্বীকার ক'রে নিলেও আধুনিক বিশিষ্ট কবি-মাত্রেই রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত এ-কথা মেনে নেওয়া যায়না—অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেরা সজ্ঞানে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেননি। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। এই দশকের কবিরা পরবর্তী জীবনে ও রচনায় অনেকেই তাঁদের প্রথম বিদ্রোহের মেজাজ থেকে সরে এসেছেন—তাঁদের কাব্যে ভিন্ন ও গভীর সুর বাজতে সুরু হয়েছে। প্রতি বিকাশমান কবির জীবনের নানা পর্বে তাঁর কাব্যেরও নানা পালাবদল ঘটবে এই-ত স্বাভাবিক। এ-দিক থেকে বিচার করলে কবি-দের কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ দিয়ে চিহ্নিত করায় বিপদ আছে। আমাদের প্রবন্ধের গোড়ার দিকের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে বলতে হয়, আধুনিক কবিরা—যেখানে তাঁরা সত্যিই বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন—আমাদের কাব্যের ঐতিহ্যে আরও নতুন নতুন সুর সংযোজিত করেছেন।

প্রথমে কাব্যের বহিরঙ্গের কথা ধরা যাক। কবিতার প্রকাশ ভঙ্গীতে, কাব্যরূপে বা আঙ্গিকে যে-পরিবর্তন তার ফলে দেখা দিল মুক্ত ছন্দ, গদ্য ছন্দ, গদ্য কবিতা। নতুন মেজাজকে প্রকাশের চেষ্টায়, শব্দচয়নে, শব্দগঠনে, কথার বিন্যাসে অনেক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হল—পূর্বের কবিতার অতিভাষণ ও বাগবাহুল্যের পরিবর্তে মিতভাষী অথচ সংহত ও বলিষ্ঠ বাক্‌রীতির উদ্ভব হল; (এ-চেষ্টা পরবর্তী নতুনতর কবিদের হাতে—সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—আরও সার্থক হয়ে উঠল); মুখের ও আটপৌরে ভাষা, ধ্বনিবাচক শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারে কবিতার ওজস্বিতা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ইতস্তত কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল—

এক-একটা দুপুরের এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন
অতিবাহিত হয়ে যায় যেন। (জীবনানন্দ)

একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেলো কেশে
অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে। (জীবনানন্দ)

দু মুঠো ভাতের স্বাদে চোখের জলের নুন

এখনও মাথা আছে। (অরুণ মিত্র)

এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই।

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

কবিতার বিষয়-বস্তুর পরিবর্তনে নতুন সুরের যোজনা হতে পারে এ-কথা পূর্বেই বলেছি। এ-দিক থেকে বিচার করলে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল বাংলা কাব্যের ক্ষেত্র বা পরিধির আশ্চর্য প্রসার; বিদেশের সঙ্গে সংযোগ এই ক্ষেত্র-প্রসারের কাজে বড় রকমে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে আমরা সমস্ত পৃথিবীকে কাছে পেয়েছি আর এ-কারণে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে অনেক বেশি যুক্ত হয়ে পড়েছি। এ যোগাযোগের ফলে অনেক নতুন কুঠুরি আজ খুলে গেছে—কবিরা নতুন চোখে পৃথিবীকে দেখার তাগিদ বোধ করছেন। বাংলা কাব্য আজ তাই শুধু স্বদেশের জল-মাটির ফসল নয়, নানা দেশের ভাবনা-অভিজ্ঞতার স্পর্শও তাতে এসে লেগেছে—তার ফলে নতুনতর ভাবধারায় বাংলা কাব্যের বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। আলোচ্য দশকের কবিরা সকলেই কম-বেশি বিদেশী কবিদের কাছে কাব্যের পাঠ নিয়েছেন এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। আধুনিক কাব্যধারা ও রীতি নিয়ে সব চেয়ে সুদীর্ঘকাল পরীক্ষা চলছে ফরাসী দেশে—সেই ধারার সঙ্গে আলোচ্য কবিদের কেউ কেউ অন্তরঙ্গতা স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় কীট্‌স্ ও প্রি-রাফায়েলাইটদের উপমা ও চিত্রকল্পের স্পর্শ মেলে, বিষ্ণু দে-র এই দশকের কবিতা টি, এস, এলিঅটের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত, বুদ্ধদেব ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়ারের ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্তেফান মালার্মের কাছে ঋণী, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অনেকে হপকিন্স ও রিল্‌কের সঙ্গে মিল পেয়েছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় হুইটম্যানের স্পর্শ আছে। এখানে এ-কথাও উল্লেখ করা যায় যে বিষ্ণু দে এলিঅটের, প্রেমেন্দ্র মিত্র হুইটম্যানের এবং বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের অনেক কবিতা অনুবাদ করেছেন; প্রথমোক্ত দু'জনের অনুবাদ গ্রন্থ 'এলিঅটের কবিতা' ও ও 'হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে (১৯৫০-৫৯) প্রকাশিত হয়েছে, এবং বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ গ্রন্থও হয়ত শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

কবিতার বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব সৃষ্টিতে যে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও মেজাজ সাহায্য করেছে এখানে তাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করছি—

১। মানুষের জীবনের চরম সংকটে, সমাজে যা কিছু অন্ধ সংস্কার, অন্যায় ব্যবস্থা, পাপাবিধি তার মুখোশ খুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা এ-যুগের কবিরা উপলব্ধি করেছেন। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ-প্রধান কবিতার উদ্ভব এই উপলব্ধি থেকে।

২। সমাজ-জীবনে যা কিছু দুঃখ, সংশয়, গ্লানি, বীভৎসতা তাকে অকপটে ভাষা দেবার দায় সমাজ-সচেতন কবিরা অনুভব করেছেন। দুঃখের নগ্ন মূর্তিকে সত্যের আলোয় ও যথার্থ রূপে প্রকাশ করা এ-যুগের কবি পুণ্যকর্ম মনে করেছেন। সমাজের অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজনে যে-কবিরা বিশ্বাসী তাঁরা সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছেন—(বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি)।

৩। মানুষকে নতুন মূল্যে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপরোক্ত কারণেই কবিরা অনুভব করেছেন। মানবতা, মানবধর্ম, মানবমূল্যে বিশ্বাস আধুনিকদের কাছে পরম সত্য।

৪। আধুনিক কবি জীবনের উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত দিককে আশ্চর্য মমতায় দেখেছেন। জীবনের সব দিকই তিনি দেখতে চান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রস-লোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়েনা।" জীবনানন্দের কবিতা থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলা যায়—

দেখিবে সে মানুষের মুখ?

দেখিবে সে মানুষীর মুখ?

দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগন্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শশা—পচা চাল্‌কুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব। ('বোধ', ধূসর পান্ডুলিপি)

৫। এ-যুগের কবিতায় হৃদয়াবেগের চেয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য, কবিতা মনন-প্রধান, কবিরা মাথা খাটিয়ে কবিতা লেখেন। আধুনিক জীবনধারা অতিমাত্রায় জটিল—এই আবহাওয়া কবির মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করছে, নতুন নতুন তত্ত্বের সাহায্যে তিনি তাঁর সমস্যার সমাধান খুঁজছেন; কবি-মনের সংশয়, ঝড়, তাঁকে আবেগ থেকে বুদ্ধির পথে চালিত করছে।

৬। আধুনিক যুগের আরম্ভের পূর্বে কবিতায় অন্তর্মুখিতার সুরই বেজেছে বেশি—কবি আশ্রয় খুঁজেছেন অন্তরাত্মার নিভৃতিতে; অনেকে একে বলেছেন স্বপ্নপ্রয়াণ। পূর্ব যুগের কবিরা নির্জন পল্লীপরিবেশে মুক্তি খুঁজেছেন (কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়); এ-যুগের কবিদের অনেকের দৃষ্টিতে বহির্মুখিতা, অস্থিরতা—নাগরিক জীবনের সুর-ও অনেকের কবিতায় ধ্বনিত।

৭। ভৌগোলিক আবেদন ও ঐতিহাসিক চেতনা এ-যুগের কবিদের (জীবনানন্দ দাস) আর একটি বৈশিষ্ট্য—যা এই শতকের পঞ্চম (১৯৪০—৪৯) ও ষষ্ঠ দশকে (১৯৫০—৫৯) আরও বিস্তৃত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় এসেছে পামীর, পলিনেশিয়া, হাওয়াই দ্বীপ; সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ইতিহাস অভিনিবেশ 'এশিয়া', 'ভারতবর্ষ' 'বাঙলা' তিনটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে; অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ক্রমে সমগ্র পৃথিবীই উপস্থিত হয়েছে ('অভিজ্ঞান বসন্ত' গ্রন্থের দু'টি ভাগের মধ্যে 'প্রদক্ষিণ' অংশ, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'পারাপার' গ্রন্থের চারটি অংশেই ছড়ানো মার্কিন, ভারতী, য়ুরোপা, দুইতীর)। শেষোক্ত বইয়ের কবিতাগুলির পটভূমিতে আছে বাংলা, ভারত, য়ুরোপ ও আমেরিকা।

যে-সব নতুন সুর ও চরিত্র লক্ষণের কথা বিশ শতকের চতুর্থ দশকের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, পরবর্তী দুই দশকের (১৯৪০—৫৯) কবিতাতেও তারা উপস্থিত; কোথাও বা তারা আরও সার্থক হয়ে উঠেছে। এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকের (১৯৪০—৫৯) প্রথম কয়েক বছরে বাঙালী জীবনের সংকট আরও তীব্ররূপে ধারণ করেছে। চতুর্থ দশকের শেষ দিকেই অবশ্য এ-সংকটের সূচনা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে (১৯৩৯), মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের চরম বিপর্যয়ের মধ্যে শতাব্দীর পঞ্চম দশক সুরু হল। দুঃস্বপ্ন-পীড়িত বাঙালী জীবনে সেদিন অগাস্ট বিদ্রোহ, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে। বাংলা বিভাগের চরম মূল্যে আমরা সেদিন স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এর প্রতিক্রিয়া কবিসমাজেও দেখা দিতে বাধ্য। নিভৃতবিলাসী বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরাও সেদিন তাঁদের নির্জন স্বপ্নলোক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন—বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ সকলেই। বাংলার "তরুণতম কবি" সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০) প্রথম আবির্ভাবেই ('পদাতিক'—১৯৪০) পাঠক ও সমালোচকের চিত্ত জয় ক'রে নিলেন—এক-ই বছরে (১৯৪০) সমর সেনের দ্বিতীয় কবিতার বই ("গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা") প্রকাশিত হল। এই দশকে রাজনৈতিক কাব্যের ঐতিহ্য গঠনে এই দু'ই বিপ্লবী কবির ভূমিকা অসামান্য। বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরা অধিকতর সময়-সচেতনতার পরিচয় দিতে চাইলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "সম্রাট" (১৯৪০), "ফেরারী ফৌজ"; বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী' (১৯৪৩); জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "মধুবংশীর গলি" (১৯৪৪), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "চিরকুট" (১৯৪৬) সঞ্জয় ভট্টাচার্যের "নতুন দিন" (১৯৪৭) জীবনানন্দ দাসের "সাতটি তারার তিমির" (১৯৪৮) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল—কিছুদিনের জন্যে বাংলা কাব্যকে একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে দেখা

গেল। "পদাতিক" কাব্যগ্রন্থের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, ছন্দসম্ভাবনা, দীপ্তবিশ্বাস ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিখ্যাতির মূলে; সমর সেন গদ্যছন্দে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিজস্ব রূপ দিয়ে প্রখ্যাত হলেন। 'পদাতিকে'র প্রথম কবিতার প্রথম স্তবকই উদ্ধৃত করা গেল—

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াসা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?

('সকলের গান', পদাতিক)

সমসাময়িক বহু ঘটনা-ও সুভাষের কবিতার বিষয়বস্তু-"চিরকুট" গ্রন্থের নাম-কবিতায় যেমন

শত কোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ করবেন খাজনা এ-সন
ছিটে ফোঁটাও ধান নেই।.........
পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্ব'লে উঠবে আগুন। (চিরকুট)

সমর সেনের স্বতন্ত্র ছন্দরূপের পরিচয়, যেমন—

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

('মহুয়ার দেশ', কয়েকটি কবিতা)

সেদিনের এই দুই তরুণ কবির মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিকর্মে নিজেকে তেমন ব্যাপৃত রাখতে পারেননি, আর সমর সেন বহুদিন রুদ্ধ-লেখনী। অবশ্য এই দুই কবিরই কাব্য সংকলন শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে (১৯৫০—৫৯) প্রকাশিত হয়েছে—কাব্যানুরাগী পাঠকের কাছে তা আনন্দ সংবাদ—"সমর সেনের কবিতা—১৯৩৭—১৯৪৬" (১৯৫৫), "সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—১৯৩৮—১৯৫৭" (১৯৫৭)।

এবারে বাংলা কাব্যের যে দশক সবে শেষ হল সেই ষষ্ঠ দশকের (১৯৫০—৫৯) কবিকাহিনীর অল্প পরিচয় নেওয়া যাক। এ-যুগের কাব্যে গত দশকের সমাজ-সচেতন, চড়া গলার শ্লোগান-ঘেঁষা আওয়াজ নেই, বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরাও রণক্লান্ত বিদ্রোহী কন্ঠ নীরব ক'রে নতুন ও গভীর সুরের সন্ধানে ফিরছেন; তরুণতর কবিরা কেউ নজরুল—প্রেমেন্দ্র—বুদ্ধদেব—সমর—সুভাষের মত আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্যগ্রন্থ নিয়ে উপস্থিত হতে পারেননি; বিপ্লবী কবির কন্ঠে এখন শুনছি—

ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
—একটুও যার ভাঙা নয়।

('শুধু ভাঙা নয়', "ফুল ফুটুক"—
সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

ভাঙনের সুর, নৈরাশ্যের সুর জীবনে বা কবিতায় স্থায়ী হয়ে থাকুক, এ-অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়, কাম্যও নয়—কবিকে সততায় ও সাধনায় সিদ্ধির পথ খুঁজতে হবে, জীবনেও স্বাস্থ্যের দীপ্তি আনতে হবে। কাব্যের নতুনতম এই ঋতু-বদলের বা সুর-বদলের কারণ হিসেবে আবার অবশ্য আমরা সামাজিক অবস্থার কথা তুলতে পারি। এ-কথা সত্যি এখন পৃথিবীতে যুদ্ধ নেই, দেশে পূর্বের বিক্ষোভ নেই; কিন্তু প্রলয়-ঝড়ের সম্ভাবনা থেকে কি মুক্ত আজ পৃথিবী? দেশ-ও কি যুদ্ধের আতঙ্ক মুক্ত? তবু পৃথিবীর সর্বত্রই আজ শান্তির জন্যে প্রয়াস ও সৃষ্টির জন্যে উদ্যম লক্ষ্য করা যাচ্ছে; কবি-সমাজও কবি-কর্মকে সৃজনীমূলক ধারায় প্রবাহিত করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন—শুধু বাংলায় নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই কবিচিত্তে এই নতুন ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। তরুণতর কবিদের চিত্তে পূর্বের বিদ্রোহ-ভাবনা-ত নেই-ই, কেউ কেউ অভিযোগ তুলেছেন, বয়সের

তুলনায় তাঁরা যেন বেশি সংযত ও সাবধানী—একেবারে পা মেপে চলতে চান তাঁরা। এ-ও হতে পারে তাঁরা এত বিক্ষোভ-ঝড়ের কথা শুনেছেন যে, মনে-প্রাণে তাঁদের আজ এই কামনা—'এ অবস্থার শেষ হোক'; অন্য পথে, শান্তি ও সার্থকতার পথে, চলুক কবিযাত্রা।

আধুনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য কবি জীবনানন্দ দাস—বোধ করি তরুণতর কবিসমাজের উপরে তাঁর প্রভাব সর্বাধিক—আজ জীবিত নন; তবু তাঁর কথা দিয়েই এই দশকের আধুনিক প্রবীণ কবিদের কবি-কর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সুরু করি। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে "জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৫৪) এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "রূপসী বাংলা" (১৯৫৭) প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতা-বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ 'কবিতার কথা' (১৯৫৬) তাঁর মৃত্যুর পরে এবং এই দশকেই প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দের 'ধূসর পান্ডুলিপি' গ্রন্থের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'—এত অজস্র নিপুণ ছবি তিনি এঁকেছেন তাঁর কবিতায় যে, তাঁর সমগ্র কবিতাবলী সম্পর্কেই ঐ বিশেষণ প্রযোজ্য; তা ছাড়া তাঁর সমগ্র কবিতাই স্বাদ-বর্ণ-গন্ধময়। "রূপসী বাংলা" (এ বইয়ের কবিতাগুলি রচিত হয়েছে ১৯৩২ **সালে**—কিন্তু জীবিতকালে তিনি এগুলি প্রকাশ করেননি) গ্রন্থে চিরন্তন বাংলা রূপে-বর্ণে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুভাবনা জীবনানন্দের কবিতায় বার বার এসেছে কিন্তু তার মধ্যেই আবার জীবনের সব কিছুর প্রতি মমতা জড়িয়ে আছে—

.... আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;
পৃথিবীর বহু পথ ঘুরে বহুদিন
অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার
শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের
সেই শ্যামা আজো আসে,
সেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে
কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায়
শুক ভুলে যায় কথা;
যেইখানে সব চেয়ে বেশি রূপ—
সব চেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন
বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা
মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন
বাজিবে কি আর!
(রূপসী বাংলা)

সংগতিকে তাঁর কবিতার স্থায়ী সুর ক'রে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে গভীর আশাবাদ ও আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত করেছেন।

দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথ হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন; তিনি মেলাবেন।
('সংগতি', অভিজ্ঞান বসন্ত)

আধ্যাত্মিকতা যে আধুনিকতার বিরোধী নয়, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা তার প্রমাণ। বহুকাল হল তিনি অধ্যাপনা-কর্মে আমেরিকায় আছেন। বহু দেশ ঘুরেছেন; সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যক্ষ-দর্শন অভিজ্ঞতার স্পর্শ যেমন তাঁর কাব্যে, তেমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতি মমতাও সেখানে ভাষা পেয়েছে—

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক
দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।
(পিঁপড়ে-পারাপার)

এই দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "পারাপার" (১৯৫৩), "পালাবদল" (১৯৫৫) তাঁর কাব্য-সাধনার ক্রম-পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যের প্রধান সুর নৈরাশ্যের, তাঁর জীবন-দর্শন নৈতিবাদী, নিজেকে

তিনি বলেছেন ক্ষণবাদী (প্রত্যক্ষ বর্তমানই তাঁর কাছে সত্য)ঃ

আমি ক্ষণবাদীঃ অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও। ('উপস্থাপন', দশমী)

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর এই মনোভঙ্গী প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতানুগ, ধ্বনিগম্ভীর, গাঢ়বদ্ধ প্রকাশরীতি। তাঁর কবিতার দুর্বোধ্য-তার অপবাদ আজও ঘোচেনি। এই দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "সংবর্ত" (১৯৫৩), "দশমী" (১৯৫৬)। আধুনিক কবিতার সমালোচক রূপেও খ্যাত (তাঁর প্রথম জীবনের বই 'স্বগত' ও এই দশকে প্রকাশিত 'কুলায় ও কালপুরুষ' সমালোচনা সাহিত্যে মূল্যবান গ্রন্থ)। অনুবাদ গ্রন্থ "প্রতিধ্বনি" (১৯৫৫) এই দশকেই প্রকাশিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জনপ্রিয়তায় আধুনিক কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। দুরূহতাবর্জিত সৎ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত; প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রথমা"র সাম্যবাদী ঝোঁক সত্ত্বেও ('আমি কবি যত কামারের'—প্রথমা)—তিনি কোনো দলভুক্ত হতে চাননি। 'গোটা মানুষের মানে' খুঁজেছিলেন যে-কবি, সম্পূর্ণ সত্যের আবিষ্কারে সে-কবি রত হবেন' সেইটেই-ত স্বাভাবিক। বিবেকবান, আদর্শবাদী এই কবি মানবমূল্যেও মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী—

পিতৃসত্য, লোকসত্য
সকলের সব সত্য পালনের পর
আপন গহন সত্য
খুঁজিবার রহে যেন কিছু অবসর।
আমার শ্রীরাম
কে জানে যে কার মাঝে
ধন্য হবে তাঁর পুণ্য নাম।
('শ্রীরাম', সাগর থেকে ফেরা)

এই দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "সাগর থেকে ফেরা" (১৯৫৬) ও অনুবাদ গ্রন্থ "হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা" ও সংকলন "শ্রেষ্ঠ কবিতা"।

"কবিতা" পত্রের প্রধান সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু "কালের পুতুল" গ্রন্থে ও কবিতা'য় আধুনিক কবি ও কবিতা সম্পর্কে নানা মূল্যবান আলোচনা করেছেন। মৌলিক ও অনুবাদ কবিতার উভয় ক্ষেত্রেই অক্লান্তকর্মী। এই দশকে "শীতের প্রার্থনাঃ বসন্তের উত্তর" (১৯৫৫), "যে আঁধার আলোর অধিক" (১৯৫৮) "শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৫৩) ও অনুবাদ গ্রন্থ "মেঘদূত" প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের কবিতার প্রধান অবলম্বন প্রেম, সর্বশেষে গ্রন্থ "যে আঁধার আলোর অধিকে" নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে; তিনি এখন অন্তর্মুখী—যদিও পূর্বের অতৃপ্তি ও বিষণ্ণতা বোধ থেকে এখন-ও তিনি মুক্ত নন—তিনি এখানে আত্ম-নিমগ্ন হতে চেয়েছেন কবিতার লক্ষ্য ও উৎস সন্ধানের অভিপ্রায়ে—

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোরে কেবল ভোলাতে চায়—
ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ;
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি,
শৌখিন ক্যাকটাস;
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।
('আটচল্লিশের শীতের জন্য (২)', যে আঁধার আলোর অধিক)

সততা ও নিষ্ঠায় বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যসাধনাকে পরিণতির পথে নিয়ে চলেছেন; অধুনা তাঁর কাব্যের সুরপরিবর্তনও লক্ষ্য করবার মত। তাঁর কাব্যের সে দুরূহতা আজ নেই, তাঁর বিদ্যাবত্তা এখন কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেনা। মন এখন তাঁর অন্তর্মুখী—দেশের মাটি ও ঐতিহ্যে তা' আজ সুস্থিত, ব্যঙ্গের পরিবর্তে গভীরতার সুর আজ ধ্বনিত তাঁর কাব্যে এবং সব চেয়ে বড় কথা তাঁর সাধনায় তিনি অনলস। তাই বুঝতে পারা যায় তরুণতর কবিদের উপরে তাঁর প্রভাব কেন অপেক্ষাকৃত বেশি। সর্বমানবের কল্যাণে ও উন্নততর বিশ্ববিধানে তাঁর বিশ্বাস অটল—

ভাবি কবে এই ধনী বসুন্ধরা প্রসাদ বিলাবে,
বীরভোগ্য রূপবতী! জনে জনে, সবাকে একাকী,
সম্পূর্ণের স্বাদ দেবে, জনে জনে স্বভাবে মিলাবে—

এই রৌদ্র এই ছায়া সুন্দরীকে দেখে ভাবি তাই।

('এই ধনী বসুন্ধরা', আলেখ্য)

কাব্য, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ" গ্রন্থে ও অন্যত্র তিনি করেছেন। এই দশকে প্রকাশিত কবিতার বই "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" (১৯৫৩), 'আলেখ্য' (১৯৫৮) "তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ" (১৯৫৮)। "বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা" ও অনুবাদ গ্রন্থ "হে বিদেশী ফুল"-ও এই দশকে প্রকাশিত। আটটি বিভিন্ন দেশের, সাতটি বিভিন্ন ভাষার সাতান্ন জন কবির কবিতার অনুবাদ—"হে বিদেশী ফুল" গ্রন্থে স্হান পেয়েছে এবং বৈচিত্র্যগুণে এ বই প্রায় আন্তর্জাতিক কাব্য-সংকলনের মত হয়ে উঠেছে।

পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ আধুনিক কবিদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ-কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, এই কবিরা সততায় ও নিষ্ঠায় তাঁদের রচনাকর্মে রত থেকে বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিদেশী কবিতার (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) অনুবাদের মধ্য দিয়েও বাংলার কাব্য-সম্পদকে তাঁরা সমৃদ্ধতর করেছেন। নানা অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ এ-দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলা কাব্যে সঞ্চয়নের সংখ্যা ছিল খুবই কম—কিন্তু এই শেষ দশ বছরে এত সঞ্চয়ন বেরিয়েছে যে আশ্চর্য হতে হয়। পূর্বোক্তদের "শ্রেষ্ঠ কবিতা" সংকলনের বিষয়ে উপরেই উল্লেখ করেছি। গত দু'তিন বছরে রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠীর প্রবীণ কবিদের কবিতা সংকলনও একাধিক প্রকাশিত হয়েছে (কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "শ্রেষ্ঠ কবিতা", কালিদাস রায়ের "সন্ধ্যামনি", সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "কাব্যসঞ্চয়"); যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্হ "নিশান্তিকা" (১৯৫৭) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে এই সব সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে সৎ কাব্যের প্রতি আমাদের অধিক আগ্রহ সূচিত হয়েছে, তা হলে আমাদের আনন্দিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলা কাব্যের অর্ধশতাব্দীর অধিককালের কাব্যসাধনার ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এ-জাতীয় সংকলন গ্রন্হের প্রয়োজনীয়তা না মেনে আমাদের উপায় থাকেনা। আধুনিকদের মধ্যে অন্য বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁদের নিজ নিজ কাব্যধারার স্বকীয়তা বজায় রেখে এগিয়ে চলেছেন। এর মধ্যে "পাতালকন্যা"র কবি অজিত দত্তের (জন্ম—১৯০৭) কাব্যগ্রন্হ "জানালা" (১৯৫৯), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (জন্ম—১৯০৯) সংকলন গ্রন্হ "স্বনির্বাচিত কবিতা" (১৯৫৮) ও সমালোচনা গ্রন্হ "আধুনিক কবিতার ভূমিকা" সাম্যবাদী কবি অরুণ মিত্রের (জন্ম—১৯০৯) কাব্যগ্রন্হ "উৎসের দিকে" (১৯৫৭)—অশোকবিজয় রাহার (জন্ম—১৯১০) "উড়ো চিঠির ঝাঁক" (১৯৫১), বিমলচন্দ্র ঘোষের (জন্ম—১৯১০) "উদাও ভারত" (১৯৫৮)—এই দশকে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যবয়সী কবিদের মধ্যে দিনেশ দাসের (জন্ম, ১৯১৫) "শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৫৯) সংকলন গ্রন্হটিও কাব্যানুরাগীদের প্রীত করবে। এ ছাড়া মনীন্দ্র রায় (জন্ম, ১৯১৯) "অমিল থেকে মিলে" (১৯৫৮), হরপ্রসাদ মিত্রের (জন্ম, ১৯১৭) "সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা" (১৯৫৯) ইত্যাদি, কাব্যগ্রন্হ খুব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র যুগের করুণা নিধানের, নরেন দেবের, সজনীকান্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানে বাঙালী মহিলা কবিদের প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। মহিলা কবিদের বিষয়ে স্বতন্ত্র উল্লেখের কারণ, বিশিষ্ট মহিলা কবির সংখ্যাল্পতা। পূর্বে বাংলা কাব্যের যে দশককে 'স্মরণীয়তম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১৯৩০—৩৯) সেই দশকে অপরাজিতা দেবী পর পর চারখানি কাব্যগ্রন্হ ("বুকের বীণা", "আঙিনার ফুল", "পুরবাসিনী", "বিচিত্র-রূপিনী") প্রকাশ করে কাব্যজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তাঁকে ঘিরে সে-সময়ে কৌতূহলেরও অবধি ছিল না। কৌতূহলের কারণ, কবি রাধারাণী দেবী (জন্ম—১৯০৪) নিজেকে গোপন রেখে এ-সময়ে অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রাধারাণী দেবী ও অপরাজিতা দেবী ব্যক্তি হিসাবে অভিন্ন হলেও, অপরাজিতার লেখনীতে যেন একেবারে স্বতন্ত্র

এক কবিসত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল। রবীন্দ্রোত্তর যুগে স্বাতন্ত্র্যে, স্বকীয়তায় ও সুরের নতুনত্বে বিশিষ্ট মহিলা কবি হিসাবে একমাত্র অপরাজিতা দেবীরই নাম করা চলে। সমসাময়িক প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন কবি উমা দেবীর (১৯০৪—৩১) অকাল-প্রয়াণের ঘটনাও বাংলা কাব্যসাহিত্যে শোকাবহ। "বাতায়ন" (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থে যে সহজ ও বিশিষ্ট সুর লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কবির অকাল মৃত্যুতে তার পরিণতি আর সম্ভব হলনা। পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে "জুপিটার" কাব্য-গ্রন্থের কবি বাণী রায় (জন্ম—১৯১৯) বিশিষ্ট হলেও কবিতা অপেক্ষা কথাসাহিত্যের সাধনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। "সঞ্চারিণী" কাব্যগ্রন্থের কবি উমা দেবী (রায়) (জন্ম—১৯১৯) অবশ্য কাব্যকেই প্রকাশ মাধ্যম রূপে গ্রহণ ক'রে আপন নিভৃত সাধনায় ব্রতী আছেন। তরুণতর কবিদের বিষয়ে স্বতন্ত্র উল্লেখ বর্তমান আলোচনায় সম্ভব হলনা একাধিক কারণে।

তরুণতর কবিদের (যাঁদের বয়স ২০ থেকে ৪০ এর মধ্যে) এই দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক হবে। এই ঘটনা থেকে আমরা এটুকু অন্ততঃ ধরে নিতে পারি যে বাংলা কাব্যের গুণগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বহু কবির সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলা কাব্যের অতি সাম্প্রতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে—তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হয়ে কেউ এখন-ও আবির্ভূত হতে পারেননি। ভাষা, ছন্দ ও গঠন কৌশলে সাম্প্রতি-কেরা নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সাধনায় তাঁরা নিবিষ্টচিত্ত, ভাল কবিতাও তাঁরা লিখছেন—কিন্তু বাংলা কবিতার আগামী রূপান্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলার সময় এখন-ও আসেনি।

আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে বাঙালী কবিরা অনেকেই আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ সে—জাতীয় বিষয়ের উল্লেখ উপরে করেছি। বয়োজ্যেষ্ঠ কবি-দের মধ্যে হুমায়ন কবিরও (জন্ম, ১৯০৬) এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর "বাঙলার কাব্য" গ্রন্থে। তরুণ কবিদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বসুর "আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি" ও অরুণ ভট্টাচার্যের "কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল" আলোচনা গ্রন্থ এই দশকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা ছাড়াও সুধীসমাজের অনেকে আধুনিক বাংলা কাব্যের সহৃদয় আলোচনা করেছেন—তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ, অমলেন্দু বসু, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ ("সমাজ ও সাহিত্য")। শশিভূষণ দাসগুপ্ত ("কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়"), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ("রবীন্দ্রা-নুসারী কবিসমাজ"), দীপ্তি ত্রিপাঠী ("আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়") প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

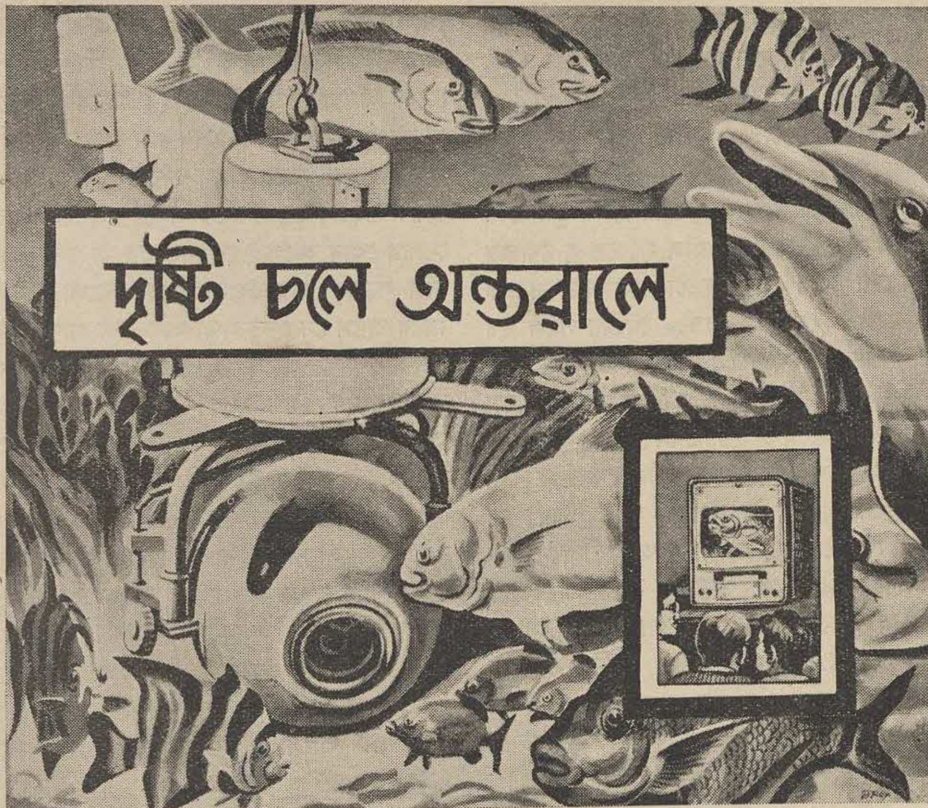
শিশু কবিতা সম্পর্কে এখানে দু'টি কথা বলব—এ ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের পরে, তাঁর জুড়ি আমরা আর কাউকে পাইনি। বয়োজেষ্ঠদের মধ্যে বুদ্ধদেব—প্রেমেন্দ্র—অজিত দত্ত প্রমুখেরা শিশু কবিতা লিখেছেন; তবে এ-প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের (জন্ম, ১৯০৪) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা ছড়াকে নতুনতর রূপে তিনি প্রকাশিত করেছেন। তাঁর "রাঙা ধানের খৈ" (১৯৫০) গ্রন্থের 'খুকু ও খোকা' ছড়াটিত এখন মুখে মুখে—

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

('খুকু ও খোকা', রাঙা ধানের খৈ)

এই সব বুড়ো খোকাদের ভারত বিভাগের ফলে বাংলাও আজ খন্ডিত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী তীরের রূপসী বাংলা আজ অন্য রাষ্ট্রদেহের অন্তর্গত কিন্তু ভাষার মধ্য দিয়ে উভয় বাংলার মধ্যে ঐক্যসূত্র আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব বাংলার তরুণেরা রক্তদান করেছিলেন এবং প্রতি-শ্রুতি সম্পন্ন তরুণ কবিদের এক অংশ পূর্ব বাংলার অধিবাসী, এ-কথা উল্লেখ করতে পারি।

দৃষ্টি চলে অন্তরালে



বহুযুগ ধরে মানুষ দিব্যদৃষ্টি লাভ করবার স্বপ্ন দেখে এসেছে। নয়নসম্মুখে যে নেই তাকে দেখতে পাইনে এই অক্ষমতার দুঃখ চিরন্তন। অন্তরালকে অগ্রাহ্য করে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখেছিলেন। এই কাহিনী শুনে ইচ্ছা হয় এমনি ক্ষমতা পেতে। সে সাধ মেটাবার উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন সর্বপ্রথম ইংলন্ডের জন বেঅর্ড। একটা মানুষের মূর্তি যন্ত্রের সামনে রেখে পাশের আর একটা ঘরে পর্দায় তারই ছবি দেখবার চেষ্টা করছিলেন। একদিন সত্যি তিনি তা দেখতে পেলেন। উল্লসিত হয়ে নগদ বকসিস কবুল করে তিনি ধরে নিয়ে এলেন এক জীবন্ত মানুষকে। যন্ত্রের সামনে তাকে বসিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পর্দায় দেখলেন তার ছবি। সেইদিন থেকে অন্তরাল হল অর্থহীন। যন্ত্রের সাহায্যে চোখের আড়ালে অবস্থিত দূরবর্তী দৃশ্যকে চোখের সামনে এনে হাজির করা অসম্ভব নয় তা জানা গেল। বেঅর্ডের অধ্যবসায় ও প্রতিভা এ বিষয়ে সাফল্যের সূচনা করেছিল। পরবর্তীদের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। বেঅর্ড দেখেছিলেন পাশের ঘরের মানুষের ছবি। বর্তমানে যন্ত্রের দৃষ্টি পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি জমাচ্ছে, পৌঁছে যাচ্ছে খেলার মাঠে রঙ্গমঞ্চে সাগরতলে যত্রতত্র সর্বত্র। দূরত্বের সমস্যা বা অন্তরালের প্রশ্ন কোনটাই আর এখন দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না।

নয়ন মেলে বিশ্বভুবন চরাচর দেখতে পাই। তবে চোখ থাকলেও কিন্তু সব সময়ে দেখা সম্ভব হয় না। আলো যেখানে নেই চোখ সেখানে অন্ধ। তাই আলোর অভাবকে অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দেখবার জন্য চোখ দুটিই সব নয়। আরও কিছুর প্রয়োজন যার প্রভাবে চক্ষু সক্রিয় হয়ে উঠবে। আলো এমন একটা শক্তি যা চোখের ভিতর দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে দর্শনানুভূতি

সৃষ্টি করে। কিন্তু কি কারণে একই আলোর প্রভাবে বস্তু বিভেদে দর্শনের অনুভূতি ভিন্ন রকম হয়ে থাকে? অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। আলো থাকলে কোনটা কি বস্তু, কোন লোকটা কে এই জাতীয় পার্থক্যগুলো বুঝা যায়। চোখে দেখে রামকে শ্যাম বলে ভুল করি না, সাদা ফুলটিকে নীল বলি না, গোরু ঘোড়ার প্রভেদ টের পাই। অথচ দুটো বস্তু অবিকল এক রকম হলে কিন্তু তাদের বেছে নেওয়া সহজ হয় না। দুটো কাককে চিনে রাখা সম্ভব হয় কি? কিংবা একই জাতের দুটো ফুলকে? যমজ সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাদের দুজনকে চিনে নেবার জন্য সুতো বেধে দিয়ে বিশেষ করে চিহ্ন দেওয়া হয়। কি কারণে দুটো প্রাণী বা জিনিস দেখতে একই রকম মনে হয়, আবার কেনই বা তাদের পৃথক বলে চেনা যায়—কি তার রহস্য?

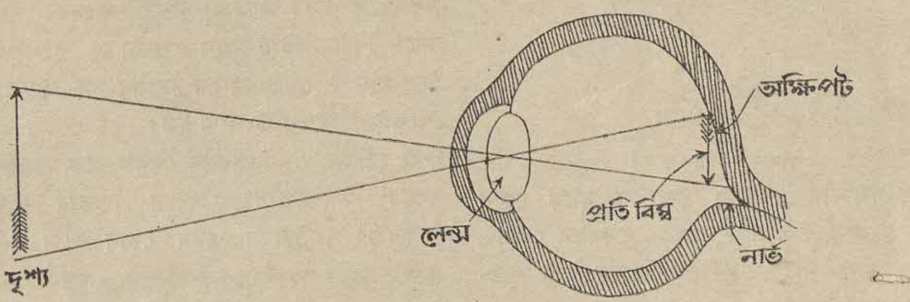
সূর্য উঠলে আলো পাওয়া যায়। আগুন জ্বেলেও আলো সৃষ্টি করা সম্ভব। রাতের আঁধারে যারা অদৃশ্য, আলো জ্বেলে তাদের সন্ধান পাই অথবা সূর্য উঠলে তাদের স্ব স্ব রূপ নিয়ে প্রকাশিত হতে দেখি। অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বাললে কেবল যে প্রদীপের শিখাটুকুই দেখা যায় তা নয়, আশেপাশের অনেক কিছুই তখন দেখতে পাওয়া যায়। যারা আলো সৃষ্টি করছে যেমন সূর্য বা প্রদীপ তাদের বলি স্বয়ংপ্রভ। নিজেরা আলো সৃষ্টি ক'রে সেই শক্তিকে রশ্মির আকারে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এই আলোর রশ্মি সরাসরি চোখে এসে ঢুকলে যেখান থেকে তারা আসছে সেই স্বয়ংপ্রভ বস্তুকে দেখা যায়। কোন স্বয়ংপ্রভ বস্তু থেকে আলোর রশ্মি অন্য কোন পদার্থের উপরে পড়লে সেখানে সাধারণ নিয়মে রশ্মির দু'রকম পরিণতি ঘটে থাকে। কতকাংশ বস্তুটির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় এবং বস্তুর ধর্মানুযায়ী সেই যাত্রা-পথে কম বেশী বা সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়ে থাকে। বাকীটা বস্তুটির উপর থেকে প্রতিহত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও বস্তু থেকে এইরূপ ঠিকরে-আসা আলোরশ্মি চোখে ঢুকলে তখন সেই বস্তুটি দৃশ্যমান হয়ে থাকে। যাদের নিজের আলো নেই তারা এমনি ধার-করা আলোতে আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। সূর্য স্বয়ংপ্রভ বস্তু। চাঁদের নিজের আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের উপরে পড়লে সেখান থেকে যে রশ্মি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তারাই চাঁদকে দেখিয়ে দেয়। যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যাবার বেলায় কোন আলোই শোষিত হয় না, সে বস্তুকে বলি স্বচ্ছ। যার উপর থেকে আলো সবটুকু ফিরে আসে সে বস্তু সাদা আলোতে সাদা দেখায় কিংবা যখন যে আলোতে প্রকাশিত হয় তখন সেই আলোর বর্ণ গ্রহণ করে। যে জিনিসের উপর আলো পড়লে সে কোন আলোই ফিরিয়ে দেয় না—সেই পদার্থ দেখায় কালো। রং-ওয়ালা বস্তুর একটা বৈশিট্য রয়েছে যার ফলে সে একটি বিশেষ রং-এর আলো ছাড়া অন্য সব আলো শোষণ করে। সেজন্য এই রকম বস্তু থেকে যে আলো বিক্ষিপ্ত হয় তার একটা বিশেষ বর্ণ থাকে। তাই সাদা আলোতে দেখলে তাদের একটা নিজস্ব বর্ণ ফুটে ওঠে। সাদা আলো কিংবা নিজস্ব রং-এর আলো ছাড়া অন্য আলোতে তাকে কালো কিংবা বিকৃত বর্ণের দেখায়।

কোন বস্তুর উপর আলো পড়লে সেখান থেকে আলো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু বস্তুটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার সব জায়গায় সমান আলো পড়ে না। সব জায়গা থেকে আলো সমান পরিমাণে ফিরেও আসে না। কোন বস্তুর স্বকীয় যে বিশেষরূপ চোখের সামনে ফুটে ওঠে তার রহস্য রয়েছে এখানে। বস্তুটির ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে যে বিশেষ ধরণে আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে আসে সেই সজ্জা বা বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যই বস্তুটির রূপ ফুটিয়ে তোলে। দুটো মানুষের ছবি দেখেও তাদের পার্থক্য বুঝতে পারি। রক্তমাংসের পরিচয় বাদ-দিয়েও তাদের চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। দুটো মানুষের ছবি বা ফোটোর পার্থক্য বিচার করলে কিন্তু দেখা যাবে সেখানে শুধু রয়েছে সাদাকালোর সমাবেশের তারতম্য, অবস্থান ও পরিমাণে।

চোখের সামনে কোন মানুষ থাকলে আলোতে

দেখে তাকে চিনতে পারি। কিন্তু আবছা আঁধারে তাকে দেখতে পেলেও হয়ত চিনতে পারিনে। মানুষটির দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে আলো পড়ে এবং সেই সব জায়গা থেকে আবার আলো কম-বেশী ঠিকরে আসে। কেবল মুখের ব্যাপারটাই মনে করা যাক। সেখানে যে আলো পড়ে তা সব জায়গায় সমান নয়। আবার সকল অংশ থেকে সমানভাবে আলো ফিরেও আসে না। নাক চোখ গাল ও কপাল থেকে যে রকম আলো ফিরে এল, দর্শকের চোখের ভিতর দিয়ে গিয়ে তারা চোখের সামনে যে লেন্স রয়েছে তারই কার্য-কারিতায় ভিতরকার পর্দায় (রেটিনা বা অক্ষিপট) একটা আলোছায়া দিয়ে প্রতিবিম্ব তৈরী করল। এই প্রতিবিম্বের আলোই নার্ভের উপর ক্রিয়া ক'রে দর্শনানুভূতি সৃষ্টি করে মস্তিষ্কে। বলতে

জায়গায় কম কালো আবার অন্যত্র হয়ত কালি-মাটা বেশ জমকালো। ফোটো-নেগেটিভের ভিতর দিয়ে আলো ফোটোর কাগজের উপর ফেললে সেখানে সাদাকালোর ছবি তৈরী হয়। একখানা ফোটো চোখের সামনে আলোতে ধরলে সেখান থেকে যেভাবে আলো ফিরে আসে তা অবিকল মানুষটির দেহের উপর থেকে ঠিকরে-আসা আলোর অনুরূপ। তাই কোন মানুষ আর তার ছবি দেখলে একই রকম মনে হয়। কোন ব্যক্তি, দৃশ্য বা অন্য কিছুকে চোখে দেখা বা তার ফোটো-তোলা কিংবা ছবি আঁকা এই তিন কার্যের মূলতত্ত্ব হচ্ছে সেখানে আলো পড়লে তা থেকে যে বিশেষ বিন্যাস করে আলো ছড়িয়ে পড়ে তারই ছাপ তুলে নেওয়া। চোখে দেখার বেলায় ছাপটি ওঠে সাময়িকভাবে অক্ষিপটে, ফোটো-



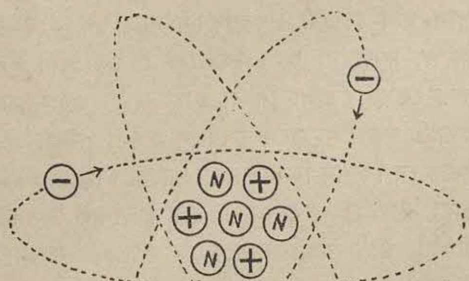
চোখের লেন্স অক্ষিপটে আলোছায়া দিয়ে প্রতিবিম্ব গঠন করে

পারি প্রতিবিম্বে আলোছায়া বিন্যাসের বিশেষ চেহারাটাই ব্যক্তিটির রূপ চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে। ফোটো-ক্যামেরার ঘষা কাচের পর্দায় যে ছবি পড়ে সেটা এমনি আলোছায়ায় গড়া প্রতিবিম্ব বা বিজ্ঞানের ভাষায় সদ্‌বিম্ব। চোখের লেন্স যে কাজ করে তেমনি প্রতিবিম্ব গঠন করে ক্যামেরার লেন্সও। চোখের লেন্স প্রতিবিম্ব ফেলে অক্ষিপটে, আলো সেখানে সাড়া জাগায় নার্ভের ভিতরে। ক্যামেরা-লেন্স প্রতি-বিম্ব তৈরী করে ফোটোর প্লেটে বা ফিল্মে, আলো তার উপরে রাসায়নিক ক্রিয়া করে এবং তা থেকেই প্রস্তুত হয় ফোটোর নেগেটিভ। একখন্ড ফোটোর নেগেটিভকে বিচার করলে সাদা কালোর বিন্যাস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না, তার কোন

তোলার ক্ষেত্রে স্থায়ী দাগ পড়ে যায় ফোটোর প্লেটে। ছবি আঁকতে হলে চিত্রকর নিপুণভাবে কালির আঁচড়ে সেই বিন্যাস গড়ে তুলতে পারলেই সেটা হুবহু প্রতিকৃতি হয়ে দাঁড়ায়।

আলোর প্রভাবে কোন বস্তুকে চক্ষু দিয়ে দেখে এমনিভাবেই চেনা যায় কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে তার ছবি তোলা যায়। কিন্তু দর্শনীয় বস্তু ও চক্ষু (কিংবা ক্যামেরা) এই দুইয়ের মধ্যে এমন পদার্থ যদি থাকে যার ভিতর দিয়ে আলো বেরিয়ে আসতে পারেনা তা হলে চক্ষু তথা ক্যামেরা সেখানে অকর্মণ্য হয়ে থাকবে। কোন কিছুকে অসচ্ছ বস্তুর পেছনে রাখলেই তাকে আর দেখা যায় না কারণ সে ক্ষেত্রে বস্তুটির উপর থেকে যে আলো প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে

অসবচ্ছ বস্তু তাকে আটকে দেয় বলে তাকে ধরে প্রতিবিম্ব তৈরী করা যায় না। দূরবীন দিয়ে দূরে দেখার কাজ করা যায় বটে। বস্তুটি খুব দূরে থাকলে তাকে দেখতে অসুবিধে হয় কারণ সেখান থেকে ফিরে-আসা আলোর পরিমাণ কমে যায়। দূরবীন দিয়ে বেশী আলো ধরে আনবার সুযোগ হয় কারণ দূরবীনের লেন্সটা চোখের লেন্সের তুলনায় আকারে অনেক বড় হয়ে থাকে।



পরমাণুর গঠন-রীতি

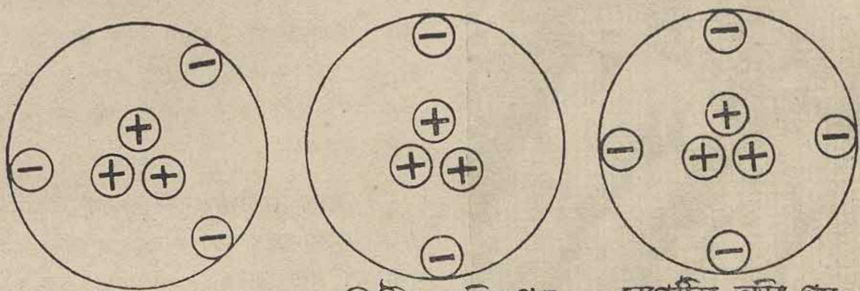
কিন্তু দর্শনীয় বস্তু ও দর্শকের মাঝে কোন অসবচ্ছ বস্তু থাকলে দূরবীনও সেখানে কোনও কাজে আসবে না। দূরবীনের ভিতর দিয়ে দূরে-দেখার কার্যে সুবিধে হয়ে থাকলেও অন্তরালকে নস্যাৎ করা সম্ভব হয়নি। আলোর রশ্মি অসবচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়ে যেতে পারে না বলেই এ সমস্যার সমাধান করা যায় না। তবে পরোক্ষভাবে আলোরশ্মিকে কিন্তু অন্তরাল পার করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তড়িৎশক্তিকে তারে বা বিনাতারে দূরবর্তী স্হানে পাঠিয়ে দেওয়া চলে। সেখানে মাধ্যমের অসবচ্ছতার কোন প্রশ্ন নেই। কোন বাধাই তড়িতের কাছে অনতিক্রম্য নয়। তড়িতের স্কন্ধে চেপেই শব্দ সাতসাগর পাড়ি দিয়ে এসে রেডিয়োর বাণী হয়ে বেরোয়। আলোর সাহায্যেও তড়িৎ সৃষ্টি করা না যায় এমন নয়। তাই তড়িৎ সংকেতের ছদ্মবেশে আলো অন্তরাল ভেদ করে যেতে পারে। টেলিভিসন বা দূরেক্ষণ ক্যামেরার কাজ আলোশক্তিকে এই উদ্দেশ্যে তড়িতে রূপান্তর করা।

পদার্থের পরমাণুর মৌলিক উপাদান তিন জাতীয় কণিকা প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। এরা আকারে খুবই ছোট। ষোল-লক্ষ-কোটি-সংখ্যক ইলেকট্রন পর পর সারি করে বসে গেলে এক ইঞ্চি জায়গা নেবে। অবশ্য প্রোটন ও নিউট্রন অপেক্ষাকৃত ভারী কণিকা। পরমাণুর ভিতরে এদের বিন্যাস অনেকটা সৌরজগতের মত। কেন্দ্রে থাকে ভারী কণিকা প্রোটন ও নিউট্রন। ইলেট্রন কেন্দ্রকে পরিক্রমা করে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে। এক পদার্থের পরমাণু থেকে অন্য পদার্থের পরমাণুর পার্থক্য হয় ইলেকট্রন-প্রোটনের সংখ্যায়। সবচেয়ে হালকা পদার্থ হাইড্রোজেন তার পরমাণুতে একটি মাত্র প্রোটন। তাকে পরিক্রমা করে একক ইলেকট্রন। সব চেয়ে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়ামের। তাতে আছে বিরানববইটি করে প্রোটন ও ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ও প্রোটনের যে বিশেষ ধর্ম আছে তা থেকেই তড়িতের উৎপত্তি হয়। এই ধর্মের মূল-কথা প্রোটন ও ইলেকট্রন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সমজাতীয় কণিকার ভিতরে রয়েছে বিকর্ষণ। নিউট্রনের এমন কোন গুণ নেই। একটা গোটা পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সমান সংখ্যায় থাকে বলে এদের যে বিশেষ গুণাগুণ আছে তা বাইরে থেকে বুঝা যায় না। বলা হয় ইলেকট্রন ও প্রোটন বিপরীতধর্মী, একে অন্যের গুণকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু কোন কারণে পরমাণুতে এক প্রকার কণিকার আধিক্য হলে যে সকল ব্যাপার ঘটে তাকেই আমরা তড়িৎক্রিয়া বলে থাকি। কোন পদার্থে ইলেকট্রনের বাড়তি হলে তখন আমরা তাকে বলি নেগেটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত। প্রোটনের চেয়ে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম থাকলে বলা হয় পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত। পদার্থ তড়িৎগ্রস্ত হলে তার কতগুলো বিশেষ গুণ প্রকাশ পায়। নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তু কাছা-কাছি অন্য বস্তুর প্রোটনকে টেনে কাছে আনতে চাইবে বা কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘাটতি হলে অন্য স্হান থেকে সুবিধা পেলেই ইলেকট্রন তার কাছে চলে আসবে। ধাতুপদার্থের ভিতর

দিয়ে ইলেকট্রন চলাচলের সুযোগ রয়েছে। বিপরীত তড়িৎগ্রস্ত দুই বস্তুর ভিতরে আকর্ষণ থাকে বলে ধাতুনির্মিত তার দিয়ে তাদের জুড়ে দিলে ঐ তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে থাকে। নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর দিক থেকে ইলেকট্রন পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর দিকে চলে। ধাতুপদার্থ ছাড়া শূন্যস্থান দিয়ে এবং আকর্ষন বেশী হলে বায়ুর ভিতর দিয়েও ইলেকট্রন চলতে পারে। মেঘে যে বিজলী চমকায় তা এমনি আকর্ষণের ফলে তড়িৎ চলাচলের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। কোন কারণে পরমাণুর বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে ইলেকট্রন যদি দল বেঁধে কোন পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর দিকে চলতে থাকে তখনই তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি

গেলে সেটা কম বেশী পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হবে। সিজিয়মের উপর আলো ফেললে সেখানে যে পজিটিভ তড়িতের সঞ্চার হবে আপতিত আলোর ঔজ্জ্বল্য অনুযায়ী তার মাত্রার তারতম্য হবে। এভাবে আলোশক্তির প্রয়োগে ধাতুপদার্থে তড়িতের সঞ্চার করানো যায় এবং আলোর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যকে কমবেশী তড়িৎসঞ্চারের আকারে পাওয়া যেতে পারে।

কোন একটা আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য থেকে যে আলো বিক্ষিপ্ত হয় লেন্সের সাহায্যে সিজিয়মের উপর ফেলে তাকে তড়িতে রূপান্তরিত করে দূরে পাঠানো যেতে পারে। একটা গোটা দৃশ্য থেকে যে আলো ঠিকরে এল তার বিভিন্ন অংশে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য থাকবে।



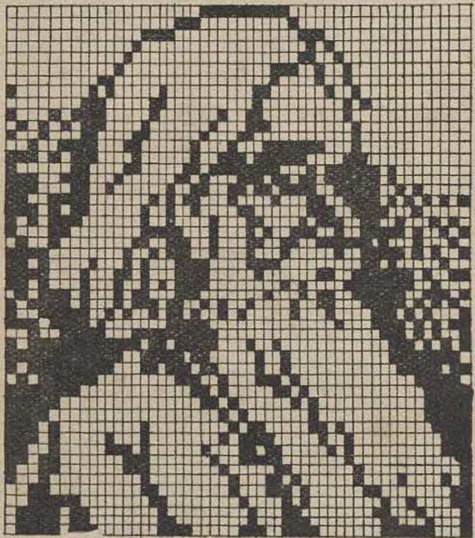
পরমাণুর বিভিন্ন অবস্থা

হয়। গতিশীল ইলেকট্রনের ধর্মকেই তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া বলে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে।

নানারকম কৌশলে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করে প্রবহমাণ করা চলে অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। তাপ প্রয়োগে ধাতুপদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করা যেতে পারে। তামা বা দস্তার পাতকে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে দিলে উহাতে যথাক্রমে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িতের সঞ্চার হয়। কতকগুলি ধাতুপদার্থ আছে যেমন সিজিয়ম, পটাসিয়ম, রুবিডিয়ম—এদের উপর আলো ফেললে এরা ইলেকট্রন মুক্ত করে দেয়। আলো যত উজ্জ্বল হবে তত বেশী সংখ্যায় ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবে। কোন পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে

গোটা দৃশ্যটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থেকে গৃহীত আলোরশ্মিকে নিয়োগ করা যেতে পারে পৃথক পৃথকভাবে তড়িৎ তৈরী করার কাজে। এই প্রসঙ্গে কাটাকাটা কতকগুলি ছবির টুকরো জুড়ে গোটা ছবি তৈরী করবার ব্যাপার নিয়ে শিশুদের যে খেলাটা রয়েছে তার কথা ভাবা যেতে পারে। কিংবা মনে করা যাক একখানা বড় ছবিকে দূরে কোন লোকের কাছে পাঠাতে হবে। কিন্তু ছবি-খানা এত বড় যে তাকে স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে ছবিকে টুকরো টুকরো করে কেটে পর পর পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অপর দিকে সেগুলো যাঁর কাছে পৌঁছুবে তিনি যদি পর পর সাজিয়ে টুকরোগুলো জুড়ে নেন তা হলেই ধীরে ধীরে ছবিটি পুরোপুরি তৈরী

হয়ে যাবে। টেলিগ্রাফে যে বার্তা পাঠানো হয় তাতে একটির পর একটি অক্ষর সংকেতের সাহায্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপর দিকে অক্ষরগুলো পর পর জুড়েই একটা করে শব্দ এবং শব্দের পর শব্দ বসিয়ে গোটা বার্তাটা জেনে নেওয়া হয়ে থাকে। দূরবর্তী দর্শকের চোখের সামনে কোন দৃশ্যকে হাজির করবার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থাই করতে হবে। দৃশ্যের বিভিন্ন

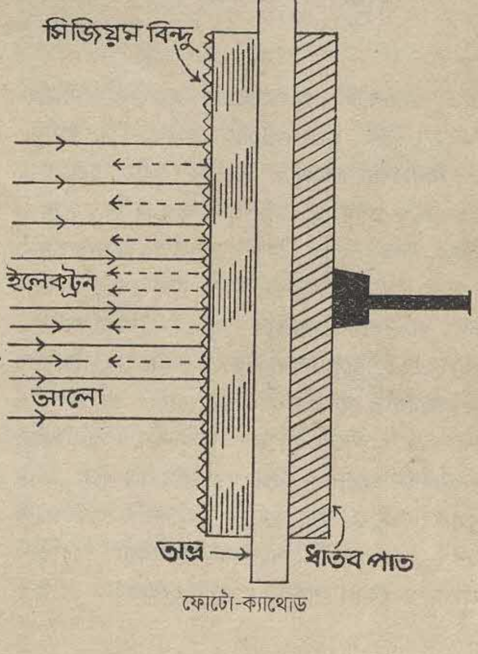


সাদা কালো ফোঁটা দিয়ে আঁকা ছবি

অংশ থেকে যে আলো আসছে তা থেকে পৃথক পৃথক তড়িৎসংকেত সৃষ্টি করে নিয়ে একে একে পাঠাতে হবে এবং অপর দিকে আবার তড়িৎ-থেকে আলোকবিন্দু সৃষ্টি ক'রে তাদের পর পর পর্দায় সাজিয়ে নিতে হবে। সম্পূর্ণ একটা দৃশ্য থেকে বিন্দু বিন্দু আলো ধরে নিয়ে এক সেকেন্ডের দশভাগ সময়ের মধ্যে তাদের পর পর চোখের সামনে যথাযথ অবস্থান অনুযায়ী ফেলতে পারলে দৃশ্যটি টুকরো টুকরো মনে না হয়ে একসঙ্গেই সবটুকু দেখছি বলে ধারণা হবে।

বই পড়বার সময় এক পৃষ্ঠায় যা লেখা থাকে তা আমরা এক সঙ্গে সবটুকু পড়তে পারি না। এক প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে এক একটি অক্ষর ও শব্দের উপর চোখ বুলিয়ে যাই। এক লাইন শেষ হলে পরবর্তী লাইনে দৃষ্টি নামিয়ে আনি। একখানি দৃশ্য থেকে আলো সংগ্রহ করে তড়িৎ-সংকেত উৎপন্ন করবার জন্যও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আলো-ছায়ায় বা সাদা-কালোয় তৈরী কোন ছবিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিলে দেখা যাবে গোটা ছবিটাতে সাদা-কালো ফোঁটার সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নেই। এমনি সাদাকালো ফোঁটা দিয়ে আঁকা একখানা প্রতিকৃতি এখানে দেখান হয়েছে। বই পড়বার মত ছবিটির এক প্রান্ত থেকে সুরু করে লাইন ধরে এগিয়ে গেলে কখনও কালো বা কখনও সাদা ফোঁটার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটবে। এই ফোঁটাগুলো থেকে আলো সংগ্রহ করে নিলেই ছবির উপরকার আলোবিন্যাসের খবর জানা হয়ে গেল। এখানে একথা বলা দরকার যে ছবিটির আলোবিন্যাসের খবর নিখুঁতভাবে জানতে হলে ঐ ফোঁটাগুলো খুবই ছোট আঁকারে নিতে হবে। ফোঁটাগুলো যত ছোট ছোট হবে ছবিটি তত সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

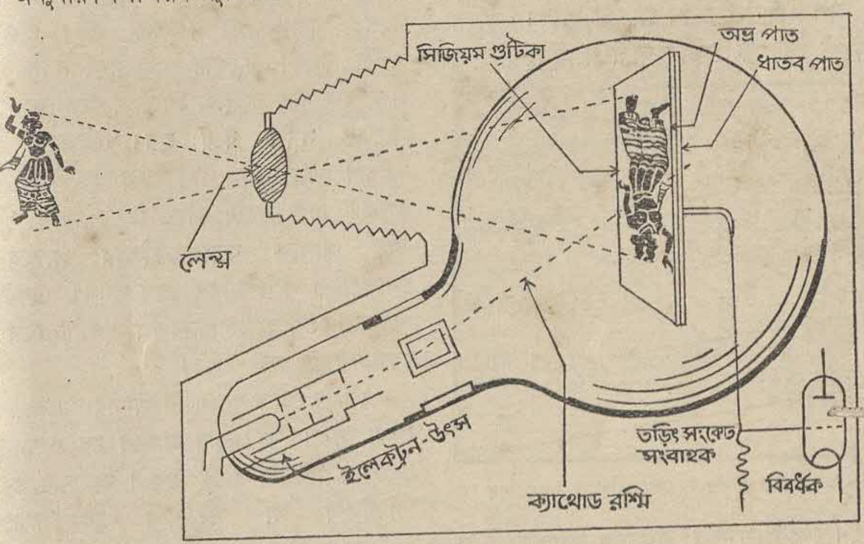
দূরেক্ষণ (টেলিভিসন) কার্যে কোন দৃশ্য থেকে আলো গ্রহণ করে তাড়িতে রূপান্তর করবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম এমিট্রন



ফোটো-ক্যাথোড

ক্যামেরা বা আইকনোস্কোপ। এর ভিতরে প্রধান অংশ রয়েছে দুটি। প্রথমটি হচ্ছে একটি অভ্রের পাত। তার একপৃষ্ঠে রয়েছে একটি ধাতব আবরণ। অপরপৃষ্ঠে রূপার পাতের উপর রয়েছে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র সিজিয়ম-গুটিকা। পরস্পরের থেকে তড়িৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাদের লাইন করে সাজান হয়েছে। এটার নাম দেওয়া হয়েছে ফোটোক্যাথোড। লেন্সের সাহায্যে কোন দৃশ্যের আলো-ছায়ায় গড়া প্রতিবিম্ব অভ্রের পাতের উপরকার সিজিয়াম গুটিকাগুলির উপর এনে ফেলতে হবে। প্রতিবিম্বের আলোর বিন্যাস অনুযায়ী সিজিয়ম গুটিকার যেটির উপর কিন্তু অপরিবাহী অভ্রের বেড়া রয়েছে বলে তারা সিজিয়ম গুটিকা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না অপর পৃষ্ঠের ধাতুর পাতের উপর জমা হয়ে থাকবে।

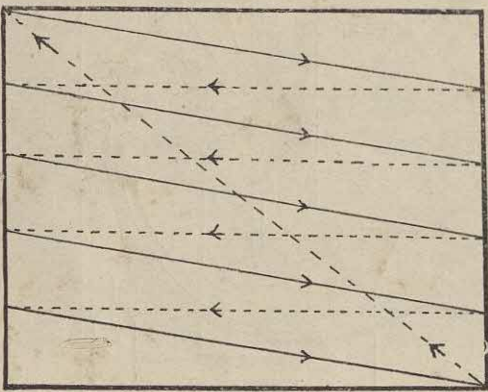
এই অবস্থায় যদি কোন উপায়ে সিজিয়াম গুটিকাতে পুনরায় একে একে ইলেকট্রন সরবরাহ করা যায় তবে গুটিকাগুলির তড়িৎসম্পদ পর পর লোপ পাবে এবং পেছনের ধাতবপাতে যে ইলেকট্রন জমা হয়ে ছিল তাদের থেকে অল্প অল্প করে ইলেকট্রনেরা আবার স্বস্থানে ফিরে যাবে। এই ফিরে যাওয়ার ফলে ইলেকট্রনের যে চলাচল ঘটবে তার জন্য সংলগ্ন সংবাহক তারে একটু



এমিট্রন ক্যামেরা

যেমন আলো পড়বে সেখান থেকে তদনুপাতে কম বেশী ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে আসবে। এর ফলে গুটিকাগুলি পজিটিভ-তড়িৎগ্রস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সকল গুটিকার তড়িৎসম্পদ সমান হবে না। দৃশ্যের আলোর বিন্যাস অভ্রপাতের উপর তৈরী করবে কমবেশী তড়িৎসঞ্চারের একটি প্যাটার্ণ, দৃশ্যের বৈদ্যুতিক প্রতিলিপি। কোন বস্তুতে ইলেকট্রনের ঘাটতি পড়লে সেখানে সুবিধামত অন্য কোন উৎস থেকে ইলেকট্রন এসে ঘাটতি পূরণ করতে চায়। তাই অভ্রের পাতের অপর-পৃষ্ঠে যে ধাতুর পাত রয়েছে সেইদিকে সংলগ্ন কোন উৎস থেকে ইলেকট্রনেরা সব ধাওয়া করবে। একটু বিচ্ছিন্ন তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। এই প্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হবে যে গুটিকা যতটুকু তড়িৎগ্রস্ত ছিল তারই মাত্রাদ্বারা। ইলেকট্রন সরবরাহ ক'রে গুটিকার তড়িৎ লোপ করবার ব্যবস্থা রয়েছে যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে। যাকে ইংরেজীতে বলে 'ইলেকট্রন গান্'। আমরা বলতে পারি ইলেকট্রন তুবড়ী। যা থেকে ইলেকট্রনের ফোয়ারা ছুটবে। ইলেকট্রন-স্রোতকে তড়িৎ-চুম্বকের সাহায্যে যে কোন দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলে। নলের ভিতরে তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে ইচ্ছামত চৌম্বক প্রভাব সৃষ্টি করবার জন্য তড়িৎবাহী কুন্ডলী রাখা হয়।

কোনও ধাতবতারকে উত্তপ্ত করলে তা থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এবং এর সামনে কোন পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তু (অ্যানোড) থাকলে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে সেইদিকে ছুটে চলে। এই রকম সজ্জা করে ইলেকট্রন স্রোত সৃষ্টি করবার ব্যবস্থাকেই 'ইলেকট্রন গান্' বলা হয়ে থাকে। এই ইলেকট্রন স্রোতের বিশেষ নাম ক্যাথোড রশ্মি। খুব সূক্ষ্ম ক্যাথোডরশ্মি তৈরী করে তাকে চুম্বকের সাহায্যে পূর্বোক্ত ফোটো-ক্যাথোডের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। চুম্বকের প্রভাব ক্রমে একটু একটু করে বাড়িয়ে ক্যাথোডরশ্মিকে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টেনে নেওয়া যাবে। আবার নিম্নমুখী চৌম্বক প্রভাব দ্বারা ক্যাথোডরশ্মিকে



ফোটোক্যাথোডের উপর ক্যাথোডরশ্মির ভ্রমণ পথ

একলাইন থেকে নীচের লাইনের গোড়ায় নিয়ে যাওয়া চলবে। ক্যাথোডরশ্মি কি ভাবে ফোটো-ক্যাথোডের উপর দিয়ে আনাগোনা করবে সংলগ্ন চিত্রে তা দেখান হয়েছে। এমনি করে ফোটো-ক্যাথোডের উপরে যেখানে প্রতিবিম্ব এসে পড়েছিল সেখানকার প্রত্যেকটি সিজিয়ম গুটিকার উপরে একে একে ক্যাথোডরশ্মি ছুঁইয়ে নেওয়া যেতে পারে। ইলেকট্রন-স্রোত যখন যে গুটিকার উপরে এসে পড়বে তখনই তার তড়িৎ সম্পদের বিলুপ্তি হবে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনকার ধাতবপাত থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন সরে যাবে এবং সংলগ্নতারে একটু ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। এই তড়িৎ সংকেতগুলোকে দৃশ্যের আলোকবিন্যাসের প্রতিনিধি মনে করা যেতে পারে। এদের যন্ত্রদ্বারা যথাসম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে বেতার তরঙ্গোৎপাদনক্ষম তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়ে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

যে দৃশ্যকে পাঠান হবে সেখান থেকে ক্যামেরার লেন্সের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব এক সেকেন্ডের পঁচিশ ত্রিশ ভাগ সময়ের ব্যবধানে একটার পর একটা ফোটোক্যাথোডের উপরে ফেলতে হবে। একটা গোটা প্রতিবিম্বকে ৫২৫ (কিংবা ৪০৫) লাইনে ভাগ করে নেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রতিটি লাইনে আবার ঐ সমান সংখ্যক বিন্দু থেকে পৃথক পৃথক তড়িৎসংকেত গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা গোটা দৃশ্যের আলোকবিন্যাসকে দুই লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে তড়িৎ-সংকেত সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে প্রতিটি দৃশ্যের বৈদ্যুতিক প্রতিলিপি তৈরী করা হয়ে থাকে। এক একটা ছবির উপর দিয়ে পরিভ্রমণ করে আসতে ক্যাথোডরশ্মির লাগবে এক সেকেন্ডের পঁচিশ-ত্রিশ ভাগ সময়। একটা দৃশ্য পাঠানো শেষ হলেই পরবর্তী দৃশ্যটি এসে পড়বে ফোটোক্যাথোডের উপর।

গোড়া থেকে ব্যাপারটা আবার আলোচনা করে দেখা যাক। ক্যামেরার সামনে যে দৃশ্য রয়েছে লেন্সের ক্রিয়ায় তারই একটা আলোছায়ায় গড়া প্রতিবিম্ব বা সদ্‌বিম্ব ফোটোক্যাথোডের সিজিয়মগুটিকাগুলির উপরে পড়বে স্বল্পকালের জন্য।

প্রতিবিম্বের আলোর বিন্যাস অনুযায়ী সিজিয়ম গুটিকাগুলি কম বেশী ইলেকট্রন হারিয়ে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হবে এবং তদনুপাতে পেছনকার পাতে ইলেকট্রন জমায়েত হবে।

ক্যাথোডরশ্মি চালিয়ে একে একে সিজিয়ম-গুটিকার প্রত্যেকটির ইলেকট্রনের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে।

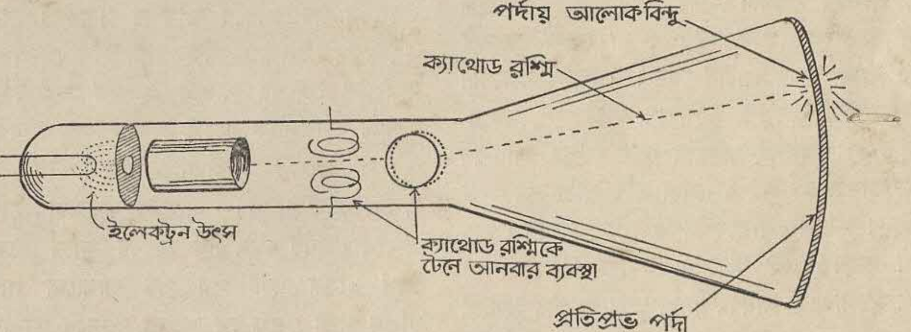
ক্যাথোডরশ্মি যখন যে গুটিকাকে স্পর্শ করবে তার উপরে যে পরিমাণ আলো পড়েছিল তদনুপাতে পেছনের ধাতব-পাত-সংলগ্ন তারে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে।

এই ভাবে আলোকের প্রতিভূ হয়ে তড়িৎ চলবে দেশ-দেশান্তরে।

টেলিভিসন ক্যামেরায় যে তড়িৎসংকেত উৎপন্ন হল বেতার গ্রাহক যন্ত্রে সেগুলো অনুরূপ তড়িৎপ্রবাহের আকারে ধরা দেবে। এই তড়িৎ প্রবাহগুলোকে ছদ্মবেশ ছাড়িয়ে অর্থাৎ আবার আলোতে রূপান্তরিত করে নিয়ে পর পর পর্দার উপর সাজিয়ে গেলেই দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ফুটে উঠবে। আলোক বিন্দুগুলি সবই একই সময়ে পর্দায় পড়বে না, একটার পর একটা আসবে পর্দার বিভিন্ন অংশে। কিন্তু এক সেকেন্ডের পঁচিশ ত্রিশ ভাগ সময়ের মধ্যে একটা দৃশ্য থেকে সংগৃহীত আলোক বিন্দুগুলি পর্দায় পড়বে বলে তাদের পৃথক পৃথক বিন্দু বলে মনে হবে না—পুরো দৃশ্যটাই একসঙ্গে দেখছি বলে ধারণা হবে। এইরকম দৃশ্যগুলো সিনেমার ছবির মতই পর পর পর্দায় আবির্ভূত হতে দেখা যাবে।

এই পর্দার উপর এসে পড়লে আলোতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। ক্যাথোডরশ্মি বা ইলেকট্রনের আঘাতে ঐ রাসায়নিক পদার্থ থেকে আলো বেরোয়। ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশী হয় উৎপন্ন আলোও তত জোরালো হয়ে থাকে।

এই নলের ভিতরে দুটো সরঞ্জামই প্রধান। এক প্রান্তে রয়েছে ইলেকট্রন তুবড়ী বা ইলেকট্রন স্রোত উৎপন্ন করবার ব্যবস্থা। অপর প্রান্তে প্রতিপ্রভ পর্দা—যেখানে ক্যাথোডরশ্মি আলো উৎপন্ন করবে। ক্যাথোড রশ্মিকে চুম্বকের প্রভাবে পর্দার উপর দিয়ে চালিয়ে নেবার জন্য এখানেও তড়িৎ কুন্ডলীর ব্যবস্থা আছে। স্বাভাবিক অবস্থাতে ক্যাথোডরশ্মিতে ইলেকট্রনের সংখ্যা এমন থাকবে যে পর্দায় বিশেষ উজ্জ্বল আলোর উৎপত্তি হবে না। প্রেরকযন্ত্র থেকে আলোর প্রতিলিপি নিয়ে আসছে যে তড়িৎপ্রবাহ তাকে প্রথমে বাড়িয়ে তারপরে যে বেতার প্রবাহের উপরে চেপে এরা এসেছে তাদের থেকে এদের ছেঁকে আলাদা করে নিতে হবে।



চিত্র-প্রদর্শন যন্ত্র

চিত্র প্রদর্শন করবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার কার্যপ্রণালী অপেক্ষাকৃত কম জটিল। প্রেরিত দৃশ্য থেকে আলোকবিন্দুর প্রতিভূ হয়ে আসছে যে তড়িৎসংকেতগুলো তাদের বেতার গ্রাহকযন্ত্রে ধরে নিয়ে প্রয়োজনানুযায়ী বাড়িয়ে নেবার পর পাঠিয়ে দেওয়া হবে একটা ক্যাথোডরশ্মি নলে। এই নলের এক প্রান্তে রয়েছে একটা কাচের পর্দা যার উপরে মাখানো হয়েছে বিশেষ রকম রাসায়নিক পদার্থ। ক্যাথোডরশ্মি

সেই প্রক্রিয়ার পর প্রয়োজনীয় তড়িৎ সংকেতগুলো পাওয়া যাবে। তাদের লাগিয়ে দেওয়া হবে ইলেকট্রন তুবড়ীর সঙ্গে, সেখানে এরা কলকাঠি নেড়ে ক্যাথোডরশ্মির তীব্রতা (অর্থাৎ নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা) কমাবে বাড়াবে। ফলে পর্দায় যে আলো উৎপন্ন হবে তার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে দূরাগত তড়িৎসংকেতের তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী। প্রতিক্ষণে ক্যাথোডরশ্মি বিন্দু বিন্দু আলোক উৎপন্ন

করবে। চৌম্বক প্রভাব প্রয়োগ করে ক্যাথোড-রশ্মিকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে নিয়ে নিয়ে আলোক-বিন্দুগুলিকে পর্দার উপরে পর পর সাজিয়ে যাওয়া চলবে। প্রেরকযন্ত্রে ফোটোক্যাথোডের যে অংশ থেকে যখন যে তড়িৎসংকেত গৃহীত হয়েছে, গ্রাহকযন্ত্রের ক্যাথোডরশ্মিকেও ঠিক সেই সময়ে পর্দার সেই অংশেই রাখতে হবে। তা হলে আলোকবিন্দুগুলি পর্দার গায়ে দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলবে। ক্যাথোডরশ্মি এক সেকেন্ডের পঁচিশ বা ত্রিশভাগ সময়ের মধ্যে এইভাবে পর পর ৫২৫টি আলোর রেখা টেনে যাবে, যা সব জায়গায় সমান উজ্জ্বল নয়। পর্দার দিকে তাকিয়ে দর্শক দেখবেন একটা গোটা ছবি। এটি তৈরী হয়েছে লক্ষাধিক আলোর বিন্দুদ্বারা যারা পর্দার উপরে বিভিন্ন অংশে এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এসে পড়ছে। এমনি করে পর্দায় আসবে এক দৃশ্যের পর অপর দৃশ্য—সিনেমার পর্দার ছবির মতই চলচ্চিত্র।

এমিট্রন ক্যামেরা তৈরী হবার আগে বেঅর্ডের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে স্টুডিও বা স্টেজ থেকেই শুধু দৃশ্য দূরে পাঠান যেত। এমিট্রন ক্যামেরা খেলার মাঠ, জনসভা, রাজপথ, বন-জঙ্গল, সমুদ্র-তল সকল স্থানেই ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ ক্যামেরার মতই এই ক্যামেরা ছবি পাঠানোর কাজ করছে। আনন্দপরিবেশন ও সচিত্র বার্তা প্রচার করা ছাড়াও এই ক্যামেরা নানারূপ ব্যবহারিক সার্থকতায় এবং মানবকল্যাণে তথা জ্ঞানের প্রসারে প্রযুক্ত হচ্ছে।

গভীর সমুদ্রের খবর জানবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী আবরণে আবদ্ধ করে এমিট্রন ক্যামেরা জলের নীচে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। জল-মগ্ন জাহাজের উদ্ধারকার্যেও এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলে।

শল্য চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদের অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি চাক্ষুষ দেখে নেবার প্রয়োজন আছে। অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপরে একটা এমিট্রন ক্যামেরা বসিয়ে দিলে অস্ত্রোপচারের সকল খুঁটি-নাটি বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর সামনে পর্দায় তুলে ধরা সম্ভব হতে পারে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এরোপ্লেনের সঙ্গে দূরেক্ষণ ক্যামেরা থাকলে শত্রুপক্ষের এলাকা দিয়ে উড়ে যাবার সময় বৈমানিক শত্রুর অনেক গোপন তথ্য নিজেদের দলের ঘাঁটিতে পেঁছে দিতে পারে।

সোভিয়েট রাশিয়ার যে রকেট চাঁদকে পরিক্রমা করেছিল তাতে ছিল এক দূরেক্ষণ ক্যামেরা। তারই গুণপনায় পৃথিবীতে বসেই দেখতে পেলাম চাঁদের অদেখা অধর্বাংশের ছবি।

কিছুটা জটিল যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ করে দূরের দৃশ্যকে পর্দায় স্বাভাবিক বর্ণে অর্থাৎ রঙিন করে দেখানও সম্ভব হয়েছে। কোন রঙিন দৃশ্যকে লাল, সবুজ ও আসমানি কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে দৃশ্যগুলি মূলতঃ একরকম মনে হলেও উহারা বিভিন্ন বর্ণের ছবি হবে এবং উহাদের বর্ণবিন্যাসে পার্থক্য থাকবে। আবার এই রকম তিন রঙের তিনখানা ছবি স্বল্পসময়ের ব্যবধানে চোখের সামনে হাজির করলে গোটা দৃশ্যটা স্বাভাবিক বর্ণেই দেখছি বলে মনে হবে। এই পদ্ধতিতেই টেলিভিসনে রঙিন ছবি দেখানো সম্ভব হতে পারে। এমিট্রন ক্যামেরার লেন্সের সামনে একটি ঘূর্ণমান চাকার গায়ে তিনখানা তিন রঙের কাঁচ পর পর লাগানো থাকবে। রঙিন দৃশ্য থেকে যে আলো আসবে তা তিনটি বিভিন্ন রঙের কাঁচের ছাকনির ভিতর দিয়ে যেয়ে ফোটো—ক্যাথোডের উপরে পর পর তিন রঙের তিনখানা ছবি ফেলবে। গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দার সামনেও ঐ একই রকমে ঘূর্ণমান তিনরঙের তিনখানা কাঁচ থাকবে। ফলে একই দৃশ্যের ছবি তিনবার তিনটি বিভিন্ন রঙে এসে পর্দায় পড়বে এবং এগুলো খুবই কম সময়ের ব্যবধানে দেখা যাবে বলে তাদের পৃথক পৃথক ছবি বলে মনে হবে না এবং গোটা ছবিটা নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণে পর্দায় ফুটে উঠবে।



ইন্দ্রজাল

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে যে, "facts are sometimes stranger than fiction"—অর্থাৎ সময় বিশেষে বাস্তব ঘটনাও উপন্যাস অপেক্ষা রোমাঞ্চকর হয়। কথাটি খুবই খাঁটি। যাদুকরদের অত্যাশ্চর্য্য খেলাগুলি দেখিলেই এই উক্তির তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। সেই জন্যই যুগে যুগে পৃথিবীর সকল দেশে যাদুকরগণ দর্শকদিগের চক্ষু ধাঁধাঁইয়া নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। যাদুবিদ্যা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ, মিশর, আরব প্রভৃতি দেশে ইহা বহুযুগ হইতেই আলোচিত হইতেছে। যাদুবিদ্যার অপর বিভাগ 'সম্মোহন বিদ্যা' বা বশীকরণ বিদ্যা ভারতবর্ষে ও মিশরে ধর্ম্মযাজকদের একচেটিয়া ছিল। ভারতীয় যোগশাস্ত্রের পুস্তকাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা অত্রশাস্ত্রোক্ত মারণ, উচাটন প্রভৃতি বিভাগের মধ্যে 'বশীকরণে'র অন্তর্ভুক্ত এবং অণিমা লঘিমা প্রমুখ অষ্টসিদ্ধির মধ্যে উহা 'বশিত্ব' সিদ্ধির পর্য্যাভুক্ত। এই 'বশিত্ব' বা 'বশীকরণ' অর্থই যাদুবিদ্যা বা সম্মোহন বিদ্যা। যাদুবিদ্যা বর্ত্তমানে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী ইত্যাদী। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। একদল লোক মনে করেন চক্ষু নামক প্রধান ইন্দ্রিয়ের উপর মায়াজাল বিস্তার করে বলিয়াই ইহার নাম 'ইন্দ্রজাল'। ম্যাজিকের কতকগুলি খেলা হাতসাফাই বা হস্তকৌশলে করা হয় বলিয়া উহা 'ভানুমতিকা খেল' ইত্যাদি। অপর দল বলেন একথা সত্য নহে, পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হইত। সেই হইতেই ইহা ইন্দ্রজাল নামে পরিচিত। তাঁহারা বলেন ইহা দেবসেনানী কার্ত্তিকের আবিষ্কৃত চুরিবিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু ব্যাপারটী চুরি হইলেও তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিভাগের ন্যায় বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ।

ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, ইহা ভোজরাজার নাম হইতে আসিয়াছে। ভোজরাজ মালব দেশের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী। প্রমার বংশীয় রাজগণের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাজা ভোজ যাদুবিদ্যা প্রমুখ অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, জোতিষ, রাজনীতি ও শিল্পকলায় যুক্তি কল্পতরু প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক গ্রন্থ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হয়। তিনিই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং পরে ১০৯২ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে নিপতিত হন। এই ভোজরাজের নাম হইতেই ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী নাম হইয়াছে। এই ভোজরাজের কন্যার নাম ছিল ভানুমতী। রাণী ভানুমতী সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের মহিষী ছিলেন এবং পিতার ন্যায় অশেষ গুণের অধিকারিণী ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, যাদুবিদ্যায় তিনি পিতা অপেক্ষাও অধিক পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই যাদুবিদ্যা বর্ত্তমানে "ভানুমতীকা খেল" বা 'ভানুমতীর খেলা' নামে সুপরিচিত হইয়াছে। পাঠকেরা উভয় মতবাদই সমর্থন করিতে পারেন। কারণ তাহাতে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোনই অসুবিধা হয় না। উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যাদুবিদ্যা এই বহু শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত। এই বিদ্যার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

করিলে আরও অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত দর্শনের ১৭শ শ্লোকে একটী বিশিষ্ট যাদুবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তাহার কৌশলও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় যাদুবিদ্যা যৌগিক ও আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক প্রভৃতি বিদ্যার চরমোৎকর্ষ এক-কালে এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। তৎকালে বহুবিধ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় যাদুকরগণ দেশব্যাপী হুলুস্থুলের সৃষ্টি করেন। কিন্তু আলোচনার অভাবে এই বিদ্যা ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশ হইতে একেবারে লোপ পাইতে চলিয়াছে। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, কয়েকজনের উৎসাহে পুনরায় এই বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যাদুবিদ্যায় বাঙালীদের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোগল রাজত্বকালে বাঙালীগণ নানাবিধ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া সমগ্র দেশময় হুলুস্থুলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর পারস্য ভাষায় লিখিত আত্মজীবনী 'জাহাঙ্গীর নামা' বা Tarikh - i - Jahangir - nama - Salimi (or Dwazda - Shaha - Jahangiri) পুস্তকে অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী এই বাঙালী যাদুকরদের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতে উল্লেখ আছে যে, একবার একদল বাঙ্গালী যাদুকরের খেলা দেখিয়া বাদসাহ জাহাঙ্গীর নিম্নোক্তরূপ লিখিয়া গিয়াছেনঃ

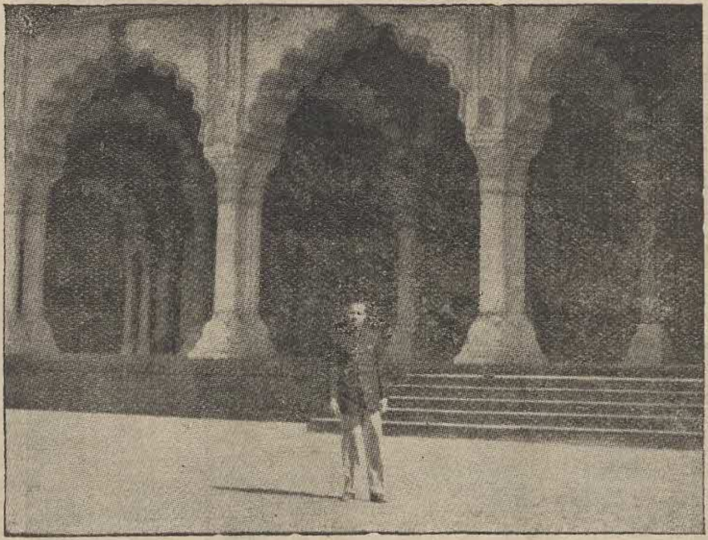
"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বাংলা দেশে কয়েকজন যাদুকর ম্যাজিক ও ভোজবাজীতে এরূপ দক্ষ ছিল যে, তাহাদের কাহিনী আমার এই আত্মজীবনীতে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"এক সময়ে আমার দরবারে সাতজন বাঙালী যাদুকরের আবির্ভাব হয়। তাহারা তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। আমাকে তাহারা গবর্ব করিয়া বলে যে, এমন খেলা তাহারা দেখাইতে পারে যে, মানুষের বুদ্ধির তাহা ধারণাতীত। একথা বলিয়া তাহারা বাজী দেখাইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি এমনই অত্যদ্ভুত খেলা দেখাইল যে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। বাস্তবিকই কৌশলগুলি এমনই আশ্চর্য্যজনক



নিউজিল্যাণ্ডের যাদুকরগণ ভারতীয় যাদুকরের সম্মানার্থে এক বিরাট পার্টীর আয়োজন করে শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে সম্মানিত করেন

ছিল যে, আমরা যে যুগে বাস করিতেছি সেই যুগে এমন বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।”

ইহার পর আর একজন বাঙালী যাদুকরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার নাম আত্মারাম সরকার। আত্মারাম বাংলার বিখ্যাত ভোজবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালে সঠিকরূপে জানা যায় না। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত গঙ্গা-গোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন যে, আত্মারাম “বনবিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রকাশছিলিম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।” কিন্তু আত্মারামের বংশধর শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সরকার উক্ত পত্রেই লিখিয়াছেন যে, আত্মারামের বাসস্থান হুগলী (বর্ত্তমান হাওড়া) জেলার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামে ছিল। আত্মারামের পিতার নাম ছিল মাধবরাম সরকার। মাধবরামের চারি পুত্র, (১) বাঞ্ছারাম, (২) আত্মারাম, (৩) গোবিন্দরাম, (৪) রামপ্রসাদ। এক বাঞ্ছারামেরই ব্যতীত অপর তিন ভ্রাতার বংশ নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সরকার মহাশয় বাঞ্ছারামেরই বংশধর। ইহারা জাতিতে কায়স্থ। শোনা যায়, আত্মারাম কামরূপ কামাখ্যা হইতে যাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন এবং দেশে আসিয়া বাজিকর দিকের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতেন বলিয়া বাজিকরেরা অদ্যাপি তাহাকে গালি দিয়া থাকে। “যাঃ গুটী চলে যা—। আত্মারাম সরকারের মাথা খা—” ইত্যাদি। আত্মারাম সরকার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। তিনি নাকি চালুনি ও ধুচুনিতে জল স্থির করিয়া রাখিতে পারিতেন। এবং ভূতপ্রেত বশ করিয়া তাহাদের দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। শেষে ভূতেরাই নাকি ছিদ্র পাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। আত্মারামের ভ্রাতা বাঞ্ছারাম সরকারও যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তবে তাহার কোন বিশিষ্ট খেলার বিবরণ পাওয়া যায় নাই।



বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদের দেওয়ানী আমের (Public audience hall-এর) সম্মুখস্থ ময়দানে দন্ডায়মান লেখক পি· সি· সরকার। এই স্থানেই সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী যাদুকরগণ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—বাদশাহ্ স্ব-রচিত আত্মজীবনীতে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে যাদুবিদ্যা এদেশ হইতেই একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এককালে এই বাঙালী যাদুকরগণ কত আশ্চর্য্য ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে অশেষ

সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা সত্য-সত্যই সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু বিদেশী সভ্যতার ছিলাম; আমাদের নিজস্ব এই বিদ্যাটীও ঐ বৈদেশিক আবহাওয়ায় ম্লান ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয়



জাপানে ভারতীয় যাদুকরের সম্মানার্থে প্রীতিভোজ—জাপানের প্রখ্যাত মহিলা যাদুকরগণও শ্রীযুক্ত সরকারকে সম্মানিত করেন



যাদুকর পি. সি. সরকারের আরোহীসহ যাত্রীদের মোটর গাড়ী অদৃশ্য করার দৃশ্য

সংস্পর্শে ও ইউরোপ আগত অতি আধুনিক মনোভাবে আমরা আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া- বাঙ্গালীর সাধনায় ও চেষ্টায় উহার লুপ্ত গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইতেছে। এত- দিন যাহা অশিক্ষিত পক্ষের বেদিয়াদের হাতে

ছিল, আজ তাহা ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত সমাজেরও হাতে আসিতেছে। এই নব পরিবর্ত্তন অতিশয় শুভ দিনের ঘোষণা করিতেছে।

আমাদের দেশ যাদুকরের দেশ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আমাদের দেশে এই বিদ্যার যথেষ্ট আদর ও সম্মান ছিল। আধ্যাত্মিক অপরকে মোহিত বা বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন কাজ সম্পাদন করাইয়া লইতে পারে—তাহার নাম 'সম্মোহন বিদ্যা'। পাশ্চাত্যদেশে 'হিপ্নোটিজম্' বা 'মেসমেরিজম্' নামে যে বিশিষ্ট বিদ্যাটির আবিষ্কার হইয়াছে উহাও এই সম্মোহন বিদ্যারই এক অংশ মাত্র।



আমেরিকায় গুণী সান্নিধ্যে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্কিন যাদুকর 'ব্লাকষ্টোন' এবং চৈনিক যাদুকর 'ওকিটো (আসলে ডাচ) শ্রীযুক্ত সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছেন

(spritual) ও যৌগিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভারতীয় যাদুবিদ্যার বিশেষত্ব।

যাদুবিদ্যারই অপর এক অঙ্গের নাম 'মন্মোহন বিদ্যা'। ইহা ভারতীয় যোগশাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর শাখার ন্যায় সাধনা সাপেক্ষ। সে বিদ্যা দ্বারা এক ব্যক্তি হিপ্নোটিজম্ ব্যবহারিক মনো বিজ্ঞানের (Experimental Psychology) একটী শাখা মেসমেরিজম্ প্রণালীতে নিদ্রাভিভূত করিবার কালে মৌখিক আদেশ দিতে হয় এবং অপরটীতে মৌখিক আদেশের পরিবর্ত্তে মানসিক আদেশ দিতে হয়, এই মাত্র। ভারতীয় সম্মোহন বিদ্যা

পাশ্চাত্য দেশীয় হিপ্নোটিজম প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের বিষয়। সম্যকরূপে মোহিত হইলেই সম্মোহন। (সম্মোহন=সম্—নিজন্ত মুহ্=(মোহি+অনট্ ভা। সম্যক্‌রূপে মোহ-প্রাপ্ত। সম্যক=সম্পূর্ণ) মোহাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকেনা, হিপ্নোটিজমে তাহা থাকিতেও পারে। সম্মোহনে আত্মবোধ থাকেনা, কিন্তু হিপ্নোটিজমে উহা অনেকাংশে থাকিতে দেখা যায়।

সম্মোহন বিদ্যার চর্চা অতি প্রাচীনকাল হইতেই এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে। তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির (নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে)। এখনও বিকৃতভাবে প্রচলিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের মুদ্রাদি করন্যাস প্রক্রিয়া ও বিবাহবাসরে পাত্রপাত্রী দর্শনের শুভদৃষ্টি ইত্যাদি স্ত্রীআচার সমস্তই এই সম্মোহন বিদ্যার মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বকালে কাপালিকগণ এই বিদ্যার প্রভাবেই ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে যূপ-কাষ্ঠে হত্যা করিত। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বকালে এদেশে এই বিদ্যার এত বহুল প্রচার হইয়া পড়ে যে, সাধু-অসাধু সর্ব্ববিধ লোক ইহার ব্যবহার



লন্ডনে লর্ড ও লেডি মাউন্টবেটেনের সঙ্গে যাদুকর পি. সি. সরকার

মধ্যে ইহা 'বশিত্ব' সিদ্ধির অন্তর্গত। এই বশী-করণ ও বশিত্ব হইতেই এই বিদ্যার অপর নাম বশীকরণ বিদ্যা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই বিদ্যার বহুল প্রচার ছিল—তখন সমস্ত লোকই প্রায় এই বিশিষ্ট বিদ্যাটির চর্চা করিত এবং যথাসম্ভব শিক্ষালাভ করিয়া সেইমত কার্য্য করিত। সেই সমস্ত বিদ্যার সুপ্ত অংশ—বিবাহ বাসরে বরণ করা, মুখ চন্দ্রিকা, ঝাড়—ফুঁক, ভূত নামান, সর্পদংশনে ওঝার ঝাড়ান, জলপড়া, তেল পড়া প্রভৃতি বহু উপকারী বিষয় করিতে জানিত। এই বিদ্যা সাহায্যে সমাজের ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই করা সম্ভবপর। এত-দ্দর্শনে সাধু ব্যক্তিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহার বহুল প্রচার বন্ধ হইয়া যায় এবং কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বিশিষ্ট বিদ্যাটী এইভাবেই সর্ব্বসাধারণের অগোচর হইয়া বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের ঠিক এমনই দিনে মেসমার সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত 'মেসমেরিজম্' বিদ্যা আমাদের দেশে প্রচারিত হয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।



মহাপণ্ডিতের পাঠশালা

।। এক ।।

এক যে ছিলো শেয়ালপন্ডিত, তার ছিলো এক পাঠশালা। সেই পাঠশালাতে দেশের যতো পশু আর পাখীর ছানারা লেখাপড়া শিখে মানুষ হতো। এই পন্ডিত এবং তার পাঠশালার কথা দেশ-বিদেশের সবাই জান্‌তো।

মহাপন্ডিতের এই পাঠশালাও কিন্তু, তোমাদেরই পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের মতো, এগারোটায় ব'সতো এবং চা'রটায় ছুটি হ্‌তো। পুজো-পার্বনের ছুটিও থাকতো ঠিক তোমাদেরই মতো। এই পন্ডিত কিন্তু, যে সে পন্ডিত ছিলো না। তাঁকে দেখলেই তার পড়ুয়াদের পেটের পিলে চম্‌কে যেতো আতঙ্কে! ছাগলছানা, কুকুরছানা, মুরগীছানা, ঈগলছানা, ভেড়ারছানা, খরগোসছানা, ইঁদুরছানা সবাইকে চুপ্‌চাপ্‌ বসে পড়াশুনো করতে হতো। টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করার উপায় ছিলো না কারুর। কেউ তা করেছো কি—'খপ্‌! তারপর কড়মড়! শেষটায় কোঁৎ! বাস্‌, খতম!'

এহেন পন্ডিতের পাঠশালার ঠিক সামান্য

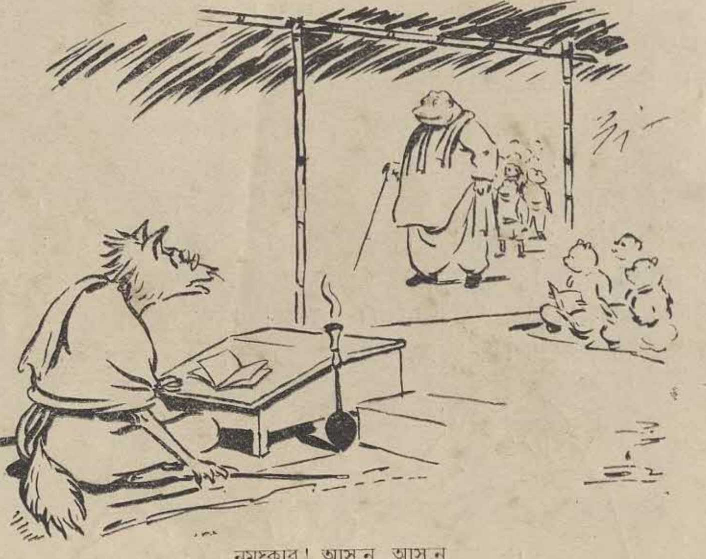


কুমীর গিন্নী বল্‌লেঃ সেই যুগ নেই……এটা জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ

কিছু দূরে এগিয়ে গেলেই, একটা সেকেলে পুরনো নদী। এই নদীতে বাস করতো এক বনেদি কুমীর পরিবার।

কুমীর তার গিন্নী এবং সাত সাত্‌টি বাচ্ছা নিয়েই ছোট্ট একটি সংসার। কিছুদিন হলো, কর্ত্তা আর গিন্নীতে চলছে জোর মন কষাকষি! সেদিন হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে কুমীর-গিন্নী বললো,—বলি,—ছেলেপুলে গুলো যে গো-মুখ্‌খু হয়ে রইলো—তার কোন খবর রাখছ কি? আমি ক'দিন ধরে বলছি—এদের পন্ডিতের পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিয়ে এসো—লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে আসুক। গিন্নীকে সকাল বেলাই চেঁচামেচি করতে দেখে কুমীর মশাই শান্ত কন্ঠে বললো, রেগে গিয়ে এমন চেঁচামেচি করছো কেন? আমাদের চৌদ্দপুরুষেই কেউ যে কখনও লেখাপড়া শেখেনি—তাতে কি তাদের দিন চলেনি বলতে চাও? কুমীরছানাদের লেখাপড়ার কি দরকার বলতো? কুমীর গিন্নী তার চোখ ঘুরিয়ে হাতমুখ নেড়ে বললো—আজ আর সেই যুগ নেই—এটা জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ। এযুগে লেখাপড়া না শিখলে কাউকে মুখ দেখানো চলেনা। কুমীরছানারাও মায়ের কথায় সায় দিয়ে পন্ডিতের পাঠশালায় পড়ার আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। ছানাদের উৎসাহ দেখে, কুমীর মশাইও শেষ পর্য্যন্ত গিন্নীর কথায় রাজী হয়ে গেলো।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। পন্ডিতের পাঠশালায় তার পড়ুয়াদের পড়াশুনার হট্টগোলে জমজমাট! শেয়ালপন্ডিতকে দেখলেই যেমনি তার পড়ুয়াদের আতঙ্কে পেটের পিলে চম্‌কে ওঠে, তেমনি শেয়াল পন্ডিতেরই পেটের পিলে চম্‌কে উঠলো—দূরে বিরাটকায় এক কুমীরকে তার পাঠশালায় দিকে আসতে দেখে। কিন্তু কুমীরের পেছন পেছন যখন তার সাত-সাত্‌টি বাচ্চাকেও দেখতে পেলো—তখন তার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলো।



নমস্কার! আসুন, আসুন

কাছে আসতেই পন্ডিত মশাই বলে উঠলো—আসুন! আসুন! এই গরীব পন্ডিতের পাঠশালায় আপনার মতো এমন টাকার কুমীরের পায়ের ধুলো এ আমার পরম সৌভাগ্য? কুমীর মশাই পন্ডিতের অভ্যর্থনায় খুশি হয়ে বললো—আর বলো কেন ভাই—আমার গিন্নীর তাগিদে—ছানাগুলোকে মানুষ করার জন্যে তোমার কাছে রাখতে এলাম। এদের লেখাপড়া

শিখিয়ে মানুষ করে দিও। শেয়ালপন্ডিত কুমীর মশাইকে কথাদিলো তার সাত-সাতটি ছানাকে খাঁটি মানুষ ক'রে দেবে।

ছানাদের জোর পড়াশুনা চলছে। পন্ডিত-মশাই খুব যত্ন নিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে। প্রতি রোব্‌বার কুমীর মশাই নিজে এসে ছেলেদের দেখে যায়। সে ছেলেদেরই শুধু দেখতে আসেনা—পন্ডিত মশাইর জন্য নিয়েও আসে



তুই আমার সাত-সাতটা বাচ্চাকে সাবাড় করে দিয়ে আমাকে নির্বংশ করেছিস?

প্রচুর উপহার! ইলিশমাছের দিনে ইলিশমাছ, রুই মাছ, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, এমনকি কচ্ছপ অবধি। আর আর সব পড়ুয়াদের অভিভাবকেরাও উপহার দেয় বটে,—কিন্তু কুমীরমশাইর মতো এমন প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় উপহার কেউ এনে দেয়নি কোনদিন। এতো সব পেয়েও কিন্তু নধরকান্তি কুমীরছানার লোভ পন্ডিতমশাইকে পাগল করে তুললো। কুমীরের হাতে প্রাণ যাবার ভয়েই শুধু এতকাল কিছু সে করতে সাহস করেনি।

।। দুই ।।

অনেক ভেবে ভেবে শেষে পন্ডিতমশাই মনে মনে একটা ফন্দি এ'টে ফেললো। —তারপরে সুরু হলো প্রতিদিন একটি করে কুমীর ছানাদিয়ে তার সকালের জলযোগ! কুমীরমশাই এসে তার ছানাদের দেখতে চাইলে,—পন্ডিতমশাই হিসেব দিয়ে বলতো—একটি গেছে সিনেমায়, একটি গেছে বেড়াতে, একটি গেছে খেলতে, একটি ঘুমোচ্ছে। আর যে কটি জ্যান্তছিলো তাদেরই কুমীরমশাইকে দেখিয়ে দিতো। এমনি করে দেখতে দেখতে কুমীরমশাইর ছয় ছয়টি ছানাকেই পন্ডিতমশাই সাবাড় করে ফেললো। এখন বাকী শুধু একটি। সেদিন কুমীরমশাই এসে জিজ্ঞাসা করলো, কিহে পন্ডিত! তোমার পড়ুয়াদের মানুষ হতে আর কতো দেরী? পন্ডিতমশাই তার হাত-দুটি কচলিয়ে ঘাড় কাৎ করে বিনয়ের সংগে বললো—স্যার, এরা প্রায় মানুষ হবো হবো হয়ে উঠেছে। আপনি আগামী রোব্‌বার এলেই এদের খাঁটি মানুষ করে আপনাকে দেখাতে পারব। পন্ডিতের কথা শুনে কুমীরমশাইর মনে আনন্দ আর ধরছেনা। এ শুভ সংবাদ গিন্নীকে

দেবার জন্যে তখনই সে রওয়ানা হলো সটান বাড়ীর দিকে।

এদিকে শেয়াল পন্ডিতের গিন্নীর মনে কিন্তু উদ্বেগের আজ সীমা নেই। সে পন্ডিতকে বল্লে,—সবাইকে নিয়ে যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে চলো এখনই আমরা সরে পড়ি। নয় তো কুমীর-মশাই এসে যখন দেখবে যে তার সাত-সাতটা ছানাকেই তুমি সাবাড় করে দিয়েছো, তখন আমাদের সবকটাকেই আস্তো গিলে ফেলবে। পন্ডিতমশাই মুচকি হেসে বললো,—আমরা পালাতে যাব কেন? আমাদের সাতপুরুষের মধ্যে ক্রোধে গর্জন করে উঠে কুমীরমশাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো,—তবে রে পাষন্ড পন্ডিত! তুই আমার সাত-সাতটা বাচ্চাকে সাবাড় করে দিয়ে আমাকে নির্বংশ করেছিস? দাঁড়া, আজ তোর হাড়-মাংস চিবিয়ে এখনই তুলো তুলো করে ছাড়ছি। বলেই, সে খপ্ করে পন্ডিতের গর্দানটা চেপে ধরলো। পন্ডিতমশাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, স্যার, আপনিইতো আপনার ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিতে বলেছিলেন—আমিও কথা দিয়েছিলুম, তাদের খাঁটি মানুষ করে দেবো। আমার কথা



দেখুন,......সাতটি ছানা মানুষ হয়ে চলে গেলো নদীর পাড় ধরে

এই পাঠশালা—আমরা পন্ডিতি করে খাই। সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না—তুমি গিয়ে শুধু ভালো করে মশলা তৈরী করো—আজ কুমীরমশাই অনেক উপহার নিয়ে আসবে যে—বলেই—চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেয়াল-ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পন্ডিতমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

নমস্কার! আসুন, আসুন। পন্ডিতমশাই কুমীরমশাইকে অভ্যর্থনা জানালো। হঠাৎ কুমীরমশাইর নজরে পড়ে গেলো তার সাত-সাতটা ছানার পরিতক্ত হাড়গোড়গুলোর ওপর। মুহূর্ত্তে আমি ঠিকই রেখেছি, স্যার—ঐ দেখুন,—এইমাত্র সাতটি ছানা মানুষ হয়ে চলে গেলো সার বেঁধে নদীর পাড় ধ'রে। বলেই,—পন্ডিতমশাই সাতভাই চাষী যারা সারাদিন মাঠের কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছিলো—তাদেরকেই দেখিয়ে দিলো। কুমীরমশাই তাকিয়ে দেখে বলে উঠলো,—আরে, তাইতো? হঠাৎ পন্ডিতের হাতটা ধরে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটা ঝাকুনী দিয়ে বল্‌লো,—'সাবাস পন্ডিত'! দিন-দিন তোমার পাঠশালার শ্রীবৃদ্ধি হোক। তার-পরে, পন্ডিতের জন্যে নিয়ে আসা সব উপহার

তাকে দিয়ে বল্‌লো, আমাকে মাপ করো ভাই পন্ডিত, আমি খুবই দুঃখিত।

এবার আনন্দে সে ছুটে চল্লো সাতভাই চাষীদের কাছে। চাষী কিন্তু কুমীরমশাইকে দেখেই ভয়ে দৌড়াতে সুরু করে দিলে প্রাণের দায়ে। ছেল্লেরা পালাচ্ছে দেখে, কুমীরমশাইর বিস্ময়ের সীমা নেই। সে চেঁচিয়ে উঠে বললো—ও গিন্নী! গিন্নী! নদী থেকে শিগ্‌গির উঠে এসো—লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ছেলেরা যে পালিয়ে যাচ্ছে—ও গিন্নী! গিন্নী!

প্রচুর উপহার দেখিয়ে পন্ডিতমশাই তার গিন্নীকে বললো,—দেখলে তো গিন্নী? আমরা সাত পুরুষের পন্ডিত আর আমাদের সাত-পুরুষের এই পাঠশালা। শেয়াল গিন্নী পন্ডিতের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বল্‌লো,—তুমি শুধু পন্ডিতই নও, 'মহা-পন্ডিত'—আর এই পাঠশালা হলো 'মহাপন্ডিতের পাঠশালা।'

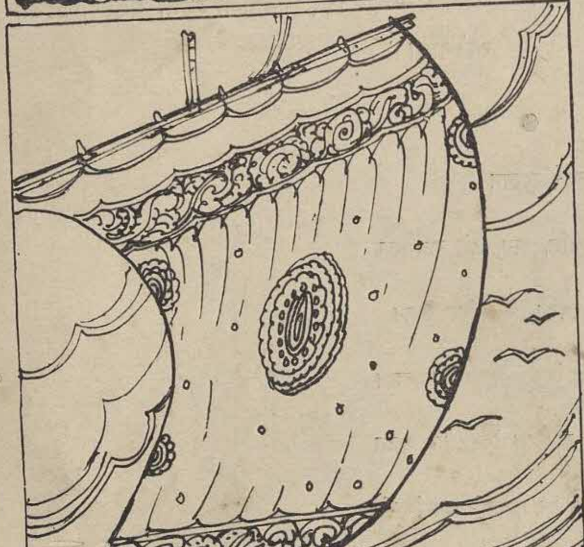
● ● ●

আত্মনিবেদন

আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙ্গালার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য—মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের সুরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জ্জন তটে বাজার কিঙ্কিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—করো আশীর্ব্বাদ,
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্য্যে আনন্দিতমনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

—রবীন্দ্রনাথ

গুর্জরের এক বণিকপুত্র



।। এক ।।

গল্পটি সেকালের, আর ভারি মজার। শোন সকলে।

এক বণিকপুত্র বাণিজ্য করতে বেরুলো, গুর্জর দেশ থেকে। তখনকার কালে বাণিজ্যই ছিল বণিকদের প্রধান কাজ। ভারত ছেড়ে, সমুদ্রের পথে বৃহৎ আকারের নৌকা ভাসিয়ে, তাতে এ-দেশের নানান্ রকমের দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে বিদেশে যাওয়া, আর বিদেশের পণ্য দ্রব্য নিয়ে ফিরে আসা আর অর্থবান হওয়া—এই ছিল সেকালের বাণিজ্য রীতি। এখনো তাই হয়—অবশ্য অন্যভাবে।

বণিকপুত্রের ভাগ্য ভালো। সে এই প্রথমবার বাণিজ্যে বেরিয়েছিল, পাঁচখানা নৌকায় সৌখিন মাল নিয়ে। কিন্তু দূর দূর দেশে গিয়ে বাণিজ্য করতে করতে, তার জিনিস-পত্র বাড়তে বাড়তে দশখানা নৌকায় দাঁড়ালো। তার তখন ভারি আনন্দ। প্রথমবারেই এত লাভ! খুসি হোয়ে সে দেশ-মুখো হয়ে ফিরলো।

বণিকের ছেলেটি একদিন নৌকার উপর গদী ঠেসান দিয়ে আরাম ক'রে বসে আছে। মন তার আনন্দে ভরপুর, কত দামী-দামী মালে এখন তার নৌকা বোঝাই। দেশে ফিরে সে আরো ধন-বান হবে। সে মহা খুসি হয়ে সমুদ্রের উপর অস্তগামী সূর্যের জলক্রীড়া দেখছিল একেবারে অবাক হয়ে। সূর্যাস্ত আগেও দেখেছে। কিন্তু

এমনটি দেখে নি। দেখলে, যেন আকাশের দেবতারা সব সমুদ্রে নেমে এসে সূর্যের সংগে জল খেলা করছে। তারপর খেলতে খেলতে এক-সংগে সমুদ্রের তলায় চট্ ক'রে গেল সব মিলিয়ে। গোটা সমুদ্রটা আর আকাশ-বাতাস সব হয়ে গেল লালে লাল। একটু পরেই অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়েই দেখতে পেল অনেক দূরে, অপূর্ব ঝক্‌মকানি। এক মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলো,—দূরে ও কিসের ঝক্‌মকানি?

ওই দিকেই চল। আর তীরে নৌকা ভিড়োবে না। নৌকাতেই রাত্রি বাস করবো। তারপর রাত পোহালেই দিনের আলোয় ঠিক পথ ধরবো। এখন এই রাত্রির অন্ধকারে যাবে কোথায়? বাবা তো ও দেশে নামতে বারণ করেছিলেন। তীরে না নামলেই হোল।

মনিবের হুকুম আর ইচ্ছা। কাজেই চললো সব নৌকা সেই কুঞ্জর দেশের দিকে। কাছে গেল, কিন্তু নৌকা থেকে নামলে না কেউ।



বণিকপুত্র ধনুকে এক তীর লাগিয়ে দিলে ছুঁড়ে। একটা বকের গায়ে

মাঝি এ সব ঝক্‌মকানি দেখেই চম্‌কে উঠেছিল। বল্‌লে,—ও হল সেই দেশ, যে দেশের ত্রিসীমায় যেতে আপনার বাবা বারণ ক'রে গেছেন। ও-দিকে যাওয়া চলবে না, শেঠ্‌জী। ও হল কুঞ্জর দেশ। অন্যদিকে ঘুরে যাই। এই বলে, মাঝি নৌকার গতি ভিন্ন দিকে ফেরাতে গেল।

দূরের ঝক্‌মকানি আরো চমৎকার দেখা যাচ্ছিল। বণিকপুত্র বললে—রাত্রি বেলা আবার কোন্ অজানা দিকে যাবে? আলো দেখা গেছে,

পরদিন প্রত্যূষ। প্রত্যূষে সূর্যোদয় আরো অপরূপ। যেন সাত ঘোড়ার রথে চড়ে, দিক্-বিদিক্ নানা বিচিত্র আলোয় ভরে দিয়ে সূর্যদেব দৃশ্যমান হলেন। অতি অপূর্ব মনোহারি শোভা।

দিনের আলোতে কুঞ্জর দেশের শোভা ভারি অপূর্ব। বণিকপুত্র তা দেখে বলছে,—ও হে, এ তো ভারি সুন্দর দেশ। চল, আমরা দেশটা শুধু উপরি-উপরি দেখে আসি। তাতে আর ভয় কি? কারো সংগে না মিশলেই হল।

কোথাও না গেলেই হল। না গেলে, না মিশলে বিপদ হবে কেন? কিন্তু তার পিতার মৃত্যু-কালীন উপদেশ ছিল,—কুঞ্জর দেশে কদাপি নামবে না। নামলেই বিপদ। সে বিপদ কি ক'রে যে এসে পড়বে, তা তুমি বুঝতেই পারবে না। আর, একবার এসে পড়লে, তা থেকে পরিত্রাণ নেই। বুঝলে, মনে রেখো এই কথা।

কিন্তু, পিতার মৃত্যুকালীন পরামর্শ মতো কাজ না ক'রে, বণিকপুত্র নৌকাগুলো সব নিয়ে এক নদীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর সেইখানেই তাকে নামতে হবে। এক মাঝি চল্‌লো সংগে সংগে। দেখলে, নদীতে জেলেরা সব মাছ ধরছে। তার পাশেই ধোপারা সব দলে দলে কাপড় কাচ্‌ছে। আর সেখানের আকাশে অসংখ্য সাদা সাদা বক চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বণিকপুত্র দেখতে লাগলো। বারে, বেশ তো বকের ঝাঁক। একটাকে মারা যাক্। এই বলে বণিকপুত্র ধনুকে এক তীর লাগিয়ে দিলে ছুঁড়ে। একটা বকের গায়ে তীর লাগলো—বকটা পড়ে গেল জলে। জলে পড়েই ভেসে গেল। এক ধোপা কাপড় কাচতে কাচতে এই ঘটনাটি দেখলে। তারপর সে হঠাৎ অমনি কাপড় কাচা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যাক্, এ আর এমন কি!

বণিকপুত্র মাঝিটাকে সংগে নিয়ে তীরে নামলো। দেখলে, চমৎকার এক সরাই। সরাইয়ে গিয়ে বসবামাত্রই একজন সৌখীন নাপিত এসে মোলায়েম সুরে বললে,—শেঠজী, আপনার দাড়ি-টাড়ি খুব বেড়েছে দেখ্‌ছি। কামিয়ে দি?

বণিকপুত্র দাড়িতে হাত বুলোলো। দেখলে, দাড়িটা সত্যই বড় হয়ে গেছে। সে তার পিতার উপদেশ ভুলেই গেছে। বললে,—বেশ, দাও কামিয়ে। কি নেবে?

নাপিত বললে,—কি নোব? দেবেন আমায় খুসি ক'রে—যাতে আমি খুসি হই।

দাড়ি কামানো হল। বণিকপুত্র একটি চক্‌চকে টাকা নাপিতকে দিতে গেল।

নাপিত বললে,—টাকা? টাকা আমি নোব না। আমি খুসি হতে চাই। কথা ছিল,—দেবেন আমায় খুসি করে। টাকাতে আমি খুসি হই না।

—তবে?

—আপনার দশ নৌকা মালের দু' নৌকা দিলে আমি খুসি হই।

—তোমার দেখ্‌ছি মাথা খারাপ। যাও। ভাগো। কিছুই পাবে না।

তারপর ওই সরাইটার উপরের বড় একটা কামরায় গিয়ে উঠলো। ঠিক হল একদিন থাকবে। বণিকপুত্রের মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। নাপিতটা বলে কিনা—দু' নৌকা মাল দিলে আমি খুসি হই। লোকটা কি পাগল? বাবা বারণ করেছিলেন বটে এখানের ত্রিসীমায় না আসতে। না এলেই হোতো।

এই রকম ভাবছে বণিকপুত্র, এমন সময় একটি ভদ্রগোছের স্ত্রীলোক এসে হাজির। এসেই আদরের সুরে বলছে,—বাবা, ভালো আছ? বেশ, বেশ। তুমি এসে গেছ—এতে আমি খুসি।

বণিকপুত্র এর কথা শুনে অবাক। এ আবার কে? বলছে, আমতা আমতা করে। আপনাকে তো আমি চিনি না।

—আমি তোমার মা। তুমি চেন না, আমি কিন্তু চিনি।

—সে কি রকম?

—তোমার বাবা যেখানে যেতেন, একটি ক'রে বিয়ে করতেন। এখানে তিনি এসেছিলেন, আমায় বিয়ে ক'রে গেছেন।

—তা তো আমায় কিছু বলেন নি।

—বলেন কখনো! সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে যে! সেই জন্যই লুকিয়ে রেখেছিলেন কথাটি। কিন্তু কথা কি কখনো লুকানো থাকে, বাবা। তুমিই বল। তোমার সব সম্পত্তি আমি চাইছি না, অন্ততঃ অর্দ্ধেক জিনিস আমার প্রাপ্য। আমায় তা দিতে হবে তোমায়।

—দিতে হবে? অমনি দিলেই হল? কিছু দোব না। তুমি কেউ নও। যাও। সরে পড় এখান থেকে।

স্ত্রীলোকটি কট্‌মট্ ক'রে চাইলে। তারপর চলে গেল।

।। দুই ।।

বণিকপুত্রের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। দেখ্‌ছি, বাবার উপদেশ মতো এখানে না নামাই উচিত ছিল। কি ভয়ংকর দেশ! লোক-জন কি ভয়ংকর।

সংগের মাঝিটির সাধাসাধিতে স্নান করলে



এক পেয়াদা—তিন-তিনখানা পরোয়ানা নিয়ে হাজির সেখানে। পরোয়ানা তিনখানা দিলে বণিক পুত্রের হাতে

বণিক পুত্র। শেষে কিছু খেয়েও নিলে। তারপর, তখুনি এ-জায়গা থেকে নিজের নৌকায় পালাবার মতলব করছে, এমন সময় মাথায় পাগড়ী আঁটা, বুকে তক্‌মা লাগানো এক পেয়াদা—তিন-তিনখানা পরোয়ানা নিয়ে হাজির সেখানে। পরোয়ানা তিনখানা দিলে বণিক পুত্রের হাতে। তাতে লেখা আছে তিনটি নালিশের কথা।

প্রথম নালিশ ধোপার। ধোপা বল্‌ছে,—আমার বাবা বকের রূপ ধরে আকাশে উড়তে উড়তে আমায় কাপড়-কাচার কায়দা বাত্‌লে দিচ্ছিলেন। তাঁকে ওই লোকটি হঠাৎ তীর বিঁধে মেরে ফেলাতে, আমার কাপড়-কাচার কায়দা শেখা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি বেকার। এবার আমি খাই কি? আমার তিন নৌকা মাল চাই। আমার নালিশের বিচার হোক্‌।

নাপিত বল্‌ছে,—আমায় খুসি করে দেবেন বলেছিলেন লোকটি। আমি দু' নৌকা মাল পেলে খুসি হই। নইলে খুসি নই। আমার নালিশ শোনা হোক্‌।

স্ত্রীলোকটি বল্‌ছে,—আমি এর মা। এই ছেলেটির বাবা আমায় বিয়ে করে রেখে গেছেন। এই ছেলেটির অর্দ্ধেক মাল আমার প্রাপ্য। তাই দিতে আজ্ঞা হোক্‌।

সর্বনাশ! তাহলে দশ নৌকা মালই তো গেল। এ কি দেশ রে বাবা! দেখ্‌ছি, আমার বাবার কথাই ঠিক। এ দেশে আসাই ভুল—মহাভুল। সর্বনাশ! এখন কি হয়!

তখন মনে পড়ে গেল, তার বাবার আর একটি কথা। তিনি বলেছিলেন,—যদি ও-দেশে পাকে-চক্রে গিয়েই পড়, বিপদে পড়বেই। বিপদে পড়লেই, আমার এক উকীল-বন্ধু আছেন সেখানে—তাঁর কাছে আগে যাবে। গিয়ে পরামর্শ চাইবে। তিনিই তোমার একমাত্র পরামর্শদাতা। বুঝলে? ভুলো না।

এবার চললো বাবার উকীল-বন্ধুর খোঁজে। কোথায় তিনি থাকেন? অনেক খুঁজে-পেতে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উকীল মশায় মক্কেলদের মকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখছেন।

।। তিন ।।

বণিক পুত্র গিয়ে নমস্কার করলো।

—কে তুমি?

—আমি গুর্জর দেশের অমুক বণিকের ছেলে।

—অ্যাঃ, তাঁর ছেলে? তুমি এখানে এলে কি ক'রে? তোমার বাবা বারণ করেন নি আসতে?

—বারণ করেছিলেন। তাঁর উপদেশ না শুনে, এখানে এসেই তো বিপদে পড়ে গেছি। ভয়ানক বিপদ। তাই এলুম আপনার কাছে। আপনি বাঁচান।

বণিক পুত্র উকীলকে সব কথা বললেন। উকীল শুনে ভাবলেন, তারপর বললেন,—ওহো, বুঝেছি—বুঝেছি। আচ্ছা ভাবনা নেই। খালাস ক'রে দোব। এক কাজ কর। আপাততঃ গোটা পঞ্চাশ টাকা রেখে যাও আমার কাছে—তদ্বিরের জন্য। আর এক কাজ কর। খুব চক্‌মকে আর মূল্যবান এক গাছা হার খরিদ ক'রে নিয়ে নিজের পকেটে রাখবে। সেই হার পকেটে নিয়ে, রাজার কাছারীতে যাবে। গিয়ে আমার কাছে বসবে—কোন কথা বলবে না। আমি যা বলবো, তাই করবে। এখন তাহলে যাও। কাল বেলা এক প্রহরের পর কাছারীতে হাজির হবে। হ্যাঁ, আর এক কথা। তোমার নৌকাগুলোকে যাবার জন্যে তৈরী থাকতে বলে রাখবে। বুঝলে? বুঝলে সব কথা?

পরের দিন রাজকাছারীতে রাজার বিচার-সভা। প্রথমেই সেই স্ত্রীলোকটি হাজির। বণিক পুত্রের উকীল বললে,—স্ত্রীলোকটির সব কথাই স্বীকার্য। ওকে বিবাহ করেছিলেন ছেলেটির পিতা, সে কথা খুব সত্যি। ওর দাবীও খুব ঠিক।

রাজা বললেন,—আপনি স্বীকার করছেন তা হলে যে, স্ত্রীলোকটির দাবী ঠিক। তাহলে আপনার মক্কেলকে দিয়ে দিতে বলুন ওকে তার অর্দ্ধেক নৌকা।

কিন্তু একটি কথা রাজা মশাই—উকীল বললে এই কথা। একটি জরুরি কথা এই যে, ছেলেটির বাবা মারা যাওয়াতে তার অন্য সব স্ত্রী সবাই গেছেন সহমরণে—কেউ বা সংগে সংগে, কেউ বা কিছু পরে পরে। তাঁর অনেক বিবাহ—অনেক স্ত্রী। এখন তাহলে এই স্ত্রীও যান সহমরণে। এখনি তার ব্যবস্থা করুন মহারাজ। এ-দিকে অর্দ্ধেক সংখ্যক নৌকাও এই ছেলে দিয়ে দিক্‌ ওকে। কিন্তু আর এক কথা। উনি সহ-মরণে গেলেই, ওর সম্পত্তি সব তো এই ছেলেই পাবে—আইন মতো। তবে আর লোকসান কিসের? ওকে তাহলে এখনি সহমরণে পাঠাবার ব্যবস্থা হোক্‌।

স্ত্রীলোকটি উকীলের এই কথা শুনেই চম্‌কে গেল। চুপ ক'রে থেকে, "বাইরে থেকে আস্‌ছি" বলে চট্‌ করে বেরিয়ে গেল। সেই যে

বেরিয়ে গেল, আর ফিরলো না। খোঁজ্ খোঁজ্, কোথাও নেই। কেউ খুঁজে পেলে না। তখন তার মোকদ্দমা খারিজ হয়ে গেল। বণিক পুত্রের হোল জয়।

কিন্তু এখনো যে দু-দুটো নালিশ বাকি। কি হবে, কে জানে? দ্বিতীয় নালিশ পেশ হল। ধোপা করজোড়ে হাজির। উকীল বলছেন, এই ধোপার কথা স্বীকার না ক'রে নিয়ে উপায় নেই। এ কথা সত্যি যে, বণিক পুত্র ওর বকরূপী পিতাকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে।

রাজা বললেন,—আপনি স্বীকার করলেন তো? তাহলে বণিক পুত্রকে দিতে বলুন—দু' নৌকা মাল।

—কিন্তু একটি কথা আছে এর ভেতর রাজা-মশাই। সে কথাটি এই। বণিক পুত্রের নৌকা-গুলিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছিল নদীর মধ্যে, এর মৎসরূপী পিতা। বকটা এর সেই মৎসরূপী পিতাকে গ্রাস করতে আসাতেই তো ধোপার বকরূপী পিতাকে এ তীর মারতে বাধ্য হল। হঠাৎ আক্রমণকারীকে শাস্তি দেওয়া আইনতঃ যে অন্যায় নয় সে কথা তো স্বীকার করেন?

—হাঁ, হাঁ, সে কথা স্বীকার্য, রাজা বললে এই কথা।

উকীল বললে,—তবে? অপরাধ কোথায় এর বলুন। এ তো একেবারেই নির্দোষ। কেমন, নয় কি?

রাজা ভেবে বললে,—হাঁ, ঠিক। এতে ওর অপরাধ কি?

যাক্। এ নালিশও গেল ফেঁসে। ধোপা মুখটি চুন করে বেরিয়ে গেল।

উকীলমশাই এবার সবিনয়ে বললে,—আপনারা দেখছি সবাই কিছু পরিশ্রান্ত। এবার তাহলে জলযোগ সেরে আসুন। তারপরে আবার বিচার-সভা বসবে। এখন কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন তো?

রাজা বললে,—হাঁ, হাঁ, সেই ঠিক। জলযোগ সারা হোক্ তাহলে।

।। চার ।।

বিচারসভা অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রইলো। এর ভেতর এক ব্যাপার ঘটে গেল। রাজার ছোট্ট একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে এ সময় পরিচারিকা এলো রাজসভায় বেড়াতে। এটা ছিল উকীলের তদ্বির। এজন্যে পরিচারিকাকে দেওয়া হয়েছে, বণিক পুত্রের উকীলকে দেওয়া সেই পঞ্চাশ টাকা। পরিচারিকা রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। রাজ-পুত্রটি দেখতে খুব সুন্দর, একেবারে হাসি-খুসি আনন্দ মূর্তি। ঘুরতে ঘুরতে উকীলের কাছে আসতেই, উকীল অমনি ইসারা করে দিল বণিক পুত্রকে। বণিক পুত্র তখনি পকেট থেকে মূল্যবান চক্‌মকে হারছড়াটি বার করে রাজপুত্রের গলায় পরিয়ে দিল। হার গলায় পেয়ে, ছেলেটির কি উল্লাস, কি হাসি, কি আনন্দ।

রাজামশায় ফিরে এসে দেখলে, তার ছেলের গলায় এক ছড়া সুন্দর হার চক্ চক্ করছে। জিজ্ঞাসা করলে,—এ কি? এ কোথায় পেলে?

উকীল বললে,—এই বিদেশী বণিক পুত্র দিয়েছে উপহার। এতে আর দোষ কি। রাজার ছেলেকে উপহার তো দিতেই হয়। ছেলেটির কত আনন্দ দেখুন। ও কত খুসি হয়েছে দেখুন।

রাজা হাসতে হাসতে বলছেন—তা তো দেখ্‌ছি।

—রাজা মশাই, আপনি খুসি হয়েছেন তো, ছেলেমানুষের আনন্দ দেখে?

—খুসি? তা ওর আনন্দ দেখে খুসি বৈকি।

উকীল জিজ্ঞাসা করছে,—মন্ত্রী মশাই, আপনিও তো খুসি?

মন্ত্রী হাসতে হাসতে বললে,—অবশ্য, অবশ্য। ছেলের আনন্দে কে না খুসি!

কাছারী-সভার অন্য সকলকেও উকীলমশাই জিজ্ঞাসা করছে,—আপনারাও সব খুসি?

সবাই হাসতে হাসতে বললে,—অবশ্য, আমরাও খুসি। সেখানে যত লোক ছিল সকলেরই সেই কথা। সবাই খুসি। বাদী

নাপিত দাঁড়িয়েছিল নালিশ নিয়ে। ইসারাতে সে জানালে,—সেও খুসি।

উকীল বললে,—বা, - বা, বেশ কথা—বেশ কথা। তবে আর নালিশ কিসের? সবাই যখন খুসি, বাদী নাপিতও যখন খুসি, তখন তো শেষ হয়ে গেল মামলা। কেমন রাজা মশাই, নাপিত-ভায়াও যখন খুসি হয়েছে, তখন আর কিসের মামলা? বলুন আপনি। নাপিতের তো খুসি হবারই কথা ছিল। এখন তাহলে বণিক পুত্রর জয়। জয়, বণিক পুত্রের জয়। মামলা হয়ে গেল শেষ।

উকীল বলছে তখন বণিক পুত্রকে,—তুমি এবার পালাও বাবাজি চট্ করে এখান থেকে। আর কোন কথা নয়।

বণিক পুত্র এই কথা শুনে, তার মাঝিটিকে সংগে নিয়ে, তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের নৌকায় উঠে পড়লো। এবং নৌকা দিলে ভাসিয়ে।

• • • • • • • • •

একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।' বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালীর সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থ ভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্ত্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ কাল জেনেছি।

আরও একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনাপাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি ঝর্ণার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক—ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী', তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্ব্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র; প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠ্ছে 'চুপ চুপ'; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্ম্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।—**আশ্রমের শিক্ষা**

শিশু পুষ্প আঁখিমেলি হেরিল এ ধরা—
শ্যামল, সুন্দর, স্নিগ্ধ, গীত গন্ধ ভরা।
বিশ্বজগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
আমি যতদিন থাকি তুমিও থাকিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ



সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস

ইংরাজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে, কিন্তু শেষে ব্যবসা করার চেয়ে এদেশে রাজ্য-করাটাই বেশী লাভজনক বলে মনে হলো। তারা কেল্লা গড়লো ও সৈন্য রাখলো। পলাশীর মাঠে একটি ছোটখাট লড়াই করে কৌশলে বাংলাদেশের রাজা হয়ে বসলো। তারপর একশো বছরের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহেরও সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁর দশলাখ টাকা পেনসেনের ব্যবস্থা করে দিল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপণীর একধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গতারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদন্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদন্ডরূপে।।

মিথ্যাকথা, চালাকি ও গায়ের জোরে ইংরাজরা যা খুশি তাই করতে লাগলো। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের বিধবা রাণী ঝিন্দনের সোনাদানা লুট করলে, রাজকুমার দলীপ সিংকে খৃষ্টান করে প্যারিসে পাঠিয়ে দিলে; শিবজীর বংশধর প্রতাপ সিংহকে বারাণসীতে বন্দী করে রাখলো; নাগপুর, ঝাঁসী, তাঞ্জোর দখল করে বসলো। পেশোয়াকে কানপুর থেকে তাড়ালো। অযোধ্যার বেগমদের সর্বস্ব লুট করলো। সারা দেশে চলতে লাগলো জুলুমের রাজ্য।



আপনি ইংরাজদের তাড়িয়ে দিন, আমরা লড়বো

সে জুলুম ভাল না লাগলেও কিছু বলার সাহস কারও ছিল না, ইংরাজদের লোকবল ছিল সবার বেশী। লোকবল মানে সিপাহী। তখনকার দিনে চাকরি বলতে সিপাহীর কাজই ছিল এক-মাত্র। মাহিনা মাসিক সাত টাকা। আর ঘোড়-সওয়ার হলে মাসিক সাতাশ টাকা, তবে নিজের

ঘোড়া চাই। তবে এখানকার রাজাদের কাছে কাজ করলে সিপাহীর পদোন্নতি হবার সম্ভাবনা থাকতো, কিন্তু ইংরেজদের চাকরিতে তা ছিল না। তবু জীবিকার জন্য লোকে কাজ করতো।

এই সিপাহীদের মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা দিল নতুন টোটা নিয়ে। টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হয়। টোটায় চর্বি লাগানো থাকে—গরুর আর শুয়োরের চর্বি। বহরমপুরের সিপাহীরা এই টোটা দাঁতে কাটতে আপত্তি জানালো—জাত যাবে! সেনাপতি মিচেল তাদের নিয়ে এলো ব্যারাকপুরে। দুজন সিপাহীর সেখানে চৌদ্দ বছর জেল হলো। সেই অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো মঙ্গল পাঁড়ে। সে লেফ্‌টেন্যান্ট বগকে গুলি করলো। সেখ্ পল্‌টু নামে একজন মুসলমান পাঁড়েকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। বিচারে পাঁড়ের ফাঁসী হয়ে গেল। আর তারই সঙ্গে ফাঁসী হলো ঈশ্বর পাঁড়ের। সে দাঁড়িয়েছিল, কোন বাধা দেয়নি, এই তার অপরাধ।

তারপর লখনৌ, মীরাট ও কানপুর। লখনৌ-তে পঞ্চাশ জন সিপাহীর জেল হলো, বাকী সবার চাকরি গেল। মীরাটে জেল হলো পচাঁশি জনের। তারপর সিপাহীরা সাহেবদের বাড়ী চড়াও করলো। সেই দুর্যোগ থেকে সাহেবদের স্ত্রীপুত্রদের রক্ষা করলো জমাদার গুলাব সিং, বখ্‌তিয়ার চৌকিদার, আসগর আলি প্রভৃতি।

মীরাটের সিপাহীরা দিল্লীতে গেল। বাদশাহকে বললে—আপনি ইংরাজদের তাড়িয়ে দিন, আমরা লড়বো।

বাদশাহ বললেনঃ বুড়ো হয়ে গেছি, আর শক্তি নেই।

সিপাহীরা তখন দিল্লীতে যত সাহেব ছিল সব মেরে শেষ করে দিল। দিল্লীতে অরাজকতা দেখা দিল। হৈচৈ গোলমালে মাসখানেক কাটলো। তার পর আম্বালা থেকে ইংরাজ সেনা এসে পড়লো। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কর্ণাল প্রভৃতির রাজা ও নবাবরা ইংরাজদের টাকা ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলো।

বাদশাহের সেনাপতি বখ্‌ৎ খাঁ দু'সপ্তাহ যুদ্ধ চালালেন। ইংরাজের কামানের গোলায় দিল্লীর দেয়াল দু-জায়গা ভেঙে পড়লো। ইংরাজ সেনা দিল্লীতে ঢুকে পড়লো। বাদশাহ পালিয়ে গিয়েছিলেন হুমায়ুনের কবরে। বাদশাহের আত্মীয় মির্জা এলাহি বক্‌স ও মৌলভি রাজীব আলি বাদশাকে ধরিয়ে দিলেন। তিনজন বাদশা-জাদা ধরা পড়লো—মির্জা মোসল, মির্জা খিজির, সুলতান ও মির্জা আবু বকর। সেনাপতি



কাণপুরের সিপাহী যুদ্ধের একটি দৃশ্য

হাডসন রাজকুমারদের পথের উপর গুলি করে মারলো। তিনদিন তাদের মৃতদেহ পড়ে রইল রাস্তাতেই। রাজপরিবারের আরো একুশ জন রাজকুমারকে ধরে ইংরাজরা ফাঁসী দিল। তারপর সেনাপতি মেটকাফ দিল্লীতে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালালো। তারপর বাদশাহকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিল বর্মায়।

বেনারসে গোলমাল দেখা দিল, কর্ণেল নীল গেল বেনারসে। নীল বেনারসে যাকে পেল তাকেই গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল। ছোট ছেলেরা পথে খেলা করছে দেখলেও নীল বলে—এদেরকেও দয়া দেখানো চলবে না।

দিল্লীর খবর এলো কানপুরে। ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেলেন, নীল সাহেবকে ডেকে বললেন—আপনাকে ধনাগার রক্ষা করতে হবে।

ধুন্ধুপন্থ নানা পেশোয়া বাজীরাওয়ের পোষ্য-পুত্র। ইংরাজের কাছ থেকে পেনসেন পেতেন। ইংরাজের সঙ্গে মেলামেশা ছিল। কিন্তু মাত্র দুশো সৈন্য নিয়ে নানাসাহেব কি আর করবেন? সিপাহীরা ধনাগার লুট করলো, জেলখানা ভাঙলো, অস্ত্রাগার লুট করলো। তারপর ধরলো নানাসাহেবকে বললো—আপনি আমাদের নায়ক হোন, নাহলে আপনাকে খুন করবো।

বাধ্য হয়ে নানা সাহেব সিপাহীদের নেতা হলেন। তাঁর সহায় হলেন আজিমুল্লা খাঁ। আজিমুল্লা গরীবের ছেলে, কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে প্রথমে হন শিক্ষক, তারপর সেনাপতি স্কট সাহেবের মুন্সী, তারপর উকিল। নানাসাহেবের পেনসেনের আবেদন নিয়ে তিনি বিলাতেও গিয়েছিলেন। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানতেন।

সিপাহীরা ইংরাজদের ঘিরে ফেললো। চার ফুট উঁচু একটী পাঁচিলের আড়ালে ইংরাজরা আশ্রয় নিয়েছিল। সাতদিনে সিপাহীদের গুলিতে আড়াই শো জন মারা পড়লো। নানা-সাহেব জানালেন—ইংরাজরা নির্ভয়ে কানপুর ছেড়ে চলে যেতে পারে, তিনি তাদের নৌকা দেবেন।

সতীচৌরা ঘাটে সাড়ে চারশো জন সাহেব মেম ছেলেমেয়ে নৌকায় উঠলো। তীরে দাঁড়িয়ে ছিল গোলন্দাজ বাহিনী। সাহেবদের নৌকা ছাড়তেই তারা কামান দাগতে সুরু করলো। অনেক নৌকা ডুবে গেল। খবর পেয়েই নানা-সাহেব হুকুম দিলেন—হত্যাকান্ড বন্ধ কর!

জল থেকে একশো পঁচিশ জনকে উদ্ধার করা



সিপাহী যুদ্ধের একটি দৃশ্য—ইংরাজ ও সিপাহীগণ

হলো। তাদের রাখা হলো বিবিঘর নামে একখানি বাড়ীতে।

নানাসাহেব এবার নিজেকে কানপুরের পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন।

এদিকে বেনারসের অত্যাচারের খবর এলো এলাহাবাদে। সিপাহীরা এখানকার জেলখানা ভাঙলো, সাহেবদের বাড়ীতে আগুন দিল, ধনাগার লুট করলো।

বেনারস থেকে সেনাপতি নীল এলো এলাহাবাদে। সুরু হলো লুটতরাজ, ঘরে আগুন লাগানো আর ফাঁসী দেওয়া। কদিনের মধ্যে নীল এতো লোককে ফাঁসী দিল যে তাদের শব-গুলি গঙ্গায় ফেলতে আটখানা ঠেলাগাড়ী লেগে-ছিল তিনমাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

এলাহাবাদ থেকে হ্যাভ্‌লক ও রেন্ড রওনা হলেন কানপুর। নীল হুকুম দিলেন যাবার পথে দুপাশে যত গ্রাম দেখবে আগুন লাগাবে, যাকে পাবে ফাঁসী দেবে।

হুকুমমত পথের দুপাশের গাছের ডালে শত শত মানুষকে লট্‌কে দিয়ে রেন্ড এগিয়ে চললো। ফতেপুরে জওলাপ্রসাদ ও টিকা সিংহ তাদের বাধা দিল, কিন্তু হেরে গেল। ফতেপুর লুট করে রেন্ড অগ্রসর হলো। বলরাও এবার তাদের রুখলো। যুদ্ধে রেন্ড নিহত হলো। কিন্তু কামানের জোরে ইংরাজরা এগিয়ে চললো। নানাসাহেব পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। কিন্তু যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গেলেন। সেই সময় আজিমুল্লার নির্দেশে বিবিঘরে যেসব মেমসাহেব ও শিশু ছিল তাদের হত্যা করা হলো।

ইংরাজরা কানপুর দখল করলো। নীল এলো কানপুরে। নির্বিচারে দশ হাজার লোককে খুন করলো। তার উপর হুকুম দিল— যার ফাঁসী হবে, তাকে আগে বিবিঘরের রক্ত চেটে সাফ করতে হবে, নাহলে চাবুক মারা হবে।

অনেকেই চাবুক খেয়েছিল, কিন্তু ফাঁসী যাবার সময় কোন চঞ্চলতা দেখায়নি।

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো লখনৌ, অযোধ্যা, সুলতানপুর, বাইরেচি, গন্ডা প্রভৃতি স্থানে।



ছদ্মবেশে তাঁতিয়া টোপি

স্যার হেনরি লরেন্স এলেন রুখতে, কিন্তু সিপাহীদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। শেষে তিনি নিহত হলেন। সেনাপতি হ্যাভ্‌লক ছুটে এলো। কিন্তু বসিরথগঞ্জের যুদ্ধে হেরে পালালো। শেষে হ্যাভ্‌লক, আউটরাম, নীল তিনজনে এলো। নীল মারা গেল, আউটরাম আহত হলো, আর মারা গেল পঁয়তাল্লিশ জন অফিসার। যেসব ইংরাজরা এখানকার রেসি-ডেন্সিতে আটক পড়েছিল তাদের উদ্ধার করে রাত্রের অন্ধকারে ইংরাজরা লখনৌ ছেড়ে পালালো। হ্যাভ্‌লক পথে আমাশয় রোগে মারা গেল।

তাঁতিয়া টোপি এবার কানপুর উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। তাঁতিয়ার আসল নাম রামচন্দ্র পান্ডুরঙ্গ, মারাঠী ব্রাহ্মণ, নানাসাহেবের সহকারী। পান্ডু নদীর তীরে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার উইলসন নিহত হলেন। ইংরাজরা পালিয়ে গেল।

স্যার কলিন ক্যাম্‌প্‌বেল এলেন। দশদিন পরে আরেক যুদ্ধে সিপাহীরা হটে গেল।

নানাসাহেব ও তাঁতিয়া পিছিয়ে গেলেন। ইংরাজরা নানা সাহেবের মন্দিরটীকে ভেঙে সমভূমি করে দিল। নবব্‌ই লক্ষ টাকা ল্‌ট করলো।

পাটনাতেও গোলযোগ দেখা দিল। জগদীশপ্‌রের কুমার সিংহ সিপাহীদের নেতৃত্ব নিলেন। সিপাহীরা জেলখানা ভাঙলো, ধনাগার ল্‌ট ভাসিয়ে দিলেন। তারপর খাটিয়ায় শ্‌য়ে শ্‌য়েই তিনি সিপাহীদের পরিচালনা করে জগদীশপ্‌র দখল করলেন। ক্যাপটেন লে-গ্রান্ড ছ্‌টে এলেন, কিন্তু য্‌দ্ধে নিহত হলেন। কুমার সিংহের বয়স তখন সত্তর বছর। অত্যধিক রক্তপাতে তিনি মারা গেলেন।



লর্ড ক্যানিংএর সদাশয়তা

করলো। ক্যাপটেন ডানবার ছ্‌টে এলেন, কিন্তু হেরে পালিয়ে গেলেন। ভিনসেন্ট এলেন, কামানের জোরে জগদীশপ্‌র দখল করলেন। কুমার সিংহ চলে গেলেন সাসারামে। তাঁর আক্রমণে ইংরাজরা বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠলো।

একদিন গঙ্গার তীরে হঠাৎ একটা গ্‌লি লেগে কুমার সিংহের একখানি হাত আহত হলো। কুমার সিংহ তখনই হাতখানি কেটে ফেলে গঙ্গায়

কুমার সিংহের ভাই অমর সিংহ ও প্‌ত্র ঋতভজন সিংহ জগদীশপ্‌র রক্ষা করলেন।

তারপর দিগৌলি, ছোটনাগপ্‌র, রাঁচি, চাইবাসা, প্‌র্‌লিয়া—সর্বত্র বিদ্রোহ, জেলভাঙা, ও ধনাগার ল্‌ঠ। পরে ইংরাজদের অত্যাচার—ল্‌ঠ, গৃহদাহ ও ফাঁসী।

এবার বিদ্রোহ দেখা দিল ঝাঁসিতে। তারা জেল ভাঙলো, দ্‌র্গ দখল করলো, তারপর রাজ-

বাড়ী ঘেরাও করে বসলো—তিনলাখ টাকা দাও, নাহলে কামান দেগে প্রাসাদ উড়িয়ে দেব।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ নামেই রাণী ছিলেন, ইংরাজরা তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে মাসিক পেনসেন দিতেন। লক্ষ্মীবাঈ সিপাহীদের শান্ত করার জন্য লক্ষ টাকার গহনা তাদের হাতে তুলে দিলেন। টাকা নিয়ে সিপাহীরা দিল্লী চলে গেল।

এই সময় ঝাঁসী দখল করতে চাইল, মৃত রাজার এক আত্মীয় সদাশিব রাও। দুপাশ থেকে দুই প্রতিবেশী ওরছার নথে খাঁ ও দাঁতিয়ার রাজা ঝাঁসী আক্রমণ করলো। কিন্তু তিনজনেই হেরে গেল। তখন তারা ইংরাজদের জানালো রাণী বিদ্রোহ করেছে। স্যার হিউ রোজ ঝাঁসী অবরোধ করলো। এক বিশ্বাসঘাতক নগরের দরজা খুলে দিল। রাণী পোষ্যপুত্র দামোদর রাওকে নিয়ে নগর ত্যাগ করলেন।

রাণী গোয়ালিয়র দখল করলেন। নানাসাহেবকে পেশোয়া বলে ঘোষনা করা হলো। হিউ রোজ এলো গোয়ালিয়ার। সারাদিন লড়াই করে রাণী আহত হলেন। এক সাধুর কুটীরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গোয়ালিয়র থেকে তাঁতিয়া ও নানাসাহেব পালিয়ে গেলেন।



মহারাণীর ঘোষণা

পাঞ্জাবেও বিদ্রোহ দেখা দিল। বওশেরায়

কয়েকজন সিপাহীকে ধরে ইংরাজরা ফাঁসী দিল, বাকী সবাইকে উড়িয়ে দিল কামান দেগে। জলন্ধরে সিপাহীরা লুধিয়ানার জেল ভাঙলো, ইংরাজদের বাড়ীঘর লুঠ করলো। ঝিলামের সিপাহীরা কাশ্মীর চলে গেল। কাশ্মীরের রাজা তাদের ধরে ইংরাজের হাতে দিলে, ইংরাজরা সবাইকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিলে। শিয়ালকোটের সিপাহীরা নিহত হলো নিকলসনের হাতে। নিঞ্জামীরে সেনাপতি ফ্রেডারিক ফাঁসীর দড়ি না পেয়ে ২৩৭ জনকে গুলি করে মারলো। একখানি ছোট ঘরে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেল পঁয়তাল্লিশ জন।

পেশোয়ারে ন'শো সিপাহীকে মেরে শেষ করা হলো।

বেরিলি, আলিগড়, ইটোয়া, মথুরা, ও ভারতপুরে সিপাহীরা জেল ভাঙলো, ধনাগার লুঠ করলো। খান বাহাদুর খাঁ রোহিল খন্ডের নবাব হলেন। ফতেগড়ে তফকুজল হোসেন নবাব হলেন। ইংরাজরা বিদ্রোহ দমন করতে উঠে পড়ে লাগলো। নির্বিচারে ফাঁসী, লুঠ ও গৃহদাহ চলতে লাগলো। নেপালের রাজা ইংরাজদের ১৩০০০ গুর্খা সেনা দিয়ে সাহায্য করলেন। গুর্খাদের সঙ্গে লড়াই করে বিদ্রোহী নেতা বেণীমাধো, যোগরাজ সিংহ ও হরদেও সিংহ নিহত হলেন। জোয়ালাপ্রসাদ, খান বাহাদুর খাঁ ও নবাব মামুদ খাঁকে নেপালীরা বন্দী করে ইংরাজের হাতে দিল, ইংরাজরা তাঁদের ফাঁসী দিল। বলসাহেব আজিমুল্লা, রাজা দেবীপ্রসাদ, হবগুলাব, ও গুলাব সিংহ জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন অসুখে ভুগে তারা মারা গেলেন।

ইংরাজরা নানাসাহেবকে বললো—আত্মসমর্পণ করো।

নানাসাহেব বললেন—আমি একাই লড়বো।

রাণী ভিক্‌টোরিয়া ইংলন্ডে ঘোষণা করলেন—আমি ভারতসাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করলাম।

অযোধ্যার বেগম হজরৎ মহল পাল্টা ঘোষণা করলেন—ভারতরাজ্য রাণীর হাতে গেল তাতে পরিবর্তন কি হলো? কোম্পানীর লাটসাহেবই



নানাসাহেব বললেন—'আমি একাই লড়বো'

বড় লাট হলো, কোম্পানীর কর্মচারীরাই এখনো কাজ করছে। এ শুধু কথার কথা। ইংরাজদের কথায় বিশ্বাস করা চলে না। বন্ধুত্বের চুক্তি করে তারা সুযোগ বুঝে অনেক রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। তাদের কথায় যেন আমরা না ভুলি!

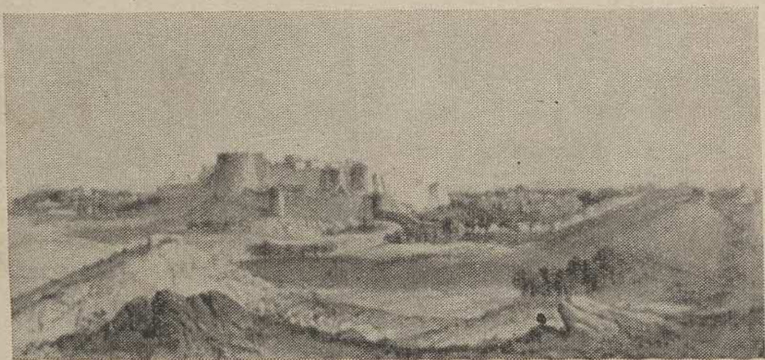
তাঁতিয়া টোপি জঙ্গলে ঘুমুচ্ছিলেন, তার সঙ্গী কোটার মাবাসিংহ সেই সময় ইংরাজকে ডেকে এনে তাঁকে ধরিয়ে দিলেন। তাঁতিয়ার ফাঁসী হয়ে গেল।

তাঁতিয়ার বন্ধু রাওসাহেব সদাশিব পান্ডুবঙ্গকে ধরিয়ে দিল মারাঠীরা। তাঁর ফাঁসী হয়ে গেল।

তাঁতিয়ার আর এক বন্ধু ফিরোজ সাহ চলে গেলেন ভারত ছেড়ে। কান্দাহার, বোখারা, তেহেরাণ, কাবুল, সমরখন্ড, কনষ্টানটিনোপ্‌ল ঘুরে তিনি গেলেন মক্কায় সেখানে তাঁর মৃত্যু হলো।

১৮৫৭ সালে যে বিদ্রোহ সুরু হয়েছিল ১৮৫৯ সালে তা শেষ হলো। সিপাহীদের মধ্যে যোগ্য নেতা ছিল না, নেতারা পরস্পরকে ঈর্ষা করতেন, নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবতেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না, এবং কোন শৃঙ্খলাবোধ ছিল না, সেইজন্যই সিপাহীরা ব্যর্থ হলো। কিন্তু সাধারণ মানুষকে সেজন্য বহু অত্যাচার সইতে হয়, প্রথমে সিপাহীদের হাতে, পরে ইংরাজদের হাতে। বাংলা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহীরা তেমনভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করেনি, সেই জন্য অত্যাচারের তেমন আঁচ লাগেনি এই সব দিকে।

কুমারসিংহ এ-বংশের সন্তান। তাঁহার পিতার নাম ছিল সাহেজাদ সিংহ। সাহেজাদ সিংহের চারি পুত্র—কুমারসিংহ, দয়াল সিংহ, রাজপতি সিংহ ও অমর সিংহ। পিতা সাহেজাদ সিংহ তাঁহার জমিদারীর বার আনা অংশ কুমারসিংহকে দিয়া গিয়াছিলেন। কুমারসিংহ যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে সে জমিদারী পরিচালনা করিতেন তাহা হইলে তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না; বরং মহাজনদের কাছ হইতে ঋণ করিতেন; ঋণের দায়ে তাঁহার জমিদারী নীলামে উঠিত, এইরূপ নানাভাবে তিনি ঋণের দায়ে বিপন্ন হন,



লক্ষ্মীবাইয়ের—ঝাঁসীর দুর্গ

জগদীশপুরের কুমারসিংহ

সিপাহী বিদ্রোহের কথা তোমরা জান। মে ১৮৫৭—৫৮ খৃষ্টাব্দের কথা, হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া ইংরাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; সে সময়ে যে সকল সাহসী বীর বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়া বীরের মত প্রাণপণে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন ছিলেন কুমারসিংহ।

কুমারসিংহ ছিলেন আরা জেলার জগদীশপুর নামক স্থানের জমিদার, তিনি জাতিতে রাজপুত ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সে অনেক দিন আগে উজ্জ্বয়িনী হইতে এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

এমনকি তাঁহার এক বন্ধু শাহবাদের কালেক্টার সাহেব তাঁহাকে কুড়ি লক্ষ টাকার ঋণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করেন, স্থির হয় যে তিনি জমিদারীর আয় হইতে ক্রমশঃ ঋণের টাকাটা পরিশোধ করিবেন, গভর্মেন্ট তাঁহার জমিদারীর কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবেন। কুমারসিংহ এই প্রস্তাবে রাজি হইয়াছিলেন এবং ঋণ মুক্ত হইলেন বলিয়া আনন্দিত ও হইয়াছিলেন কিন্তু রেভেনিউ বোর্ড পাটনার কমিশনার দ্বারা কুমারসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেনঃ—এক মাসের মধ্যে যদি সমুদয় টাকা না পাওয়া যায় তাহা হইলে গভর্মেন্ট তাঁহার সমস্ত জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব লইতে পারেন না,—সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন।

সে সময়ে পাটনার কমিশনার টেলর সাহেবও

বোর্ডের ঐরূপ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই। এজন্য ছোটলাট সাহেবের কাছে পত্র লেখেন, কিন্তু তাহাতেও বোর্ড তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্ত্তণ করিলেন না।

এজন্য কুমারসিংহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, পিতৃপুরুষের জমিদারী নীলাম হইয়া পরের হাতে চলিয়া যাইবে, এ দুশ্চিন্তা তাঁহার মনের ভিতর অশান্তি আনিয়া দিল, তারপর পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখী ছিলেন না, তাঁহার একমাত্র পুত্র দলভজন সিংহের মৃত্যু হইয়াছিল, পৌত্র বীরভঞ্জন বংশের এক ছেলে, সেও ছিল জন্মাবধি মস্তিষ্কবিকৃত। একমাত্র তাঁহার ভাইয়েরা ও ভাইয়ের ছেলেরা ছিল আশ্রয় ও অবলম্বন, এইরূপ নানা অশান্তির মধ্যেও কুমারসিংহ ব্রিটিশ গভর্মেন্টের প্রতি বিমুখ ছিলেন না।

বাংলাদেশে যখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়াছিল, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, অযোধ্যা, ঝাঁসী প্রভৃতি স্হানে সেই আগুণের শিখা ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তখন বিহারেও সে আগুণ জ্বলা যে অসম্ভব নয়, একথা মনে করিয়া পাটনার কমিশনার টেলার সাহেব বিহারের প্রধান প্রধান জমিদার ও তালুকদারদের লইয়া এক মন্ত্রণা সভার আহবান করেন, কুমারসিংহও সেই দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া দেখিলেন, বিহারের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীদের আসনের কাছে তাঁহার আসন নাই, তাহাতে তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া সভাস্হলেই এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিলেন এবং প্রধান আসনখানি গ্রহণ করিয়া তবে দরবারে যোগদান করিলেন।

সে সময়ে বিহারেও অশান্তি দেখা দিয়াছিল, বিদ্রোহের আগুণ সেদিকেও ছড়াইয়া পড়িতেছিল, কি ভাবে উহা প্রশমিত হইতে পারে, সেই জন্য ডোমরাঁও জগদীশপুর ও অন্যান্য বিখ্যাত স্হানের হিন্দু ও মুসলমানদের আহবান করিয়া পাটনার কমিশনার সাহেব তাঁহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া কুমারসিংহ ও ডোমরাঁওয়ের রাজাকে ভবিষ্যত বিপদের কথা বলিয়া দানাপুরের সিপাহীরা যাহাতে বিদ্রোহে



বীর কেশরী বাবু কুঁয়রসিংহ

যোগদান না করে সে-বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কুমারসিংহ, কমিশনারের এই কথায় উত্তর দেনঃ—শাহাবাদের লোক আমার কথা শুনিতে পারে কিন্তু অন্যান্য জেলার অধিবাসী ও দানাপুরের সিপহীরা আমার কথা শুনিবে কেন?

কুমারসিংহের এই নির্ভীক ও যথার্থবাদিতায় কমিশনার সাহেব সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

।। দুই ।।

কুমারসিংহ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন সাহসী ও তেজস্বী। অশ্বারোহণে ও অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের বল, বীর্য্য ও নির্ভীকত ছিল তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আলস্য ও বিলাস তাঁহার ছিলনা।

সে সময়ে জগদীশপুরের কাছে এক নিবিড় অরণ্য ছিল, তাহার নাম "তাড়কার বন", সেই নিবিড় বনে বাস করিত নানা হিংস্র জন্তু, সাপ, বাঘ, শুকর, ভল্লুক, চিতাবাঘ প্রভৃতি নানা হিংস্র প্রাণী, সে বনে শিকার করিতে ছিল তাঁহার অদম্য

উৎসাহ, তিনি তাঁহার সাহসী বন্ধুগণের সহিত সেই নিবিড় বনে ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য অরণ্যে শিকার করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

কুমারসিংহকে সকলে বলিত 'বাবু কুঁয়র-সিংহ।' প্রজাদের ও বিপন্ন ব্যক্তির তিনি ছিলেন আশ্রয়দাতা। তিনি এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন—যে তাঁহার নাম শুনিলে দুর্দ্দান্ত দস্যু-ডাকাতেরাও ভয়ে থরহরি কম্পমান হইত, তাহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়িত অস্ত্র-শস্ত্র, বিপন্ন শত্রুও তাঁহার কাছে আশ্রয় পাইত। একবার তিনি একজন নিজের আততায়ীকেও স্বগৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমনি ছিল তাঁর মহত্ব।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে সিপাহীরা যখন দানাপুর অঞ্চলে বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে তখন পাটনার কমিশনার টেলার সাহেব কুমার-সিংহকে পাটনায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহবান করেন, বাবু কুমারসিংহ তখন অসুস্থ ছিলেন বলিয়া পাটনার কমিশনার সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার ফল ফলিল অন্যরূপ। কমিশনার সাহেব তাহা বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহার সন্দেহ হইল কুমারসিংহ বিদ্রোহীদের একজন উৎসাহ-দাতা, এবং হয়ত তাঁহারও উহাদের সহিত যোগ আছে। কুমারসিংহ কিন্তু সিপাহীদের এইরূপ অন্যায় বিদ্রোহের সমর্থনকারী ছিলেন না—বরং তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবই প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। সিপাহীরা তাহাদের যে সকল অনু-চরদের তাঁহাকে বিদ্রোহে যোগদান করিবার জন্য পাঠাইত কুমারসিংহ তাহাদের কোনরূপ উৎসাহ দেন নাই।

ইংরাজ কমিশনার কিন্তু কুমারসিংহকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে ব্যক্তিকে তিনি কুমারসিংহকে পাটনায় আসিবার জন্য আহবান করিয়া দূত স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন, সে ব্যক্তিও তাঁহার বিরুদ্ধে নানা রূপ কথা বলিতে কুন্ঠিত হয় নাই, ইহা হইল এক অশান্তির ব্যাপার। তাহার ফলেই ভবিষ্যতে ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল।

রণদলন সিংহ ও হরেকৃষণ সিংহ নামে কুমার-সিংহের দুই বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সিপাহীদের কথায় ও অনুরোধে উত্তেজিত হইয়া কুমার-সিংহকে বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। রিপুভঞ্জন সিংহ নামে কুমারসিংহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদলের সহিত যোগদান করিবার বিরোধী ছিলেন এবং কাকাকে বলিলেনঃ—'দেখুন, আমরা সামান্য জমিদার, আমাদের না আছে বন্দুক, না আছে কামান আমরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কেমন করে যুদ্ধ করবো কতজন বরকন্দাজ আর অশিক্ষিত সিপাহী নিয়ে কি যুদ্ধ চলে? আপনি পাটনা গিয়ে কমিশনার সাহেবের সাথে দেখা করে আমাদের যাতে সর্ব্বনাশ না হয় তাই করুন।'

রিপুভঞ্জনের কথায় কুমারসিংহ বুঝিলেন অন্যরূপ, যদি তিনি এখন পাটনায় যান তবে হয়ত অন্যান্য মৌলবী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তাঁহাকেও ইংরাজের হাতে বন্দী নতুবা ফাঁসী-কাঠে ঝুলিতে হইবে, রিপুভঞ্জনের জমিদারী প্রাপ্তির লোভে তাঁহাকে পাটনায় ঐরূপ মৃত্যুমুখে পাঠাইবার উদ্দেশ্য থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু তখন কুমারসিংহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিবেন কিনা সে বিষয়ে মন স্থিরও করিতে পারেন নাই। নানা রূপ দুশ্চিন্তায় তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

কুমারসিংহ বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার শক্তি ছিল সিংহের ন্যায়। নিজের জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার মনেও ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের আগুণ জ্বলিতেছিল। এমন সময়ে বিদ্রোহীদলের আহবান শুনিলেন এদিকে বিদ্রোহীরাও অগ্রসর হইল আরার দিকে, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য, সেই সঙ্গে হরেকৃষ্ণও আসিলেন। এ সময়ে তাঁহার পূর্ব্বতন সহচর হরেকৃষ্ণ এক চাতুরী খেলিলেন, তিনি কুমার সিংহকে সংবাদ দিলেন, "আপনি যদি বিদ্রোহী সিপাহীদের অধিনায়ক না হন, তাহলে সিপাহীরা আপনার জগদীশপুরের প্রাসাদ, লুঠ করবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইংরাজ যখন

আপনাকে বিশ্বাস করেন না, তখন কেন আপনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করবেন না? আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।" এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই সিপাহীরা তাঁহাকে নেতৃত্ব পদে বরণ করিবার জন্য জগদীশপুরে আসিল।

কুমারসিংহ প্রমাদ গণিলেন। তিনি সিপাহীদের বিদ্রোহ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন বলিয়া পরের দিন যখন জগদীশপুরে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের বিস্তৃত প্রান্তরে অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন, তখন সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধের নিয়মানুসারে অভিবাদন করিল এবং "বাবু কুমার সিংহের জয়!" 'দিল্লী চলো।' এবং 'হর্ হর্ বম্ বম্' শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

কুমারসিংহ একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। তাহাকে বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীগণের অধিনায়কের পদ গ্রহণ করিতে হইল।

বিদ্রোহী সৈনিকেরা কুমারসিংহের নেতৃত্বে বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। আরা, পাটনা, নানা স্থানে একে একে সিপাহীরা ধনাগার লুন্ঠন, আদালতের কাগজপত্র নষ্ট করিল। তাহারা চারিদিকে অশান্তির আগুণ ছড়াইয়া দিল—চারিদিকে ধ্বংসের লীলা চলিতে লাগিল। ইংরাজেরা যখন জানিতে পারিলেন যে কুমারসিংহ বিদ্রোহীদলের নেতা হইয়াছেন তখন ইউরোপীয় দশ নম্বর পদাতিক দল জগদীশপুরে গিয়া কুমার সিংহের বাড়ী ঘর সব ধ্বংস করিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে আগুণ জ্বলাইয়া পল্লী ধ্বংস করিয়াছে, নরহত্যা ও লুন্ঠনে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সামান্য উদারতার পরিচয় ও তাহারা দেয় নাই—এই ভাবে কুমারসিংহের প্রিয়তম জন্মভূমি তাঁহার বাসভূমি পল্লী ভবন এবং বিরাট প্রাসাদ ধ্বংস হইল! এইরূপ অবস্থায়ও কুমার সিংহ বিচলিত হন নাই। এইবার তিনি পণ করিলেন হয় ইংরাজ কোম্পানীকে যুদ্ধে হারাইবেন, নতুবা নিজে মরিবেন।

সে সময়ে সাসারামের কাছে একটি পাহাড়ের উপর কুমারসিংহ শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার অনুগত সর্দ্দারেরা কুমারসিংহের শিবিরে আসিয়া দেখিলেন, কুমারসিংহ একাকী বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন ও কাঁদিতেছেন, তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতেছে; একজন সর্দ্দার বলিলেন—"আপনার চোখে জল কেন? যখন যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছেন, তখন কোন মতেই নিরস্ত হওয়াত সম্ভবপর হবে না? হয় জয়—নয় পরাজয়, হয় জীবন—নয় মৃত্যু।"

কুমারসিংহ বলিলেন—"সেজন্য আমার চোখে জল আসেনি, একবার যখন যুদ্ধ করতে নেমেছি, তখন যুদ্ধ করবোই, তবে কি জানেন সর্দ্দার সাহেব, আমা হতেই আমার পৈত্রিক রাজ্য বিলুপ্ত হতে চললো। পুত্রহীন আমি, আমার পৌত্রও অস্থিরমতি তাই দুঃখ হয় রাজ্য গেল—মান—সম্ভ্রম যেতে বসেছে—তারপর এই বৃদ্ধ বয়সে নিমকহারাম বলে ইংরাজের কাছে পরিচিত হলেম।"—এ সময়ে কুমারসিংহের বয়স হয়েছিল সত্তর বৎসর।

বৃদ্ধ রাজপুত ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া এইবার যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন; তাঁহার লোক বল ছিল না—অর্থ বল ছিল না—উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল না যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র বন্দুক কামান—বারুদ তেমন ছিল না, কাজেই তাঁহার যেরূপ ভাবে অভিযান করিতে হইয়াছিল তাহা একেবারে দুঃসাহসিক অভিযান বলিলেই সত্য হয়।

এদিকে ইংরাজ কোম্পানী চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন "বিদ্রোহী কুমারসিংহের ছিন্ন মুন্ড যে ইংরাজ শিবিরে এনে উপস্থিত করতে পারবে তাকে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

আশ্চর্য্যের বিষয় কোম্পানীর এইরূপ ঘোষণায় সিপাহী ও জনসাধারণ ইংরাজদের প্রতি অনেকে অসন্তুষ্ট এবং ভীষণ বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। জনসাধারণ কুমারসিংহকে এমনি তর প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

বাবু কুমারসিংহ বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়াছেন যেমন একথা প্রচার হইল তখন দলে দলে বিদ্রোহী সৈন্যেরা আসিয়া তাঁহার সহিত

মিলিত হইল। দেখিতে দেখিতে অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইল, বিদ্রোহীরা নবোৎসাহে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল।

।। তিন ।।

কুমারসিংহের প্রেরণা বলে সৈন্যবাহিনীতে জাগিল নবীন উদ্যম, তিনি অমিতবিক্রমে এইবার যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যে সকল যুদ্ধে কুমার সিংহ বিজয়ী হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে আর্দ্রা ও লিয়ার যুদ্ধ প্রধান, এই যুদ্ধে তিনি আজিমগড়ের সেনা নায়ক মিলম্যান্ সাহেবকে সম্পূর্ন রূপে পরাজিত করেন। কুমারসিংহ মিলম্যানের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহার পরিত্যক্ত সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রাদি অধিকার করেন। মিলম্যান আজিমগড়ে গিয়া আবার শত্রু সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

মিল্‌ম্যানের এই পরাজয়ের সংবাদ এলাহাবাদে পৌঁছিলে লর্ড ক্যানিং বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি এলাহাবাদে ছিলেন। কুমারসিংহের রণ-কৌশল এবং সাহসিকতার কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, লর্ড ক্যানিং কুমার সিংহের অপূর্ব্ব রণনীতির পরিচয় পূর্ব্বেই জানিতেন; জানিতেন যাহাতে তিনি লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতির দিকে তাঁহার সেনাদল সহ অগ্রসর হইতে না পারেন সেই জন্য ক্যানিং মনোযোগী হইলেন এবং ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকেও তদনুরূপ উপদেশ দিলেন।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল—ইংরাজ সেনানায়ক লুগার্ড আজিমগড়ের কয়েক মাইল দূরে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এদিকে আবার কুমারসিংহও ইংরাজ সেনাপতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে ছিলেন। তিনি আজিমগড়ের কাছাকাছি নঘাই নামক একটি গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। স্থানটির চারিদিক বেড়িয়া ছিল আমের বাগান। সৈন্যেরা সেখানে ইংরাজের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রহিল। তাহাদের সম্মুখে কামান সাজাইয়া রাখা হইল।

ডগলাস্ নামে একজন ইংরাজ সেনাপতি আসিয়া কুমারসিংহকে আক্রমণ করিলেন। এখানে কুমারসিংহ অসাধারণ রণ-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে দুই



অশ্বপৃষ্ঠে কুঁয়রসিংহ

দলে বিভক্ত করিয়া ইংরাজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে তাহাদের দুইদিকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রথম দলের সৈন্যেরা যখন ইংরাজ সেনাদের বাধা-দিতে লাগিল, তখন কুমারসিংহ নিরাপদে ঘর্ঘরা নদী পার হইয়া গাজীপুরের কাছাকাছি মান্‌নাহার নামক স্থানে আসিলেন। তাঁহার সৈন্যদল অনাহারে ও অনিদ্রায় এবং পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা এখানে আসিয়া আহার ও বিশ্রাম করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল কিন্তু সে সুযোগও তাহারা পাইল না। তন্মুহূর্ত্তেই আবার তাহাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ডগলস্ সাহেব তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া কুমারসিংহের নিরাপদে প্রস্থানের সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং রাত্রিকালেই কুমারসিংহের শিবির আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ডগলাস্ বিজয়ী হইতে পারিলেন না। কুমারসিংহ এইবার গঙ্গা পার হইয়া নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য গঙ্গাতীরে আসিলেন। ইংরাজের গঙ্গার তীরে যে সব নৌকা ছিল সে সব একস্থানে ডুবাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, যেন কুমারসিংহ ও তাঁহার সেনাদল নৌকার সাহায্যে গঙ্গা পার হইতে না পারেন। এদিকে কুমারসিংহ গঙ্গার তীরে আসিয়া কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সাহায্য করিল, যে স্থানে ইংরাজরা নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছিল, তাহারা সেই স্থান দেখাইয়া দিল, এই ভাবে ইংরাজ সৈন্যদের আসিবার আগেই কুমারসিংহ সসৈন্যে নিমজ্জিত নৌকাগুলি তুলিয়া গঙ্গা পার হইয়া গেলেন।

গঙ্গার অপর পারে তাঁহার জন্য রক্ষিত হস্তীর উপর তিনি আরোহণ করিলেন, তখনও সূর্য্য প্রখর কিরণ বিস্তার করে নাই; কুমার সিংহ হাওদার উপর বসিলেন, রণদল সিংহ নামে একজন নেপালবাসী তাঁহার মাথায় রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্য গঙ্গার অপর পারে আসিয়া তাঁহার মাথার উপর ছত্র দেখিয়া কুমারসিংহকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলা নিক্ষেপ করিল; গোলার আঘাতে কুমারসিংহের একখানি হস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তাহার সেই দক্ষিণ বাহুখানি একজন সৈনিক তাঁহারই আদেশে তরবারির আঘাতে বিভক্ত করিয়া ফেলিল এবং সেই ছিন্ন-বাহু গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইল। পবিত্র গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি তৃপ্তি লাভ করিলেন।

আহত কুমারসিংহকে তাঁহার অনুরক্ত সিপাহীগণ একখানি খাটিয়ায় শোয়াইয়া তাঁহার অতিপ্রিয় বাসপল্লী জগদীশপুরে লইয়া গেল। জগদীশপুরের প্রাসাদ ধ্বংস হইয়াছিল। একটি বৈঠকখানা ঘর মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। অনু-চরেরা তাঁহাকে সেই ঘরে আনিয়া রাখিলেন। বাবু কুমারসিংহের ভ্রাতা অমর সিংহ তখন কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া জগদীশপুরে ছিলেন, কুমারসিংহের সৈন্যদলের সহিত তাহারা মিলিত হইল। অমর সিংহও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই মত সাহসী ও বীর ছিলেন।

আরাতে এ সময়ে ইংরাজ পক্ষের অনেক সৈন্য ছিল, তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন কাপ্তেন গ্র্যান্ড সাহেব। তিনি এইবার সুযোগ পাইয়া জগদীশপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন কিন্তু নিবিড় জঙ্গলে লুক্কায়িত কুমারসিংহের সৈন্যগণ এইরূপ বীর বিক্রমের সহিত তাঁহাকে আক্রমণ করিল যে ইংরাজেরা সহজেই পরাজিত হইল। পলায়নের পথ পর্য্যন্ত তাহারা পাইল না। ইংরাজ সৈন্যদের এই পরাজয়ে ব্রিটিশ রাজ-পুরুষদের মনে আবার আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। এদিকে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ কুমারসিংহ কামানের গোলার আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, উরুদেশের মাংসপিন্ডও অপসারিত হইয়াছিল। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত বীর কুমারসিংহ এসময়েও কি ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিলে ভাল হইবে সে কথা সৈন্যদিগকে উপদেশ দিতেন। ইংরাজ সেনানায়ক গ্র্যান্ডের এইরূপ ভাবে পরাজিত হইবার মাত্র তিন দিন পরে এক গভীর নিশীথে নীরবে প্রিয় অনুচরগণের সম্মুখে ঈশ্বরের নাম

স্মরণ করিতে করিতে মহাবীর কুমারসিংহ অমর ধামে প্রস্থান করিলেন।

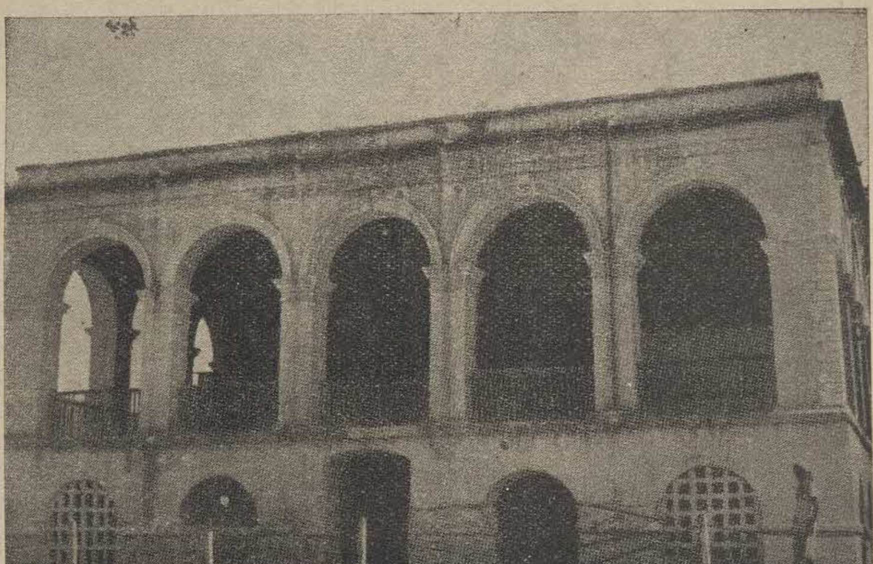
বাবু কুমারসিংহ ইংরাজের অনুদার ব্যবহারে বাধ্য হইয়াই বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়াছিলেন, অপূর্ব্ব রণ-কৌশলে ইংরাজদের বার বার পরাজিত করিয়াছিলেন। একবারও তিনি ইংরাজের কাছে পরাজিত হন নাই। বিদ্রোহী সৈন্য দলের অধিনায়ক হইয়া তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল দেশে স্বাধীনতা অর্জ্জন।

কুমারসিংহ ছিলেন প্রকৃত বীর ও মহৎ। হিন্দুর মহত্ত্ব, মানবপ্রীতি ছিল তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবহমান। যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও তিনি কোন ইউরোপীয় বালক বালিকার প্রাণ নাশ করেন নাই, কোন মহিলার প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ তাহার কঠোর আদেশে কোন সৈনিক করে নাই। যুদ্ধ ভিন্ন কোন ইংরাজের প্রতি তিনি অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই। এমন কি তাঁহার বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে যোগদানের পূর্ব্বে যে কয়জন ইংরাজ বন্দী ছিলেন; তাহাদের ও প্রাণ বধ করেন নাই—শুধু রণ নীতি অনুযায়ী বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইংরাজদের সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করিয়াই রাণা কুমারসিংহ তাঁহার রাজধানী জগদীশপুরে বিজয় গৌরবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

কুমারসিংহ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া স্বাধীনতার গৌরবে উৎফুল্ল চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক হোমস্ (Holmes) লিখিয়াছেনঃ—"The old Rajput who had fought so honourably and so bravely against the British power died on April 26, 1858. (History of Sepoy war)—বৃদ্ধ রাজপুত বীর বীরত্ব ও সম্মানের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল স্বাধীন ভারতে পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

'শ্রীমৎকুমারসিংহ সিংহ সমতাশক্তিঃ প্রতাপস্তস্য।
সন্মার্গেনিরতস্তথা বুধজনৈঃ শোভায়মানঃ যদা।।
শ্রী নারায়ণপাদবন্দনিরতো ধর্ম্মধ্বজো বেদবিদ্
বিম্যতোপি জগন্দ্রয়ে তু মহতী কীর্ত্তির্যুযতা ধর্ম্মবিৎ।।
দাতা সাহসসংযুক্তঃ ক্রিয়াশুচিযুতস্তথা।
কুমারসিংহসমো ভূপো কুমধ্যে ন ভবিষ্যতি।।



কুঁয়রসিংহের আরার বাড়ীর সাধারণ দৃশ্য



অন্ধজনে দেহ আলো

"অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ"—গেয়েছেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ। এই আলোর জন্যেই উন্মুখ ছিল শিশু হেলেন কেলারের অন্তরাত্মা। কেমন করে এই অন্ধমূক বধির শিশুর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন অসাধারণ মেধা, নিষ্ঠা, সাধনা ও ইচ্ছাশক্তির বলে অপূর্ব সাফল্যে ভরে উঠলো তা যেন গল্পের চেয়েও আশ্চর্য ও চমকপ্রদ। মহীয়সী বিদুষী হেলেন কেলারের নাম আজ বোধহয় জগতের শিক্ষিত সমাজের কারো অজানা নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময়ে উভয়ের যে মিলিত আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল তা অনেক সাময়িক পত্র পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ছবিটিও হয় তো অনেকেই তখন দেখে থাকবেন। কয়েক বছর আগে যখন হেলেন কেলার ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তিনি কলকাতাতেও এসেছিলেন। সেই সময়ে আমাদের মধ্যে কারো কারো তাঁকে দেখবারও সুযোগ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন, সে কথা বলেছি, আমরা সে আলোক চিত্রটি এখানে দিলাম।

মহিয়সী হেলেন কেলারের নাম আজ বিশ্ব-বিশ্রুত। এই অন্ধ-মূক-বধির নারীর ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের অপূর্ব সাফল্য আজকের দিনে শিক্ষাজগতের এক পরম বিস্ময়। যে জীবন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছিল, তা কেমন করে অসামান্য মেধা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনা, এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে অশেষ গৌরব-মন্ডিত হয়ে উঠলো সে কাহিনী যেন গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। হেলেন কেলার তাঁর জীবনের সেই অতিবিস্ময়কর কাহিনীটি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মজীবনী "The Story of My Life"—বইখানিতে। বইখানির অনুপম ভাষা ও সাবলীল প্রকাশ-ভংগীর মাধুর্য বাস্তবিকই মর্ম স্পর্শ করে। বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের খুঁটিনাটি চিত্রণে লেখিকার সৌন্দর্য-পিয়াসী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি পড়ে মনে হয় না তিনি এই রূপরসশব্দ-গন্ধস্পর্শময় জগতের অনেকখানি আনন্দ থেকেই বঞ্চিতা। চিরতমসার ঘন যবনিকা তাঁর চোখের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে বিশ্বপ্রকৃতির সব রূপ, রঙ, ও আলোকে। চিরমৌনতার

দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে তাঁর কানে প্রবেশ করে না এই আনন্দ কোলাহল মুখর পৃথিবীর কোনও রব, ধ্বনি বা গান। কিন্তু তাঁর বইখানি পড়ে মনে হয় তিনি যেন এক দিব্য দৃষ্টিদিয়েই অন্তরের গভীরে দেখেছেন এ বিশ্বের সমস্ত রূপ, রঙ ও আলোকে—যেন নিজের প্রাণের মধ্যেই অনুভব করেছেন বিরাট এই ধরণীর বিপুল প্রাণস্পন্দনকে, আর যেন অপরের কান-দিয়েই শুনেছেন জগতের সব শব্দ, ধ্বনি, ও রাগিণীকে। তাঁর এই সুন্দর জীবনালেখ্য-খানিতে কোথাও বেজে ওঠেনি ব্যর্থতার করুণ সুর—কোথাও নেই তাঁর দুঃখলাঞ্ছিত, বেদনাহত জীবনের এতোটুকু গ্লানির পরশ। তাঁর আত্ম-জীবনীর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—"'There is joy in self-forgetfulness'. So I try to make the light in others' eyes my sun, the music in others' ears my symphony, the smile on others' lips my happiness"—অর্থাৎ 'আত্ম-বিস্মৃতিতেই পাওয়া যায় গভীর আনন্দ। তাই আমি অপরের চোখের জ্যোতিকেই আমার নিজ নয়নের আলো বলেই মনে করতে চেষ্টা করি, অপরের কানের ভেতরদিয়েই ধরতে চাই সংগীতের অপূর্ব সুরটিকে, এবং অপরের মুখের হাসির মধ্যেই



হেলেন কেলার রবীন্দ্রনাথের মুখ স্পর্শ করে তাঁর ঠোট নড়া দেখে কথা বলছেন

খুঁজে পেতে চাই আমার ব্যর্থ, বঞ্চিত জীবনের সুখ ও আনন্দকে।' তাঁর এই কথা ক'টির মধ্যেই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরের গোপন মর্ম্মবেদনা। জীবন প্রভাতেই তাঁর অকরুণ ভাগ্যবিধাতা তাঁর ললাটে লিখে দিয়েছেন এক চরম অভিশাপলিপি। সেই অভিশপ্ত জীবনকেই পরম সার্থকতার আনন্দে ভরিয়ে তোলাই তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। আজ তিনি যেন তাঁর নির্ম্মম জীবনবিধাতাকে অসীম বিজয় গর্বেই বলতে পারেন—

> "দুঃখ খানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
> অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
> আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
> দিনশেষে মিলনের রাতে।"

এইটিই যেন তাঁর সার্থক বিড়ম্বিত জীবনের মর্মবাণী। নিজ দুর্ভাগ্য তাঁকে দমাতে পারে নি'। তার কাছে তিনি হার মানেন নি। তার সংগে আপ্রাণ যুঝে, অক্লান্ত নিষ্ঠা ও সাধনার বলে তিনি অর্জন করতে পেরেছেন নিজ সাফল্যকে।

হেলেন কেলারের জীবনের সংগে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আছে আর একটি জীবনও। আজ বোধহয় জগতের লোক তাঁর নাম শুনতেই পেতোনা, যদি না তাঁর জীবনে সেদিন বিধাতার মূর্তিমতী করুণার মতোই আবির্ভূতা হতেন তাঁর সুযোগ্যা শিক্ষিকা—মিস অ্যান ম্যান্স্ফিল্ড সালিভ্যান। এই মহিমাময়ী নারীর অশ্রান্ত, নীরব সাধনা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ত্যাগ, অসীম দরদ ও মমত্ব, অতুল সাহস ও মনোবল, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অসাধারণ শিক্ষানৈপুণ্য তাঁর শিশু-ছাত্রীর জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। নিষ্করুণ ভাগ্যের নিদারুণ কশাঘাতে যে নিষ্পাপ সুন্দর শিশু-জীবন ব্যর্থতা ও নিস্ফলতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল তারই মোড় ফিরিয়ে দিলেন মিস সালিভ্যান। তিনি সেদিন শুধু হেলেনের শিক্ষিকাই হলেন না—একাধারে হলেন তার friend, philosopher, ও guide—বন্ধু, গুরু ও পথনির্দেশিকা। তাঁর শিক্ষার সোনার



অধ্যয়নরতা ডক্টর হেলেন কেলার

কাঠির পরশেই ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগলো তাঁর শিশুছাত্রীর অশেষ-সম্ভাবনাময় চিত্ত-কোরকটি—তার প্রসুপ্ত শক্তি, ও সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো। এজন্যে যে তাঁর বহু শ্রম, ধৈর্য, ও সময় ব্যয়িত হয়েছিল সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। ষোল বছর ধরে তিনি ছিলেন তাঁর ছাত্রীর নিত্য সহচরী—শুধু কাজে ও পড়াশুনায় নয়—শয়নে, জাগরণে, আহারে, বিহারে, খেলাধুলায়, ও আমোদ প্রমোদে। অবশ্য তাঁর ছাত্রীর প্রতিভাও অধ্যবসায় ও অনস্বীকার্য। শিশু হেলেনের অসামান্য মেধা ও স্মৃতিশক্তি, তার নিরলস সাধনা ও অপার নিষ্ঠা, এবং দুর্দম্য ইচ্ছাশক্তি ও তাঁর কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। মিস সালিভ্যান তাঁর ছাত্রীর পিতামাতার অকুন্ঠ সহযোগিতা এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভেও বঞ্চিত হন নি। নিজের সাময়িক দৃষ্টিহীনতার অভিজ্ঞতাও তিনি তাঁর ছাত্রীর শিক্ষায় প্রয়োগ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

মাত্র উনিশ মাস বয়সেই শিশু হেলেন এক

কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধির ফলে তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। তার আগে সে মোটে দু'চারটি কথা বলতে শিখেছিল। অসুখের পরে তার শুধু 'ওয়াটার' (water) কথাটিই মনে ছিল। শ্রবণশক্তির অভাবে তার সেই শব্দটির উচ্চারণও ক্রমে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। অন্য স্বাভাবিক শিশুদের মতোই শিশু হেলেনের মনেও আছে আত্মপ্রকাশের জন্যে গভীর আকুতি। সে অন্যদের সংগে কথা বলতে চায়, অথচ কেউই তার কথা বোঝে না। সে নিজেও শুনতে পায় না—অন্য কারুর কথা। তার মধ্যে আছে উচ্ছল প্রাণ প্রাচুর্য ও অন্তহীন কর্মচাঞ্চল্য। তাও সুনিয়ন্ত্রিত হতে বা উপযুক্ত খাতে পরিচালিত হতে পায় না। নিজ অক্ষমতার অপরিসীম গ্লানি হেলেনের অশান্ত, অবোধ শিশুচিত্তে জাগায় তুমুল বিক্ষোভ। এর ফলে সে হয়ে ওঠে অত্যন্ত রাগী, জেদী, উদ্দাম ও উচ্ছৃংখল। গৃহে তার দুরন্তপনায় বাধা দেবার কেউ নেই। স্নেহের পুত্তলী, আদরিণী শিশু-কন্যার চরম দুর্ভাগ্য পিতামাতার অন্তরে বড়োই বেজেছে। সেই মেয়েকে শাসন করবার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। অথচ অভাগিনী কন্যার জন্যে তাঁদের দুঃখ ও দুর্ভাবনারও অন্ত নেই। হেলেনের মা একটি বইতে লরা ব্রিজম্যানের কথা পড়লেন। জানলেন এই মেয়েটি অন্ধ বধির হয়েও লেখাপড়া শিখেছে। এতে হেলেনের মা বাবা যেন একটুখানি ক্ষীণ আশার আলোক দেখতে পেলেন। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পরে তাঁরা মিস সালিভ্যানের সন্ধান পেলেন।

অন্ধ-মূক-বধির শিশু হেলেনের সমস্ত অন্তরাত্মাই যেন আলোর জন্যে উন্মুখ। 'আলো চাই', 'আলো দাও'—এই নির্বাক, নিঃশব্দ প্রার্থনাই যেন অহরহ তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠছে। তার জীবনের এক পরম শুভ ক্ষণেই তার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত আলোর আশ্বাস নিয়েই সেদিন যেন তার জীবন-পথে উদিত হলেন মিস সালিভ্যান—যাঁর জীবনের মূল মন্ত্রই হলো—"অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ"। তিনি তাঁর অন্ধ-মূক-বধির শিশু ছাত্রীটির জীবনে শুধু জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকবর্তিকাটি জ্বালিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তার অর্ধমৃত জীবনকেও সঞ্জীবিত করে তুললেন অসীম স্নেহ, মমতা ও দরদের সুধা-সিঞ্চনে। কেমন করে তিনি তার জীবনমুকুলের দলগুলিকে ধীরে ধীরে খুলে তাকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে তুললেন সে কাহিনী তাঁর স্বলিখিত বিবরণী থেকেই পাওয়া যায়। আদর্শ শিক্ষিকার সব গুণগুলিই তাঁর ছিল। নতুন পথ ও মত পরীক্ষা করবার জন্যেও ছিল তাঁর প্রচুর মনোবল ও দুর্জয় সাহস। আর ছিল মনো-বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভংগী ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি।

মিস সালিভ্যান যখন শিশু হেলেনের শিক্ষার ভার নিলেন তখন তার বয়স সাতবছর পূর্ণ হতেও মাস তিনেক বাকী ছিল। তিনি দেখলেন তাঁর ছাত্রীর নিটোল দেহে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের লাবণ্য টলমল করছে-গন্ড-দ্বয় রক্তিমাভ, শরীরও সুগঠিত, হৃষ্ট পুষ্ট। —প্রথমদিন থেকেই শুরু হলো তাঁর খেলাচ্ছলে শিক্ষাদান। তিনি একটি পুতুল ও কেক দেখিয়ে শব্দ দু'টি হেলেনের হাতে বানান করলেন। ছাত্রী এর অর্থ কিছুই বুঝলো না। সে জিনিস নেবার জন্যেই ব্যগ্র। বানান অর্ধ-সমাপ্ত রেখেই সে তাড়াতাড়ি কেকটি খেয়ে, পুতুলটি নিয়ে ছুটে পালাল। সেদিন আর সে শিক্ষিকার ঘরের দিকেই গেল না। মিস সালিভ্যান দেখলেন তাঁর ছাত্রী এখন পর্যন্ত শিষ্টাচারও কিছু শেখে নি। টেবিলে খাবার এলেই সে যা খুশী তাই হাত দিয়ে উঠিয়ে নিতে চায়—অন্যের প্লেটে হাতদিয়ে তা থেকে খাবার তুলে নিয়ে নিজের মুখে পোরে। চামচ, ন্যাপকিন ইত্যাদিও সে খাবার সময়ে ব্যবহার করতে চায় না। একদিন সে মিস সালিভ্যানের প্লেট থেকে যেই খাবার উঠিয়ে নিতে গিয়েছে, অমনি তিনি বাধা দিলেন। রেগে তক্ষুণি মেঝের উপরে শুয়ে পড়ে হেলেন অনবরত লাথি ছুঁড়তে ও চীৎকার করতে লাগলো। পরে শিক্ষিকা একটা চামচ দিতেই সে সেটা অমনি

মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। অবশেষে তিনি অতিকষ্টে তাকে দিয়েই সেটি মেঝে থেকে তুলিয়ে সেটি দিয়েই খেতে বাধ্য করলেন তাকে। হেলেন কিছুতেই ন্যাপকিন ব্যবহার করতেও চায় না। এই নিয়ে একদিন শিক্ষিকার সংগে এক ঘন্টা ধরে ধ্বস্তাধস্তি চললো। মিস সালিভ্যান কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি বুঝলেন এই দুরন্ত, অবাধ্য শিশুটিকে বশে আনতে তাঁকে প্রথমে বেশ বেগে পেতে হবে এবং তাঁকে শাসনে অচল, অটল থাকতেই হবে। ছাত্রীর গৃহপরিবেশ যে তার শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়, একথা বুঝে তিনি তাকে নিয়ে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যেও একটু দূরে যাওয়া ঠিক করলেন। বাড়ী থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে কেলারদের একটি ছোট বাগান বাড়ী ছিল। তিনি হেলেনকে নিয়ে সেখানেই কয়েক সপ্তাহ থাকবেন বলে প্রস্তাব করলেন। প্রথমে কেলার দম্পতি এ প্রস্তাবে রাজী হন নি। শেষে অনেক করে বোঝাতে ক্যাপ্টেন কেলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিলেন। মিস সালিভ্যান দেখলেন ছাত্রীকে বাধ্যতা ও আনুগত্য শেখানো নিতান্তই দরকার। সেজন্যে তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে তাকে একান্তভাবেই তাঁর উপরেই নির্ভরশীল হতে হবে।

বাগান বাড়ীতে গিয়ে হেলেন প্রথমে একটু গোলমাল বাধিয়েছিল। রাতে সে কিছুতেই বিছানায় শোবে না। কিন্তু যেমনি জেদী সে নিজে, তেমনি জেদী তার শিক্ষিকাও। শেষ পর্যন্ত তাকেই হার মানতে হলো। তারপর সে অনেকটা শান্ত হয়ে এল। সে রোজই নতুন নতুন শব্দ বানান করতে শেখে। কিন্তু একাজে সে বিশেষ আনন্দ পায় বলে মনে হয় না। বানান করা শেষ হলেই যেন সে বাঁচে।......আস্তে আস্তে তার স্বভাবেও কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হতে লাগলো। সে আর দুরন্তপনা করে না। কোনও কাজ দিলে সে তা বেশ খুশী মনেই



অন্ধ ও বধির হেলেন কেলার বোম্বে নগরীতে এক সামাজিক সম্মেলনে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে তারিখ টাউনহলে গুড্‌উইল ভিজিটে বক্তৃতা দিচ্ছেন সঙ্গে তার সেক্রেটারী মিস্ পলি টমসন

করে। মন ভালো থাকলে সে কখনও কখনও তার শিক্ষিকার কোলে গিয়েও দু' এক মিনিট বসে। তিনি তাকে চুমু খেলেও সে আর আপত্তি করে না। সে যেন অনেকটা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে—বুঝেছে তাঁর আদেশ পালন না করে তার উপায় নেই। ছাত্রীর ক্রমশঃ বুদ্ধি খুলছে দেখে মিস সালিভ্যানের আনন্দ আর ধরে না।......সপ্তাহ দুই পরে তিনি হেলেনকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তিনি তার মা বাবাকে বললেন এতোদিনে তাঁদের মেয়েকে অনেকটা তিনি বশে আনতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁরা যদি সব সময়েই তার অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দেন, তাহলে তাঁর সব শ্রমই পন্ড হবে। কেলার দম্পতি মেয়ের স্বভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে খুবই খুশী হলেন। তাঁরা মিস সালিভ্যানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর কোনও কাজে তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না।

হেলেন আর দুরন্তপনা করেনা দেখে তার শিক্ষিকা খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন—ভাবলেন তার স্বভাব হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু শীগগিরই তাঁর সে ভুল ভাঙলো। একদিন খাবার টেবিলে যতোবারই তিনি হেলেনের গলায় ন্যাপকিন জড়িয়ে দেন, ততোবারই সে সেটি গলা থেকে টেনে খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে এবং টেবিলে লাথি মারতে থাকে। মিস সালিভ্যান তার খাবারের প্লেটটি সরিয়ে নিয়ে তাকে ঘর থেকে বার করে দিতে চাইলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন কেলার তাতে বাধা দিলেন। তিনি চান না তাঁর মেয়ে অভুক্ত থাকে। সে রাতে খাবার পরে হেলেন আর তার শিক্ষিকার ঘরে গেলই না। পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেতে গিয়ে মিস সালিভ্যান দেখলেন হেলেন তিনি নামবার আগেই তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে আছে, এবং তার থুতনীর নীচে ন্যাপকিন। শিক্ষিকাকে দেখেই সে ইসারায় ন্যাপকিনটি তাঁকে দেখালো। তিনি কোনও আপত্তি করলেন না দেখে সে যেন বেশ খুশীই হলো। ঘর থেকে বেরুবার আগে শিক্ষিকার একখানি হাত নিয়ে তা খানিক থাবড়ালো। মনে হলো সে যেন এখন সন্ধি স্থাপন করতেই চায়। পরে সে যখন উপরে শিক্ষিকার ঘরে রোজকার মতো পাঠ নিতে গেল দেখলো টেবিলে সেদিন সবই আছে—নেই শুধু কেক। কোন শব্দ তাড়াতাড়ি বানান করতে পারলে মিস সালিভ্যান তাকে পুরস্কারস্বরূপ কেক দিতেন। আজ কেক নেই দেখে সে ইসারায় কেক চাইলো। মিস সালিভ্যান তখন তার গলায় একটি ন্যাপকিন জড়িয়ে দিয়ে তক্ষুণি সেটি টেনে খুলে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা নাড়লেন। এরকম কয়েকবার করতেই হেলেন ব্যাপারটি বুঝলো। সে অমনি নিজের হাতের উপর চপেটাঘাত করে নিজের মাথাটি ঝাঁকালো। রোজকার মতো পাঠ শুরু হতেই হেলেন একটি শব্দ অর্ধেক বানান করেই থেমে গেলো। পরে ন্যাপকিনটি নিয়ে নিজের গলায় সেটি পিন দিয়ে আটকিয়ে সে কেকের জন্যে ইশারা করলো। বলতে চাইলো তাকে কেক দিলে সে আর দুষ্টুমি করবে না। মিস সালিভ্যান তাকে সেদিন বেশ বড়ো এক টুকরো কেক দিলেন। কেক পেয়ে সে খুব খুশী হয়ে নিজেকে থাবড়ালো।

মিস সালিভ্যান শিশু হেলেনকে একটি স্বাভাবিক শিশুর মতোই শিক্ষা দিতে চাইলেন। তিনি তাকে নিয়ে বেশীর ভাগ সময় বাগানেই কাটান। সেখানে তাঁর শিশু ছাত্রী প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পায়। সে মাটি খোঁড়ে, ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করে। বাগানে সে প্রকৃত বস্তু পর্যবেক্ষণ করে অনেক কিছু শিখতেও পায়। সে দেখে বিশ্বপ্রকৃতিতে—গাছ পালা, ফুল ফল, পশু পাখী, কীট পতঙ্গ—সবেরই জীবন ক্রমবর্ধনশীল। এগুলির জীবনরহস্য সম্বন্ধে তার মনে জাগে অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল, এবং এগুলির প্রতি তার গভীর মমত্ব ও দরদ ও জন্মায়। মাটির নীচে ছোট্ট একটি বীজ পোঁতা হলো। রোজ তাতে জল দেওয়াতে দেখা গেল সেই বীজটিই একদিন অংকুর হয়ে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠলো—আলোবাতাসের জন্যে। সেই অংকুরটিই আবার ক্রমে বেড়ে হ'লো ছোট একটি কচি চারাগাছ—যেটি একদিন বড়ো

গাছেই পরিণত হবে। গাছে ছোট্ট একটি কুঁড়ি থেকেই ফুটে উঠলো সুন্দর একটি ফুল। ফুলটি খানিক গন্ধ ছড়ালো, নিজ বর্ণসুষমায় একটুখানি বাগান আলো করে ঝরে গেল। হয়তো সেই ঝরা ফুল থেকেই বেরুলো একটি ফল। ফলটিও এতোটুকু থেকে ক্রমে বড়ো হতে থাকলো—পাকলো আর অমনি টুপ করে একদিন মাটিতে পড়ে গেল। মিস সালিভ্যানের বর্ণনা করবার ক্ষমতাটিও খুব অদ্ভুত। তাঁর চোখ দিয়েই তাঁর অন্ধ বধির শিশু ছাত্রীটি যেন সব কিছু দেখছে। সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে নেড়ে সব কিছু অনুভব করতেও চেষ্টা করে। হেলেন কেলার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"My teacher is so near to me that I scarcely think of myself apart from her. How much of my delight in all beautiful things is innate, and how much is due to her influence, I can never tell."—অর্থাৎ 'আমার শিক্ষিকা আমার এতো আপনার—তাঁর থেকে আলাদা করে আমি নিজেকে যেন কল্পনাই করতে পারি নে। এ জগতে সব সুন্দর জিনিস থেকে আমি যতো আনন্দ পেয়েছি তার কতোটুকু আমার নিজস্ব আর কতোটুকু আমার শিক্ষিকার কাছ থেকে পাওয়া তা বলা খুবই কঠিন।'

মিস সালিভ্যানের মতে উপযুক্ত পরিবেশে শিশুরা নিজে নিজেই অনেক কিছু শিখতে পারে। তাদের জন্যে প্রয়োজন শুধু শিক্ষক শিক্ষিকার সহানুভূতিপূর্ণ নির্দেশ ও পরিচালনা। তিনি তাই তাঁর ছাত্রীকেও অনেক কিছু নিজে নিজেই আবিষ্কার করে শিখতে দেন। তাকে কাজেও অনেকখানি স্বাধীনতা দিতে চেষ্টা করেন। তাকে তিনি কতোগুলি পুঁতি দিয়ে যেমন ইচ্ছা তেমন করে তা দিয়ে মালা গাঁথতে বলেন। তাকে জিজ্ঞেস করেন ক্রোশে দিয়ে না কাঁটা দিয়ে সে বুনতে চায়। হেলেন জিমনাস্টিকের নানা কসরৎ ও শিখেছে। সে ডাম্বেলও ভাঁজে। বেলা বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত সে বানান শেখে। তাছাড়া, সারাদিন ধরে সে যা যা কাজ করে শিক্ষিকা তার হাতে সব বানান করে দেখান। বেলা একটা থেকে দুটো পর্যন্ত মিস সালিভ্যান বিশ্রাম করেন। এই সময়ে হেলেন পুতুল নিয়ে খেলা করে, অথবা ছোট ছোট নিগ্রো ছেলেমেয়েদের সংগে উঠোনে খেলা করে।

মিস সালিভ্যান জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর শিশু ছাত্রীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগাতে চান। হেলেন বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে প্রজাপতির গায়ে হাত দিয়েছে—তার ডানাগুলিও ছুঁয়ে দেখেছে। ব্যাঙ ও ব্যাঙাচিকেও হাত দিয়ে ধরে অনুভব করেছে। বাড়ীতে পোষা জীবজন্তুও কিছু আছে। বিকালে মিস সালিভ্যান বিশ্রাম করে উঠবার পরে তিনি তাঁর শিশু ছাত্রীকে নিয়ে তাদের দেখাশুনা করতে যান। হেলেন তাদের খেতে দেয়। ঘোড়ার বাচ্চাদের ও গোরুর বাছুরদের ছুঁয়ে দেখে—তাঁদের আদর করে। মুরগীর বাচ্চাগুলির তুলোর মতোই নরম গা। হেলেন তাদের গায়ে হাত বুলায়—মুরগীর ডিমগুলিও ছুঁয়ে দেখে। কোনও ডিমের খোলা ফেটে হয়তো বাচ্চা বেরুচ্ছে, সে তাও হাত দিয়ে অনুভব করে। সদ্যোজাত শুয়োরের বাচ্চাগুলিকে কোলে নিয়ে তাদের নরম গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে। এই রকম করে জীবজন্তু, পশুপাখী, কীটপতঙ্গের উপরেও তার গভীর স্নেহ মমতা জন্মায়। তাদের জীবন সম্বন্ধেও তার অসীম কৌতূহল হয়।

বিকালে দিন ভালো থাকলে শিক্ষিকা তাঁর ছাত্রীকে নিয়ে গাড়ীতে বেড়াতে বেরোন। হেলেন স্বভাবতঃই বেশ মিশুক ও আমোদপ্রিয়। সে লোকের বাড়ীতে গিয়ে সকলের সংগে মেলা মেশা করতে খুবই ভালোবাসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের—বিশেষ করে যারা তার চেয়ে বয়সে ছোট—কতো আদর করে। তাদের অনেক খেয়াল ও আব্দারও সে নীরবে সহ্য করে। খুব ছোট শিশু দেখলে তার যেন সুপ্ত মাতৃত্বই জেগে ওঠে। সে তাকে মায়ের মতো করেই কোলে নিয়ে কতো আদর করে। এই রকম করে শিক্ষিকা তাঁর ছাত্রীকে সামাজিকতা ও শেখান।

রাত্রে খাবার পরে হেলেন তার শিক্ষিকার ঘরে গিয়ে তাঁকে এটা ওটা করতে সাহায্য করে। রাত ঠিক আটটার সময়ে সে পোশাক ছেড়ে ঘুমোতে যায়। সে এখন তার শিক্ষিকার সংগেই ঘুমোয়। তার মা তার জন্যে একজন নার্স রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিস সালিভ্যান তাতে আপত্তি করেন। তিনি নিজেই তাঁর ছাত্রীর নার্স। এই রকম করে সবসময়েই ছাত্রীকে নিজের কাছে কাছে রেখে সারাক্ষণই তাকে কিছু না কিছু শেখান।

এর পর শুরু হয় হেলেনের শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপ। সে এখন বুঝতে শিখেছে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি নাম আছে। যে জিনিসটির নাম জানতে চায় আঙুল দিয়ে সে সেটি দেখিয়ে দেয় এবং শিক্ষিকার হাত থাবড়ায়। 'মিল্ক' ও 'মাগ'—এই দু'টি কথা নিয়ে প্রথমে তার একটু গোলমাল ঠেকছিল। একদিন শিক্ষিকা তাকে জলের ঘরে নিয়ে গিয়ে কলের নীচে তার একটি হাত রেখে কল খুলে দিলেন, আর তার অন্য হাতে 'ওয়াটার' (water) কথাটি বানান করলেন—প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর তাড়াতাড়ি বানান করলেন। হাতের উপর ঠান্ডা জলের স্পর্শ পেয়েই হেলেন হঠাৎ যেন চমকে উঠলো। তার কোন্ ভুলে যাওয়া পূর্ব স্মৃতি যেন অমনি মথিত হয়ে উঠলো এবং মুহূর্তের মধ্যে ভাষার সমস্ত রহস্যই যেন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। সে সেখানে খানিকক্ষণ স্হানুর মতোই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এক নতুন আলোতে তার মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।......তারপর সব জিনিসের নাম জানবার জন্যে তার কী ব্যাকুল আগ্রহ! সেদিন কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সে ত্রিশটা নতুন শব্দ বানান করতে শিখলো। সেদিনকার সেই ছোট ঘটনাটির স্মৃতি যেন তার জীবনে অম্লান, অক্ষয় হয়েই চিরজাগরূক হয়ে রয়েছে। হেলেন কেলার তাঁর আত্মজীবনীতে এই দিনটি উল্লেখ করে লিখেছেন—"It would have been difficult to find a happier child than I was, as I lay in my crib at the close of that eventful day and lived over the joys it had brought me, and for the first time longed for a new day to come."—অর্থাৎ সেই ঘটনাবহুল দিনটির শেষে আমি যখন আমার ছোট্ট খাটটিতে শুয়েছিলাম, তখন আমার চেয়ে সুখী জগতের আর কোন্ শিশু? সেদিনকার সুখস্মৃতিতে আমার সারা মনই তখন ভরপুর। সেদিনই প্রথম রজনীশেষে আমি নতুন দিনের জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় রইলাম।'

এমনি করেই হেলেন যেন ভাষার রাজ্যে ঢুকবার চাবিকাঠিটি সেদিন খুঁজে পেল। তার মনে জেগেছে অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা। সে যেখানেই শিক্ষিকার সংগে যায় প্রত্যেকটি নতুন জিনিসের নাম জানবার জন্যে তার কী অদ্ভুত ব্যাকুলতা! কোনও একটি নতুন নাম শিখলে তার আনন্দের আর সীমা থাকে না। তার ভাবলেশহীন মুখটিও ক্রমে ভাবব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। আগে সে ইশারায় অনেক মনের ভাব প্রকাশ করতো। এখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে সেই ইশারা গুলি ছেড়ে দিচ্ছে।......মিস সালিভ্যানও নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি ঠিক করলেন একটি দু' বছরের স্বভাবিক শিশু যেমন করে ভাষা শেখে তেমনি করেই তিনি হেলেনকে ভাষা শেখাবেন। প্রত্যেক শিশুরই জানবার ও শিখবার আগ্রহ ও শক্তি সহজাত। বহির্জগৎ তার সহজাত সংস্কারগুলিই ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে—উপযুক্ত উদ্দীপনা জুগিয়ে। অনুকরণ স্পৃহাও শিশুর সহজাত। কথা বলতে শিখবার আগেই সে অন্যদের কথা বুঝতে শেখে। মিস সালিভ্যান একটি পনেরো মাসের শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সে একটিও কথা বলতে পারতো না, কিন্তু সব কথাই বুঝতো। তাকে যা করতে বলা হতো তাও সে করতো। মিস সালিভ্যান ঠিক করলেন হেলেনকে এই স্বাভাবিক উপায়েই কথা শেখাবেন। সে কানে শুনতে পায় না। তাই কথাগুলি বার বার তার হাতে বানান করতে হবে। তার সংগে তিনি পূর্ণ বাক্যেই সবকথা

বলতে লাগলেন। শুধু প্রয়োজন হলে ইশারায় কথাগুলির মানে বুঝিয়ে দিতেন। ভাষা শেখাবার এই স্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করে খুবই ভালো ফল পাওয়া গেলো। হেলেন নিত্যই নতুন নতুন কথা শিখছে। অথচ সে বুঝতেও পারছেনা যে তাকে কিছু শেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সে যেন নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই কথা শিখছে। সে আস্তে আস্তে সব কথা বুঝাতেও শিখছে। তাকে যা বলা হয় তাই সে করে, যদিও এখনও সে পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে শেখেনি। কোনও মনোভাব প্রকাশ করতে হলে ছোট্ট শিশুর মতোই সে একটি বা দু'টি শব্দ বানান করে দেখায়। শিক্ষিকা সেইটিই আবার পূর্ণ বাক্যে বলেন। শিশুরা এই রকম বার বার শুনে শুনেই কথা বলতে শেখে।

মিস সালিভ্যান তাঁর ছাত্রীকে খেলাচ্ছলেও ভাষা শেখাতে চেষ্টা করেন। তাঁর শিশু ছাত্রীর সংগে তিনি নিজেও যেন একটি শিশু ব'নে গিয়েছেন। কতোগুলি জিনিস লুকিয়ে রেখে হেলেনকে সেগুলি খুঁজে বার করতে বলেন। তিনি নিজেও খোঁজেন। কে কতো তাড়াতাড়ি জিনিসগুলি খুঁজে বার করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে। এ খেলায় হেলেন প্রচুর আমোদ পায়। জিনিসের নাম শেখাবার পরে কতোগুলি গুণের নামও—যেমন শক্ত, নরম, টক, মিষ্টি, ঠান্ডা, গরম, ছোট, বড়ো ইত্যাদি—শেখানো দরকার হয়। মিস সালিভ্যান প্রকৃত জিনিসের গুণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছাত্রীর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন (association) দ্বারা গুণের নামগুলি বোঝাতে চেষ্টা করেন। যেমন টক জিনিস খাইয়ে ছাত্রীর হাতে 'টক' শব্দটি বানান করেন, শক্ত জিনিস তাকে হাত দিয়ে অনুভব করতে বলে তার হাতে 'শক্ত' শব্দটি বানান করেন। ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি শেখাবার সময়ে তিনি নিজে সেই কাজগুলি করে দেখান এবং হেলেনকে দিয়েও সেগুলি করান। পাঠদানের কোনও নির্দিষ্ট সময় না থাকাতে হেলেনের শিক্ষা আরও দ্রুত এগিয়ে চললো। অবশ্য দৃষ্টি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন অন্য স্বাভাবিক শিশুর মতোই সে তাড়াতাড়ি কথা শিখতে পারবে শিক্ষিকা কখনই এ আশা করেন না।

হেলেন বড়োই চঞ্চল। সে সর্বদাই একটা না একটা কিছু করতে চায়। এজন্যে সে অনেক



অন্ধদের পড়ার ব্রেইল অক্ষরে ছাপা বই হাত দিয়ে কেমন করে পড়ে দেখানো হচ্ছে

সময়ে অনেক জিনিস ভেঙেও নষ্ট করে। মিস সালিভ্যান অনেক চেষ্টা করেও তার এই অভ্যাসটি ছাড়াতে পারেন নি। একদিন একজন বন্ধু মেক্সিকো থেকে সুন্দর একটি পুতুল এনে হেলেনকে দিতেই তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন পাছে সে সেটি ভেঙে ফেলে। তিনি ইশারায় পুতুলের মাথা ভাঙা দেখিয়ে তার হাতে 'না', 'না' বানান করলেন—আরও বানান করলেন—'হেলেন দুষ্টু', 'শিক্ষিকা দুঃখিত'। তারপর খানিকক্ষণ নিজের মুখটি বিষণ্ণ করেও রইলেন। পরে তাকে দিয়ে পুতুলটিকে আদর করালেন ও চুমু খাওয়ালেন। হেলেন একটুখানি হেসে পুতুলটিকে নিয়ে উপরে চলে গেল এবং গিয়ে একটি আলমারীর উপরে রেখে দিলো।

হেলেনের দুরন্তপনা এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। একদিন সকালে মিস সালিভ্যান শোনেন সে রেগে খুব চেঁচাচ্ছে। ব্যাপার কি দেখতে গিয়ে তিনি দেখেন হেলেন একটি ঝিকে আঁচড়ে কামড়ে খামচে একবারে অস্থির করে তুলেছে। সে নাকি তার হাত থেকে একটি গ্লাস কেড়ে নিতে গিয়েছিল। মিস সালিভ্যান শক্ত করে হেলেনের হাত চেপে ধরতেই সে শান্ত হলো। পরে সান্ধ্যভোজনের সময় তিনি আর তার পাশে গিয়ে বসলেন না—তাকে চুমু খেতেও দিলেন না। তাই দেখে হেলেন তাঁকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খুব কাঁদতে লাগলো। পরে উপরে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বানান করলো কাল থেকে সে খুব ভালো মেয়ে হবে। এর পর থেকেই তার স্বভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। সে খুব স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলো।

মিস সালিভ্যান তাঁর ছাত্রীকে ভাষা শেখাবার জন্যে নানা উপায়ে তার অভিজ্ঞতা বাড়াতেও চেষ্টা করতে লাগলেন। বড়োদিনের সময়ে শিশুদের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি হেলেনকে নিয়ে যোগ দিলেন। "সান্টা কুজ" ও "ক্রীসমাস ট্রী" সম্বন্ধে হেলেনের সে কী ঔৎসুক্য! রাতে তার চোখে ঘুম নেই। সে জানে ঘুমিয়ে পড়লে "সান্টা ক্লজ" এলে যদি সে টেরই না পায়। মিস সালিভ্যান তাকে নিয়ে একদিন সার্কাস দেখতে গেলেন। সার্কাসের যে সব জন্তু জানোয়ারদের সম্ভব তিনি তাকে ছুঁয়ে নেড়ে দেখতেও দিলেন। হেলেন হাতীর পিঠে চড়লো—তাদের খেতেও দিলো। বাড়ী ফিরে তার মুখে আর সার্কাসের কথা ছাড়া কথাই নেই। একবার শিক্ষিকা হেলেনকে নিয়ে মেক্সিকো বেড়াতে গেলেন। এরই মধ্যে তার নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তার অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে কী বিরাট আয়োজন হলো! সে কতো ভোজে নিমন্ত্রণ পেলো! কতো জায়গায় বেড়ালো! তাকে দেখবার জন্যে লোকের সে কী আগ্রহ!

শিক্ষিকা যখনই হেলেনকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান তিনি সর্বদাই গাড়ীতে তার পাশে বসে জানালার ভিতর দিয়ে যা যা দেখতে পাচ্ছেন তা সবই তাকে বর্ণনা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন। কখনও কখনও হেলেন কোনও ছবি এনেও তাতে কি দেখা যাচ্ছে তা তাকে বর্ণনা করে বলতে বলে। এমনি করে সে রঙগুলির নাম শেখে—কোন রঙের কি বৈশিষ্ট্য তাও শেখে।

শিক্ষিকা ডাকঘরে চিঠি ফেলতে গেলে হেলেন অনেকবার তাঁর সংগে গিয়েছে। তাঁর ডাকে চিঠি ফেলা দেখে তার নিজের ও চিঠি লিখবার খুব ইচ্ছা হলো। তার আগ্রহ দেখে মিস সালিভ্যান তাকে চিঠি লিখতে শেখাতে লাগলেন। চিঠি ও ডাইরী লেখায় হেলেনের খুব উৎসাহ। সে গল্প শুনতে ও খুব ভালোবাসে। শিক্ষিকা তাকে কতো সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন—কতো ছড়া কবিতাও শেখান! একদিন তিনি দেখেন হেলেন মস্তো বড়ো একটি বই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তাই দেখে তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না যে তাঁর ছাত্রীর বই পড়বার খুব সখ হয়েছে। তিনি তাকে পড়তে শেখাতে শুরু করলেন। বই পড়ায় হেলেনের আগ্রহের সীমা নেই। সে বই এর লাইনগুলির উপর আঙুল বুলিয়ে জানা শব্দগুলি বার করে এবং অজানা শব্দগুলির অর্থ অনুমান করতে চেষ্টা করে। ক্রমে মিস সালিভ্যান তাকে পঠনে, অংকে, ভূগোলে, উদ্ভিদ-বিদ্যায়, প্রাণীবিদ্যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে

নিয়মিত পাঠ দিতে লাগলেন। এর আগে আড়াই বছর ধরে তিনি তাকে সব বিষয় খেলাচ্ছলেই শিখিয়েছেন।

হেলেন কেলারের আত্মজীবনীখানি পড়লেই বোঝা যায় ভাষার উপরে তাঁর কতোখানি দখল। বই পড়েই তিনি এতো সুন্দর লিখতে শিখেছেন। বই পড়ায় তাঁর ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই। বইই যে তাঁকে অন্ধতার চিরতমসার ভিতরে আলোক-রশ্মির সন্ধান দিয়েছে। তাঁর অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু অনেক ভালো ভালো বই ব্রেইল অক্ষরে ছাপিয়ে তাঁর পড়বার খোরাক জুগিয়েছেন। তাঁর অনন্য সাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি ও তাঁকে ভাষা শিখতে খুব সাহায্য করেছে। তিনি একবার যা পড়েন তা সহজে ভোলেন না।

মিস সালিভ্যান হেলেনের শিক্ষার ভার নেবার বছর তিনেক পরে সে কথা বলতে শিখতে শুরু করে। রাগ্‌ন হিল্‌ড কাটা নাম্নী একটি অন্ধ বধির বালিকা তার শিক্ষিকার মুখ স্পর্শ করে তাঁর ঠোঁট নাড়া থেকে কথা বলতে শেখে। তাই জেনে হেলেনও কথা বলতে শিখতে খুব আগ্রহান্বিত হয়। শিক্ষিকা ছাত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে তাকে কথা বলতে শেখাবার ব্যবস্থা করেন। এই কাজে হেলেন তার সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করে অল্প সময়ের মধ্যেই অপূর্ব সাফল্য লাভে সক্ষম হয়। হেলেন কেলার এখন বক্তৃতা দিতেও পারেন। কথা বলতে শেখার জন্যেই তিনি স্কুল কলেজের শিক্ষালাভেরও সুযোগ পেলেন। তিনি ইংরিজি ছাড়াও ফ্রেন্স, জার্মান, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা জানেন।

সেদিনকার সেই দুরন্ত প্রাণচঞ্চল শিশুটিকে আজকের এই বিদুষী মহীয়সী হেলেন কেলারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর বিধি বিড়ম্বিত ভাগ্য আজ আর কারো মনে করুণার সঞ্চার করে না—করে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের। যেভাবে তিনি দুর্ভাগ্যকে জয় করে নিজ বিড়ম্বিত



কলিকাতা ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে ডাঃ হেলেনের বক্তৃতা প্রদান—হস্তস্পর্শ দ্বারা মিস্‌ টমসনের সঙ্গে

জীবনকে পরম সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে পেরেছেন তাই আজ তাঁকে জগতের চোখে বড়ো করে তুলেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে তাঁর মমতাময়ী প্রতিভাশালিনী শিক্ষিকার দৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ। তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শেই এক জেদী, অবাধ্য, দুর্দান্ত শিশু হয়ে উঠলো আজকের এই হেলেন কেলার—স্নেহ, মমতা, করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁর জীবনের অসামান্য সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর শিক্ষিকার ও অনেকখানি কৃতিত্ব—তাঁর অসীম ধৈর্য, সহানুভূতি ও অধ্যবসায়।

হেলেন কেলারের সার্থক জীবন জগতের বর্তমান ও আগামীকালের সহস্র সহস্র অন্ধ মূক বধিরদের অন্তরে জাগাবে অশেষ আশা ও মনোবল। মিস সালিভ্যানের সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান ও ভাবীকালের অন্ধ বধিরদের শিক্ষার পথটিকে করবে সুগম ও সহজ।

ধন্য হেলেন কেলার! ধন্য মিস সালিভ্যান!

... ...

তোমাদের সুখদুঃখে আমার সুখদুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমন্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইবনা—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানিনা। আমার এ রুদ্ধ নয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকা-সকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি এই সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্তসকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

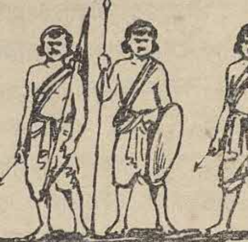
ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই। সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক প্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম—

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকো কলি—

রজনী—বঙ্কিমচন্দ্র



ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী



সিপাহী-বিদ্রোহেরও আটাশ বছর আগেকার কথা।

সারা ভারতে তখন ইংরেজের শাসন-শোষণ ও উৎপীড়ন চলছে অব্যাহত ভাবে। হঠাৎ পূর্ব-ভারতে ব্রিটিশরাজের টনক নড়ে উঠলঃ আসামের ক্ষুদ্র রাজ্য খাসিয়া পাহাড়ের আদিবাসীরা রাজা তীর্থ সিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শুধু বিদ্রোহ ঘোষণাই করে নি, সশস্ত্র সংগ্রামেরও তোড়জোড় সুরু করে দিয়েছে।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সেই প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সিপাহী-বিদ্রোহের কথা আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সগৌরবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সমগ্র ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম যিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, দুঃখের বিষয়, আজও দেশবাসীর নিকট তিনি যথোচিত মর্য্যাদা লাভ করতে পারেন নি।

আদিবাসীরা ভারতের খাঁটি মাটির মানুষ। আর্য্যদের ভারতে আগমনের বহু আগেই তারা এসে এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। তাই এদেশের মাটির সঙ্গে তাদের একেবারে নাড়ীর যোগ। বিদেশী শাসনকে কখনো তারা নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে নি। মুসলমান যুগের কথা ছেড়েই দিলাম, ব্রিটিশ আমলেও তারা বারবার পরবশ্যতার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। খাসিয়া রাজা তীর্থ সিং-এর মত নাগারাণী গাইডিলিউর কথাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা সমীচীন, আগস্ট আন্দোলনের সময় প্রাণদন্ডে দন্ডিত কমলা মিরির কথা ভুলে যাওয়াও অন্যায়।



শ্রীরাম রাজা

শুধু আসামেরই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আদিবাসীরাও প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে উৎখাত করবার জন্যে। মহাত্মা গান্ধীরও আগে মুন্ডানেতা বীরসা ভগবান যে, মুন্ডাদের মুলুকে করবন্ধ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন সে খবর আমরা কয়জন রাখি! ওদিকে অন্ধ্রদেশের এজেন্সী অঞ্চলের কোন্ডা ডোরা নামক আদিবাসীরা আল্লুড়ি শ্রীরাম রাজার (সীতারাম রাজু)

পরিচালনাধীনে অন্ধ্রের পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজ সরকারকে যে সাময়িক ভাবে বানচাল করে দিয়েছিল সে সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিবহাল নই। ভীল জননায়ক মোতীলাল তেজাবৎ, মুন্ডানেতা নির্ম্মল এবং কাছাড়ীনেতা মধুবনও আমাদের নিকট অপরিচিত। এই সকল আদিবাসী দেশ-প্রেমিক বীরবৃন্দের কথা বাদ দিলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হতে পারে না। আদিবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বাস্তবিকই ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সেই গৌরবের সুমেরুচূড়ায় যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত তেমনি কয়েক-জন আদিবাসী বীরপুরুষ এবং একটি বীরাঙ্গনার কৃতির কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

।। তীর্থ সিং ।।

আদিবাসীদের স্বাধীনতাপ্রীতির প্রসঙ্গে সকলের আগে উল্লেখযোগ্য তীর্থ সিং-এর কথা। এদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুথান হয় তাঁরই নেতৃত্বে। তীর্থ সিং-এর সমকালে তাঁর সমকক্ষ স্বদেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা যে সমগ্র আসামে আর দ্বিতীয়টি ছিল না সেকথা কোনো কোনো ইংরেজও স্বীকার করেছেন।

তীর্থ সিং ছিলেন খাসিয়া পাহাড়ের নংক্লো রাজ্যের 'সিম' বা সামন্ত রাজা।

দক্ষিণ আসাম ইংরেজদের হস্তগত হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। আসামের প্রথম ব্রিটিশ এজেন্ট মিঃ স্কট ছিলেন অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থ সিং-এর সঙ্গে মিঃ স্কটের এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে সিমের* রাজ্য নংক্লো আসে ব্রিটিশের রক্ষণব্যবস্থার অধীনে। এর কিছুকাল পরেই তীর্থ সিং স্কটের কূটকৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে নিজ রাজ্যের ভেতর দিয়ে ইংরেজদের রাস্তা নির্ম্মাণের অনুমতি দেন। কিন্তু এই নবনির্ম্মিত রাজ-পথের বুকের ওপর দিয়ে দিনরাত যখন ইংরেজ-সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে চলাচল করতে লাগল তখন তীর্থ সিং নিজের ভুল বুঝতে পারলেন: কি সর্ব্বনাশ তিনি করেছেন, খাল কেটে এনেছেন কুমীর!

এই সময়ে খাসিয়াদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব, মল্লিমের সামন্ত রাজা বরমাণিকের আহ্বানে সমস্ত পাহাড়িয়া সামন্ত রাজা এবং সর্দ্দাররা একযোগে নিজ নিজ অঞ্চল থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার তোড়-জোড় সুরু করে দিয়েছে। মসিং-এর মুকুন্দ সিং এসে যোগ দিয়েছেন এদের দলে। শেষ পর্যন্ত তীর্থ সিং এসে যখন এই বিদ্রোহী পার্বত্য নেতাদের পাশে দাঁড়ালেন তখন তাঁদের শক্তি-বৃদ্ধি হল প্রভূত পরিমাণে।

প্রত্যাসন্ন বিপদের পূর্ব্বাভাস পেয়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে মিঃ স্কট একদল সৈন্য সহ ঝড়ের বেগে চেরাপুঞ্জীর দিকে অগ্রসর হলেন। খাসিয়ারা তাঁর মতলব বুঝতে পেরে আগে থেকেই তৈরী ছিল। ফলে মিঃ স্কট পরাজিত এবং রীতিমত জব্দ হলেন। এই জয়লাভে উৎসাহিত হয়ে খাসিয়ারা ইংরেজদের পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে অনুষ্ঠিত হল সেই শোচনীয় ব্যাপার ইতিহাসে যা কুখ্যাত হয়ে আছে নংক্লো হত্যাকান্ড নামে। নংক্লোয়ের ইংরেজদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলল খাসিয়ারা।

এই হত্যাকান্ডের পর বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, এবার প্রতিবেশী গারোরাও এসে বিদ্রোহীদের দলপুষ্টি করতে লাগল। বিদেশী ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে "নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড", "বন্য জাতির বর্ব্বরতার প্রকাশ" ইত্যাদি বলে বর্ণনা করে একে খেলো করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এ তো হল আসল ব্যাপারের বিকৃত ব্যাখ্যা। এর মূল ছিল গভীরে, ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি-লাভের উদ্দেশ্যেই খাসিয়াজাতি সেদিন একজোট হয়েছিল।

* খাসিয়া সামন্ত রাজাদের বলা হয় সিম।

তীর্থ সিং শুধু মহাবীরই ছিলেন না, তিনি একজন কূট রাজনীতিবিদও ছিলেন। ইংরেজ-বিতাড়নের জন্যে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা যেমন ব্যাপক তেমনি বিরাট। এই বিদ্রোহের আগুন যাতে সারা আসামে ছড়িয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে নিজের মতলবের কথা জানিয়ে তিনি দূত পাঠালেন আহোম রাজা চন্দ্রকান্তের নিকট। ভুটিয়া এবং সিংফোদের নিকটেও যথাসময়ে খবর গেল। আসামে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বলাবল কিরূপ তা জানবার জন্যে তীর্থ সিং গৌহাটি এবং অন্যান্য স্থানে গুপ্তচর পাঠালেন।

এখন মিঃ স্কট পড়লেন মহা ফাঁপরে, আসামের উপত্যকাভূমিতে যাতায়াতের দিকটা আগলে রেখেছে খাসিয়ারা, সেদিক থেকে কোনো রকম সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই।

সৌভাগ্যক্রমে মিঃ স্কটের মুশকিল-আসানের উপায় হল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য এল সিলেটের দিক থেকে। ক্যাপ্টেন লিস্টার একদল সৈন্য সহ চেরাপুঞ্জীতে গিয়ে পৌঁছলেন এবং মিঃ স্কট ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সেই সঙ্কট-জনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন।

ইতিমধ্যে নংক্লৌ হত্যাকান্ডের খবর গিয়ে পৌঁছেছে কলকাতার সরকারী মহলে। কর্ত্তাদের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আসামস্থ ব্রিটিশ এজেন্টকে তাঁরা নির্দ্দেশ দিলেন এই অসভ্য পাহাড়ীদের ঢিট করতে। ফতোয়া জারী করলেনঃ তীর্থ সিংকে যেন গণ্য করা এমন একজন "রক্তপিপাসু বুনো খুনী" রূপে, প্রাণ-দন্ডই যার উপযুক্ত শাস্তি।

তীর্থ সিং এবং অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের শায়েস্তা করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন ইংরেজ সরকার। তাদের রাজ্যের বহু অঞ্চল দখল এবং ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল অনেকগুলি খাসিয়া গ্রাম। এত অত্যাচার সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা কিন্তু বশ্যতা-স্বীকার করলে না।

এই যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ স্কট অকস্মাৎ মারা গেলেন। তাঁর পরবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ তীর্থ সিংকে বেকায়দায় ফেলবার উদ্দেশ্যে এক চাল চাললেন। ১৮৩২ সালের ২৩শে আগস্ট যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করা হল। দিনকতক পরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ক্যাপ্টেন লিস্টার খাসিয়া পাহাড়ের ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গুহায় গিয়ে তীর্থ সিংহের সহিত দেখা করলেন।

ক্যাপ্টেন লিস্টারের প্রস্তাব শুনে তীর্থ সিংহ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেনঃ—"সন্ধি হতে পারে কেবলমাত্র দুটি সর্ত্তেঃ (১) নূতন তৈরী রাস্তাটির ওপর ইংরেজদের দখল ছেড়ে দিতে হবে, আর (২) আমার নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

তীর্থ সিংহের মুখে যে এ-ধরনের কথা শুনবেন তা আশা করতে পারেন নি ক্যাপ্টেন লিস্টার। কি জবাব দেবেন তিনি! এ সকল দাবি সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করবার নির্দ্দেশ তো তাঁকে দেননি সরকার। কাজেই আপস-আলোচনায় কোনো সুরাহা হল না, ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিয়ে চলে এলেন ক্যাপ্টেন লিস্টার।

এবার মিঃ রবার্টসন খাসিয়াদের 'ভাতে মারবার' উদ্দেশ্যে খাসিয়া পাহাড়ের চারিদিকে রচনা করলেন অর্থনৈতিক অবরোধ-প্রাচীর। খাসিয়াদের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল সঙ্কটজনক। মীরজাফর, উমিচাঁদের সগোত্র, বিশ্বাসঘাতক খাসিয়া সিম সিং মাণিক সুযোগ বুঝে এই সময় বারবার তীর্থ সিং-এর চোখের সামনে ভবিষ্যতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরতে লাগলেন, বললেনঃ তিনি যদি ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ না করেন তা হলে খাসিয়াজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এদিকে খাসিয়াদের লোকবল নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, অনেকে দল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হতাশ হয়ে পড়ছেন তীর্থ সিং। এ অবস্থায় সিং মাণিকের ওষুধের প্রতিক্রিয়া ঠিক মতই হল। ১৮৩৩-এর ১৩ই জানুয়ারি স্বধীনতাপ্রিয় বীর যোদ্ধা তীর্থ সিং ব্রিটিশ সরকারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করলেন।

এবার সুরু হল তীর্থ সিং-এর বিষাদমাখা জীবনের শেষ অধ্যায়। প্রথমে তাঁকে পাঠানো

হল গৌহাটিতে। পলিটিক্যাল এজেন্ট আদেশ দিলেন, তাঁকে ভারতের বাইরে টেনাসেরিম প্রদেশে অন্তরিত করা হবে। কিন্তু বাংলা সরকার তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে সেখানে আটক রাখা সাব্যস্ত করলেন। তখন তাঁর গৌরবের দিন অবসান হয়েছে, এবার তিনি সর্ব্বহারা, রিক্ত কপর্দ্দকহীন। এই রাজভিখারী যেদিন ঢাকায় গিয়ে পৌঁছলেন সেদিন একটি মাত্র মোটা কম্বল ছাড়া তাঁর আর কোনো গাত্রাবরণ ছিল না। প্রথমে জেলে তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে রাখা হয়, শেষে আলাদা একটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে তাঁর জন্যে মাসিক ৬৩্ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সরকার দয়া করে তাঁর জন্যে দুটি চাকরও রেখে দেন। এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তীর্থ সিং-এর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এমনি ভাবে ইংরেজের বিধানে শেষ স্বাধীন খাসিয়া নৃপতি তাঁর চিরপ্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে নিভৃত বন্দীনিবাসে তিল তিল করে মরণের পথে এগোতে থাকেন।

অবশেষে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু তাঁকে সকল দুঃখদুর্গতি, সকল জ্বালাযন্ত্রণা আর অপমান লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

তাঁর মৃত্যুর সতের বৎসর পরে দেশে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল—কিন্তু সে হল ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর দ্বিতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহ। বাহাদুর শাহকে যে গৌরবের আসনে আমরা আজ বসিয়েছি তার পুরোভাগে তীর্থ সিং-এর স্থান।

।। নাগারাণী গাইডিলিউ ।।

১৯৩০ সাল। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যায় ভেসে গেছে সারা দেশ। সেই আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস আসামের সমতল অঞ্চল অতিক্রম করে নাগা পাহাড়কে গিয়ে স্পর্শ করল।

বহুদিন ধরে বৃটিশ শাসনের হাত থেকে নাগাজাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখছিল দুটি তরুণ-তরুণী—যাদুনাঙ্ আর তার সম্পর্কিতা বোন গাইডিলিউ। গান্ধীজীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ভ্রাতা-ভগ্নী। এদের উভয়েরই আদিম রক্তে হিংসার বীজ। তাই মহাত্মাজীর অহিংসার আদর্শ এরা হয়তো বোঝে নি, তবে এটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, শাসক ইংরেজরা তাদের মাতৃভূমির পরম শত্রু, এই বিজাতির অধীনতাপাশ ছিন্ন করবার জন্যে হানতে হবে চরম আঘাত। মহাত্মাজীর আদর্শে নাগা পাহাড়ে তারা করবন্ধ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করল—ব্রিটিশ-শাসনের কবল-মুক্ত হয়ে 'নাগারাজ' প্রতিষ্ঠা করাই হল তাদের উদ্দেশ্য।

কাবুই নাগাবংশের কন্যা গাইডিলিউ। ছোটবেলা থেকেই খৃষ্টান মিশনারীদের পরি-চালিত একটি স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ হয়। সেখানে পড়েন তিনি নবম দশম মান পর্য্যন্ত। স্কুলে পড়বার সময়ই গান্ধীজীর নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং মহাত্মাজীর স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেন। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নাগাজাতির মুক্তির কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে সুরু করেন এবং কি ভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নাগাদের বিদ্রোহী করে তোলা যায় সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন।

অবশেষে সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হল। যাদুনাঙের সঙ্গে মিলিত হয়ে নাগাদের তিনি ক্ষেপিয়ে তুললেন। তারা গৃহকর দেওয়া বন্ধ করলে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম মেনে নিয়ে মজুরের কাজ করতেও অসম্মতি জানালে। দেখতে দেখতে নাগা পাহাড়ে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠল। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সূচনাতেই এ বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন এবং অনেক তোড়জোড়ের ফলে সরকারী কর্ম্মচারীরা যাদুনাঙকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। তাঁকে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। আন্দোলনের গতি কিন্তু এতে ব্যাহত হল না। এবার মুক্তিসংগ্রামে জাতিকে পরিচালিত করবার ভার গ্রহণ করলেন গাইডিলিউ স্বয়ং—নাগারা তাঁকে রাণী আখ্যায়

ভূষিত করলে—এই নাগারাণীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ এবার দানা বেঁধে উঠল।

এবার রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ইংরেজ সরকারঃ অবস্থা যে ধীরে ধীরে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে! কাজেই অবিলম্বে গাইডিলিউকে বন্দিনী করা দরকার। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করলেন, যে-কেউ গাইডিলিউকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে ৫০০ ্ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট খবর পেঁাছল যে, রাণী গাইডিলিউ খনোমা গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

দিনকতক পরে একদিন ঘুম থেকে উঠে খনোমা গ্রামের অধিবাসীরা তো অবাকঃ ইংরেজ সৈন্যেরা যে তাদের গ্রামটিকে চারদিক দিয়ে একেবারে ঘেরাও করে ফেলেছে! তাদের যে আর তৈরী হবার অবসরটুকুও নেই।

গাঁয়ের উপর চড়াও হয়ে ইংরেজরা গাইডিলিউ এবং তাঁর অনুচরদের খুঁজে বের করলে। ১৯৩২ সালের ১৭ই অক্টোবর শত্রুহস্তে বন্দিনী হলেন রাণী গাইডিলিউ, এর পর নাগা-বিদ্রোহ প্রশমিত হতে বিলম্ব হল না। মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট গাইডিলিউকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করলেন—তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর।

এই বিদ্রোহিণী নাগা তরুণীর দিন কাটছিল যখন কারাগারের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে, সেই সময় পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু যান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আসাম সফরে। গাইডিলিউর স্বাধীনতা-প্রীতি এবং স্বজাতির মুক্তিবিধানের জন্যে অপরিসীম দুঃখবরণের কথা শুনে তিনি অভিভূত হন। এবং তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ থেকেই দেশ-বাসী প্রথম ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের কথা অবগত হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর নির্জ্জন কারাবাস থেকে মুক্তিলাভ করেন গাইডিলিউ। যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অপচয় হয়েছে তাঁর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে। কিন্তু তাঁর জীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নাগারাও মুক্তিলাভ করেছে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে। নূতন রাজ্য নাগাভূমির প্রতিষ্ঠা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

এদেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে নাগা-রাণী গাইডিলিউর অতুলনীয় দেশপ্রেম ও বীরত্ব-কাহিনী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



বীরসা ভগবান

।। বীরসা ভগবান ।।

"ভাই সব, এগিয়ে এসো দেশের সেবায়, বন্ধ করো ইংরেজ সরকারকে খাজনা দেওয়া", এ দেশে এই উক্তি যাঁর মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিল তিনি একজন আদিবাসী, নাম বীরসা ভগবান। ভগবান তাঁর কৌলিক পদবী নয়, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে বসিয়েছিল দেবতার আসনে। তাই তো আজও তিনি তাদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন বীরসা ভগবান এই নামে।

ভারতের মুক্তিসাধকদের অন্যতম বীরসা ভগবান। মহাত্মা গান্ধীর বহুপূর্বে এই আদিবাসী নেতা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম অস্ত্র রূপে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে একটি নূতন সমরনীতি প্রবর্ত্তনের গৌরব যেমন এই আদিবাসী নেতার প্রাপ্য তেমনি তাঁর অনুগামী মুন্ডা যুবকদের আত্মদানের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৮৭৪ সালে রাঁচির এক মুন্ডা পরিবারে বীরসার জন্ম হয়। ছোটবেলায় তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদের এক স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে লেখাপড়া শেখেন, সামান্য ইংরেজীও তিনি শিখেছিলেন। জার্মান মিশনারী কর্ত্তৃক তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন খ্রীষ্টধর্ম্মে।

জাতির দুঃখদুর্গতি কিশোর বয়সেই বীরসার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করে তুলল। ইংরেজের অত্যাচারের থেকে স্বজাতি মুন্ডাদের কি ভাবে বাঁচানো যায় তাই হল তাঁর একমাত্র ভাবনা। রাঁচি থেকে একদিন চলে গেলেন তিনি পাহাড়ের উপরকার তাঁর নিরালা পল্লীকুটিরে। গ্রামবাসীদের ডেকে বললেনঃ "ভাই সব তোমরা ওঠো, জাগো। দেবতা স্বপ্নে আমায় প্রত্যাদেশ দিয়েছেন—মুন্ডাদের এবার দেশের কাজে লাগতে হবে। তোমরা মদ ছাড়, পৈতে নাও, নিরামিষ খাওয়া সুরু করো।"

বীরসার কথায় মুন্ডারা এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল, মুন্ডাদের এলাকায় জাগল এক প্রবল আন্দোলনের সাড়া। বীরসার নির্দ্দেশে তারা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করলে। ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বাধল বীরসাপন্থীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। মুন্ডারা ক্ষেপে গিয়ে থানা কাছারি আদালত ইত্যাদি পুড়িয়ে দিতে লাগল এবং রেলপথ ধবংস ও টেলিগ্রাফের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিলে। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট মনে মনে প্রমাদ গণলেন। অবশেষে বীরসাকে গ্রেফ্তার করে রাঁচি জেলে এনে বন্দী করে রাখা হল।

যেদিন বীরসা ভগবানকে জেলে পোরা হয় সেই রাত্রিতেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, উঠল প্রচন্ড ঝড়—এই জননায়কের লাঞ্ছনায় প্রকৃতি যেন ক্ষেপে উঠল। ঝড়ের ঝাপ্টায় ধ্বসে পড়ে গেল রাঁচি জেলের প্রাচীর। বীরসাকে তখন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল হাজারিবাগ জেলে। কিন্তু ইংরেজের সাধ্য কি এই মুক্তিপূজারীকে বন্দীশালায় আটক রাখে। হাজারিবাগ জেলে ১৯০২ সালে বীরসার জীবনান্ত হল।

।। আল্লুড়ি সীতারাম রাজু
ও
কোন্ডা ডোরাদের মুক্তিসংগ্রাম ।।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অন্ধ্রের এজেন্সী অঞ্চলের কোন্ডা ডোরা নামক আদিবাসীদের মুক্তিসংগ্রাম যিনি পরিচালনা করেছিলেন সেই মহাবীর আল্লুড়ি সীতারাম রাজু (শ্রীরাম রাজা) ছিলেন ধর্ম্মে হিন্দু, জাতিতে তেলুগু। কিন্তু অত্যাচরিত কোন্ডা ডোরাদের বেদনা তাঁর বুকে গভীর ভাবে বেজেছিল। চরম দুর্দ্দিনে তিনি শুধু যে তাদের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাই নয়, তিনি হয়ে গিয়েছিলেন তাদেরই একজন।

কৃষ্ণদেবুপেটা পাহাড়ে কোন্ডা ডোরাদের বাস। একেই তো তাদের দুঃখদারিদ্র্যের পরিসীমা ছিল না তার উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মুট্টাদারি প্রথা প্রবর্ত্তন করে তাদের জীবনকে একেবারে দুর্ব্বহ করে তুলেছিলেন। মুট্টাদারদের নির্ম্মম শোষণে কোন্ডা ডোরারা দুর্গতির চরম সীমায় গিয়ে পেঁছেছিল। মাঝে মাঝে আবার চলত তহশীলদারদের অমানুষিক উৎপীড়ন। ১৯১৯ সালে কোন্ডা ডোরাদের বস্তিতে বিস্টিন নামে এক তহশীলদার প্রভুর আবির্ভাব হল। এমন অত্যাচারী সরকারী কর্ম্মচারীর পাল্লায় পাহাড়ীরা আর কখনো পড়ে নি। তারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

সে ডাক গিয়ে পেঁছল কৃষ্ণদেবুপেটা পাহাড়েরই এক নিভৃত স্থানে কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত এক তরুণ তাপসের কানে। আর্ত্ত মানবতার

করুণ ক্রন্দনে ধ্যানভঙ্গ হল তপস্বীর। চারপাশে মানুষের দুঃখ হয়ে উঠেছে অভ্রভেদী, এই সময়ে নিজের মুক্তিসাধনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা তাঁর কাছে মনে হল ঘোর স্বার্থপরতা। ইনিই অন্ধ্রবীর আল্লুড়ি শ্রীরাম রাজা।

সাধনকুটির ছেড়ে পাহাড়ীদের বস্তিতে এসে তাদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন শ্রীরাম রাজা। তখন ১৯২০ সাল শেষ হয়েছে, সারা দেশ ভেসে গেছে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায়। সাধন-ভজন স্থগিত রেখে তিনি নেমে এলেন সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের দুর্গতিমোচনের উদ্দশ্যে। সহসা যেন শ্রীরাম রাজার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। তিনি দেখলেন, এই তো সুবর্ণসুযোগ—পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে হানতে হবে এবার প্রচন্ড আঘাত।

সাধক-জীবনের পূর্বে শ্রীরাম রাজা ছিলেন দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত নবযুবক। সেই অল্প বয়সেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সেই স্বপ্ন আবার আচ্ছন্ন করল তাঁর কল্পনাকে। কম্বুকন্ঠে ডাক দিলেন তিনি পাহাড়ীদের। সেই আহ্বানে দলে দলে পাহাড়ীরা তাঁর পতাকাতলে এসে সমবেত হতে লাগল। তিনি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি করে নিতে লাগলেন। গোতম ডোরা, মাল্লু ডোরা, আঙ্গিরাজু, ইয়েন্ডু ডোরা প্রভৃতি পাহাড়ীরা হল এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় তাঁর প্রধান সহকর্ম্মী। সমতলের অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি পাহাড়িয়া অঞ্চলে চলল বিপক্ষের সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে সামনাসামনি লড়াইয়ের আয়োজন। কিছুকাল পরে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন গান্ধীজী, কিন্তু গোটা কৃষ্ণদেবুপেটা পাহাড় জুড়ে তখন চলছে বিদ্রোহের তোড়জোড়। ১৯২২-এর আগস্ট থেকে অক্টোবর এই তিন মাসের মধ্যে শ্রীরাম রাজার নেতৃত্বে পাহাড়ীরা কতকগুলি থানা আক্রমণ করে দখল করলে, একটি প্রকাশ্য সংগ্রামে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ স্কট এবং হেইটারসন পাহাড়ীদের হাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন। ১৯২২ থেকে '২৪ এই দুই বৎসর নীরুখাজরাটানম এজেন্সীর একশত বর্গমাইল পরিমিত স্থান প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাম রাজা এবং তাঁর অনুচরদের কর্তৃত্বাধীনেই ছিল।

১৯২৪-এর শেষভাগে ভেদুরুমুন্ডিতে সরকারী সৈন্যবাহিনীর সহিত পাহাড়ীদের বাধল তুমুল সঙ্ঘর্ষ। এই যুদ্ধে শ্রীরাম রাজার অনুচরদের হল চূড়ান্ত পরাজয়। যে গোতম ডোরা ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তিনি সংগ্রামে প্রাণ হারালেন, মাল্লু ডোরা এবং আঙ্গিরাজু হলেন ব্রিটিশের হাতে বন্দী। এতে শ্রীরাম রাজার মন একেবারে ভেঙে পড়ল এবং এই সঙ্ঘর্ষের পর পাহাড়ীদের উপর ব্রিটিশ সৈন্যদের অত্যাচার যখন সীমা অতিক্রম করল, তখন তিনি আর সহ্য করতে না পেরে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

দেশকে ভালোবাসার অপরাধে শ্রীরাম রাজা হয়তো ছিলেন অপরাধী, কিন্তু ব্রিটিশের আদালতে তাঁর সে অপরাধেরও (?) বিচার হল না—হাজতে বন্দী করে ব্রিটিশ অফিসার তাঁকে গুলী করে হত্যা করল।

ভারতের মুক্তিযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান কৃষ্ণদেবুপেটা। সেখানকার পার্ব্বত্যভূমিতে রক্তের অক্ষরে নূতন হলদিঘাট রচনা করে স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের নেতার প্রতি আনুগত্য এবং স্বাধীনতাপ্রীতির যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তা যুগে যুগে মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকদের নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলবে।

ভীলজাতির মুক্তিসাধক ঃ

।। মোতীলাল তেজাবৎ ।।

ভীলরা ভারতের এক অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ আদিবাসী সম্প্রদায়। এক মহান্ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এরা।

আচার্য্য দ্রোণকে দক্ষিণাস্বরূপ অঙ্গুষ্ঠ দান করে যিনি একদা গুরু ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ ধানুকী একলব্য ছিলেন ভীল-বালক। পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ঐতিহাসিক যুগে রাজপুত রাণাদের আমল পর্যন্ত ভীলদের বহু বীরত্বকাহিনী রাজ-

পুতানার অরণ্য-পর্ব্বতে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহী এই ভীলজাতির মধ্যে বর্ত্তমান যুগে আবির্ভাব হয়েছে এমন একজন দেশভক্ত ত্যাগী পুরুষের, যিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন পাবার যোগ্য—নাম তাঁর মোতীলাল তেজাবৎ।

১৯৪৬ সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসে মেবারের তৎকালীন মগরা জেলায় এক প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালী পরিবারে মোতীলালের জন্ম হয়। ইনি মোটামুটি একরকম লেখাপড়া শেখেন এবং হিন্দী ভাষায় মামুলি জ্ঞান অর্জন করেন।

মোতীলাল ছিলেন একজন জায়গীরদার; প্রজাদের ওপর ছিল তার গভীর দরদ।

প্রজাদের উপর অন্যান্য জায়গীরদারদের বিশেষভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের জুলুম জবরদস্তি দেখে মোতীলালের প্রাণ কেঁদে উঠল। এর প্রতিকারের জন্যে ১৯২১ সালে তিনি সুরু করলেন ভীল আন্দোলন। বিভিন্ন স্থানে মেলা উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করে তিনি অগণিত ভীল নরনারীকে সংঘবদ্ধ করলেন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে উন্নত শিরে দাঁড়াবার জন্যে অনুপ্রাণিত করে তুললেন; ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠল ভীলদের স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনকে অংকুরে বিনষ্ট করবার জন্যে সরকার তৎপর হয়ে উঠলেন। সিরোহী, মেবার দাঁতা এই তিনটি অঞ্চলের কোনো কোনো গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন মহাত্মা গান্ধীর তরফ থেকে শ্রীমণিলালজী কোঠারী সিরোহীতে গেলেন। মণিলালজীর মধ্যস্থতায় ভীল-নেতা তেজাবৎ আর ব্রিটিশ অফিসার হ্যালিডের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়ে একটা আপোষরফার ব্যবস্থা হল।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দেরি হল না ইংরেজ সরকারের। ফলে ভীলরা আবার মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এবার সরকারের তরফ থেকে তাদের উপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন সুরু হল



ভীলনেতা মোতীলাল তেজাবৎ

তার তুলনা নেই। গবর্ণমেন্ট রিপোর্টেই প্রকাশিত হল যে, ভুলা আর বলোলিয়া নামক দুটি গ্রামে ৩৩৫টি পরিবার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। অকথ্য অত্যাচার করেও সরকার ক্ষান্ত হলেন না, আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্যে তেজাবৎকে সাত বছরের জন্যে কারাদন্ডে দন্ডিত করলেন।

নির্দিষ্ট কাল কারাদন্ড ভোগ করবার পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল মোতীলাল মুক্তিলাভ করেন।

দিনকতক বিশ্রাম করবার পর আবার তিনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হল।

৪২'-এর আগস্ট আন্দোলনের সময়েও তিনি এসে দাঁড়ালেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ভীলদের পাশে। ১৯৪৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী সরকার পুনরায় তাঁকে উদয়পুর সেন্ট্রাল জেলে পুরলেন।

এই ভীল-নেতার জীবন একটানা দুঃখ-বরণের কাহিনীতে পূর্ণ। সুদীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে তাঁর কারাপ্রাচীরের

অন্তরালে আর অজ্ঞাতবাসে। ভীল নরনারীর কাছে মোতীলাল মানুষ নন, সাক্ষাৎ দেবতা, তারা তাঁর নামে মানত পর্য্যন্ত করে।

মোতীলাল তেজাবতের নেতৃত্বে ভীলদের অভ্যুত্থানের কাহিনী রূপকথার মতই চমকপ্রদ। কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে পর্য্যন্ত যে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর পরিচয় নেই সেটা ঘোর লজ্জার কথা।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সকল আদিবাসী নেতার নাম সোণার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের কথা এখানে বলা হল। কিন্তু সাঁওতাল-নেতা নির্ম্মল মুন্ডা, কাছাড়ী-নেতা মধুবন, কমলা মিরি প্রভৃতি অনেকের কথাই বাদ পড়ে গেল। তা'ছাড়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সাঁওতালদের আত্মদানের, এবং আগস্ট আন্দোলনে বহু আদিবাসীর মৃত্যুবরণের কাহিনীও অনুক্ত রয়ে গেল। রহস্য-যবনিকার অন্তরাল থেকে আজ আমাদের আদিবাসী ভ্রাতৃগণের সেই আত্মদানের কাহিনীকে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করতে হবে এবং নূতন করে ঢেলে সাজতে হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসকে। একথা ভুললে চলবে না যে, যে সকল আদিবাসী নেতা ও শহীদ স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে গেছেন তাঁরাও জাতির বরেণ্য, তাদের বীরত্বকাহিনীও কীর্ত্তনীয়।

বঙ্গ বহুদিনের সভ্য জনপদ। এখানকার ভাষা, এখানকার লিখনপ্রণালী, এখানকার গৃহনির্ম্মাণ কৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিতেছিল, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় তখনও সংস্কৃতের ছায়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইত, অদ্যাপি তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিখনপ্রণালী পুরাতন পালি বা দেবনাগরী বা মৈথিলী আকার পরিত্যাগ করিয়া যে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। পূর্ব্ববঙ্গের গৃহনির্ম্মাণ কৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে কেন—উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালার গৃহনির্ম্মাণ কৌশল হইতেও বিভিন্ন; বরং এতদ্বিষয়ে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গলা প্রায় একরূপ, কেবল পূর্ব্ব বাঙ্গালাই পৃথক্। পূর্ব্ব বাঙ্গালার শিল্পোন্নতি পৃথক্ পথে ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যাহারা নিয়ত মাতৃভূমির সহিত সংলগ্ন থাকিয়া তাহার আদর্শের অনুকরণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা ভিন্ন দেশে বাসকরিবার সময়েও সে দেশের নূতন দ্রব্যাদির ফল লাভ করিতে পারে।

—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্য ভরে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষত চিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্কাম প্রয়াসে।

—রবীন্দ্রনাথ



ভারতের শিল্পকলা

তোমরা সবাই আজ জান যে দেশ শৃঙ্খল-মুক্ত হয়েছে বিদেশী ইংরাজদের হাত থেকে—তাই বলে উৎশৃঙ্খল তো হ'লে চলবে না?- একমাত্র দেশের শিল্পকলাই দেশের সকল উৎশৃঙ্খলা ঘোচাতে পারে। আর্টের কাজই হল সব বস্তুকে সাজিয়ে গড়ে তোলা—সকল বিষয়ে শ্রী বৃদ্ধি করা। তাই ভাল গৃহ-সজ্জা, ভাল ভাবে কথা বলা, ভাল ভাবে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা, ভাল শিক্ষা পাওয়া সব বিষয়ই আর্ট বা শৃঙ্খলা থাকবেই। শুধু ছবি আঁকা বা মূর্ত্তিগড়াই আর্ট নয়। এই 'শ্রী' বা আর্ট সবদেশের সভ্য মানুষের ধর্ম্মাচরণের মূলে আছে। ধর্ম্ম যেমন চিন্তার দিক দিয়ে মানুষের জীবনকে আদিম বর্ব্বর উচ্ছৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে আর্টের দ্বারাও তাই হয়।

দেখা গেছে, আমাদের দেশে ধর্ম্ম আর আর্ট একই পথের পথিক। সিন্ধু সৈকতের (মোহেন-জো-দাড়ো আর হারাপ্পার খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫০০-র) সভ্যতার কাল থেকে আরম্ভ ক'রে বহুকাল ধরে চলেছিল। ভাস্কর্য-ও চিত্রকলায় মন্দিরে মন্দিরে ভগবানের অনন্ত রূপ (৩৩ কোটী দেবতার রূপ) পরিকল্পনায় রূপক ভাবে ফোটাবার চেষ্টা ক'রে চলেছে। এ আবিষ্কারের অর্থাৎ সিন্ধুসৈকতের—সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত মোহেঞ্জোদড়ো ও হারপ্পার অতি প্রাচীন সহরের ধংসাবশেষের মধ্য হতে আবিষ্কৃত হয়েছে সেকালের দুই সমৃদ্ধিশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ। সেখানে ছোট বড় বাসগৃহ পাওয়া গিয়েছে। এ বাসগৃহগুলি ইটের তৈরী। বড় বড় বাড়ীগুলি দ্বিতল অথবা ত্রিতল এবং তাহাতে উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। ঘরের দরজা জানালাও আছে। বাড়ীতে কূপ, নর্দ্দমা এবং স্নানাগার দেখা যায়। নগরের রাজপথগুলি সোজা এবং প্রশস্ত। রাজপথে আবর্জ্জনা ফেলবার জন্য আবর্জ্জনাঘাট ছিল। শহরের জল নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী ছিল। আমরা মোহেন্-জো-দাড়ার বিষয়ে 'শিশু-ভারতী' প্রথম খন্ডে সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছি। *আমাদের আনন্দ ও গৌরবের কথা এই যে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ বাঙ্গালী ঐতিহাসিক স্বর্গত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবিষ্কারের গৌরবের অধিকারী। আজও তার শেষ নেই মৃত্তিকা গর্ভে কত শিল্পসম্পদ যে লুক্কায়িত আছে তা' কে বলতে পারে?

আমাদের দেশের মন্দিরে মন্দিরে যে সব দেবতাদের ভাস্কর্য আছে বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক পন্ডিতেরা সেগুলিকে 'পুতল' (Idol) নামে অভিহিত করেন। তাঁরা একথা মনে রাখেন না যে তাঁদের নিকট এগুলি পুতুল (Idol) হতে পারে, কিন্তু শিল্পী বা ধর্ম্মজ্ঞের নিকট তা 'প্রতিমা' (Image)। 'আইডল' ইংরাজি শব্দটির অর্থে বোঝায় (বেকনীর দর্শনে—Baconian philosophy-তে) বর্বর পেগান গ্রীকদের পুতুল পূজো। আর 'ইমেজ' অর্থে ইংরাজীতে বোঝায় মানসিক পরিকল্পনাপ্রসূত অর্থাৎ ধ্যানলব্ধ মূর্ত্তি। আমাদের চিত্র বা মূর্তিকলার সঙ্গে জীবন্ত মাংস পেশি ফুটিয়ে তোলা গ্রীক বা পেগানের চারুশিল্পের তুলনা করলেই এবিষয় যথেষ্ট জানা যাবে। পেগান পূজার ভিতর ছিল

দেহধারী মানুষ পূজার উপকরণ এবং তাই তাদের ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের আর্টে ফুটে আছে। ভারতেই অনন্তের বিভিন্ন শক্তি ও গুণের ভাব অবলম্বনে পরিকল্পিত বহু মুন্ড, বহু আয়ুধধারী হাতযুক্ত প্রতিমা শিল্পীরা গড়েছেন আছে তার কথা 'ভারত নাট্য শাস্ত্রে' আছেঃ চিত্রে এবং নৃত্যে ত্রিলোকের সব বস্তুর অনুকৃতি করা যায়। এ-বিষয় সম্প্রতি (১৯৫৪) একজন ইংরাজ মহিলাশিল্পী (ভাস্কর) কুমারী ফ্রেডা ব্রিলিয়াল্ট বম্বেতে পদার্পণ করেই



একটি ভগ্ন ধ্যানী মনুষ্য মূর্ত্তি—মোহেন্-জো-দাড়ো
(ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

পৃথিবীতে। রূপক বা প্রতীকের দৃষ্টান্ত কোনো দেশের আর্টে বা ধর্ম্মে নাই। রূপকের বিষয় দার্শনিক তত্ত্ববিচারে শুধু নয়, আন্তরিক সূক্ষ্ম বিচারে (অন্তঃসংগা) দ্বারাই জানা যায়, আর্টের মধ্যে যে কিরূপ তার শক্তি এলিফেন্টা গুহার ভাস্কর্য কলা দেখে মুগ্ধ হন এবং ভারত শিল্প যে পৃথিবীর অন্যান্য শিল্প-কলা থেকে শ্রেষ্ঠ বিদেশিনী হয়েও তা তিনি অনুভব করেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি বিশেষ জাগ্রত থাকায় তিনি বলেছিলেনঃ—"আমি

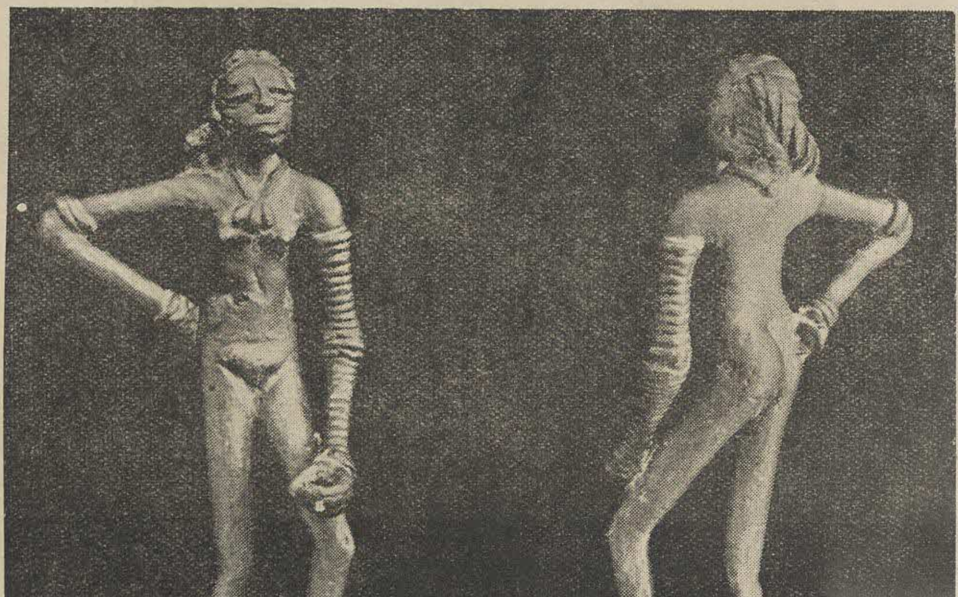
ভারত শিল্প যে শ্রেষ্ঠ তা এই কারণেই অনুভব করেছি, যে গীতার শান্তি ও স্থৈর্যের একটি বিশেষ সম্পূর্ণতার ভাব এতে আছে। আর অপরদিকে য়ুরোপের মাইকেলআঞ্জিলোর মত বড় বড় শিল্পীরা ক্রুসবদ্ধ খৃষ্টের ছবির প্রতীক আঁকতে গিয়ে প্রচন্ড উগ্র ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অশান্ত উদ্বেগ এবং প্রকাশ বেদনার অসম্পূর্ণতা রেখে গেছেন, যেন তাঁরা আজও তার সীমা দেখতে পান নি।"

এই গীতার কথা বিদুষী ইংরেজ মহিলা শিল্পী যা বলেছেন আর্টের বিষয়, সেইটেই হল এ দেশের সার কথা। ধর্ম ও শিল্প-সংস্কার আমাদের দেশে ওতপ্রোত ভাবে থেকে গেছে। য়ুরোপে মধ্যযুগে খৃষ্ট জন্মাবার পর তাঁর ধর্ম্মের আওতায় আর্টের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল কিন্তু আধুনিক য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের শিল্পকলার আওতায় এসে পড়ে আমরা এখন নিজেদের আর্টের সংস্কারকেও উড়িয়ে দিতে চাই।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ-পুরীর (লঙ্কার) চিত্রকলার কথা উল্লেখ আছে। তাছাড়া মধ্যযুগে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিদের কাব্যে চিত্রপটে আঁকা চিত্রের কথা উল্লেখ আছে। এই প্রকার চিত্রের নিদর্শন এখন আর পাওয়া যায় না। তবে খৃঃ পূঃ ২৫০-এর যোগীমারা গুহায় (মধ্যপ্রদেশে) এবং অজন্তা, বাগ, বাদামী, ইলোরা, সাত্তানাভাসাল প্রভৃতি স্থানের গুহার পাথরের দেয়ালে এবং মন্দিরে আঁকা ছবির বহু দৃষ্টান্ত আছে। এগুলি সব খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র

এখন আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পকলার



মোহেঞ্জোদরোর দুইটি নর্ত্তকী
(ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

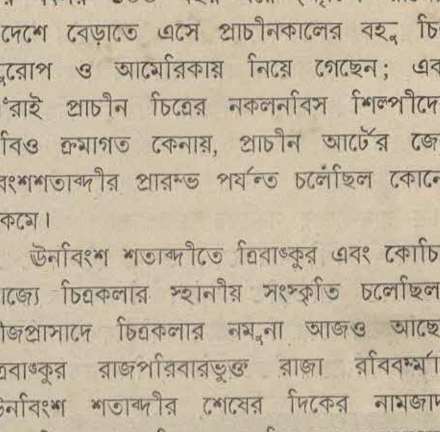
বিষয় কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমাদের দেব। দেশের আর্টের ঐতিহ্য (Tradition) আজও আমরা বৃহদ্‌বজ্রভৈরবতন্ত্র, শিল্পরত্নম, বাৎস্যায়ন এই সকল শিল্পকলার গ্রন্থে এবং সংস্কৃত পুঁথির মধ্যে নিহিত আছে। বেশী কিছু উদ্ধার এখনো হয়নি। তাছাড়া অমূল্য প্রাচীন গ্রন্থসম্পদ বার বার বিজাতির ভারত আক্রমণের ফলে লুন্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। শিশুদের যেমন জন্মাবার পর বড়দের কাছে সব শিখতে হয়—চলা-বলা প্রভৃতি, তেমনি এইসব প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা উপেক্ষা ক'রে দেশের বড় শিল্পী বা শিল্প-রসিক হতে পারা যায় না।

আধুনিক কাল (ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষে)

ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন এদেশে আনলেন, সেই সংকটে ভারত-শিল্পের গৌরবের অবসান হল। মোগল যুগের অবসান ঘটেছিল ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে। তারপরেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরাজদের আমলে করদ রাজ্যগুলিতে ক্ষীণভাবে দেশী আর্টের প্রভাব কিছুদিন পর্যন্ত চলেছিল। পাটনা, আগ্রা, জয়পুর, অযোধ্যা এবং দিল্লীতে তার জের সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। পরে তাঁদের বংশধররা যাঁরা রইলেন তাদের মধ্যে জয়পুরের গঙ্গাবক্স, আগ্রার বাবুলাল, পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ এবং দিল্লীর জাকাউল্লা খাঁর উল্লেখ করা যায়। এ'দের কাজে পূর্ব গৌরব কিছু নেই, আছে কেবল, নকল-নবিসী করা পূর্বেকার কাজের চিহ্নটুকু মাত্র। ডক্টর আনন্দকুমার স্বামী এইসব শিল্পীদের পূর্ববর্তী মোগলযুগের আর্টের চারটি প্রধান বিভাগ দেখিয়েছেন।

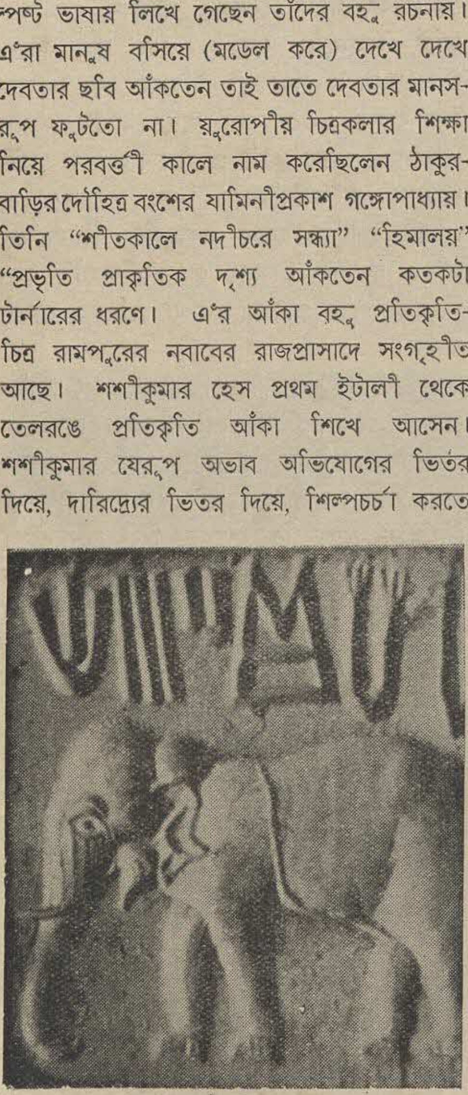
(১) মোগল—যা মোগল দরবারে নিযুক্ত শিল্পীদের কাজ। (২) রাজস্থানী—যা' রাজস্থানের করদ রাজ্যগুলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চলেছিল। (৩) পাহাড়ী ও কাংড়া—যা' ভসৌলি, গাড়বাল এবং কাংড়া অঞ্চলে রাজাদের দরবারী শিল্পীরা রচনা করতো। এবং (৪) পাটনা, অযোধ্যা, দিল্লী ও শিখ্‌শৈলী—ঊনবিংশ শতাব্দীর কাজ। আকবর-নামা আইন-ই-আকবরীতে এবং জাহাঙ্গীরনামা প্রভৃতি পুস্তকে বহু বিশিষ্ট শিল্পীদের নাম পাওয়া যায়। মীর-সৈয়দ্‌-আলী, খউজা-আবদুল-সমাদ শিরীণ, মন্‌সুর, ফারুক, দেশবন্ত (ইনি পাল্কি বেয়ারার পুত্র এবং মানুষের প্রতিকৃতি ভাল আঁকতেন), কৈসু বা কেশবদাস; বিসওয়ান, লাল বা রামলাল, মেখন্ড, মুশ্‌কীন্‌ কেলমেক্‌, মাধো, যোগেন, মহমীন, খেম্‌করণ, তারা, সাহনুল্লা, হরবংশ এবং রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পরিব্রাজকেরা বৎসরের পর বৎসর ১০০ বছর ধরে (বৃটিশ রাজ্যে) এদেশে বেড়াতে এসে প্রাচীনকালের বহু চিত্র য়ুরোপ ও আমেরিকায় নিয়ে গেছেন; এবং এ'রাই প্রাচীন চিত্রের নকলনবিস শিল্পীদের ছবিও ক্রমাগত কেনায়, প্রাচীন আর্টের জের বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত চলেছিল কোনো রকমে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন রাজ্যে চিত্রকলার স্থানীয় সংস্কৃতি চলেছিল। রাজপ্রাসাদে চিত্রকলার নমুনা আজও আছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারভুক্ত রাজা রবিবর্ম্মাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের নামজাদা শিল্পী। এ'র ছবি প্রথম ওলিওগ্রাফে ছাপা হয় এবং হিন্দু দেবদেবীর ছাপা চিত্রগুলি সারা ভারতবর্ষে তখন জনপ্রিয় হয়েছিল। বরোদার



সীলমোহর মোহেঞ্জোদড়ো

মহারাজার প্রাসাদে তাঁর আঁকা বহু চিত্র আছে। রাজা রবিবর্মার অনুকরণে সেই সময় বম্বেতে ধুরন্ধর এবং বাঙলা দেশে বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবদেবীর ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। এ'দের কাজের ভিতর পৌরাণিক বিষয়বস্তু আঁকা হলেও দেশী শিল্পকলার রসৈশ্বর্য আর রইল না। কুমারস্বামী এবং হ্যাভেল এ'দের কাজের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয় জোরালো এবং স্পষ্ট ভাষায় লিখে গেছেন তাঁদের বহু রচনায়। এ'রা মানুষ বসিয়ে (মডেল করে) দেখে দেখে দেবতার ছবি আঁকতেন তাই তাতে দেবতার মানসরূপ ফুটতো না। য়ুরোপীয় চিত্রকলার শিক্ষা নিয়ে পরবর্ত্তী কালে নাম করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির দৌহিত্র বংশের যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি "শীতকালে নদীচরে সন্ধ্যা" "হিমালয়" "প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতেন কতকটা টার্নারের ধরণে। এ'র আঁকা বহু প্রতিকৃতিচিত্র রামপুরের নবাবের রাজপ্রাসাদে সংগৃহীত আছে। শশীকুমার হেস প্রথম ইটালী থেকে তেলরঙে প্রতিকৃতি আঁকা শিখে আসেন। শশীকুমার যেরূপ অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়ে, দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে, শিল্পচর্চা করতে ইটালী গিয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা তাঁর জীবনীতে পাই। "ইংলন্ড ও ইয়োরোপ মহাদেশে লব্ধ শিল্প বিষয়ক অভিজ্ঞতা" (Artistic experiences on the continent and in England) প্রবন্ধে আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ শশীবাবুকে ইটালী যাত্রার সময় সাহায্য করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং মৈয়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি তাকে অর্থ সাহায্য করতে অনুরাগী হয়েছিলেন। মৈয়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোণা মহাকুমার অন্তর্গত সাজিউড়া গ্রামে দরিদ্র পিতামাতার ঘরে শশী হেসের জন্ম হয়। বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করে ইন্‌সপেক্টিং পন্ডিতের সামান্য কাজ করে, পরে মৈমনসিংহ জেলার জাহ্নবী চৌধুরাণী এবং মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্যের উৎসাহ ও সাহায্যে তিনি যে ভাবে ইটালী হতে চিত্রশিল্প শিক্ষা করে যশস্বী হয়েছিলেন সে কথা অনেকেই জানেন না। তাঁর জীবনী ও চিত্র পরিচয় সম্বন্ধেও বিশেষ কেউ লেখেননি, এও দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা যতদূর জানি শশীবাবুর পূর্বে ঢাকার বারদী গ্রাম নিবাসী পরলোকগত রোহিণীকান্ত নাগ ব্যতীত আর কেহ আমাদের



মোহেঞ্জোদড়োর শীল মোহর
(ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)



মোহেঞ্জোদড়োর শীল মোহর
(ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

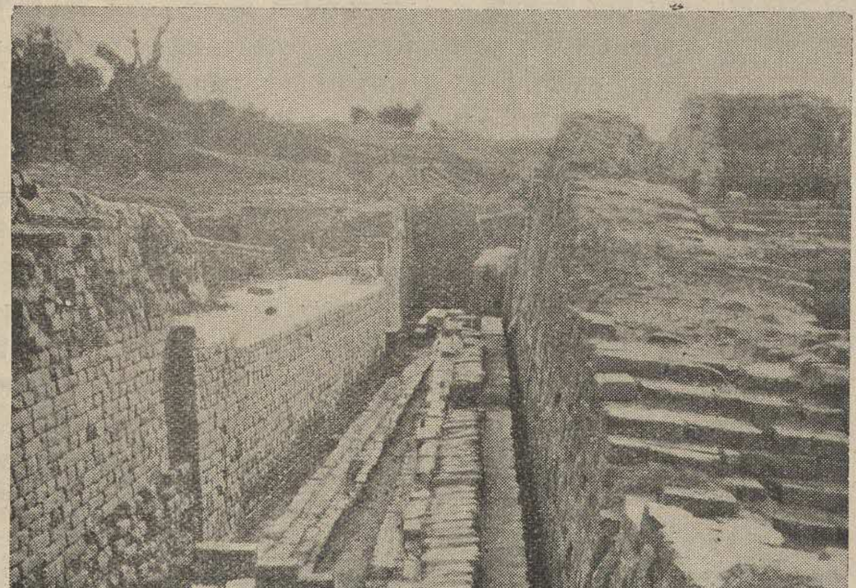
দেশ হতে শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ইউরোপে যান নি। কিন্তু হতভাগ্য রোহিণীর কথা মনে হ'লে আজও অশ্রু সংবরণ করা যায় না। শুনেছি রোহিণীকে সেই সুদূর বিদেশে অর্থাভাবে অনাহারে অনেক সময়ে কষ্ট পেতে হয়েছিল। সেই বিদেশে বিজাতির মধ্যে Blackie-র জন্য যতটুকু সহানুভূতি ছিল, এ-দেশে তাও ছিল না। ক্রমে ক্রমে অনাহারে বা স্বল্পাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তার শরীর ও মন ভগ্ন হয়ে গিয়েছিল। রোহিণীর এই শোচনীয় অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী—তার আত্মীয়রা, না দেশের ধনীরা, না সে নিজে, কার দোষে ভারতমাতার এই শোক, তা ঠিক বলা সহজ নয়, বোধ হয় সকলকে সমান ভাগ করে দিলে কারো আপত্তি থাকবে না।

শিল্পের নবজাগরণের (Renaissance) কথা
বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ

খৃঃ পূঃ ৩৫০০ সিন্ধুসৈকতের সময় থেকে বৈদিক ও পৌরাণিক কাল অতিক্রম করে বৌদ্ধ, মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্তযুগ এবং মোগলযুগ পার হয়ে শিল্পকলার যে ধারা চলেছিল তার স্বর্ণ জ্যোতি মলিন হয়ে এল বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ভিক্টোরিয়া যুগের অন্তে এবং বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পকলার ভাঙা দেউলে আবার দীপ জ্বালতে এলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দূরদর্শী পন্ডিত কলিকাতা গভর্মেন্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ই. বি. হ্যাভেল এবং শিল্পরসিক ডক্টর এ. কে. কুমারস্বামী তাঁর হলেন সহায়। তাঁদের প্রত্যেক লেখার ছত্রে ছত্রে ভারতশিল্পের অতীত গৌরবের জীবন্ত ইতিহাস ফুটে উঠল—১৯০৮ সাল থেকে। কাকতালীয়বৎ বঙ্গভঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন বাঙলাদেশের দ্বারে উপস্থিত। স্বজাতির অভিমান তাতে যোগযুক্ত হওয়ায় আরো জোর পেল নবজাগরণীর (Renaissance) উদ্যোগ। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে কেবলমাত্র স্বদেশীয়ানার মোহে পড়ে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যরা স্বদেশী আর্টের রেনেসাঁর প্রতিষ্ঠানটি কলকাতায় গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের দিব্যদৃষ্টি ছিল—তাঁরা বিলাতি আর্টের রঙিন মোহে ভোলেননি—তাঁরা নিজেদের আর্টের মধ্যে দিয়ে নিজেদের দেশকে চিনতে চেয়েছিলেন। য়ুরোপের বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবে রচিত মাংসপেশীবহুল আর্ট অপেক্ষা অধ্যাত্মবোধক দেশী আর্ট যে শাশ্বত বস্তু তা বুঝতে পেরেই এই কাজে তখন এঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁদের সে সময় দেশের লোকেদের নিকট অপদস্ত হতে হয়েছিল—তখনকার কাগজ পত্রে তার নিরিখ আজও থেকে গেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তখন বিদেশী জিনিষ বয়কটের কারণ বৃটিশ সরকারও এঁদের ভুল বুঝেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন দেশী আর্ট চালানোর দ্বারা তার প্রভাব দেশী শিল্পপণ্যের উপর পড়বে এবং লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষিত হবে এই কারণেই একদল শিল্পী রেনেসাঁ এনেছেন। এতে বিলাতি জিনিষের ক্রমে চাহিদা কমে যাবে। অবশেষে বঙ্গের দুজন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং লর্ড রোনাল্ডশে (পরে মারকুইস-অব-জ্যেটল্যান্ড) কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত—"ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়্যান্টাল আর্টের" পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং সর্বপ্রকারে দেশী আর্টের উন্নতির সহায় হন। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল হোম ইন্ডাষ্ট্রি" প্রতিষ্ঠানে দেশী পণ্য শিল্পের প্রচারের যে আয়োজন হয়—বেঙ্গল গর্ভমেন্ট তারও সহায় হন। এক কথায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপতিরা তখন ভারতের কৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ভাবে মুক্তি দিলেন রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বন্ধনদশায় ফেলে রেখেও।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতীয় আর্টের উপর অনুরাগের প্রধান কারণ হল কুমারস্বামী এবং হ্যাভেলের রচিত গ্রন্থাবলী। এঁদের গ্রন্থের দ্বারা তখন ভারতশিল্পের সারা পৃথিবীতে প্রচার হয়। ঐতিহাসিক ভিনটসেন্ট স্মিথের "ভারত ও সিংহলের শিল্প ইতিহাসে" (১৯১১) হ্যাভেলের "ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা" (১৯০৮—১৯২৮) পুস্তকে এবং

কুমারস্বামীর "সিলেক্টেড এগ্জামপলস্ অব ইন্ডিয়ান আর্ট" (১৯১০) গ্রন্থে ভারতশিল্পের নবজাগরণ (Renaissance) এবং আচার্য অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যদের কার্যের বিষয়ও প্রচার করলেন। ভারতীয় প্রাচ্য শিল্প-সভা (The Indian Society of Oriental Art) অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ কলকাতায় স্থাপন করেন ১৯০৭ সালে। জঙ্গী-লাট লর্ড কিচ্নার তার প্রথম সভাপতি হন। ২৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন দেশী সভ্য ছিলেন। ১৯০৮ সালে কলিকাতা গভর্মেন্ট আর্ট স্কুলে সোসাইটির প্রথম প্রদর্শনী খোলা হয়। তাতে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম দলের শিষ্য স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত,



মোহেঞ্জোদড়োর নগরের রাজপথ, স্নানাগার
ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, হাকিম-মহম্মদ খাঁ সমীউজ জমা এবং অসিতকুমার হালদারের আঁকা চিত্র প্রদর্শিত হয়। সে সময় কেবলমাত্র ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিবারদের আঁকা ছবি নিয়ে প্রত্যেক শীতকালে কলকাতায় এবং গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙে এবং সিমলার চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হোতো। তাতে দেশী শিল্পীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। তখনকার বিদেশী শিল্পরসিকদের ভারতীয় চারুকলার বিষয়ের মনোভাব জানা যায় সার জর্জ বার্ডউড্, সার জর্জ—ওয়াটস্, জন ওয়েস্মিকট এবং কলারসিক রাস্কিনের লেখার ভিতর। তখন তাঁরা প্রচার করতেন ভারতবর্ষে চারুকলা (Fine art) বলতে কিছুই ছিল না—কারুশিল্পের (Arts & Crafts) মধ্যেই আর্ট পর্যবসিত ছিল। গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ, লখনউ আর্ট স্কুলের ইংরাজ অধ্যক্ষেরাও এই মনোভাব প্রচার করতেন। বিলাতি আকাডামীর শিক্ষা আর্ট স্কুলগুলিতে তাই প্রচারিত হতো।

ঠিক এই সময় হ্যাভেল এবং কুমারস্বামীর ভারতীয় শিল্পকলার প্রচারের ফলে ১৯১০ সালে "রয়েল সোসাইটি অব আর্টসে" ১৩ জন ঐতিহাসিক, শিল্পী এবং শিল্পরসিক সভ্যদের এক বৈঠক বসে। তাঁরা বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে বার্ডউডের বিরুদ্ধ উক্তির খন্ডন করেন এবং ভারতশিল্পের যশোগান করেন; বিশেষ করে বুদ্ধের মূর্তির সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে দেশ-বিদেশে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যদের প্রবর্তিত আর্টের নবজাগরণের কথা প্রচার হয় শিল্পজগতে এবং তার কাজও বেগে অগ্রসর হয়। পূর্বে য়ুরোপে যখন শিল্পকলার ইতিহাস লেখা হোতো, ভারতশিল্পের বিষয় কোনো উল্লেখ করা হতো না। এরপর থেকে মোড় ফিরল—পরবর্তী সকল শিল্প ইতিহাসের গ্রন্থে ভারতশিল্পের একটি অধ্যায় যোগ করা হল।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে কলিকাতা গভর্মেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব কর্তৃক আহূত হন এবং সহকারী অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। ভারতীয় শিল্প পদ্ধতি শেখানোর ব্যবস্থা সেই প্রথম হল। পাটনার শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদও এসে যোগ দিলেন শিক্ষক-দলে। ১৯০৫ ডিসেম্বরে এলেন নন্দলাল বসু (এখন ডক্টর নন্দলাল বসু পদ্মভূষণ) অবনীন্দ্রনাথের নিকট আর্ট স্কুলে। তার তিন মাস পরে স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অসিতকুমার হালদার এসে যোগ দেন। হ্যাভেলের "ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার এন্ড পেন্টিং"-এ এঁদের বিষয় বিশেষ ভাবে দেওয়া আছে। তারপর ক্রমশঃ এলাহাবাদ থেকে শৈলেন্দ্রনাথ দে, লাহোর থেকে সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহীশূর থেকে ভেঙ্কাটাপ্পা, লখনউ থেকে সমী-উজ্-জমা এবং হাকিম মহম্মদ খাঁ আর সিংহল থেকে আসেন নাগাহাওয়াত্তা। সুতরাং এটা শুধু বাঙলাদেশের নিজস্ব-আর্টের নবজাগরণের ব্যাপার হল না—এটা হল সারা-ভারতের কৃষ্টির রেনেসাঁর একটি ক্ষেত্র। 'বেঙ্গল স্কুল' 'টেগোর স্কুল' প্রভৃতি নামে হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী তখন প্রচার করায় এখন সকলেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'রেনেসাঁ' বলতে যা বোঝায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একযোগে তারই আয়োজন করেছিলেন কলকাতায় তখন। কোন প্রাদেশিকতার অভিমানে বা ঝুটো স্বদেশীয়ানার মোহে তাঁরা এ-কার্যে প্রবৃত্ত হন নি। আন্তরিকতা থাকার ফলে এক নবীন শিল্প প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। তাঁদের কাজ অজন্তার বা কোনো বিশেষ এক প্রদেশের প্রাচীন কলার আদর্শে বা নকলে তৈরী যে হয় নি, তা তাঁদের কাজ দেখলেই বোঝা যায়। নানা ভাবে মৌলিক চিত্র তাঁদের হাতে যা বেরিয়েছে তার তুলনা হয় না। অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক চিত্রের মধ্যে "সাজাহানের মৃত্যুবাসর" এবং "তাজের স্বপ্ন"; নন্দলাল বসুর "শিব এবং সতী," স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কার্তিক' এবং "বেদব্যাসের মহাভারত রচনা"; ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'রাধা' ও 'তমাল তরু'; শৈলেন্দ্রনাথ দে'র 'মেঘদূতের চিত্রাবলী'। ভেঙ্কাটাপ্পার 'মহাবীর'

এবং 'মাছওয়ালি'; হাকিম মহম্মদের 'লায়লা-মজনু'; সমীউজ জমার 'সাজাহান'; সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের "দীপ ও পতঙ্গ" অসিতকুমার হালদারের 'সীতা' ও 'যশোদা' প্রভৃতি বহু চিত্রাবলী শিল্প-রসিকদের মনে দাগ অঙ্কন করে আছে। মৌলিক বিশেষত্বপূর্ণ এঁদের চিত্রকলার প্রধান গুণই এই যে সেগুলি একবার দেখলেই মনে গেঁথে যায়—তার বিষয়বস্তু এবং ভাব। আন্তরিকতা থাকায় এঁদের কাজ এত ভাবলোকের সম্পদ হতে পেরেছে। অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যেরা এই ভাবে যে কেবল দেশের আর্টের প্রচারই শুধু করেছিলেন তা নয়—এঁদের এই শিক্ষা প্রত্যক্ষ বোধের দ্বারা উজ্জ্বল। নন্দলাল বসু ও ভেঙ্কেটাপ্পা একবার এবং সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও অসিতকুমার হালদার দুবার অজন্তা গুহাচিত্রের অনুলিপি গ্রহণ করতে যান ১৯০৯—১০ এবং ১৯১০—১১ সালের শীত-কালে। লেডি হ্যারিংহাম তখন বিলাত থেকে দু'বারই এসে তাঁদের সঙ্গে কাজ করেন। পরে ১৯১৪-তে সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং অসিতকুমার হালদার যোগীমারা গুহায় (আর খৃঃ পূঃ ২৫০ এর) ভিত্তিচিত্রের নকল নেন। ১৯১৭-তে অসিতকুমার প্রথম বাগ গুহা চিত্রকলা দেখে আসেন এবং ১৯২১-এ নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কর সহ তিনি পুনরায় ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি নেন। এঁরা এই ভাবে দেশের আর্টের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন।

ঠিক এই সময় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (অবনীন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) বিলাতি 'কিউবিজম্' 'ইমপ্রেশানিজম' প্রভৃতি— যা বিলাতে তখন নতুন আমদানি হয়েছিল তারই ঢেউ আনলেন ভারত-শিল্পে। তিনি বিদেশী আর্ট গ্রহণ করেও স্বকীয় মৌলিকতায় নতুন রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-সময় অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা দেশী শিল্পে দীক্ষিত হয়ে এমন গভীর সাধনায় মত্ত যে গগনেন্দ্রনাথের বিলাতিধরণের আর্টের প্রতি কেহই আসক্তি প্রকাশ করলেন না। গগনেন্দ্রনাথের অনেক পরে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ৭০ বৎসর বয়সে বিলাতি—'সুররিয়ালিষ্ট' আর্টের অনুরূপ ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। তাঁর ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকে ঘন ঘন য়ুরোপ যাত্রার ফলে তাঁর অনেক-কালের চিত্রকলার গভীর অনুরাগ কার্যে পরিণত করলেন জার্মাণ শিল্পী কুবিন (Kubin)-এর দৃষ্টান্ত দেখে। গভীর রসরচনার কাজের ফাঁকে অবসর বিনোদনের খেলা হল তাঁর এইরূপ ছবি আঁকা। রাষ্ট্রপাল চার্চিল যেমন দৃশ্যচিত্র এঁকে অবসর বিনোদন করেন, এবং আইনষ্টাইন গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্তে হালকা হাসির চুটকি কবিতা লিখতেন, এবং বেহালা বাজাতেন মহাকবির ও শেষ বয়সে ছিল ছবি আঁকার সেই-রূপ একটা খেলা। তাই নিয়ে তিনি কখনই বড়াই করেননি। তবে তিনি চিত্রকলায় হাত দেওয়ায় চিত্রকলারই গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে—সকলে বুঝেছেন চিত্রকলা ছেলেখেলা নয়।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যের দল ক্রমে পুষ্ট হল ২৫।৩০ বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে "ভারতীয় প্রাচ্য শিল্পসভার" বাৎসরিক প্রদর্শনীর দ্বারা আর্টের প্রচার ক'রে। চক্তাই (লাহোর গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র) এবং দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী—প্রকৃতপক্ষে অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের কাজে প্রভাবান্বিত হন। মুকুলচন্দ্র দে অসিতকুমার হালদারের একটি আদি শিষ্য এবং পরে কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিরাট সাহিত্য সম্মিলনে 'স্বাগত' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন,—

.........পঞ্চ প্রদীপ জ্বালে

অবন, গগন, অসিত, মুকুল, নন্দলালে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। অসিতকুমার হালদার ১২ বৎসর (১৯১১—২৩) শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের অধ্যক্ষতা করার পর ১৯২৪ সালে জয়পুরের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হন এবং ১৯২৫-তে সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ চালিত আর্টস্কুলে (দেশী শিল্পী হয়েও) অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত

হইলেন এবং ২০ বৎসর ধরে সেখানে কাজ করলেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মান্দ্রাজ গভর্মেন্ট আর্ট স্কুলের এবং সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাহোরে গভর্মেন্ট আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। নন্দলাল বসু ১৯২৪ থেকে অসিতকুমারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষতা করেন। সারা ভারতবর্ষে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নবীন ভারতশিল্পের প্রচার হল তাঁর শিষ্য ও নাতিশিষ্য পরম্পরায়। ৪২ বৎসর ধরে আর্টের এই এক স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছিল তখনকার দিনে। অসিতকুমারের শিল্প প্রতিভায় প্রীতি-লাভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে আশীর্ব্বাদ করেছেন তা এখানে প্রকাশ করলাম।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয় শ্রীমান অসিতকুমার হালদার

আমার মূর্তি পূর্ণ করি
মুক্তি পেল' তোমার শক্তি,
রেখায় রেখায় নিত্য শিখায়
দীপ্তি পেল তোমার ভক্তি।
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্ত্র,
তাই তো তোমার ধ্যানের দৃষ্টি
তোমার রসে আমার রূপে
রচিল এই নূতন সৃষ্টি।

২৫শে বৈশাখ — আশীর্ব্বাদক
১৩৩৪ — **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

It is freedom for your spirit to conjure up a vision from the inert, to illumine its every line with the flame of your devotion.

You have the magic of life's touch in your eyes and therefore your dream has come out in a creation in which are made one my form and your delight.

—*Rabindranath Tagore.*

গণতন্ত্র যুগে ভারত-শিল্প (১৯৪৭—১৯৫৮)

১৯৪৭এ বৃটিশ সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলমুক্ত দেশ কংগ্রেস গভর্মেন্টের প্রবর্তিত গণতন্ত্রের আওতায় এল। দেশের কৃষ্টির বিষয় একটা সাড়া পড়ে গেল—তার আয়োজনের বহুল প্রচেষ্টা দেখা গেল। স্বর্গত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলিকাতা গভর্মেন্ট হাউসে ১৯৪৯-এ একটি 'কনফ্রেন্স' ডাকলেন শিল্পী ও শিল্পরসিকদের। ১০০ জন শিল্প-রসিক, ঐতিহাসিক এবং শিল্পীরা এসে যোগ দিলেন। সেই বৈঠকে অসিতকুমার হালদার প্রস্তাব করলেন দেশের ২০০০ বৎসরের শিল্প-কৃষ্টির ঐক্যভাব বজায় রেখে শিক্ষা দেবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিল্প মহাবিদ্যালয় দিল্লীতে খুলতে। প্রস্তাব কোনো কারণে গৃহীত হল না —হল তার বদলে একটি "ললিত কলা আকা-দামী" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। স্থির হল, ভারত-শিল্পের এই অনুষ্ঠানটির ভিতর ধর্ম বা জাতীয়তার কোনো গোঁড়ামি থাকবে না—থাকবে সার্বজনীন (International) আর্টের প্রচারের ব্যবস্থা। শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ রেনেসাঁ আর্টের শিল্পীরা এই 'আকাদামী' থেকে সরে গেলেন। তাঁরা বুঝলেন, রাষ্ট্রনীতির নিয়ম অনুসারে আর্ট যদি চলে তো দেশের আর্টের চিরনির্ব্বাসন ঘটবে। দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী হলেন এই ললিতকলা আকাদামীর প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং বরদা উকিল হলেন তার জেনারেল সেক্রেটারী। অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ভারতশিল্পের নব-জাগরণীর (Renaissance) ব্যাপারের এই ভাবে সমাধি হল। পূজনীয় গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথও স্বর্গত হলেন তার কিছুদিন পরেই। মৃত্যুর পূর্বে শেষ উপদেশ শিষ্যদের দিয়ে গেলেন, "আমরা যা করেছি এখন আর চলবে না—ওরা যা করছে করতে দাও। যতদিন তোমরা নিজেরা পার, নিজেদের মত করে চুপচাপ কাজ করে যাও।"

চিত্রকলা-জগতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় শিষ্য হলেন নন্দলাল বসু—এঁকে একাধারে মহাকবি রবীন্দ্রনাথও সম্মান দিয়ে

গেছেন। কবি সে-সম্বন্ধে যে আশীর্ব্বাদ জানান সে-কবিতাটি এবং অপর একটি কবিতাও আমরা প্রবন্ধের শেষের দিকে প্রকাশ করলাম। নন্দলাল বসুর চিত্রকলাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম কালের—যখন কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথের কাছে গুরুগৃহে শিক্ষা করতেন- আর্টস্কুল থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর। এই প্রথম দিকের কাজে তাঁর মৌলিক রচনার বৈচিত্র্য এবং কঠোর সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব কাজে অসম্পূর্ণতার বা জড়তার কোনোই লক্ষণ নেই। তার পরের একটি কাল হল ১৯২৩—২৪ সালে শান্তিনিকেতনে যখন এলেন। আশ্রমে মহাকবি ৭০ বৎসর বয়স থেকে জার্মাণ শিল্পী কুবিনের ধরণে রঙিন কালির আঁচড়ে ছবি আঁকতে সুরু করায় তাঁর প্রভাবেও নন্দলাল প্রভাবান্বিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন সার্বজনীন এবং সর্ব-কালের কাজকেই বড় বলে গড়ে তুললেন আশ্রমে, নন্দলাল বসু দেশবিদেশের আর্টের অনুকরণে ছবি আঁকার দ্বারা সার্ব্বজনীনতা আর্টে আনবার পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। তাঁর মন আর দেশী আর্টে সন্তুষ্ট রইল না, এই প্রকার সার্ব্বজনীন আর্টের সত্য আবিষ্কারের চেষ্টায় শেষ জীবন অতিবাহিত করলেন। অবশ্য আধুনিক কালে পন্ডিত শিল্পরসিকেরা নিজেদের দেশের আর্টের সংস্কৃতির বিষয় উপেক্ষা করে বিলাতি আর্টের গ্রন্থাবলী পড়ে বিলাতের আধুনিকতাকে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের পক্ষে নন্দলাল বসুর এই বিলাতি আর্টের পরীক্ষা ভাল লেগেছে; কেননা দেশের আর্টের পক্ষ-পাতিত্বর মানেই হ'ল (তাঁদের কাছে) 'গোঁড়ামি'। নন্দলাল বসুর ছবির এ্যালবাম শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ থেকে যা সম্প্রতি ছাপা হয়েছে তাতেই তাঁর এই দুইকালের চিত্র-কলার প্রতিলিপি দেওয়া আছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা যেমন দেশের আর্টকে পুনরায় জাগাবার চেষ্টা করলেন, এখন আবার গণতন্ত্র দিবসে তরুণ শিল্পীরা চাইছেন 'গোঁগা', 'রোদাঁ', 'এপ্স্টাইন' 'পিকাসো'র দৃষ্টান্ত নিয়ে নবতর ভাবে এক নবীন আর্টের পরীক্ষা করতে। স্বাধীন দেশে শিল্পীরা চান স্বাধীন ভাবে বিলাতি আর্টকে নিয়ে এক নতুন আর্ট সৃষ্টি করার দ্বারা ললিতকলাকে পুষ্ট করতে। এখন সবাকারই মুখে শিল্পে নবীনতা ও সার্ব্বজনীনতা ফোটানের কথাই শোনা যায়। দেশের আর্টে দেশের বিশেষ রূপকে ফুটিয়ে তোলার কথা এখন আর কেহই ভাবেন না। এখন আর্টের মধ্যে দিয়ে দেশের সংস্কৃতির গৌরব প্রচার করবো এরূপ অভিমান—অন্ততঃ শিল্পীরা রাখছেন না। এখন দেখা যাক কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে যে য়ুরোপের সার্বজনীন আর্টের শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন তার ভিতরেই বা কি পদার্থ নিহিত আছে।

য়ুরোপের আধুনিক আর্ট

য়ুরোপে আধুনিক ঢংএ ছবি আঁকার প্রবর্তন হল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার আবিষ্কার হবার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে। খৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে গ্রীক বা রোমান আর্টে জীবন্ত আকারে মানুষ গড়া হোতো—চিত্রকলার বিশেষ উন্নতি হয়নি তখনো। প্রথম খৃষ্টাব্দ থেকে খৃষ্টধর্ম যাজকেরা 'গথিক' বা 'বাইজান্তাইন' যুগে ছবি আঁকতেন বাইবেলের গল্প অবলম্বনে—খৃষ্টের জীবনী নিয়ে। সেগুলি হোতো তাঁদের সম্পূর্ণ মৌলিক পরিকল্পনার সাহায্য করা ছবি। এই গথিক বা বাইজান্তাইন যুগের সমসাময়িক অজন্তার চিত্রকলা। কিন্তু বাইজান্তাইন চিত্র কাঠপুতুলের বা পটোদের আঁকা গ্রাম্য ছবির মত হোতো—আর অজন্তায় শিল্পীরা মন থেকে জীবন্তভাবে ছবি ভিত্তিগাত্রে এঁকে গেছেন ভাব ও লাবণ্যমন্ডিত ক'রে।

বাইজান্তাইনের পর অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে যখন বারুদ আবিষ্কার হল য়ুরোপে তখনই বৈজ্ঞানিক মনোভাবও তৈরী হল সে দেশে। তাদের মনে তখন পোটোভাবের ছবির জায়গায় জীবন্তভাবে ছবি ক্যান্ভাসে ফোটানোর স্পৃহা জাগল এবং অব্যবহিত পরেই য়ুরোপে রেনেসাঁ স্কুলের প্রারম্ভেই পারিপ্রেক্ষিক বিজ্ঞান (Perspective) আলো-



বুদ্ধ মূর্ত্তি
(ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

ছায়ার বিজ্ঞান (Light & Shade). দেহ পেশিতত্ত্ব (Anatomy) আরম্ভ হল আর্টে। জীবন্তভাব চিত্রে ফুটে উঠ্‌লো সামনে মডেল বসিয়ে ছবি আঁকার দ্বারা। এর বিপর্য্যয় এক ঘটল মডেলের পক্ষে, একই ভঙ্গী দিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার দরুন অস্বাভাবিক ভাবই ফুটে উঠলো মুখে চোখে—শিল্পীও হুবহু নকল করে তুললেন চিত্র-পটে সেই আড়ষ্ট ভাব। ক্যামেরায় ছবি তোলা আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁদের পূর্বের মডেল থেকে ছবি আঁকার ভ্রম তাঁরা বুঝতে পারলেন য়ুরোপে। বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে তাই কতকগুলি শিল্পী ক্যামেরার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আর্টে নবীনতার পরীক্ষা সুরু করে দিলেন।

১৮৩০—১৮৬৫ থেকে মোড় ফিরল য়ুরোপের আর্টে এক অভিনব ভঙ্গীতে। এই কালের অভিনব চিত্রে তখনও বিষয়বস্তুর ভিতর গল্পাংশ ছিল। আর তারপর থেকে আবার 'আরো নতুন' —'আরো আলো' দেখার আগ্রহ জাগল এই অভিনবত্বের ভিতরেও ১৮৬৫—১৯০০ পর্যন্ত। এখন থেকে আর ছবিতে কিছু বলার বা প্রকাশ করার কথা রইল না। কেবল যে-কোনো আকৃতি বা ফর্ম (Form) বা প্যাটার্ণ (যা পণ্যশিল্পেই কাজে লাগে) গড়ার প্রতিযোগিতা সুরু হল শিল্পীদের মধ্যে।

অতি আধুনিকতার কাল হিসাবে বিলাতি আর্টকে ভাগ করা যায় এই ভাবেঃ—(১) কিউ-বিজম (Cubism) ১৯০৯; (২) ফিউচারিজম (Futurism) ১৯১১—১৯১৫; (৩) য়্যাবস্টাক্ট-ইজম (Abstractism)—১৯১১ (৪) দাদাইজম (Dadaism) ১৯১৬—২২; (৫) সুররিয়ালিজম (Surrealism) ১৯২৪; (৬) একস্প্রেশানিজম, ভেনগাফ (Vangough) থেকে আরম্ভ এবং (৭) প্রিমিটিভিজম (Primitivism)—এর গুণ সবরকমের আধুনিক বিলাতি আর্টে বর্তমান। এগুলির উর্দ্ধে ইম্প্রেশনিজম (Impression-ism); আধুনিক আর্টের অনেক পূর্বে টার্ণার (Turner), দেলেরোঁ (Delaeroix), এবং মনে (Monet) কর্তৃক আবিষ্কৃত। ক্যান্‌ভাসের উপর জোরালো রঙের ছোপছাপ দিয়ে প্রকৃতির রূপ ধরা হোল এদের কাজে। টার্ণারের এই অভিনব পদ্ধতিতে আঁকা একটি ছবি নিয়ে তখনকার ইংলন্ডের বিখ্যাত শিল্পরসিক রাসকিনের (Ruskin) যে দ্বন্দ্ব হয় এবং কোর্টে রাসকিনকে হার মানতে হয়েছিল তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করার দরুন, তার কথা এখন সবাই জানেন।

পিকাসো (Picasso) এবং ব্রাক (Braque) এর পর আনলেন কিউবিজম (Cubism)। চ্যাপটা ছবিতে বস্তুর গভীরতা (three Dimension) দেখানোর খেলাই হোল এই প্রকার ত্রিকোণ ঘনত্ববোধক চিত্র আঁকা। এটা এঁরা পেলেন জংলী হাফ্‌সীদের গড়া মূর্তির মধ্যে কোণাচে ভাব দেখে। এই শিল্পীরা সবাই ছবিতে—ত্রিকোণ ঘনত্বর তত্ত্ব প্রথম ঘোষণা করলেন। অজন্তার ছবিতে যেখানে ছবির ভিতর পাহাড় আঁকা হয়েছে তাতেও এই প্রকার ভাব দেখতে পাওয়া যায়। ইটালীর একজন শিল্পী মারিনেটি (Marinethi) ১৯১১—১৯১৫এ ফিউচারিজম (Futurism) আবিষ্কার করেন। 'ছন্দ' বা 'সুরুচি' দুটি কথাকে তাঁরা দেশছাড়া করলেন। তাঁরা বলেন এই দুটি শব্দ থাকার দরুন আর্ট পঙ্গু হয়ে আছে—এগোচ্ছেনা। জার্মাণ হিটলারের 'ফ্যাসিষ্ট' মনোভাব এই শিল্পীদের। সব ভাঙতে হবে—ভাঙার নামই নতুন করে গড়া। অর্থাৎ যেমন করেই হোক নতুনত্ব আনার চেষ্টা। এই প্রকার শিল্পীদের মধ্যে করৱা (Carra) রুসোলো (Russolo) সেরোইরিন (Seroerin), বেলা (Bella) এবং বকিত্তন (Boccion)দের নাম করা যেতে পারে। আরো নতুন ধরণের আর্টের খেলা খেললেন সুইজারল্যান্ডের একজন শিল্পী দাদাইজম (Dadaism) এনে। এর প্রকৃত অর্থ কাঠের খেলার ঘোড়া (Hobby horse) একটি ডাক্তার আঁদ্রে ব্রাইটন (Andre Briton) ১৯২৪, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের ভাবে অভিভূত হয়ে ছবি আঁকলেন। এই সব শিল্পীদের মনস্তত্ব বিষয় ডক্টর 'গর্ডন' বলেন প্রথমতঃ (১) শিল্প

শিক্ষার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এমন হওয়া চাই; (২) জীবনে ভালমন্দের বিচার না করে শিশু বা জংলীদের মত মনোভাব তৈরী করার দ্বারা; (৩) এমন ভাব দেখানো যে বাইরে থেকে কোনো অনুপ্রেরণা বা প্রভাবের ছোঁয়াচ তাঁদের গায়ে লাগতে পারেই না। (৪) বেশী পরিমাণে আঁকার দ্বারা নাম কেনা—সারের চেয়ে ভার বাড়ানো।

এই প্রকার য়ুরোপীয় মনোভাব হল বস্তু-তান্ত্রিক মনোভাব এবং তা তাদের বৈজ্ঞানিক পন্থার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। ভারতবর্ষের নিজস্ব মৌলিক অধ্যাত্ম জগতের আর্টের সঙ্গে য়ুরোপীয় আর্টের কোনোই মিল নেই। কিন্তু যেহেতু আধুনিক য়ুরোপীয় আর্ট আয়ত্ত করতে হ'লে শিক্ষা করার প্রয়োজন হয় না, শিশুর মত তুলির আঁচড় টেনে আঁকলেই হল—সেই হেতু সবাই এখন শিল্পী হবার চেষ্টা করতে সুরু করেছেন আমাদের দেশে। এক পক্ষে এ-থেকে আর্টের উপর পূর্বের বিরাগ দেশ থেকে চলে যাচ্চে কিন্তু দেশের নিজস্ব শিল্প-সম্পদের কথাও ভুলতে বসেচেন শিল্পীরা। গণতন্ত্র যুগে গত ১৪ বৎসর ধরে এই রূপ আর্টই ললিতকলা আকাদামীতে লালিত পালিত হচ্চে। মাত্র চৌদ্দ বৎসর দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আর্টের বেলায় বিদেশীর শৃঙ্খল জোর করে আমরা আবার পরে নিয়েছি পায়ে সাবর্বজনীনতার দোহাই দিয়ে। এই আর্টকে বিদ্রূপ করার যো নেই। এর ফলে দেশের নিজস্ব মৌলিক আর্ট যে আবার কোন্ বিস্মৃতির গর্ভে লীন হবে তা কে' জানে? ভবিষ্যৎ বংশধররা এর মীমাংসা করবেন।

আর এক কথা, পাণিনিতে (আঃ খৃঃ পূঃ ২০০০) আছে 'গ্রাম্য শিল্প' আর 'রাজশিল্প'র কথা। গুপ্তযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই দুই প্রকারের আর্টের পরিচয় এ দেশে আছে। গ্রাম্য আর্ট থাকায় হাটেবাজারে সস্তা দরে তা বিক্রি হ'তো সর্বসাধারণের জন্যে। তাতে 'রাজশিল্প' অর্থাৎ ক্লাসিকাল আর্টের কোনোই ক্ষতি হয়নি। বরং দেখা গেছে অজন্তা ও মোগল আর্টে তার ক্রমোন্নতি। আধুনিক য়ুরোপীয় ক্রিটিকেরা পটের অনুকরণে আঁকা চিত্র দেখে মুগ্ধ হন। কেননা তাঁরা বুঝেছিলেন অর্দ্ধ-সভ্যটবর্বরের ন্যায় ভারতের পক্ষে এই প্রকার আদিম (প্রিমিটিভ) আর্টই যথেষ্ট।

একটা ভাল লক্ষণ এই দেখা দিয়েছে যে কেন্দ্রিয় শিক্ষা বিভাগ থেকে নামজাদা শিল্পীদের নিকট শিক্ষা পাবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। আর সারা ভারতের শহরে শহরে এবং পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রাম্যমাণ চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী করার ব্যবস্থা হয়েছে। স্বাধীনতা পাবার পূর্বে আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে এরূপ কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

দেশের শিল্পকলার ভবিষ্যৎ বিষয় একটা কথা বলে শেষ করি। ভারতে য়ুরোপীয় আর্টের প্রস্তাব পূর্বেও ঘটেচে ভারতে গ্রীক অভিযানের ফলে। পাঞ্জাবে কাশ্মীর অঞ্চলে গ্রীক ধারায় গান্ধার শৈলীর প্রভাব এসেছিল, কিন্তু তা' দুই শতাব্দীর অধিক স্থায়ী হয়নি। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় দেশী আর্টের পরম্পরাই চলে ছিল পরবর্তী মৌর্য, শুঙ্গ ও গুপ্তযুগ থেকে মোগল আমোল পর্যন্ত। বিংশ-শতাব্দীতে যানবাহনের উন্নতির ফলে সারা পৃথিবীর যোগ সহজ ও সুলভ হয়েছে। অতএব শিল্পীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনোভাবের বৈচিত্র আধুনিককালে দেশবিদেশের আর্টের প্রভাবে যে নবতর রূপ নেবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এখন কেবল মাত্র দেশের আর্টের ঐতিহ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশী আর্টের প্রভাবকে এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। এই সংকটে, প্রতিভাবান শিল্পীই কেবল দেশের গৌরব দেশের আর্টে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন—দেশের আর্টের ও বিদেশী আর্টের আদর্শ বিচার দ্বারা তথ্য ভাল ক'রে বুঝে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। তাই একদল শিল্পীকে দেশী ও বিলাতির কোন অনুকরণ করতেই দেখা যাবে, আবার অন্য একদলকে দেশের আর্টে নবীন জোয়ার আনতে দেখা যাবে, সহজ ভাবে দেশী বা বিদেশী আর্টকে ভাল ক'রে জেনে, কোনো প্রকার অনুকরণের প্রশ্রয় না দিয়ে। নদী যেমন শাখা

প্রশাখায় নিজের বেগে প্রবহমান হয়, তাকে খাল কেটে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, আর্টের বেলায়ও তাই দেখা গেছে সকল কালে সকল দেশে। দেশের আর্টের উন্নতি প্রতিভাবান শিল্পীদের নিজস্ব সাধনার উপর নির্ভর করে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ শিল্পী অসিতকুমার হালদারকে এবিষয় একটি চিঠিতে লিখেছেনঃ

কল্যাণীয়েষু, তোর প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই। প্রতিভার সাধনা কোন্ পথে চলে হঠাৎ বোঝা যায় না—প্রথমটা লাগে ধাঁধা, তারপরে দেখা যায় একটা কোথাও পৌঁছে সে আপন তাৎপর্য প্রকাশ করে। ইতিহাসে বার বার এ-ঘটনা ঘটেচে।

প্রতিভার পাগ্‌লামী সৃষ্টি প্রণালীর অঙ্গ। যখন মনে করেছি বাঁধা পথ পাওয়া গেছে সে পথ ছাড়া গতি নেই, তখন হঠাৎ দেখি উচৈঃশ্রবা চার পা তুলে ছুটে চলেছে যেদিকে পথের চিহ্ন পড়েনি—এদিকে আমরা হৈ হৈ চীৎকার করি, সহিসকে গাল পাড়ি, হাওয়ায় সাঁই সাঁই রবে চাবুক আস্ফালন করি, কিন্তু দেবতার ঘোড়া আপন চলার দ্বারা নতুন পথ বের করে, নতুন ঐশ্বর্যের পথ।

সকল প্রকার সৃষ্টির ইতিহাস এই অনা-সৃষ্টির রাস্তা দিয়েই। তাই তাড়াতাড়ি কিছু বলতে সাহস হয় না। আমার কলম যখন চলেছিল, হেমবাঁড়ুয্যের পথ ডিঙিয়ে গেল—তার পরেও ক্ষণিকায়, বলাকায় বাঁক বদলাতে লাগল, আজও কি পাকা রাস্তা ঠিক্ করতে পেরেছি?—**রবিদাদা**

আচার্য্য নন্দলাল বসু

স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ব-বিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম বয়সেই সমাজ তাঁকে নির্মম ভাবে ত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন দুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ করেন নি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চলত; ফ্রান্সের



নন্দলাল বসু

রাজা চতুর্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেন্সন্ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, সর্ত ছিল এই যে তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা রাজি হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন, সে সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক কোঠায় মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবলমাত্র তার্কিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলব্ধি ও প্রকাশ।

শিল্পকলায়, রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ করি আরো ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্মের অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হোতে পারে। স্বভাব-কবিকে, স্বভাব-

শিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি তাদের লেখায়, তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের ব্যবহারে তাদের দিনযাত্রায়, তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম ক'রে থাকেন। এ রকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হতে পারে না, বস্তুত প্রতিকূলতাই অনেক সময় শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে, জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এল্‌ম্‌হর্স্ট। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচার-শক্তি অন্তদর্শী। একদল লোক আছে আর্টকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এই রকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার করা। এই রকমের যাচাই-প্রণালী মুজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিষ মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষ সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-ভান্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়। সজীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলেছে, সে এগোচ্ছে, তার সম্ভূতির শেষ হয়নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়েনি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরী করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাঁকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যেই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি,—তার এমন কোন ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হোলো, বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ্ আর্টস আছে এবং এ কথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে সেই স্কুলের অনুবর্তীরা আমাদের এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোরে লেখালেখি কোরে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল সস্তায় চোখ ভোলাবার ফন্দি, বাস্তব সংসারের প্রাণ-বৈচিত্র্যতার মধ্যে নেই। আমরা কাগজেপত্রে কোন প্রতিবাদ করিনি,—ছবিগুলি দেখানো হোলো। এতদিন যা বলে তাঁরা বিদ্রূপ কোরে এসেছেন। প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্রের প্রকাশ, বিচিত্র হাতের ছাঁদে, তাতে না আছে সাবেক কালের নকল না আছে আধুনিকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি বাজার দরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই।

যে নদীতে স্রোত স্বল্প সে জড়ো ক'রে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক

অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা ক'রে তোলে। তাদের কর্মে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলই তার পথ তৈরী করতে থাকে। সৃষ্টি কার্যে জীবনী শক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চল্‌বেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখেনা। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হোতো তা হোলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা খরিদ্দার তাদের বিচার বুদ্ধি অচল শক্তিতে খুঁটিতে বাঁধা। তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যস্থ আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভাল লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিস্‌টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভাল লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্তন করলে আর্টিস্‌টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক্, হাটে বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক্ বাজারে ঠকা ভাল, নিজেকে ঠকানো তো ভাল নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তা হোক্। অমুক বই বা অমুক ছবি পর্যন্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকর্ষের সীমা—বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে লোকের অভ্যস্থ বরাদ্দে বিঘ্ন ঘটেছে। সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক্ সেই পাপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অতীত-কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিনী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অন্ত-হীনের আহ্বান।

আর্টিস্‌টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তাঁর জীবনে। আমরা বারম্বার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্খার দৌড় থাকত, তা হোলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাঁচ্চা দাম-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্পসাধকদের তপস্যার সম্মুখে রজত নূপুরনিক্বণের মোহজাল বিস্তার ক'রে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তি-লোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আরেকটি লক্ষণ দেখা যায় সে তাঁর অবিচলিত ধৈর্যে। বন্ধুর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় নি তার দৃষ্টান্ত দেখেছি। যাঁরা তাঁকে জানে এমনতর ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে কিন্তু তিনি অতি সহজে ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করে। তাঁর মন গরীব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ীর কারো প্রতি ঈর্ষার আভাসমাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। যাকে যার দেয় সেটা চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের যশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনো দিন তাঁকে ছোট হতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য, নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি নিজের রচনায় যেমন, নিজের স্বভাবেও তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এ রকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্চে, তারা এ কথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর ঔদার্যে ও চিত্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্খা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি।*

এখানে কবির নন্দলাল সম্বন্ধে লিখিত দুটি কবিতা প্রকাশ করিলাম।

শ্রীমান নন্দলাল বসু
পরম কল্যাণীয়সু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভান্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতা আশিষ মন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে—
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ!
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পারায় আপন ছন্দ।
চিরসুন্দরে করগো তোমার
রেখাবন্দনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক্ তব তুলি
চিররস—নিষ্যন্দী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* কবির এই রচনাটি সম্বন্ধে আমাকে কেহ কেহ জানিয়েছেন যে—রচনাটি সম্ভবত, শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার মহাশয়ের কোনো লেখার উত্তরে 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

আশীর্ব্বাদ

পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ—

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অনতুন সে কী মধুরাতে
লাগাল কে যে নয়ন পাতে,
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা।

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের লীলা লিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি,
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি।

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে
রঙজাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়াল ভালে।

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমি ও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন চুলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত।

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপ ছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন পটের' পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়।

চিরবালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলা ঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা—' পরে।

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

নন্দলালের অঙ্কিত 'দীক্ষা' নামক চিত্রটি দেখে কবি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঐ-ছবিটি উপলক্ষ্য করে একটি গানও রচনা করেছিলেন। এখানে তা তুলে দিলাম। নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ ছিল।

পূরবী—একতালা

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা।
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার আজন্মবতাঁর দেখা
সারাদিন শুধু বাইরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে।
সন্ধ্যা বেলার আরতি হয়নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে জীবন প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজা লোক করে রচনা
আমিও সেথায় ধরিব একটি জ্যোতির রেখা।

সাধনার পীঠ সাধের আসন শিল্পের নব জীবন-ধারা,
এ মহানগরী ভারত-আকাশে সাতাশ তারার নয়ন-তারা।
একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে,
পঞ্চ প্রদীপ—অবনী—গগন—অসিত—মুকুল—নন্দলালে।
মাইকেল মধু হেথা সমাহিত, বঙ্কিম—হেম—ভস্মকণা
ধূলিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে কত না ভাবুক রসিক জনা।
হেথা "মহীয়সী মহিলা"র কবি গাহিল মধুর মায়ের স্তুতি;
বিহারী বঙ্গসুন্দরী—ভালে সঁপিল শ্লোকের শুভ্র যূথী।
কবির "স্বপ্ন-প্রয়াণ" তুরগী, রবির প্রভাত-গীতির শ্রোতা
এই কলিকাতা কোলাহলময়ী, এর ভাগ্যের তুলনা কোথা।
কবি-গুঞ্জনে এ ধূলিপুঞ্জ ধরেছে কুঞ্জবনের ছিরি,
জগৎ উজল যার প্রতিভায় এ সেই রবির উদয়-গিরি।
হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নব নালন্দা শিক্ষা গেহ,—
দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি পক্ষীমাতার স্নেহ।
এরি উপান্তে বৈষ্ণব লালা লভিল প্রথম অমৃত-ছিটা;
প্রত্ন-প্রেমিক রাজা রাজেন্দ্র,—এইখানে তার আছিল ভিটা।
হেথা পরিষৎ অশথের চারা দিকে দিগন্তে পসারে শাখা,
টেঁকচাঁদ আর গুপ্ত কবির প্রকাশে এ ঠাঁই পুলকে মাখা।
গিরিশ হেথায় রঙ্গে মাতিল, রায় দ্বিজেন্দ্র হাসিল হাসি।
স্বাগত কাব্য—কোবিদ! হেথায় উজ্জয়িনীর বাজিছে বাঁশী।

* * *

মানুষ আপনার অন্তরতম ইচ্ছাকে ভালোবাসাকে শুধু কেবল আপন ব্যবহারের দ্রব্যের মধ্যেই প্রকাশ করে তাহা নহে; তাহার সংগীত, তাহার চিত্রকলা এই প্রকাশের প্রধান বাহন। ইহার দ্বারাই দেশ আপন অন্তরের আবেগকে বাহিরে রূপদান করে এবং তাহাকে চিরন্তন করিয়া উত্তরকালের হাতে সমর্পণ করিয়া যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিস জাতি বিশেষে যাহার তারতম্য আছে, কিন্তু প্রকার ভেদ নাই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে-সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্য বিচার এক নিয়মে হইবে আর ইংলনডের অন্য নিয়মে হইবে ইহা হইতেই পারেনা। বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তাহার ফল দেশভেদে বিভিন্ন হইবে ইহাও অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি মূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে তাহা সর্বত্র এক হইবেই।

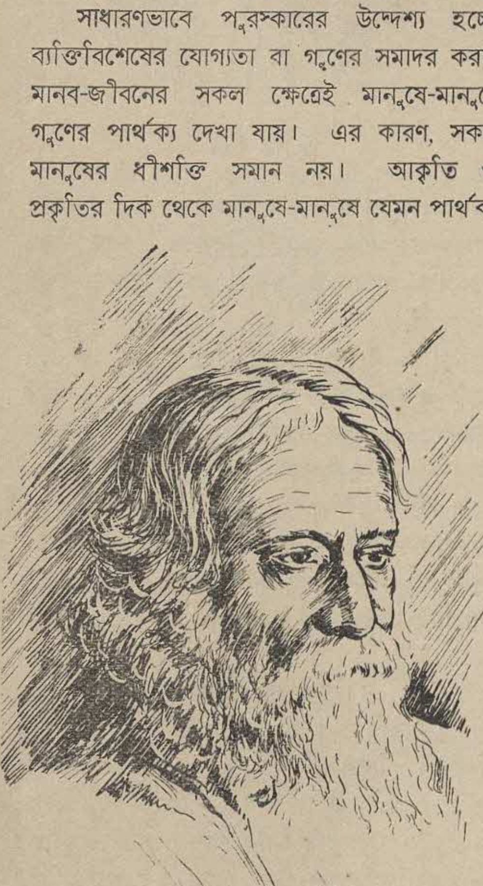
কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই, আর থাকাই শ্রেয়। ইহাকে নষ্ট করা আত্মহত্যার করারই সামিল। এই হৃদয় বৃত্তির প্রকাশ কলা বিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নাই। স্থান থাকার যে গুরুতর প্রয়োজন আছে সেই বোধ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হইতে চলিয়া গিয়াছে।—**রবীন্দ্রনাথ**

নোবেল পুরস্কার



পৃথিবীতে যতগুলি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আছে তাদের মধ্যে নোবেল পুরস্কারই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সাধারণভাবে পুরস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা বা গুণের সমাদর করা। মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানুষে-মানুষে গুণের পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ, সকল মানুষের ধীশক্তি সমান নয়। আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে মানুষে-মানুষে যেমন পার্থক্য দেখা যায়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রেও মানুষে-মানুষে তেমনি পার্থক্য বর্তমান। তাই একে যা পারে, অন্যে তা পারে না। এই কারণেই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানুষকে পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এই পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতায় যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, তাঁর গুণই একটি বিশিষ্টতা লাভ করে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উৎসাহিত করার জন্যই পুরস্কার দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।



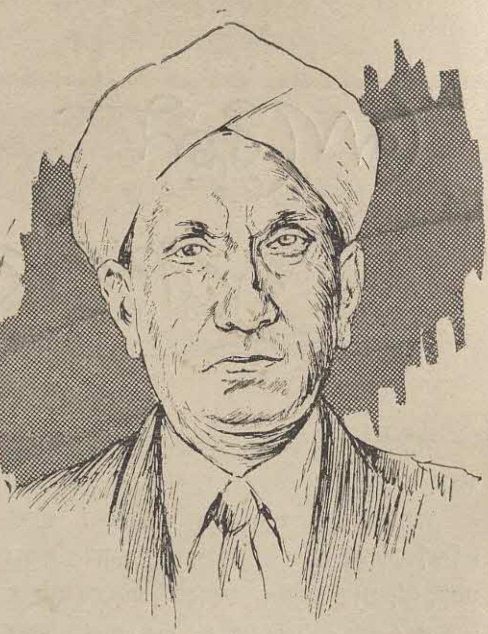
রবীন্দ্রনাথ

প্রায় সকল সভ্য দেশেই অতি প্রাচীনকাল থেকে দেশের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের তাঁদের কৃতিত্বের মর্যাদাস্বরূপ পুরস্কৃত করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু দেশের বহির্ভূত গুণী ব্যক্তিকে এরূপ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করার রীতি আধুনিক কালের উদার মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। অবশ্য, বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে দেশে-দেশে মেলামেশা ও আদান-প্রদানের যে সুযোগ-সুবিধা ঘটেছে, এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী তারই সুফল বলা যায়। এ ছাড়া আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের মহত্তর বৃত্তির মধ্যে পরার্থে দানের স্পৃহা একটি প্রধান গুণ বলে গণ্য। বলা বাহুল্য, এই পুরস্কারও উক্ত দানেরই পর্যায়ভুক্ত। যাঁরা দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে বিশ্বের মানবতার কল্যাণে তাঁদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য দান করেন, তাঁরাই চিরকাল প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকেন। তাই স্কটল্যান্ডের দেশপ্রেমিক কার্নেগি, আমেরিকার হেন্‌রি ফোর্ড, সুইডেনের অ্যালফ্রেড নোবেল বার্নহার্ড দানবীর হিসাবে আজ বিশ্ব-

বরেণ্য। স্বাধীন ভারতের মানুষও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। উড়িষ্যা রাজ্যের ধনী ব্যবসায়ী বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে 'কলিঙ্গ' পুরস্কারের মাধ্যমে আজ বিশ্ববিদিত দানবীরদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু দাতা হিসাবে সুইডেনের অ্যালফ্রেড নোবেল বার্নহার্ডের যে কীর্তি, এবং তাঁর প্রবর্তিত 'নোবেল অর্থ-ভান্ডার' প্রতিষ্ঠিত 'নোবেল পুরস্কার'-এর যে ব্যাপ্তি, পৃথিবীতে তার তুলনা হয় না।

।। দানবীর নোবেল ।।

য়ুরোপের উত্তর-পশ্চিমে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপের দুটি দেশ—নরওয়ে ও সুইডেন। স্টকহোল্‌ম হ'ল সুইডেনের রাজধানী। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর এই স্টকহোল্‌মে অ্যালফ্রেড বার্নহার্ড সুইডেনের বিখ্যাত 'নোবেল' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইম্‌ম্যানুয়েল ছিলেন একজন রাসায়নিক এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। নোবেল সেন্ট পিটার্সবার্গ ও যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ করে, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) পিতার সঙ্গে বিস্ফোরক দ্রব্যের গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে 'নাইট্রোগ্লিসারিন' নামক বিস্ফোরকের প্রস্তুতপ্রণালীর যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। তাঁর এই সুসংস্কৃত বিস্ফোরকের নামকরণ হয় 'পাইরোগ্লিসারিন'। আরও গবেষণার দ্বারা পরবর্তীকালে এর রূপান্তর ঘটে,—'গ্লোনোইল তৈল' এবং পরে 'নোবেলের বিদারণশীল তৈল' নামে অভিহিত দুটি পদার্থের দ্বারা। কিন্তু তৈলজাতীয় তরল বিস্ফোরকের নানা অসুবিধা থাকায়, নোবেল আরও কয়েক বৎসর গবেষণার দ্বারা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাতে উক্ত তৈলজাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে শোষক মৃত্তিকার মিশ্রণে যে কঠিন বিস্ফোরকের সৃষ্টি হয় তাই-ই হচ্ছে তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'ডিনামাইট'—যা তাঁকে অপরিমেয় যশ, মান ও অর্থের অধিকারী করেছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারিস শহরে তাঁর বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন; কিন্তু



সি. ভি. রমন

তাঁর মহামূল্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ইটালীর অন্তর্গত স্যান রেমোর বিখ্যাত ভিলা 'মিও নিডো'র শয়নকক্ষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর।

তাঁর মৃত্যুর বাইশ দিন পরে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী যখন তাঁর স্বরচিত ইচ্ছাপত্র বা উইল প্রকাশিত হয়, তখন বিশ্ব-মানবের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের উন্নতিসাধনে তাঁর দানের অপরিমেয়তা এক বিস্ময় সৃষ্টি করে। এমনটি পৃথিবীতে আর কখনো হয়নি! মানব-প্রীতি ও জ্ঞানস্পৃহার সাধনায় নোবেলের এই দান চিরদিন অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ হয়ে থাকবে।

।। নোবেল পুরস্কার ।।

নোবেল তাঁর ইচ্ছাপত্রে যে অর্থ-ভান্ডারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার পরিমাণ হ'ল ৮,৫০০,০০০ ডলার, যার সুদ থেকে প্রতি বৎসর জাতি ও নর-নারী নির্বিশেষে পাঁচটি পুরস্কার কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই অর্থ-ভান্ডারই হ'ল জগদ্বিখ্যাত 'নোবেল পুরস্কারের' ভিত্তি। এই পাঁচটি পুরস্কারের



মাদাম কুরী

শ্রেণীবিভাগ হ'ল—(১) পদার্থবিদ্যা, (২) রসায়ন, (৩) শারীরবৃত্ত বা ভেষজ, (৪) আদর্শবাদী সাহিত্য, এবং (৫) শান্তি-সংরক্ষণ। প্রত্যেকটি পুরস্কারের পরিমাণ হ'ল ৩৭,৫০০ ডলার। ইচ্ছাপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী—'নোবেল অর্থ-ভান্ডার' পরিচালনার জন্য পাঁচজন সভ্যদ্বারা গঠিত একটি সমিতি আছে, যার সভাপতি নির্বাচন করেন সুইডেনের রাজা; পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দু'টি বন্টন করেন সুইডেনের বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমি; শারীরবৃত্ত বা ভেষজের পুরস্কারটি বন্টন করেন স্টকহোল্‌ম অনুষদ্; সাহিত্যের পুরস্কারটির ভার যাঁদের উপর, তাঁরা হচ্ছেন সুইডেনের সাহিত্য-অ্যাকাডেমি; শান্তি-সংরক্ষণের পুরস্কারটি বন্টন করেন নরওয়ের সংসদ্।

নোবেলের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী 'নোবেল অর্থ-ভান্ডারের' ব্যবস্থা করতে, নোবেলের মৃত্যুর পর চার বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। এই কারণে প্রথম পুরস্কার বন্টন করা হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় থেকে অব্যাহতভাবে প্রতিবৎসর এই পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা চলে আসছে। তবে, কোন কোন বৎসর যোগ্য প্রার্থীর অভাবে কোন কোন বিষয়ের পুরস্কার বিতরণ বন্ধ থাকে। বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, পুরস্কার বিতরণের তের বৎসরের মধ্যেই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতের বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতি-কবিতা, বিশেষভাবে 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের জন্য, সাহিত্যের পুরস্কারটি লাভ করেন, এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সার্ সি. ভি. রমন পদার্থবিদ্যায় তাঁর গবেষণার জন্য—যা 'রমন এফেক্ট' নামে পরিচিত—পদার্থবিদ্যার পুরস্কারটি লাভ করেন।

।। নোবেল ইন্‌স্টিটিউট ।।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, নোবেল ইচ্ছাপত্রে 'নোবেল পুরস্কার' ব্যতীত 'নোবেল অর্থ-ভান্ডার' থেকে পাঁচটি 'নোবেল ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ থাকায়, বর্তমানে পাঁচটির মধ্যে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্টক্‌হোল্‌মে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এবং সাহিত্য সম্পর্কে, এবং অপর একটি হচ্ছে নরওয়ের নোবেল ইন্‌স্টিটিউট, যেটি প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক আইন ও শান্তির পাঠাগার।



আইনস্টাইন



আরনেস্ট হেমিঙওয়ে (বৃদ্ধ বয়সে)

।। ইচ্ছাপত্র বা উইল ।।

আমার অবশিষ্ট লভ্য সম্পত্তির সমস্তই নিম্নলিখিতভাবে নিয়োগ করা হবেঃ

আমার অছিমন্ডলী সমস্ত মূলধন নিরাপদ কোম্পানীর কাগজে নিয়োগ করে একটি ভান্ডার গঠন করবেন। এই মূলধনলব্ধ সুদ প্রতি বৎসর পুরস্কারস্বরূপ বন্টন করা হবে। পূর্ব-বৎসর যাঁরা মানবজাতির সর্বোত্তম সেবা করেছেন বলে গণ্য হবেন, চল্‌তি বৎসর তাঁদেরই মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হবে। উল্লিখিত সুদের অর্থকে সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বন্টন করা হবেঃ

পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেছেন যিনি, এক ভাগ পাবেন তিনি।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোন রাসায়নিক তথ্য আবিষ্কার বা উহার উন্নয়ন করেছেন যিনি, এক ভাগ পাবেন তিনি।

শারীরবৃত্ত অথবা ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন যিনি, এক ভাগ পাবেন তিনি।

সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শপূর্ণ অভিনব কিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন, এক ভাগ পাবেন তিনি।

জাতিগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনের জন্য, স্থায়ী সেনাবাহিনীর বিলোপসাধন বা হ্রাস করার জন্য এবং শান্তি-পরিষদসমূহের অনুষ্ঠান ও উন্নয়নের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অথবা শ্রেষ্ঠ কাজ করেছেন যিনি, এক ভাগ পাবেন তিনি।

পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত পুরস্কার-গুলি সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্স কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

শারীরবৃত্ত অথবা ভেষজ সংক্রান্ত পুরস্কার বিতরণ করবেন স্টক্‌হোল্‌মের ক্যারোলাইন ইন্‌স্টিটিউট।

সাহিত্যের জন্য পুরস্কার প্রদান করবেন স্টক্‌হোল্‌মের অ্যাকাডেমি। শান্তি সেবায়েত-গণের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার বিতরণ করবেন



পার্ল বাক (যৌবনে)



উইন্সট্‌ন চার্চিল

নরওয়েজিয়ান স্ট্যাটিং (সংসদ)-নির্বাচিত পাঁচজন সদস্যসমন্বিত একটি সমিতি।

ইহা আমার সুস্পষ্ট অভিলাষ যে, পুরস্কারগুলি বিতরণ সম্পর্কে প্রার্থীর জাতীয়তার কোন প্রশ্ন বিচার করা হবে না। তিনি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান হোন বা না হোন, যোগ্যতম ব্যক্তিমাত্রেই পুরস্কার লাভ করতে পারবেন।

প্যারিস — স্বাক্ষর

২৭শে নভেম্বর, ১৮৯৫ — **অ্যালফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল**

।। নোবেল ফাউন্ডেশন (অর্থ-ভান্ডার) ।।

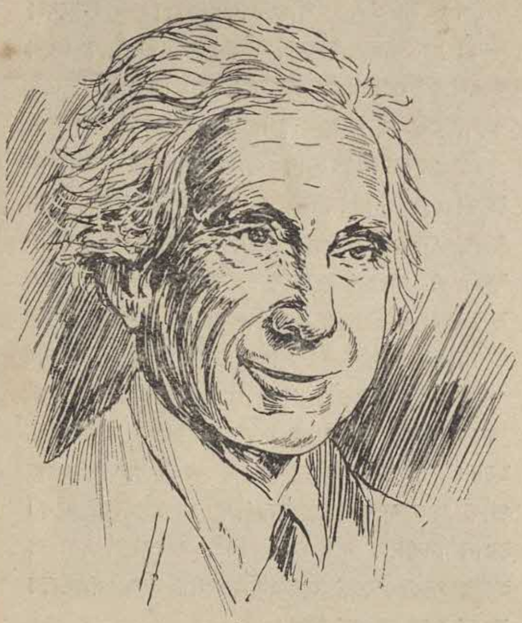
নোবেল তাঁর ইচ্ছাপত্র রচনাকালে কোন আইন-বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করেন নি, কাজেই তাতে আইন-সংক্রান্ত ত্রুটি বড় কম ছিল না। ইচ্ছাপত্রের সেই সকল আইনগত ত্রুটি সংশোধন করে, সুইডেন ছাড়া বিভিন্ন আটটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় নিয়োজিত সম্পদ উদ্ধার করে, কার্যনির্বাহের জন্যে উপযুক্ত বিধি-নিষেধ রচনা করে নোবেল ফাউন্ডেশন (অর্থ-ভান্ডার) প্রতিষ্ঠা করতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। শেষ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গ-নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলী নোবেল ফাউন্ডেশনের তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। এই বৎসর থেকেই পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়।

পুরস্কার বিতরণ ব্যাপারে যাতে কোনদিন কোন ত্রুটি বা বিতর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে পুরস্কার বিতরণের নিয়মাবলী ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ করা হয় নোবেল ফাউন্ডেশনের বিধানে। কোন বৎসর উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের পুরস্কার পরবর্তী বৎসরে স্থগিত রাখা হবে অথবা সেই বিভাগের মূল তহবিলে যুক্ত করা হবে। প্রত্যেক বিভাগের পুরস্কার অন্ততঃপক্ষে প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার বিতরণ করতেই হবে। কোন বিভাগে দুইজন প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হলে, পুরস্কারের অর্থ দুইজনের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেওয়া হবে।

নোবেলের ইচ্ছাপত্র অনুসারে পাঁচটি বিভাগের পুরস্কার বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হ'ল শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম চারটি প্রতিষ্ঠানের উপর। (এঁদের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে)।



বার্ণার্ড শ'



বারট্রান্ড রাসেল

সুইডেনের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত স্টক্‌হোল্‌মের রয়েল অ্যাকাডেমি অফ্‌ সায়েন্স-এর উপর অর্পিত হ'ল পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের পুরস্কার দানের দায়িত্ব।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনে অধিষ্ঠিত স্টক্‌হোল্‌মের রয়েল ক্যারোলাইন মেডিকো-সার্জিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট-এর উপর ন্যস্ত করা হ'ল শারীরবৃত্ত বা ভেষজবিজ্ঞান বিভাগের পুরস্কার বিতরণের ভার।

সাহিত্য-বিভাগের পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হ'ল সুইডেনের রাজার ব্যক্তিগত পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত স্টক্‌হোল্‌মের সুইডিস অ্যাকাডেমির উপর।

।। সাহিত্যের পুরস্কার ।।

নোবেল তাঁর ইচ্ছাপত্রে লিখেছেন—"যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট আদর্শপূর্ণ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কিছু সৃষ্টি করেছেন," এই রকম প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই তাঁর সাহিত্য-পুরস্কার লাভের অধিকারী হবেন।

নোবেলের এই সংজ্ঞা অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের কাজ খুব সহজ নয়। তাছাড়া তাঁর নির্দেশ,—প্রার্থী নির্বাচনে জাতীয়তার কোন প্রশ্ন থাকবে না। ফলে, বিশ্বের সমগ্র সাহিত্য-ক্ষেত্র মন্থন করতে হয় সর্বোত্তমকে খুঁজে বার করবার জন্যে এবং এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর। বর্তমানে প্রায় ত্রিশটি ভাষার গ্রন্থ-সম্ভার নিয়ে বিচার করতে হয় নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানকে। এঁদের কাজের জটিলতার কথা চিন্তা করলে এই নির্বাচনে বিতর্কের অবকাশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত প্রার্থী নির্বাচন প্রসঙ্গে যে সকল বিতর্ক বা প্রতিবাদ হয়েছে তা নগণ্যই বলা চলে।

সাধারণতঃ কোন একটি মাত্র গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় না। গ্রন্থকারের সমগ্র রচনার উপর নিরূপণ করা হয় তাঁর যোগ্যতা।

নোবেল পুরস্কার দানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কোন স্থলে বিরূপ সমালোচনা হলেও এই পুরস্কার গুণীজনের গুণগ্রাহিতার শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানজনক নিদর্শন হিসাবে এখনও যে সর্বত্র সমাদৃত, এ কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।



আলবার্ট সুইটজার



পার্ল বাক (পরিণত বয়সে)

।। শান্তি-পুরস্কার ।।

নোবেলের 'শান্তি-পুরস্কার' বিতরণের কর্তৃত্ব আরোপ করা হয় নরওয়ের স্ট্যার্টিং (সংসদ) নির্বাচিত একটি বিশেষ সমিতির উপর।

এই চারটি পুরস্কার বিতরণী প্রতিষ্ঠান নোবেলের অভিলষিত দান বন্টন করে আসছেন ১৯০১ সাল থেকে। এই চারটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকে তিন থেকে পাঁচজন সদস্য সংবলিত এক-একটি 'নোবেল সমিতি' নিয়োগ করেন। এই সমিতির কার্যকাল ছয় বৎসর। ছয় বৎসর অন্তর নূতন করে সমিতি গঠন করা হয়। পুরস্কার-দানের জন্য উপস্থাপিত সুপারিশ বা প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করে বন্টন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করাই এই সমিতির কাজ। এই সকল সমিতির মতামতের উপর নির্ভর করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নোবেলের ইচ্ছাপত্র-নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট পুরস্কার বিতরণী প্রতিষ্ঠান-গুলি।

কেবলমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যের প্রস্তাবই গৃহীত হয় নোবেল সমিতিগুলিতে। পুরস্কারের জন্য প্রার্থীর ব্যক্তিগত আবেদন গ্রহণ করা হয় না। প্রার্থীর প্রকাশিত গ্রন্থাদি এবং তাঁর অবদানের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রস্তাব লিখিতভাবে দাখিল করতে হয় সমিতিতে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কারদানের উদ্দেশ্যে প্রার্থী সম্পর্কে প্রস্তাব দাখিল করবার ক্ষমতাসম্পন্ন ঃ

পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগীয় পুরস্কার সম্পর্কে—স্টক্‌হোল্‌মের রয়েল অ্যাকাডেমি অফ্‌ সায়েন্স এবং পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগের জন্য নিযুক্ত নোবেল সমিতির সদস্যগণ; এই দুই বিভাগের পুরস্কার-প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি; আপসালা, লান্ড, অস্‌লো, কোপেনহেগেন ও হেলসিঙ্‌ফোরসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মেডিকো-সার্জিক্যাল ইনস্টিটিউট্‌, স্টক্‌হোল্‌মের পলি-টেক্‌নিক্‌ ও স্টক্‌হোল্‌ম কলেজের শিক্ষকগণ এবং স্টক্‌হোল্‌মের রয়েল অ্যাকাডেমি অফ্‌ সায়েন্স কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য দেশের কলেজের অধ্যাপক ও মনীষীগণ।

শারীরবৃত্ত বা ভেষজবিজ্ঞান বিভাগীয় পুরস্কার সম্বন্ধে—স্টক্‌হোল্‌মের ক্যারোলাইন মেডিকো-সার্জিক্যাল ইনস্টিটিউটের সেনেটের সদস্যগণ; রয়েল অ্যাকাডেমি অফ্‌ সায়েন্সের মেডিক্যাল বিভাগের সদস্যগণ; এই বিভাগের পুরস্কারপ্রাপ্ত যে-কোন ব্যক্তি; আপ্‌সালা, লান্ড, অস্‌লো, কোপেনহেগেন ও হেলসিঙ্‌ফোরসের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টির অধ্যাপকগণ, এবং ক্যারোলাইন ইনস্টিটিউটের সেনেট অনুমোদিত অন্যান্য কলেজের অধ্যাপকগণ।

সাহিত্য বিভাগীয় পুরস্কার সম্পর্কে—সুইডিশ, ফ্রেঞ্চ এবং স্পেনিশ অ্যাকাডেমির সদস্য-গণ; সমগোত্রীয় অন্যান্য অ্যাকাডেমি বা ইনস্টিটিউটের হিউম্যানিস্টিক্‌ ক্লাসের সদস্যগণ, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের এস্‌থেটিকস্‌, সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপকগণ।

শান্তি-পুরস্কার সম্পর্কে—নরওয়ের স্ট্যার্টিং-এর (সংসদের) নোবেল সমিতির সদস্যগণ, গভর্নমেন্ট ও ন্যাশানাল এসেম্‌ব্লির সদস্যগণ; হেগের ইন্টারন্যাশানাল কোর্ট অফ্‌ আর্‌বিট্রেশন এবং ইন্টার পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সদস্যগণ; পার্মানেন্ট ইন্টারন্যাশানাল পীস্‌ ব্যুরোর কমিশনের সদস্যগণ; ইনস্টিটিউসন অফ্‌ ইন্টার-

ন্যাশানাল-এর সদস্যগণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ এবং 'সাহিত্য-পুরস্কার'-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

।। ফাউন্ডেশন তহবিল ।।

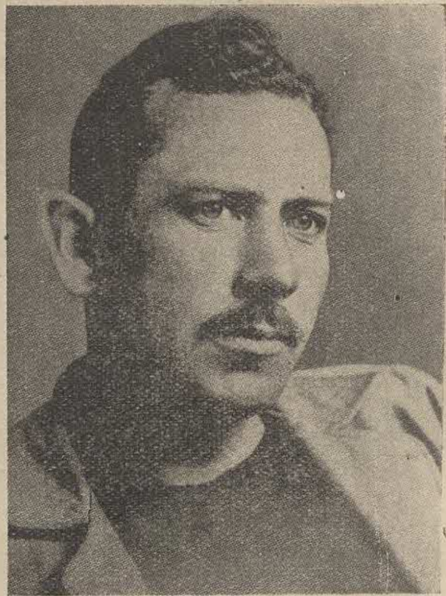
অ্যালফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁর অর্পিত সম্পত্তির মূল্য নিরূপিত হয় ৩৩,২৩৩,৭৯২ ক্রোনোর (সুইডিশ মুদ্রা)। মৃত্যুকর ও অন্যান্য দায়দফা ওয়াশিলের পর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল ফাউন্ডেশনের নীট তহবিল দাঁড়ায় ২৭,৭১৬,২৩৪ ক্রোনোর। এই মূলধনের বার্ষিক আয়ের দশভাগের এক ভাগ প্রতি বৎসর মূলধনে সংযুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট অংশ থেকে কার্যনির্বাহের ব্যয় ও অন্যান্য খরচ বাদে যা থাকে, তাকে পাঁচটি সমান অংশে ভাগ করা হয় পাঁচটি পুরস্কারের জন্য।

প্রতি বৎসর মোট আয়ের দশমাংশ মূলধনে যুক্ত হওয়ায় এবং কোন বৎসর কোন বিভাগের পুরস্কার বিতরিত না হওয়ার ফলে সেই পুরস্কারের অর্থও মূলধনে গচ্ছিত করায় মূলধনের পরিমাণ তদবধি বেড়েই চলেছে প্রতিবৎসর, এবং সেই সঙ্গে পুরস্কারের অর্থের অংকও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলা যায়।

।। বিতরণী উৎসব ।।

প্রতি বৎসরের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, অ্যালফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিবসে পুরস্কার বিতরণ করা হয় ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য।

পদার্থ, রসায়ন, শারীরবৃত্ত বা ভেষজবিজ্ঞান এবং সাহিত্য বিভাগের পুরস্কার বিতরণ করা হয় স্টক্‌হোল্‌মে এবং শান্তি-পুরস্কার অস্‌লোতে। স্টক্‌হোল্‌মের মিউজিক্যাল অ্যাকাডেমির হলে, মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সহকারে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ এবং সুইডেনের রাজার উপস্থিতিতে এই পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হয়। ঐ একই দিনে অস্‌লোতেও নরওয়ের স্টার্টিং-এর প্রেসিডেন্টের পৌরোহিত্যে



জন স্টেনব্যাক

অনুরূপ ভাবে 'শান্তি-পুরস্কার' বিতরণের উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কারের অর্থের সঙ্গে পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেওয়া হয় সনদ এবং নোবেলের মূর্তি অঙ্কিত স্বর্ণপদক—'নোবেল মেডেল'।

।। নোবেল পুরস্কার বিতরণ ।।

(দশ বৎসরের তালিকা ১৯৫১—১৯৬০)

পদার্থবিদ্যা

১৯৫১ সার্ জন ডগলাস কক্রফট্ ও ই. টি. এস. ওয়ালটন (আয়ার্ল্যান্ড)

১৯৫২ ডঃ ই. পার্সেল ও ডঃ এফ. ব্লক (আমেরিকা)

১৯৫৩ ডঃ ফ্রীস জারনিক (নেদারল্যান্ডস)

১৯৫৪ ওয়াল্টার বোথে ও ম্যাক্সবর্ণ (জার্মানী)

১৯৫৫ ডঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব ও ডঃ পলিকার্প কুশ (আমেরিকা)

১৯৫৬ ডঃ উইলিয়াম শক্‌লে, ডঃ ডব্লিউ. এইচ. ব্রাটেন ও ডঃ জন বার্ডিন (আমেরিকা)

১৯৫৭ ডঃ সুং দাওলী ও ডঃ চেন নি-ইয়্যাং (চীন)

১৯৫৮ ডাঃ চেরেনকোভ, ডাঃ আই· ফ্রাঙ্ক ও ডাঃ আই· ট্যাম (রাশিয়া)
১৯৫৯ ডঃ এমিলিও সেগ্রে, ও ডঃ ওয়েন চেম্বারলেন (আমেরিকা)
১৯৬০ ডোনাল্ড এ· গ্লাসের (আমেরিকা)

রসায়ন

১৯৫১ ডাঃ গ্লেন থিওডোর সিবর্গ ও ডাঃ এডুইন ম্যাটিসন ম্যাকমিলান (আমেরিকা)
১৯৫২ ডাঃ এ· জি· মার্টিন ও আর· এল· এম· সিঞ্জ (ইংল্যান্ড)
১৯৫৩ হেরমান সটাউডিনজার (জার্মানী)
১৯৫৪ ডঃ লিমাস পালিং (আমেরিকা)
১৯৫৫ ভিনসেন্ট দ্য ভিনো (আমেরিকা)
১৯৫৬ সার্ এস· হিন্মেল্ উড (ইংল্যান্ড) ও অধ্যাপক এন্· সেমিনফ্ (রাশিয়া)
১৯৫৭ সার্ আলেকজান্ডার টড (ইংল্যান্ড)
১৯৫৮ ডাঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গার (ইংল্যান্ড)
১৯৫৯ জারোশ্লাভ হেরোভস্কি (চেকোশ্লাভাকিয়া)
১৯৬০ উইলার্ড এফ· লিব্বি (আমেরিকা)

শারীরবৃত্ত বা ভেষজ

১৯৫১ ম্যাক্স থেইলার (আমেরিকা)
১৯৫২ এস· ওয়াকস্ম্যান (আমেরিকা)
১৯৫৩ ডাঃ এইচ· এডল্ফ্ ক্রেবস (ইংল্যান্ড) ও ডাঃ ফ্রীজ লিপ্ম্যান (আমেরিকা)
১৯৫৪ ডাঃ জন এফ· এন্ডার্স, ডাঃ টমাস এইচ ওয়েলার ও ডাঃ ফ্রেডারিকস্ রবিন্স (আমেরিকা)
১৯৫৫ ডাঃ হুগো থিয়োরেল (সুইডেন)
১৯৫৬ ডাঃ ডি· রিচার্ডস, ডাঃ এ· এফ· কুর্নান (আমেরিকা) ও ডাঃ ডব্লিউ· ফর্সম্যান (পঃ জার্মানী)
১৯৫৭ ডাঃ ড্যানিয়েল বোভেট (সুইট্জারল্যান্ড)
১৯৫৮ ডাঃ জর্জ ওয়েলস, ডাঃ ই· এল· টাটুম ও ডো· লেডারবার্গ (আমেরিকা)
১৯৫৯ ডঃ সেভেরো ওচোয়া ও ডঃ আর্থার কর্ণবার্গ (আমেরিকা)
১৯৬০ পি· বি· মেডাওয়ার (ইংল্যান্ড) ও ফ্রাঙ্ক্ ম্যাক্ ফারলেন (অস্ট্রেলিয়া)

সাহিত্য

১৯৫১ পার লাগেরকিস্ট (সুইডেন)
১৯৫২ এম· ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক (ফ্রান্স)
১৯৫৩ সার্ উইনস্টন চার্চিল (ইংল্যান্ড)
১৯৫৪ আর্নেষ্ট হেমিঙওয়ে (আমেরিকা)
১৯৫৫ এইচ· কিলজান ল্যাকনেস (আইসল্যান্ড)
১৯৫৬ জুয়ান র‍্যামন জিমেনেডা (স্পেন)
১৯৫৭ আলবিয়র কামু (ফ্রান্স)
১৯৫৮ বোরিশ প্যাস্টারনাক (রাশিয়া) (দ্রষ্টব্যঃ পুরস্কার অস্বীকৃত)
১৯৫৯ সালভাতোর কোয়াসিমোদো (ইতালী)
১৯৬০ সাঁ জ্যাঁ পার্স (ফ্রান্স)

শান্তি

১৯৫১ লেওঁ জুয়ো (ফ্রান্স)
১৯৫২ এ্যালবেয়ার শোয়াইসার (ফ্রান্স)
১৯৫৩ জর্জ ক্যাটেল মার্শাল (আমেরিকা)
১৯৫৪ জি· জে· ভ্যানহুভেন সোহেনহার্ট (নেদারল্যান্ডস)
১৯৫৫ পুরস্কার স্থগিত
১৯৫৬ ঐ
১৯৫৭ লিস্টার বি· পিয়ারসন (কানাডা)
১৯৫৮ ফাদার ডি· জি· পারার (বেলজিয়াম)
১৯৫৯ ফিলিপ্ নোয়েল-বেকার (ইংল্যান্ড)
১৯৬০ পুরস্কার স্থগিত



প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যে এসিয়া মহাদেশ। এসিয়ার স্থলভূমির মধ্যে যেমন অতি উচ্চতম স্থান আছে, তেমনি আছে অতি নিম্নতম ভূমি। এই বিরাট মহাদেশে মানুষের বাস কতশত বৎসর আগে বলা কঠিন। সে প্রায় ৫০০,০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এখানে মানুষের বাস। পৃথিবীর যত কিছু ধর্ম্মমত তাহার অভ্যুদয় হইয়াছিল এসিয়া মহাদেশে। 'এসিয়া' এ নামটির উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? পন্ডিতদের মতে হিব্রু (Hebrews) বা আসিরিয়া হইতে। এসিয়া এবং ইউরোপকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় ইউরেশিয়া (Eurasia) উহা একত্রে একটি বৃহৎ স্থলভাগ। ইউ. এস. এস আর বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর স্থলভাগ মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই এক একটি দেশকে মহাদেশ বলা হয়। (১) এসিয়া, (২) ইউরোপ, (৩) আফ্রিকা, (৪) ওশিয়ানিয়া, (৫) উত্তর-আমেরিকা, (৬) দক্ষিণ আমেরিকা, (৭) আন্টার্কাটিকা। মহাদেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এসিয়া আর সবচেয়ে ছোট ওসিয়ানিয়া। এক একটি মহাদেশ অনেকগুলি দেশে বিভক্ত। আমাদের ভারতবর্ষ—যুক্তরাষ্ট্র এসিয়ার অন্তর্গত একটি বিরাট Sub continent বা উপমহাদেশ।

এই এসিয়া মহাদেশ মধ্যে যে সকল জাতি বাস করে, তাহার মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বা রুশদেশ একটি। এই মহাদেশের জনসংখ্যা ১,৩২১,০০০,৯০০০। এই মহাদেশের পরিবেশ ও অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সীমানাঃ—উত্তরে সুমেরু সাগর, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে ইউরোপ পর্য্যন্ত। পর্ব্বত, নদী—কাস্পিয়ান, কৃষ্ণ ও লোহিত সাগর দ্বারা ইহার চারিদিক বেষ্টিত। ভূপ্রকৃতির দিক্ দিয়া এসিয়া মহাদেশকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) সাইবেরিয়ার ওব, ইনিমি ও লেনা বিধৌত সমভূমি ও তুরাণের নিম্নভূমি লইয়া গঠিত। **উত্তরাংশে বিশাল নিম্ন সমভূমি।** (২) মধ্যভাগ পর্ব্বতময় উচ্চভূমি ও উহার মধ্যস্থ ভূভাগ মালভূমি (৩) আরব, ভারতের দক্ষিণাংশ ইন্দোচীনের মালভূমি দ্বারা দক্ষিণদিকে একটি মালভূমি বিরাজিত। আবার দক্ষিণ-পূর্ব্বে নদ-নদী বিধৌত নিম্নভূমি—ইউক্রেটিস, টাইগ্রিস প্রবাহিত হইয়া স্থানটিকে নিম্নভূমি করিয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারতবর্ষের দিকে, সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত হইয়া মধ্যভারতে সমভূমি সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী বিধৌত নিম্নভূমি। (৪) পূর্ব্ব উপকূলে বহু আগ্নেয়গিরি শোভিত দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। যেমন কিউরাইল, জাপান, ফিলিপিন, বোর্নিও, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ ইহার অন্তর্গত।

পরিবেশ—১,৩২১,০০০,৯০০০ বর্গমাইল। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ।

ভূপ্রকৃতি—উচ্চতা এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ। ইহা নেপালের ভূভাগে অবস্থিত। নিম্নভূমি—মরুসাগর (Dead Sea)।

বৃহত্তম মরুভূমি গোবি ৪০০ মাইল বিস্তৃত। পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম স্থানীয়। অবস্থান মঙ্গোলিয়ায়।

দীর্ঘতম নদী—ইয়াংসিকিয়াং ৩,১০০ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থানীয়।

এখন আমরা এসিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই আমাদের ভারতবর্ষের কথা বলিব। কবি ভারত সম্বন্ধে যে সংগীত রচনা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের ভারতের পরিচয় পাই।

ভারতবর্ষ—মহাসাগরের উত্তর তীরে বিরাজিত।

আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর এই দেশটিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোগসূত্রের মধ্যভাগে স্থাপন করিয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভারতের সীমা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

হেভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।
যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ



মৌর্য্য যুগের ভারতবর্ষ

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট; সাগর ঊর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে।
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে,
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষ ছিল দুইশত বৎসরের ও কিছু উপর ইংরাজদের অধিকারে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে স্বাধীনতা। ঐ তারিখে দেশটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একটির নাম ভারতগণতন্ত্র অপরটির নাম পাকিস্তান। পূর্ব্ববঙ্গ বা পূর্ব্ব পাকিস্তান আসামের অল্প অংশ, পশ্চিম, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশ পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের নাম হইল—ভারতইউনিয়ন বা ভারত যুক্তরাষ্ট্র।

সে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিত ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার, পৃথিবীর নানা সভ্য দেশের সঙ্গে ছিল যোগসূত্র। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ছিল ৩৬·১২ কোটি।

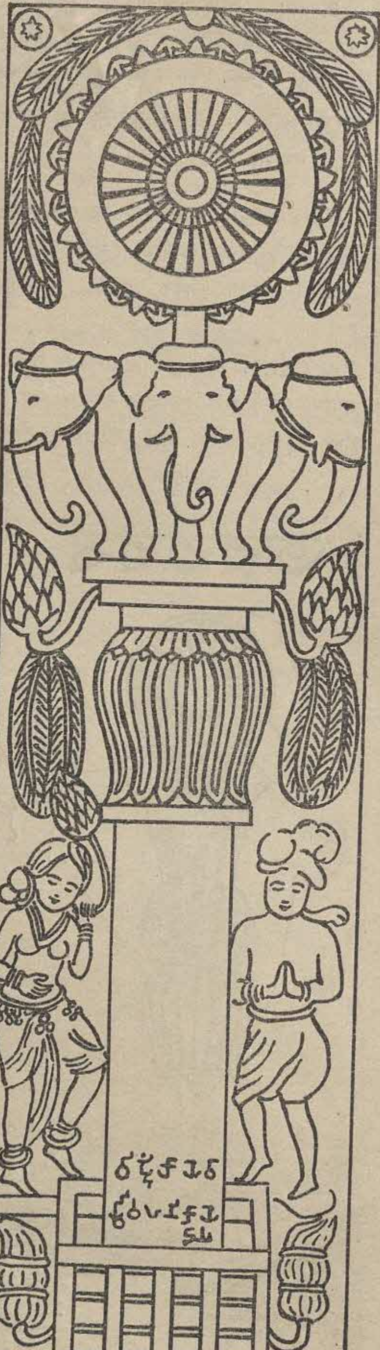
সীমা—ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতমালা। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব পাকিস্তান ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর ও পশ্চিম পাকিস্তান।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগ—ভূমির প্রকৃতি অনুসারে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্ব্বতমালা হিমালয়। ইহা ভারতের উত্তরে অবস্থিত। এই শ্রেণীতে নন্দা দেবী, ধবলগিরি, এভারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি। ইহাকে (১) উত্তর পার্ব্বত্য অঞ্চল নাম দেওয়া হইয়াছে।

(২) **মধ্যভাগের সমতলভূমি**—এই বিশাল সমভূমির উপর দিক বহ্ু নদনদী প্রবাহিত হইয়াছে। পলিমাটির দ্বারা দেশটি গঠিত।

(৩) **দক্ষিণের মালভূমি**—এই সমতলভূমির দক্ষিণে মধ্যভারত মালভূমি। এই মালভূমির দক্ষিণে ত্রিভুজের মত যে মালভূমি তাহার নাম দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। এই মালভূমির পশ্চিম সীমায় পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা এবং প্ূর্ব্ব সীমায় প্ূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা অবস্থিত।

নদ-নদী—গঙ্গা, ব্রহ্মপ্ুত্র ও সিন্ধ্ু উত্তর ভারতের এবং নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদী। গঙ্গা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক একটি তুষার নদীর ধারায় উৎপন্ন হইয়া হরিদ্বারের নিকট সমতল-ভূমিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, পরে বিহারের মধ্য দিয়া বহিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর ম্ুর্শিদাবাদ জেলার ধ্ুলিয়ানের নিকট গঙ্গা দ্ুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পাকিস্তানের মধ্য দিয়া বরাবর বহিয়া পরে পদ্মা, মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে। যম্ুনা ও শোণ গঙ্গার দক্ষিণদিগের গোমতী, গন্ডক, ঘর্ঘরা ও কুশী (কোশী, ইহার প্রধান উপনদী। ব্রহ্মপ্ুত্র হিমালয়ের মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া তিব্বতের সামপ্ু নামে প্রবাহিত হইয়া আসামের মধ্য দিয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর এই নদ গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত এবং ব্রহ্মপ্ুত্রের শাখা ভৈরববাজারের নিকট মেঘনা নদীতে মিলিয়াছে। তিস্তা, করতোয়া ব্রহ্মপ্ুত্রের ডান দিকের এবং দিবং ও লোহিত ইহার বাঁদিকের প্রধান উপনদী। সিন্ধ্ুনদ মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া আরব সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা বিতস্তা, এদের বাম দিকের প্রধান উপনদী নর্মদা মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক, পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বোম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। তাপ্তীর জন্ম হইয়াছে মহাদেব পর্বতে। পরে সাতপ্ুরা পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া বহিয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে।



সাঁচীতে স্ত্ূপ প্রান্তে একটি স্তম্ভগাত্রে খোদিত চিত্র ও লিপি। শেষের পংক্তিতে দানং একথাটি লিখিত আছে

মহানদী—মধ্যপ্রদেশের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গোদাবরী পশ্চিম-ঘাট হইতে বাহির হইয়া বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভীমা ও তুঙ্গাভদ্রা ইহার প্রধান উপনদী, কাবেরী মহীশূরের পূর্বঘাট পর্বত ভেদ করিয়া শিবসমুদ্র নামক জলপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে, কৃষ্ণা গোদাবরী মহানদী ও কাবেরী নদীর এক ব-দ্বীপ আছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্র

জলবায়ু—এ দেশের জলবায়ু কোথাও শীত, কোথাও গ্রীষ্ম (উষ্ণ)। বৃষ্টিপাত প্রভৃতিতে এ-বিশাল দেশ বৈচিত্র্যময়।

(১) **আসাম**ঃ ভারতের উত্তর পূর্ব অংশে আসাম প্রদেশ। রাজধানী শিলং। সহরের মধ্যে গৌহাটি, ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে বিরাজিত। কামাখ্যা দেবীর মন্দির এইখানেই পর্বত-শিখরে বিরাজমান। চেরাপুঞ্জী খাসিয়া পাহাড়ে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় এখানে। এছাড়া ডিব্রুগড়, তেজপুর, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, শিলচর প্রভৃতি অনেক বড় ও ছোট সহর আছে।

(২) **পশ্চিমবঙ্গ**—বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ নিয়া এ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগে—বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া এই সাতটি জেলা। প্রেসিডেন্সি বিভাগ—কলিকাতা, চব্বিশপরগণা, নদীয়া (কৃষ্ণনগর) মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দারজিলিং, কুচবিহার। পশ্চিম-বাংলার রাজধানী কলিকাতা।

(৩) **বিহার**—রাজধানী পাটনা গঙ্গার তীরে অবস্থিত, বিহারের রাজধানী। হাজারীবাগ, জামসেদপুর, বা টাটানগর, রাঁচি, মুঙ্গের, ভাগল-



উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির
(পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

পুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, গয়া, বৈদ্যনাথধাম,— দেওঘর, বুদ্ধগয়া, সিন্ধ্রি, ঝরিয়া, গিড়িডি।

(৪) **উড়িষ্যা**—বিহারের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজধানী ভুবনেশ্বর। সমুদ্রতীরে পুরী, তীর্থ-স্থান। রৌরকেলায় লৌহ ও ইসপাতের কারখানা। কটক, সম্বলপুর, ইহার অনতিদূরে হীরাকুঁদে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

উত্তর প্রদেশ—রাজধানী লক্ষ্ণৌ। এলাহাবাদ বা প্রয়াগ প্রাচীন স্থান। হিন্দুদের তীর্থস্থান। এতদ্ব্যতীত মীরাট, বারাণসী (কাশী), অযোধ্যা, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, রুড়কি, আগ্রা, কানপুর, বেরিলি, দেরাদুন, নাইনিতাল ও মুসৌরী শৈল নিবাস, স্বাস্থ্যকর স্থান।

পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ—১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে ১লা নভেম্বর রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শতদ্রু নদীর নাঙ্গাল বাঁধ প্রসিদ্ধ। ভাক্‌রা বাঁধ তৈয়ারী হইতেছে। লুধিয়ানা, জলন্ধর, অমৃতসর, চন্ডীগড় (হিমালয় গিরিমালার পাদদেশে এই নগরটি অবস্থিত)। এটি নূতন সহর ও পাঞ্জাবের রাজধানী। পাতিয়ালায় ছিল পেপাসুর রাজধানী।

দিল্লী—ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। যমুনাতীরে অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় তেরো চৌদ্দ লক্ষ। ইহা একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। কার্পাস শিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি শিল্প-সম্ভারের জন্য এবং ঐতিহাসিক কীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত।

বোম্বাই রাজ্য—পশ্চিম ভারতের রাজ্য। ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র এবং হায়দারাবাদ ও মধ্য প্রদেশের মারাঠী অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। আবার এই রাজ্যের কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চল বিভক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম প্রদেশ। সাতপুরা পর্বত ও পশ্চিমঘাট গিরি-শ্রেণী এই রাজ্যে অবস্থিত।

রাজস্থান—১লা নভেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আজমীর রাজ্য এবং বোম্বাই রাজ্যের আবু পাহাড় ইত্যাদি এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখানকার সম্বর হ্রদ হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয়। জয়পুর রাজধানী, অতি সুন্দর নগরী। চিতোর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। উদয়-পুর সমৃদ্ধ ও সুন্দর সহর। বিকানীর, যোধপুর উল্লেখযোগ্য সহর। আজমীর মুসলমানদের তীর্থ স্থান—বাণিজ্য কেন্দ্র। আবু পাহাড়—অতি সুন্দর সুন্দর জৈন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

বোম্বাই—বোম্বাই রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান নগর। আহ্‌মদাবাদ সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত। কার্পাসশিল্পে ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে প্রায় ৭৪টি কাপড়ের কল আছে।

পুণা—এখানে সেনানিবাস আছে। পুণা অতি প্রাচীন সহর। ইহা পশ্চিমঘাট পর্বতের ভোরঘাট গিরিশিখরে অবস্থিত। এখানে ভারতের বৃহত্তম মানমন্দির। বরোদা, শোলাপুর, সুরাট, নাসিক, দ্বারকা (হিন্দুদের তীর্থস্থান) বেলগাঁও, মহাবালেশ্বর পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর অবস্থিত, স্বাস্থ্যকর স্থান। রাজকোট (পূর্বে সৌরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল) কালডালী নূতন বন্দর। নাগপুর পুরাতন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। ইলোরা গুহার কৈলাস মন্দির একটি প্রাচীন কীর্ত্তির অপূর্ব নিদর্শন। সোমনাথ প্রাচীন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

অন্ধ্র প্রদেশ—১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর মাড়াক অঞ্চলের তেলেগু ভাষাভাষী এগারোটি জেলা এবং বেলারী জেলার ছয়টি তামলুক লইয়া অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হয় কিন্তু আবার ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে হায়দারাবাদের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল এই রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হয়। এইরূপ সংযুক্তিকরণে রাজ্যের আয়তন বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহা অন্ধ্রপ্রদেশ নামে পরিচিত। ইহার উপকূল সমতল। এই রাজ্যের প্রধান নদী হইতেছে গোদাবরী, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা। উত্তর পেনার নাগার্জ্জুন বাঁধ নির্ম্মিত হইতেছে। দেশটি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। ধান হইতেছে এই রাজ্যের প্রধান শস্য। নদ নদী খাল-বিল বিধৌত দেশটিতে নারিকেলের চাষ খুব বেশী। কর্ণুলে ছিল অন্ধ্ররাজ্যের অস্থায়ী

রাজধানী। রাজধানী হায়দারাবাদ বড় সহর। বিজগাপত্তনম্ স্বাভাবিক বন্দর। জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য এইখানে একটি বিরাট কারখানা আছে। ওয়ালটেয়ার সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থান। কোকনদ বা কাকিনদ, মসলিপত্তন—দুটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। গুণটুর, সেকেন্দাবাদ, বেজওয়াদা রেলপথের কেন্দ্রস্থান।

মাদ্রাজরাজ্য—মাদ্রাজরাজ্য ভারতের একটি প্রধানতম অঞ্চল। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম উপকূলের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই কারণেই ইহার আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের উপকূল অংশ সমতল ভূমি। কাবেরী নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই প্রদেশে গ্রীষ্মকালে এবং নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে বহু সেচ খাল আছে। এখানকার কাবেরী নদীর মেটুর-বাঁধ প্রসিদ্ধ। রাজ্যের রাজধানী মাদ্রাজ। সালেম একটি বৃহৎ নগর। এতদ্ব্যতীত ধনুষ্কোটী, নেলাপাট্টিনম, তুতিকোরিন এই রাজ্যের একটি বন্দর। রামেশ্বরম বিখ্যাত হিন্দু তীর্থস্থান। তিরুচিরাপল্লী বা ত্রিচিনাপল্লী প্রাচীন সহর এবং তীর্থস্থান। বহু হিন্দু তীর্থযাত্রীদের প্রতিবৎসরই সমাবেশ হয়। উটকামন্ড নীলগিরি পর্বতের উপর অবস্থিত, শৈলস্বাস্থ্যনিবাস। মদুরাট (মদুরা) কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত।

মধ্যপ্রদেশ—রাজধানী জববলপুর। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মালভূমির উপর অবস্থিত। ১লা নভেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারত গণতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। মধ্যভারত, ভূপাল, বিন্ধ্যপ্রদেশ, এবং মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বতন হিন্দী ভাষাভাষীদের অঞ্চল লইয়া এই নূতন দেশটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থানীয়। এখানকার পর্ব্বতগুলির মধ্যে বিন্ধ্য, সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল পর্ব্বত এখানে অবস্থিত। নদীর মধ্যে নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহানদী, চম্বল নদী এই দেশের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ভিলাই—লৌহ ইস্পাতের কারখানার জন্য বিখ্যাত।

ভূপাল—মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। বাণিজ্য-কেন্দ্র। জববলপুর একটি বৃহৎ নগর। মর্ম্মর পর্ব্বত (মার্বেল পাথর) ও নর্ম্মদা নদীর জলপ্রপাত বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইন্দোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিন্ধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল রেওয়া। উজ্জয়িনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ও প্রসিদ্ধ নগর। সাঁচী বৌদ্ধ স্তুপ—বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন জগৎপ্রসিদ্ধ।

মহীশূর—ইহাও ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর। এই রাজ্য মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়াদারাবাদ রাজ্যের কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই জন্য মহীশূর রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে, মহীশূরের অধিকাংশই মালভূমি, পশ্চিম উপকূল সমভূমি। এই দেশের পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। পূর্বাংশে কম বৃষ্টিপাত হয়। এখানে কফি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার বনভূমিতে সেগুন, চন্দন, বাঁশ প্রভৃতি গাছ জন্মে। মহীশূরে প্রচুর জলবিদ্যুৎ তৈয়ারী হয়। রেশম শিল্পের জন্য এই রাজ্য বিখ্যাত। মহীশূর—রাজ্যের শাসন কেন্দ্র। মহীশূর অতি সুন্দর সহর ও রাজধানী। ইহা কোলার স্বর্ণখণির জন্য বিখ্যাত। ভদ্রাবতী—লৌহের কারখানা, ধারওয়ার, বেলগ্রাম, বিজাপুর—বাণিজ্য কেন্দ্র।

কেরল—মালাবার উপকূলের রাজ্য। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের অংশবিশেষ ও পূর্ব্বতন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছে। বৃষ্টি এখানে খুব বেশী হয়। নারিকেল, মশলা, চা, রাবার এই রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন জিনিষ। ত্রিবান্দ্রম—রাজধানী। বৃহৎ নগরী। কোচিন—প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। কালিকট—বাণিজ্যকেন্দ্র।

সংযুক্ত কাশ্মীর—ভারতরাষ্ট্রের এই সুন্দর দেশটিকে বলা হয় ভূ-স্বর্গ। তুষারাবৃত গিরিশ্রেণী, তরুশ্রেণীর শ্যামল সুন্দর বনভূমি, ফলেফুলের অপরূপ শোভা, নদনদী হ্রদের বিচিত্র

শোভা এত সুন্দর ও মনোহর যে তাই বিশ্ববাসী সকলেই ইহাকে বলে ভূ-স্বর্গ। সিন্ধু ও ঝিলাম এ দেশের প্রধান নদী। এখানে শস্যের মধ্যে গম, জোয়ার, যব, ধান, আঙ্গুর, আপেল, পীচ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। রেশম ও পশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীনগর—রাজধানী, ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত। লেহ—লাডাকের প্রধান সহর। জম্মু—এরাজ্যের শীতকালের রাজধানী।

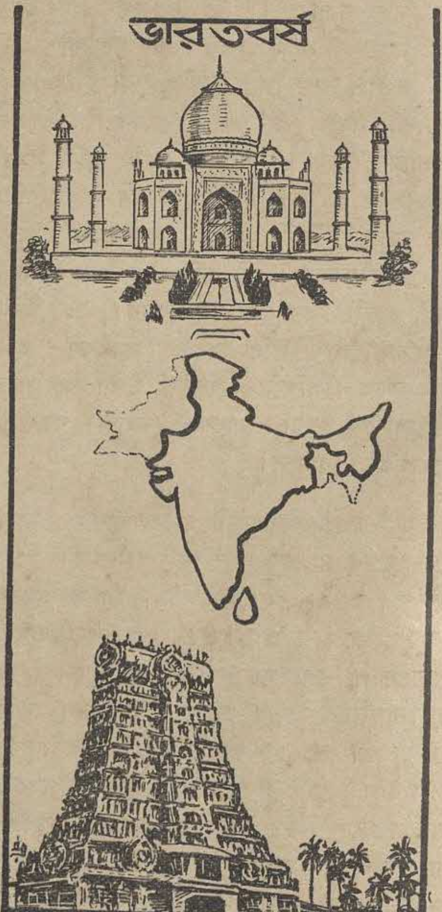
টেরিটরি—এই টেরিটরি দিল্লী নগরী এবং ইহার নিকটবর্ত্তি অঞ্চল লইয়া গঠিত। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নয়াদিল্লী (New Delhi).

ত্রিপুরা—এই টেরিটরি আসামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ইহা পার্ব্বত্য অঞ্চল ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজধানী আগরতলা। **মণিপুর** ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত। ইম্ফল—রাজধানী ও সুন্দর নগর। হিমাচল প্রদেশ—হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। সিমলা—রাজধানী স্বাস্থ্যকর স্থান।

স্বাধীন ও আশ্রিত রাজ্য—নেপাল স্বাধীন রাষ্ট্র। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। দক্ষিণাংশে তরাই বনভূমি। এখানকার প্রধান নদী হইতেছে কুশী (কোশী) ও গন্ডক। কাঠমুন্ডু—রাজধানী ও প্রধান সহর। **সিকিম**—দার্জ্জিলিং জেলার উত্তরে, হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল। রাজধানী গ্যাংটক। **ভূটান**—সিকিমের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। স্বাধীন রাষ্ট্র। পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পূর্ণ। রাজধানীর নাম পুনাপ। বংশপরাক্রমে রাজারা দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন। আয়তন ১৮০০০ বর্গমাইল। বর্তমান রাজার নাম জিগমী ওয়াং চাক্ (Jigme Wang Chuck)। ভারতরাষ্ট্র প্রতি বৎসর ৫৮০,০০০ টাকা সাহায্য করেন। ১৯৪৯ সালে ভারতরাষ্ট্রের সহিত এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ভূটানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন। **নেপাল**—স্বাধীন রাজ্য। রাজধানী কাটমন্ডু (Katmandu) জনসংখ্যা ৭,০০০,৪০০০। ভাষা ভারতীয় আর্য্য, তিব্বতীয়, পার্ব্বত্য। ধর্ম্ম হিন্দু এবং অন্যান্য লামাধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম। আয়তন—৫৪,০০০ বর্গমাইল। গম, রেসিন, কাঠ, চাউল, মসলা আমদানী ও রপ্তানীর জন্য প্রসিদ্ধ।

পাকিস্তান

মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র পাকিস্তান। ভারত বিভাগের সময় এই রাজ্যের সৃষ্টি। বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব লইয়া পশ্চিম পাকিস্তান। অপর দিকে পূর্ববঙ্গ এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত পূর্ব্ব পাকিস্তান। ভারত রাষ্ট্রের পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহার



মোগল-ভারতের সাজাহান নির্মিত তাজমহল
নিচে—দক্ষিণ-ভারতের একটি গোপুরম

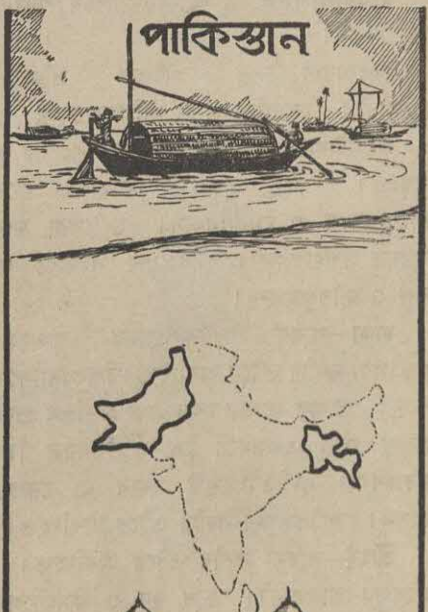


"স্মৃতি-চিহ্ন"

—স্মরণে আসি মরমে পরশে কথা—

আয়তন ৫৪,৫০১ ও ৩১১,৪০৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৪·২১ ও ৩·৩৬ কোটি। ভাষা—উর্দ্দু, ইংরাজী, পার্সি এবং বাংলা। ধর্ম্ম—প্রধানতঃ মুসলিম এবং অন্যান্য হিন্দু। রাজধানী—করাচী।

৭০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুসলমানেরা আরব হইতে ভারতে আসেন। বর্ত্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান জাতি সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করিত। জনাব মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাজ্য গঠন করিবার ছিলেন উদ্যোগী। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনিই সর্ব্বপ্রথম শাসন কর্ত্তা (Governor General) নির্ব্বাচিত হন। সে-সময়েই পাকিস্তান রাজ্য সংগঠিত হয়। ইহা গণতন্ত্র রাষ্ট্র এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য। (a member of British Commonwealth).



রাজধানী করাচীর—একটি প্রবেশ তোরণ

অবস্থান—এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

আমদানী রপ্তানী—চা, তুলা, কাঠ, গম এবং খনিজ দ্রব্য। ধান, জোয়ার, বাজরা, ছোলা, অড়হর, যব, ভুট্টা। পূর্ব্ব পাকিস্তানে শ্রীহট্টের ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের পাকিস্তানের চা-বাগান অবস্থিত। পূর্ব্ব পাকিস্তানের চা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া প্রধানতঃ যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হয়।

নদ-নদী—সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তার অন্তর্গত। সিন্ধুনদের দোয়াব, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার অন্তবর্ত্তী জেকদোয়াব, ইরাবতী ও শতদ্রুর অন্তবর্ত্তী বারি দোয়াব। শেষের তিনটির প্রত্যেকটি হইতেই একটি করিয়া খাল নিম্ন প্রবাহ অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। সিন্ধু-প্রদেশের মকুব সহরের নিকট সিন্ধুনদের লয়েড বাঁধ হইতে অনেকগুলি খাল বাহাওয়ালপুর ও সিন্ধুপ্রদেশের প্রায় ৯০ লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচ ও কৃষির ব্যবস্থা আছে। সিন্ধু নদে একটি বৃহৎ জলাধার নির্ম্মিত হওয়ায় জল সেচের সুব্যবস্থা হইয়াছে। বেলুচিস্তানে এই প্রথায় জলসেচ করা হয়।

উৎপাদন—উৎপাদনের দিক দিয়া প্রায় এক তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের ভূমি (৪৪০ একর)। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। শ্রীহট্ট ও পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পেশোয়ার উপত্যকায় প্রচুর ধানের চাষ হয়। এতদ্ব্যতীত গম, জোয়ার, বাজরা, ছোলা, অড়হর, যব ও ভুট্টা জন্মে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুগ, মসুর, মটর প্রভৃতি ডাল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাকিস্তানের চা-বাগান সমূহ অবস্থিত। পূর্ব্ব পাকিস্তানের চা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তামাক,

ইক্ষুবীজ, কার্পাস্ (ইহার শতকরা প্রতি ৯৭ ভাগই) জন্মে। পৃথিবীতে যে পাট জন্মে তার মধ্যে মোট ৮০ ভাগ পাটই পাকিস্তানে জন্মে।

পাকিস্তান জুট কমিটি নামে একটি কমিটিও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। পশুর মধ্যে উট (সিন্ধু, বেলুচিস্তান), মেষ (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও নিম্ন প্রদেশ, গবাদি পশু পশ্চিম পাঞ্জাবে পালিত হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে খনিজ সম্পদ অধিক নাই। সামান্য পরিমাণে (ক্রোমাইট, এ্যান্টিমণি, আর্সেনিক, জিপ্সাম, চূণাপাথর, সোরা, গ্রানাইট, লবণ, গন্ধক, কয়লা, সামান্য মাত্র হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ও চলিতেছে।

যানবাহন—পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রে মোট ৭,০৪৯ মাইল রেলপথ। সেখানকার নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলপথ (৫,৩৪৪ মাইল) লাহোর হইতে পেশোয়ার, শিয়ালকোট করাচী ও চমন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্ব পাকিস্তানের ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথ (১৭০ মাইল) ছোট মাপের (মিটারগজের) রেলপথ চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর, বাহাদুরাবাদ ও ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বড়-মাপের (ব্রডগজ) রেলপথ। পোড়াদহ হইতে সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী হইয়া ফরিদপুর এবং ঈশ্বরদি হইয়া ডুয়ার্স এবং সেখান হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সীমান্ত পথ—পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত ইরাণ, আফগানিস্তান ও সিকিয়াং পর্য্যন্ত সংযুক্ত।

জলপথ—সিন্ধুনদ পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ব্বপ্রধান জলপথ। ইহা ১৮০০ মাইল দীর্ঘ এবং মোহানা হইতে আটক নদের তীরে আটক, ডেরাগাজি খাঁ, সক্কর, হায়দারাবাদ প্রভৃতি নগর অবস্থিত। পূর্ব্ব পাকিস্তানের পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদী সমূহ প্রসিদ্ধনামা।

বিমান চলাচলের কেন্দ্র—পশ্চিম পাকিস্তানের ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রসিদ্ধ বিমান ঘাঁটি। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন কর্পোরেশন কর্ত্তৃক বিমানপথে চলাচল কার্য পরিচালিত হয়। পাকিস্তানের বিমানপথগুলি করাচী হইতে লন্ডন, ঢাকা, পেশোয়ার, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই;—ঢাকা হইতে কলিকাতা, চট্টগ্রাম, যশোহর, চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা, রেঙ্গুন এবং লাহোর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কয়েকটি বৈদেশিক বিমান-প্রতিষ্ঠানের বিমানপোতও পাকিস্তানের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

নগর ও বন্দর—করাচী—শ্রেষ্ঠ বন্দর। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী। এখানকার পোতাশ্রয় অতি উৎকৃষ্ট।

লাহোর—পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী।

লায়লপুর—পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ গম রপ্তানীর কেন্দ্র।

রাওয়ালপিন্ডি—এ স্থানটি পশ্চিম পাঞ্জাবের সেনানিবাস।

পেশোয়ার—উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রাজধানী। সেনানিবাস ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

এবোটাবাদ—চর্ম্মকার ও প্রস্তরশিল্পের জন্য বিখ্যাত। বান্নু, কোহাট সীমান্ত প্রদেশে বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনানিবাস। নৌসেরা, মর্দ্দন বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। কোয়েটা সীমান্ত পথে রেল ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

ঢাকা—পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানী। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র। সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য এবং মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রের জন্য একসময়ে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। **নারায়ণগঞ্জ**—নদীতীরবর্ত্তী বন্দর ও রেলওয়ে জংসন। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীহট্ট—সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের রাজধানী। চূণ, চা ও কমলালেবুর জন্য প্রসিদ্ধ। **খুলনা**—একটি নদী তীরবর্ত্তী বন্দর। রূপসা ও ভৈরবের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

কুমিল্লা—ত্রিপুরা জেলার প্রধান নগর। **চাঁদপুর**—একটি বিখ্যাত নদীতীরবর্ত্তী বন্দর। রেলজংশন, পাট, মৎস্য ও সুপারি ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। **গোয়ালন্দ**—একটি বিখ্যাত নদী-বন্দর। রেল ও মৎস্য সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। **খুলনা**—জেলার পুসুর নদীর তীরে অবস্থিত।

চালনা—পূর্ব্ব পাকিস্তানের একটি নবগঠিত প্রথম শ্রেণীর বন্দর।

পাকিস্তানে বর্ত্তমানে ১০৫টি কাপড়ের কল আছে। তার মধ্যে ৮৪টি পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ২১টি পূর্ব্ব পাকিস্তানে আছে। ইহা ছাড়া পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, কুষ্ঠিয়া, বাগেরহাট ও খুলনা শিল্পকেন্দ্র। বস্ত্র উৎপাদনে পাকিস্তান স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছে। পাটশিল্প, পশম-শিল্প, রেশম শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, শর্করা শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাগজ শিল্প, কাচ শিল্প প্রভৃতি সকল শিল্পের প্রসারই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

চীন



রাজধানী পিকিংয়ের একটি বৌদ্ধ মন্দির

চীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। চীন মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও সিনকিংয়া নিয়া চীন গণতন্ত্র রাজ্য গঠিত। জনসংখ্যা—৫৭৪,২১৫,৯৪০; পূর্বে ছিল ৪৬৩,৫০০,৯০০। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সেন্সাস বা আদম-সুমারির গণনা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তেওয়ান (Taiwan) প্রদেশ এর মধ্যে ধরা হয় নাই। রাজধানী—পিকিং। প্রধান ভাষা—চীন ভাষা, ধর্ম্ম কনফুসিয়ান্, তা ছাড়া বৌদ্ধ, মোসলেম, খৃষ্টান। পরিমাণ ফল, ৩,৮৫০,০০০ বর্গমাইল। একে বলা চলে উপমহাদেশ। পৃথিবীর মধ্যে চীন মহাদেশ দ্বিতীয়স্থানীয়। মুদ্রা চীনা ডলার। পৃথিবীর মধ্যে উত্তর, পূর্ব্ব গোলোকের মধ্যে অবস্থিত। আমদানী রপ্তানী—বস্ত্রশিল্প, তুঙ্গ তেল (Tunga oil), টিন, মৎস্য, ডিম ইত্যাদি। সম্মিলিত জাতিসংঘ (United Nation) চার্টারমেম্বার, ১৯৪৫ জাতীয় সরকার রূপে পরিগৃহীত।

ইতিহাস ১২০০ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের উন্নত শাসন প্রণালী চলিতেছিল। চীন সম্রাট—চিন শি-হুয়াঙ্গ তি (Chin-Shi-Huang-Ti)-র সময়ে হতে চীন সীমান্ত রাজগণ সম্মিলিত ভাবে রাজ্য শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চীনের জগদ্বিখ্যাত প্রাচীর প্রায় ২২শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। চীন দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির যুগ বলা চলে ৬১৮—৯০৭ সাল। মিং বংশের রাজাদের সময়ে,—পরে য়ুয়াঙ্গ বংশ (Yuang-dynasty) ১২৮০—১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ, মিং রাজারা মাঞ্চু (Manchu)দের দ্বারা পরাজিত হন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন-চ্যুত হন। একটা বিপ্লব ও বিদ্রোহের পর ডক্টর সান-ইয়াৎ সেন (Sun Yat Sen), চীন গণতন্ত্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President) নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন—১৯২৮ খৃষ্টাব্দ। জেনারেল চিয়াং-কাইশেক (Chiang-kai-shak) প্রেসিডেন্টও প্রতাপশালী হয়ে উঠেন। কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদর্শ অনুযায়ী শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন, ১৯৪৯

খৃষ্টাব্দে—ফরমোসাবাদ। রাজধানী তাইপেই (Taipai)। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা জনসংখ্যা পূর্ণ শ্রেষ্ঠতম স্থান। চীনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিন দিনই উন্নততর হইতেছে। যানবাহন, রেলপথ, পথঘাট, অরণ্যভূমি, কৃষি, বাণিজ্য, ললিতকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি-শিক্ষা,—নদী সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। চীনের দীর্ঘতম নদী ইয়াংসি—৩৪০০ মাইল। তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র চীনদেশকে বিধৌত করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া মিশিয়াছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে সিকিয়াং, হোয়াং, পীত নদী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

চীন দিন দিন বিভিন্ন দিকে বীর্য্যশালী ও খ্যাতিমান হইতেছে। তিব্বত,—রাজধানী লাশা একটি পথকেন্দ্র। গ্যায়াৎসী চীনের একটি বাণিজ্য কেন্দ্র এবং চীন রাজ্যের সহিত স্থলপথে সংযুক্ত।

জাপান

এ দেশের লোকসংখ্যা ৮৮,৮০০০,৯০০। ভাষা জাপানিস্। ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্ম, অন্যান্য সিনটোইজিম্, প্রোষ্টেন্ট রোমান ক্যাথলিক। পরিমাণ ফল ১৪২,৩০০ বর্গমাইল। পৃথিবীতে পয়ত্রিশ স্থানীয়। অর্থনৈতিক ইয়েন (Yen) উত্তরপূর্ব্ব গোলোক মধ্যে অবস্থান। পূর্ব্ব আফ্রিকার দূরবর্তী। আমদানী—কাঠ, রেশম, রেয়ন, মৎস্য, তুলা প্রভৃতি। রাজশাসন তন্ত্র রাজাধিপতি। রাজধানী টোকিয়ো (Tokio)

ইতিহাস—৬০০ খৃষ্ট পূর্ব্বে প্রথম সম্রাট জিম্সু টেলনু। সিংহাসন অধিকার করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে এজাতি ও রাষ্ট্র সামন্ত নৃপতিমন্ডলের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। সে সময়ে ক্ষমতাশালী মন্ত্রীগণ শাসন ভার গ্রহণ করেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা এ দেশে আসেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে একটি সন্ধিসূত্রে গড়িয়া উঠে। ১৮৮৯ সনে এক পার্লামেন্ট গঠিত হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান ধবংসমূখী হয়, ১৯৪৫ সালে জাপানের দায়িত্ব পরে জনগণের উপরে। সম্রাট শুধু নামমাত্র আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পাদনের ভার পান।

জাপান দ্বীপময় দেশ। সমুদ্রের প্রভাব এ দেশের উপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল। দেশটি পর্ব্বতসঙ্কুল। এ দেশে কৃষিকার্য্য চলে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ দেশের কৃষিকার্য্য নির্বাহিত হয়। ভারতবর্ষে ও আজকাল জাপানী বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধানের চাষ হয়। জাপান মৎস্য উপাদনে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাপান সমুদ্র তীরবর্ত্তী পূর্বতম দেশ। কথায় বলে (সূর্য্য যেথায় প্রথম দেখায় মুখ)।



জাপানের বিখ্যাত পর্বত ফুজিয়ামা

ইরাক

এসিয়ার মধ্যপ্রাচী দেশ মধ্যে আফগানিস্তান, আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়। ইরানের লোকসংখ্যা ২,১০০,২০০। ভাষা—আরবীয়, কুর্দিস্, ধর্ম্ম—মোসেল্লম, য়ীহুদী, খৃষ্টান। বর্গমাইল ৬২৮,০০০,২৫০, মহাদেশের তুলনীয় চতুর্দ্দশস্হানীয়। পৃথিবীর মধ্যে অবস্হান, ৩৪ স্হানীয়। অর্থনীতি দীনার। দক্ষিণ পশ্চিম এসিয়াতে অবস্হিত। রাজধানী তিহেরান। মাসূল ও কারকুক বাণিজ্য কেন্দ্র। ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্ত্তী সমভূমি প্রায় অঞ্চলের নাম ইরাক।

ইতিহাস ৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বে এ দেশে সভ্যতার অভ্যুদয় হয়। ইরাক ছিল বেবিলোনিয়া এবং এসিরিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুত,—সে প্রায় ২,০০০ খৃষ্টপূর্ব্বের কথা। আলেকজান্ডার ৩৩১ খৃঃ পূর্ব্বে ইরাক জয় করেন। তারপর আরবেরা ৬৩৭—৬৪০ খৃষ্টাব্দ কালে ইরাক জয় করিয়া বোগদাদকে করেন রাজধানী। ষোল শতাব্দী হতে আঠারো শতাব্দী পর্য্যন্ত, তুর্কীরা, এবং পার্সিয়ানরা অধিকারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করেন। ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত তুর্কীরা দেশের অধিকার লাভ করেন। ১৯২০ সালে বৃটেন বিচারাদেশ লাভ করেন। ১৯২২ সালে বৃটেন, ইরাকের উপর রাজ্য লাভ করেন। ১৯৩২ সালে সেই শাসনাধিকার লোপ পায়। বর্ত্তমান সময়ে এই দেশ রাজতন্ত্র শাসনাধিকারে ন্যস্ত। জাতিসঙ্ঘ মেসোপোটামিয়া রাজ্য বলে পরিচিত।



তেহেরাণের—ইরানের রাজপথ ও অধিবাসী

ইরান

পারস্য দেশ নামে অভিহিত। আয়তন ৬২৮,০০০ বর্গ-মাইল। মধ্য ভাগ মালভূমি। লোকসংখ্যা ১·৯ কোটি। রাজধানী তিহারাণ। রাজশাসনতন্ত্র। কাস্পিয়ান সাগরের তীর হতে তেহারাণ পারস্য সাগরের উপকূল অঞ্চল পর্য্যন্ত অপসারিত। খনিজ তৈল, গালিচা, পশম, রেশম, ধান, ফল, মুক্তা প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। তেহারাণ ছাড়া তাব্রিজ, বুশাবার, বন্দনআববাস প্রভৃতি নগর, বন্দর ও তীর্থস্হান।

আফ্গানিস্হান

জনসংখ্যা ১২,০০০,২০০। পস্তুভাষা, পার্শিয়ান বা পারস্য। ধর্ম্ম মোসলেম। আয়তন ২৭০,০০০ বর্গমাইল। রাজধানী কাবুল। রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী। দেশটি পর্ব্বতাকীর্ণ, অনুর্ব্বর। জলবায়ু চরমতা সম্পন্ন, যেমন উষ্ণ-গ্রীষ্ম ও তেমনি শীত। অবস্হান—দক্ষিণ এসিয়া। আমদানী রপ্তানীর মধ্যে করকুল, কার্পাস, রেশম, পশম, চর্ম্ম, রাগ, ফল।

ইতিহাস ৩৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, দিগ্বিজয়ী বীর গ্রীক সম্রাট আলেকজেন্দার পারস্য সাম্রাজ্য হইতে আফগানিস্তান জয় করেন। মোগলরা ১২০০ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আক্রমণ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তান স্বাধীন রাজ্য রূপে পরিণত হয়। ১৯১৯ সালে ইহা বৃটিশ শাসন মুক্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীন রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৩২ সালের কথা।

এ দেশে রেল-পথ নাই। পশুপালন অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান উপজীবিকা। রাজধানী কাবুল ব্যতীত, কান্দাহার, হীরাট বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। খাদ্য শস্য উৎপাদনে এ দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারতের বহুদেশের সহিত ইহাদের বাণিজ্য প্রচলিত।

আফ্রিকা মহাদেশ

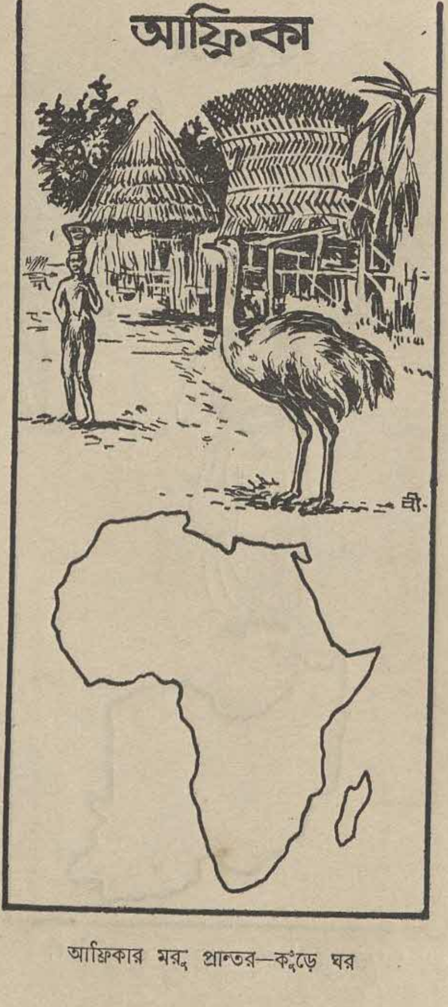
প্রাচীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। ইহার অবস্থান উত্তরে দক্ষিণে ৫,০০০ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ইহার বিস্তার ৪৬০০ মাইল। আয়তন ১·১৬ কোটি বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ২০৮,০০০,৭০ মাইল। ভূ-প্রকৃতি, উত্তরে আটলাস পর্ব্বত, জঙ্গল বলা যাইতে পারে। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত কিলিমানজারো, ১৯,৫৬৫ ফিট। নিম্নভূমি কোয়াটায়ার (Quattara)। উপকূল ভূমি সিদ্রা উপসাগরের দক্ষিণ দিকের নিম্ন ভূখন্ড। বৃহত্তম মরুভূমি—সাহারা ৩,০০,০০০ বর্গ মাইল। আফ্রিকার উত্তর ভাগে অবস্থিত। কবি সাহারার কথা বলিয়াছেন—

'সুদুর্গম দূর দেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহা পিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্ত বিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইয়ে পড়ে
তপ্ত দেহ, উষ্ণশ্বাস, বহ্নি জ্বালাময়,
শুষ্ককন্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দ্দয়।'

কবি রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনাটি অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক, চক্ষের সম্মুখে সাহারার রূপটি ফুটে উঠে।

নীল নদ ৪,০০০ মাইল। ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ কঙ্গো।

মরোক্কো, আলজিরিয়া, লিবিয়া, মিশর নিউবিয়া, সুডান, বৃটিশ, পশ্চিম আফ্রিকা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি বহু দেশ প্রসিদ্ধ।

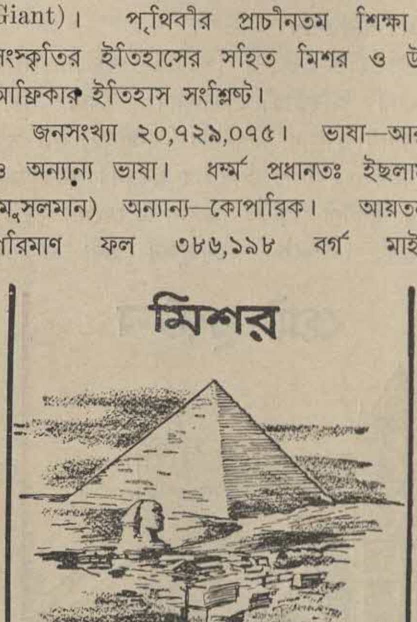


আফ্রিকার মরু প্রান্তর—কুঁড়ে ঘর

মিশর

পুরাতন পৃথিবীর মধ্যে মিশর সুপ্রসিদ্ধ। সুয়েজ যোজক আফ্রিকার সহিত এসিয়ার যোগ-সাধন করিয়াছে। এই মহাদেশে নানা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস। ৪ ফিট উঁচু বামনদের হতে ৭ ফুট উঁচু দৈত্যমানবেরও বাস (7 feet Giant)। পৃথিবীর প্রাচীনতম শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সহিত মিশর ও উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট।

জনসংখ্যা ২০,৭২৯,০৭৫। ভাষা—আরবী ও অন্যান্য ভাষা। ধর্ম্ম প্রধানতঃ ইছলাম—(মুসলমান) অন্যান্য—কোপারিক। আয়তন—পরিমাণ ফল ৩৮৬,১৯৮ বর্গ মাইল।



মিশরের বিখ্যাত পিরামিড

পৃথিবীর দেশ সমূহের মধ্যে উনিশ স্হানীয়। রাজধানী—কাইরো।

মিশরের ইতিহাস খুব প্রাচীন। সে প্রায় ৫০০০ খৃঃ পূঃ এ-দেশের আদি যুগ বলা চলে। এ-সময় হতে আরম্ভ করিয়া ১৬১৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত যে ইতিহাস আমরা পাই তাহাতে খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ক্লিওপেট্রার বংশের শেষ রাণী আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিশর হলো রোম-সাম্রাজ্যের অধীন। আরব খলিফারা ৬৪১—১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দেশের অধিপতি ছিলেন। পরে ওটোমেন তুর্কীদের অধীনে আসে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মোহম্মদআলি হন রাজা বা পাশা। ব্রিটিশ সামন্ত রাজ্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৫৫ সাল ব্রিটেন মিশরে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। রাজন্য প্রভাব হয় বিলুপ্ত। মিশর গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ইথিয়োপিয়া — এ দেশের জনসংখ্যা ১৯,৫০০,০০০। আয়তন বা পরিমাণ ফল ৩৫০,০০০ বর্গমাইল। ভাষা—আয়হারিক ও অন্যান্য গালা, সোমালি। ধর্ম্ম—খৃষ্ট (Coplic 'Christian')। মোসলেম ও আদিবাসী।

রাজা কর্ত্তৃক শাসিত। রাজধানী আদিস আববা (Addisababa) অর্থনীতি ইথিয়োপিয়ান ডলার। পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্হিত। ১৬০০ খৃঃ পূঃ মিশরিরা এ দেশ জয় করেন। ১১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে স্বাধীনতা লাভ। ৭০০ শত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইথিয়োপিয়ানরা মিশর বিজয় করেন। মুসলমানেরা আক্রমণ করেন, তাহার ফলে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহাদের বিজয় বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ সময় হইতে তাদের পতন আরম্ভ হয়। একাদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয় থিয়োডোর (Theodore III) ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আপনাকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। সে সময় হতে রাজ বংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে শাসন কার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় মেনোলিক (Menelek) সমগ্র ইথিওপিয়া জাতিকে একক রাজা রূপে শাসন করেন। ১৯৩৫ সালে মুসোলিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন।

বৃটিশ এবং ইথিয়োপিয়ান ১৯৪১ সালে পুনরায় বিজয় লাভ করেন। পূর্বে এ দেশের নাম ছিল এবিসিনিয়া। এ বংশের রাজারা আপনাদের রাণীসাবার এবং মালোলকের বংশ সম্ভূত বলে পরিচয় দেন।

ইউরোপ মহাদেশ

ইউরোপ পৃথিবীর একটি বৃহত্তম মহাদেশ। এই মহাদেশের অন্তর্ভূত বহু শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা পূর্ণ দেশ অবস্থিত। রোম সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে সমগ্র ইউরোপের সমুদয় দেশ সমূহ উন্নত ও জাগ্রত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইউরোপের প্রত্যেক দেশে নব নব সৌভাগ্য ও রাজ্যশাসন নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপ ও এসিয়ার সংযুক্ত নাম ইউরেসিয়া (Eurasia)।

বৃহত্তম জাতি—সোভিয়েট রাষ্ট্র। পূর্ব, উত্তর গোলোক। জনসংখ্যা ৫৪৮,৩২৫,৯০০, পৃথিবীর দ্বিতীয় স্হানীয়। আয়তন, ৩,৮০০,০০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ স্হানীয়। ভূ-প্রকৃতি, উচ্চতা এলব্রাস (পর্ব্বত) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র (ইউ, এস, এস, আর)। প্রধানতম পর্ব্বত শ্রেণী এল্পস, এপিনাইনস, বলকানস্, কার্পেছিয়ান, ককাসাস্। মরুভূমি—ইউরোপে কোন মরুভূমি নাই। নদী—নদীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী ভল্গা, ২,২১৫ মাইল। পৃথিবীর ভিতর ঊনিশতম স্হানীয়।

গ্রেট বৃটেন বা যুক্তরাজ্য

(United Kingdom) পরিবেশ ৫০° উঃ ৬০° উত্তর সমাক্ষ রেখা এবং পশ্চিম ৪ পঃ ও ১০° পঃ দ্রাঘিমা রেখা দ্বারা আবদ্ধ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত হইতেছে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস্ লইয়া গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যান্ড যুক্ত রাজ্য। লোকসংখ্যা ৫১,৫৪০,৯০০। ভাষা (Breton) ইংলিশ, (অন্যান্য) গেলিক (Gaelic) ওয়েলস্। আয়তন ৯৩,৬৬৭ বর্গ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্র বেষ্টিত। ধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাইন, য়ীহুদি (Jewish)। অর্থনীতি পাউন্ড, ষ্টার্লিং। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ—উত্তর, পশ্চিম। অবস্হান পশ্চিম ইউরোপ। আমদানী রপ্তানী—আকাশযান, জাহাজ, খনিজ দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, তুলা, বস্ত্রশিল্প, অটোমবাইলস্ (Automobiles) ইত্যাদি। রাজধানী লন্ডন। শাসন প্রণালী রাজতন্ত্র।

ইতিহাস—কেল্টরা (Celts) প্রাচীন কালে বৃটেনের অধিকারী ছিলেন। রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar), ৫৫ খৃঃ পূর্বাব্দে এই দেশ অধিকার করেন। রোমেনরা পঞ্চম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন এ দেশের সম্রাট। এঙ্গলস্ (Angles) সেক্সন এবং জুরেস

গ্রেট বৃটেন





ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনের টেমস নদীর সেতু

(Jutes) এরা পঞ্চম খৃষ্টাব্দে এদেশ আক্রমণ করেন এবং ডেনিস নৃপতি কেনিউট (Canute) হন রাজা। একাদশ শতাব্দীতে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ যুক্ত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জন্ (King John) মেগনাকার্টা (Magna-Carta) সই করেন। তাহাতে প্রজা সাধারণকে অনেক অধিকার দেওয়া হয়। তৃতীয় এড্ওয়ার্ড (Edward III) ফরাসী দেশের সিংহাসন লাভ করিতে চাইলে ইংল্যান্ডর সহিত ফরাসী দেশের (Hundred years war) শতবর্ষ কালব্যাপী যুদ্ধ হয়। (১৩৭৭ ১৪৫৩)। ১৫৮৮ সালে ইংরাজের সাথে স্পেনিস নৌবহরের (Spanish Armada Fleet) ধ্বংস করে। সমুদ্রের উপর ইংল্যান্ড একাধিপত্য লাভ করে। ১৮৩২ সালে দেশের মধ্যে সাম্যনীতি সংস্কার সম্পর্কিত একটি বিধান প্রবর্ত্তিত হয়। যুক্তরাজ্য (U. K. বা United Kingdom) গড়িয়া উঠিয়াছে ইংল্যান্ড উত্তর ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস নিয়ে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বহুদেশ ও উপনিবেশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইংল্যান্ডের কমনওয়েলথের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃত্ব চলিতেছে। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের রাণী।



ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারির বিখ্যাত ইফেল টাওয়ার

ফ্রান্স

লোকসংখ্যা ৪২,৪০০,৩০০। ভাষা ফ্রেন্স (French) ব্রেটন এবং অন্যান্য। ধর্ম্ম—রোমানক্যাথলিক, প্রোটেষ্টান্ট, য়ীহুদী (Jewish) প্রাচীন গোলার্দ্ধ—উত্তর পূর্ব্বাংশ, কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশ। অবস্হান পশ্চিম ইউরোপ। ব্যবসা-বাণিজ্য—ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, মোটর গাড়ী, লৌহ (আকরিক) বিমানযান, রেলপথ। প্রধান নদী—রোণ (৪৯০ মাইল দীর্ঘ) সীন নদী ৪৮০ মাইল। রাজধানী—প্যারী (পেরিস) বিখ্যাত সহর। মার্সাই, হাবার। মার্সাই ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বন্দর। সাধারণ গণতন্ত্র শাসন প্রণালী।

ইতিহাস—জুলিয়াস সীজার এদেশের কিয়দংশ ৫৭—৫২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জয় করেন। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এদেশ রোমকদের অধীনে ছিল। শার্লেমেন (Charlemgne নামে) একজন পরাক্রমশালী সম্রাট পশ্চিম ইউরোপের উপর ৭৬৮—৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করেন। ১৩৩৭—১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ ইংল্যান্ড ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী মহাসমর চলে। ফরাসী বিপ্লব ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ান আপনাকে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ১৮১৫ সালে ওয়াটালুর যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে সাধারণ-গণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এ হইতেছে তৃতীয় গণতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হিটলারের জার্মেন সৈন্যেরা ফরাসী দেশ আক্রমণ করে।

ফরাসী দেশ পশ্চিম ইউরোপের একটি গণতন্ত্র দেশ। দেশটি—স্পেনের সীমান্তবর্ত্তী, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ইটালি, সুইজারল্যান্ড, এবং জার্মেনী, পূর্বে বেলজিয়াম।

১৯৪৬ সালের ১৩ই অক্টোবর ফরাসী দেশে এক নব গণতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়। এ-ভাবে ক্রমানুয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ গণতন্ত্র গঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পরিষদ গঠিত হয় যাকে বলে—A New National Assembly এজাতীয় পরিষদ ২৩ এবং ৩০শে নভেম্বর মাসে ১৯৫৮ সালে এবং জেনারেল দ্যা গোলি (General De Gaulle) ১৯৫৯ সালের ৮ই জানুয়ারী ফ্রান্সের পঞ্চম গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নিবর্বাচিত হন এবং নূতন বিধান বলে তিনি নিবর্বাচন কালে বা মত বিরোধিতা উপস্থিত হইলে জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং নব নিবর্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ফ্রান্সের ভূমির পরিমাণ ফলঃ ২১২,৬৫৯ বর্গ-মাইল এবং জনসংখ্যা ৪৪,৮২৮৯,০০০, রাজধানী প্যারি (Paris)।

তিনি রুশিয়ার প্রথম জার (Zar) বা সম্রাট। ১৮৬১ সালে তাঁহারা সামন্তরাজ অধিকার বিলুপ্ত করেন। চতুর্থ আইভানের সময়, ১৫৩৩—৮৪ খৃঃ সময়মধ্যে চতুর্থ জার আইভান রাশিয়াকে শক্তিশালী রাজ্যে সংগঠন করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। সেই বিপ্লবের জন্য জারনিকোলাস রাজ্য-ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে সোভিয়েট সাম্রাজ্য লেলিন এবং টরসকি দ্বারা শাসিত হয়। ইউ. এস্. এস্. আর (U. S. S. R.) পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় ধন-সম্পদে সবর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খনিজ ধন-সম্পদে অতুলনীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ইভান (Ivan) মোঙ্গলদিগকে বিতাড়িত করেন। সোভিয়েট সম্মিলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-জার্ম্মান পরস্পরের শান্তি-বিধায়ক সন্ধি সবাক্ষরিত হয়। জার্ম্মানী ১৯৪১ সালে রুশকে আক্রমণ করে। সে সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সম্মিলিতভাবে ১৯৪৫ সালে বিজয়ী হয়। বর্ত্তমানে ইউ. এস্. এস্. আর (U. S. S. R.) ১৬টি গণতন্ত্র শাসনতন্ত্রে গঠিত। তাহার মধ্যে ইউক্রেণ ও বাইলোরুশিয়া সবতন্ত্রভাবে গণতন্ত্র শাসিত রাজ্য রূপে গঠিত।

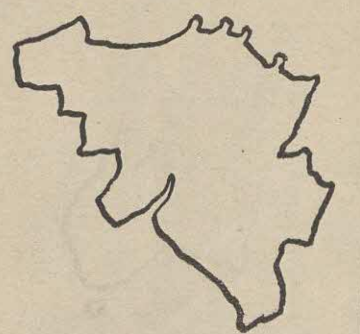
খনিজ পদার্থের জন্য ইরেল (Ural) পাবর্বত্য প্রদেশ শ্রেষ্ঠতম খনিজ সম্ভার পূর্ণ। পরিমাণ ফলঃ—৮,৫৯০,০০০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা—২০০,২০০,০০০। রাজধানী মস্কো (Moscow)।

সোভিয়েট দেশ



বেলজিয়াম

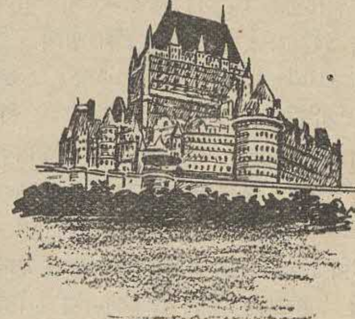




বেলজিয়াম

এদেশের লোকসংখ্যা ৮,৭০০,৯০০। প্রধানতম ভাষা ফ্রেন্স (French) ফ্লেমিশ (Flemish), জার্মান (German) ও অন্যান্য। ধর্মঃ রোমান-ক্যাথলিক, য়ীহুদী এবং অন্যান্য। আয়তনঃ ১১,৭৭৫ বর্গ মাইল। মহাদেশ মধ্যে ২৪তম স্হান। পৃথিবীর মধ্যে ৭৪তম। মুদ্রাঃ বেলজিয়ম ফ্রেঙ্ক। অবস্হানঃ পশ্চিম ইউরোপ। দেশটি উত্তর পূর্ব গোলোকার্ধে অবস্হিত। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া ইস্পাত, লৌহ, কয়লা, সুত্র, ধাতব দ্রব্য। এই দেশটি জুলিয়াস সীজার (Julias Caesar) ৫৭-৫০ খৃষ্টাব্দে বেলগেসদের নিকট হইতে অধিকার করেন। পূর্বে দেশটি স্পেনিশ, অষ্ট্রিয়ান, ফ্রেন্স এবং ডাচদের অধিকার ভুক্ত, ছিল বিভিন্ন সময়ে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সংবিধান রচিত হয় এবং স্বাধীন দেশ বলিয়া বিঘোষিত হয়। সংবিধান অনুসারে প্রিন্স লিওপোল্ড প্রথম রাজা বলে নির্বাচিত হন। নাজিরা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এ দেশ অধিকার করেন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দেশ অধীনতা শৃঙ্খল হইতে লাকস্মেবার্গ (Belgein Netherlands and Luxembarg) ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন করেন তাহা বেনিলাক্স (Benelux) নামে খ্যাত।

কানাডা





কানাডা

জনসংখ্যা—১৪,২৯০,৪০০। ভাষা—ইংরাজী ও ফরাসী। ধর্মঃ প্রোটেষ্টান্ট রোমান ক্যাথলিক, য়ীহুদী, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির।

আয়তন—৩,৮৪৫,২০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর মহাদেশ মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। মুদ্রা—কেনাডিয়ান ডলার। উত্তর পশ্চিম গোলোকার্ধে অবস্থিত। বহির্ বাণিজ্য—ফার, জীবজন্তু, এম, ফল খনিজ দ্রব্য। মৎস্য। সময়ঃ ওয়াসিংটন ডি· সি· ১২,০০ মধ্যাহ্ন একই সময়।

লেফ এরিকসন (Leef Ericson) সম্ভবত ১,০০০ খৃষ্টাব্দে এ-দেশে আসেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে জন কেবোট (John Cabot) নিউ ফাউন্ডল্যান্ড (New found land) বা নোভা স্কোটিয়া (Nova Scotia) আসেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার (Cartier) ফরাসী দেশের পথে এদেশ অধিকার করেন। ১৬৭২ সালে নোভা স্কোটিয়ার ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। দি ইংলিস হাড্‌সন বে কোম্পানি (The English Hudson Bay Company) ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিসূত্রে কানাডা ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে স্বায়ত্তব শাসন-তন্ত্র (Self Government) চালু হয়। ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকার বিধান বলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কানাডা গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। কানাডা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত।

অস্ট্রেলিয়া

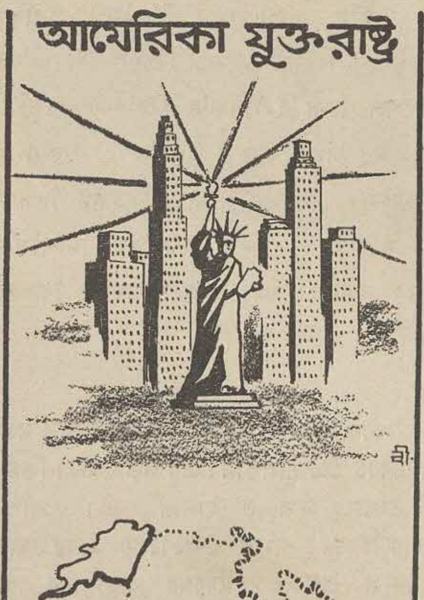


একটি প্রাচীন মহাদেশ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে চৈনিকেরা আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ মহাদেশের কথা জানিতেন। অস্ট্রেলিয়া দ্বীপ মহাদেশ (Island Continent) নামে পরিচিত। অনেককাল পরে সভ্যজাতিরা আসিয়া বাস করিতে থাকে। উদ্ভিদ—অর্থাৎ তরুলতা গাছপালার প্রাধান্য এদেশে খুব বেশি। সমগ্র প্রদেশটি একটি মাত্র জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত—তাহা অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ। এই মহাদ্বীপ দেশটি এসিয়ার দক্ষিণতম স্থানে অবস্থিত।

দেশটি উত্তর প্রদেশ (Northern Territory) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া (South Australia) কুইনসলেন্ড (Queens Land) নিউ সাউথওয়েলস (New South Wales) এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া (Western Australia) ভিক্‌টোরিয়া (Victoria) এই ছয়টি রাজ্যে বিভক্ত। বৃহত্তম জাতি অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ গোলোকার্ধে অবস্থিত। জনসংখ্যা—৯,০৯০,৭৫০ পৃথিবীর ষষ্টতম বৃহৎ দেশ। আয়তনঃ ২,১৭৪,৫৮১ বর্গ মাইল। উচ্চতাঃ কোসিকো পর্বত (Mt Kosciusko) ৭,৩০৫ ফিট। এই পর্বতটি সাউথ ওয়েলসে অবস্থিত। নিম্নতম ভূমি সমুদ্র তট রেখা হইতে ১৯ ফিট। লায়র হ্রদ (Lake Lyre)। অন্যান্য পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান আল্পস গিরিশ্রেণী বৃহত্তম মরুভূমিঃ বৃহৎ সেন্ডি (Great Sandy) ১৬০,০০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম

স্হানীয়। নদীর মধ্যে দীর্ঘতম ডারলিং (Darling) দৈর্ঘ্যে, ১,৭৫০ মাইল। পৃথিবীর নদী সমূহের মধ্যে ২৯তম।

ভাষাঃ ইংলিশ ও আদিবাসীর ভাষা। ধর্মঃ প্রোটেস্টান্ট, রোমান ক্যাথোলিক এবং অন্যান্য। শাসনঃ স্বায়ত্ত শাসন-তন্ত্র। রাজধানী—কেনবেরা (Canberra) মুদ্রাঃ অস্ট্রেলিয়ান পাউন্ড। ব্যবসা-বাণিজ্যঃ পশম, মাংস (Meat), ময়দা (Flour), মোটা চিনি এবং খনিজ দ্রব্যাদি। যুক্তরাষ্ট্র চার্টার মেম্বার (Chartered Member) ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে।



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

নূতন জগতের একটি বিখ্যাত মহাদেশ। এই মহাদেশ পানামা যোজকের দ্বারা সংযুক্ত। (Isthumus of Panama) এখানকার হ্রদটি আকারে বৃহৎ এবং সুমিষ্ট জলে পূর্ণ। এ-দেশে নানা লোকের বাস। সর্বপ্রথম বসতি স্হাপন করেন (Leif Ericson) এবং নর্সম্যান আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে। বৃহত্তম জাতির নাম কেনেডা। ভূগোলার্ধঃ পশ্চিম এবং উত্তর। জনসংখ্যাঃ ২২৯,৯০০,৫০০। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এবং তৃতীয় স্হানীয়। পরিমাণ ফলঃ ৮,৩৫০,০০০ বর্গ মাইল। উচ্চতাঃ মা কিনলি (Mc Kinley) অলযাকা দেশে অবস্হিত। নিম্নতমঃ ডেথ ভ্যালি, সমুদ্রতট সমতা হইতে ২৮০ ফিট নিম্ন। কেলিফোরনিয়া **(U.S.A)** প্রধান প্রধান পর্বত শ্রেণীঃ সেরা মেদ্রি (Sierra Madre) রকিস (Rockies) সিথেরা নেভেডা (Sieera Nevada) আপেলাচিয়ানস্ (Appalachians) বৃহত্তম মরুভূমিঃ মাহাবে (Mohave) ১৩,৫০০ বর্গমাইল—পৃথিবীর মধ্যে ২৩ স্হানীয়। দীর্ঘতম নদীঃ মিসিসিপিঃ ৩,৮৭২ মাইল দৈর্ঘে—পৃথিবীতে তৃতীয় স্হানীয়।

দক্ষিণ আমেরিকা

নূতন পৃথিবীর একটি মহাদেশ। এই মহাদেশ মধ্য আমেরিকার পানামা যোজক দ্বারা সংযোজিত। (Panama Isthumus) এখানকার হ্রদ টিটিকাকা (Teticaca), পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ হ্রদ। সমুদ্রতট রেখা হইতে ১২.৫০৭ ফিট উচ্চ। পেরু (Peru) এবং বলিভিয়া এ মহাদেশের অন্তর্ভূত।

দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা হইতে বহুদূরে—পূর্বে অবস্হিত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস এই দেশে প্রথম পদার্পণ করেন। সকলে জানে যে কলম্বাসই আমেরিকার আবিষ্কর্তা বলিয়া বিখ্যাত।

বৃহত্তম রাষ্ট্র ব্রেজিল (Brazil)। রাজধানী রিও-দি-জেনেইরো (Rio de Janeiro)। এ-দেশটি পর্তুগীজেরা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। অবস্হান—পশ্চিম গোলার্ধ। জনসংখ্যা ১১৮,১০০,৪০০। পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থতম

দক্ষিণ আমেরিকা





মহাদেশ। পরিমাণ ফল ৬,৮০০,০০০। উচ্চতা—সর্বোত্তম এ কোন কাগিয়া (A Con Cagua), ২২,৮৩৫ ফিট। এই গিরিশ্রেণী আর্জেনটিনা (Argentina) রাষ্ট্রে অবস্থিত। এ মহাদেশের প্রধান প্রধান পর্বত শ্রেণীঃ ব্রেজিলিয়ান, উচ্চতম দেশ আন্দেস (Andes) গায়ে না হাইলেন্ডস। বৃহত্তর মরুভূমিঃ আতা কামা (Ata Cama), ৭০,০০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান ভুক্ত। দীর্ঘতম নদী আমাজন (Amazon) —৩,৯০০০ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে দৈর্ঘে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী।

উত্তর আমেরিকা

জনসংখ্যা—২২৯,৯০০,৫০০। ভাষা—ইংরাজী ও ফরাসী। ধর্ম—প্রোটেষ্টান্ট, রোমান ক্যাথলিক, য়ীহুদী আদিবাসীর ভাষা। পরিমাণ ফল—৮,৩৫০,০০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর তৃতীয় স্থানীয়। উচ্চতা—মেকর্নলি পর্বত ২০.৩০০ ফিট—আলসকা রাষ্ট্রে অবস্থিত (Alaska), নিম্নতম মৃত্যু উপত্যকা (Death Valley) সমুদ্র তটরেখা হইতে ২৮০ ফিট নিম্নতম (কালিফোর্ণিয়া) প্রধান প্রধান পর্বত শ্রেণী—সেরা মেদ্রি (Sierra Madre) রকিস (Rockies), সিয়েরা নেভেডা (Siera Nevada), আপ্‌পেল চিনা (Appala China) প্রভৃতি। বৃহত্তম মরুভূমি—মোহেভ (Mohave) ১৩,৫০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম হিসাবে ২৩ সংখ্যক। নদী দীর্ঘতম—মিশিসিপি ৩,৮৭২ মাইল। বহু শাখা প্রশাখাতে বিভক্ত। পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানীয়।

আন্টার্কটিকা

আন্টার্কটিকা বা কুমেরু (দক্ষিণ মেরু) মহাদেশ একটি উচ্চ মালভূমি। এর গড় উচ্চতা (সমুদ্র গর্ভ থেকে) প্রায় ৬ হাজার ফুট। পশ্চিম আন্টার্কটিকায় পামার উপদ্বীপের পবর্বতমালা সমুদ্রকূল থেকে মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

আন্টার্কটিকা মহাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর তুষার আবরণ এবং সমুদ্র সৈকতের পরিবর্তে বিশাল দিগন্তব্যাপী তুষার প্রাচীর। এই বিস্তীর্ণ ভূখন্ড প্রায় সর্বত্রই তুষারে আবৃত দুই-একটি স্থানে গিরিশৃংগ তুষার আবরণ ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বরফের আস্তরণটি স্থানে স্থানে ১০.০০০ (দশ হাজার) ফুট পুরু। (প্রায় দুই মাইল) মূল ভূখন্ড থেকে হিমপ্রবাহ কুমেরু সাগরে এসে পড়ে বিশাল তুষার শৈলের প্রাচীর সৃষ্টি করেছে।



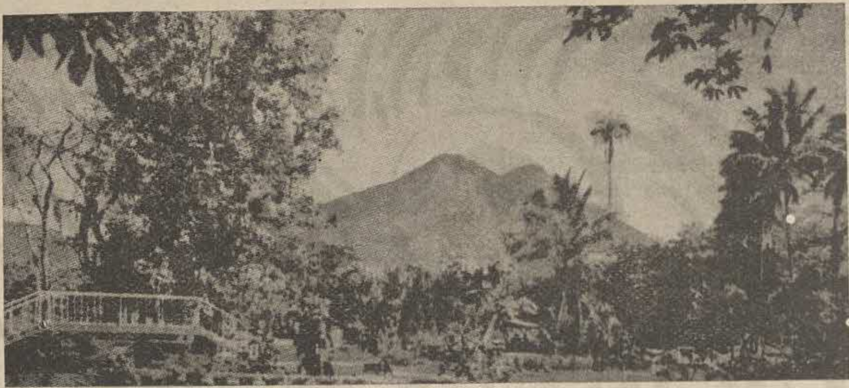


বি. বোনার্জি

এল সালভাডোর

আমেরিকার একখানি মানচিত্র নিয়ে দেখ, দেখতে পাবে একটি প্রাকৃতিক সেতু দুই মহাদেশকে সংযুক্ত করিয়াছে, সে হইতেছে মধ্য আমেরিকা (Central America) তারপর দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল তরঙ্গ দ্বারা বিধৌত দেশ গোয়েটিমলো, এবং তারই দক্ষিণে এল সালভাডোর (El Salvador)। এই দেশের উত্তর সীমা হইতেছে গোয়েটিমাল গণতন্ত্র এবং হোন-ডুরাস এবং ফোনসিকা উপসাগর এবং দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর।

পরিমাণফল ও লোকসংখ্যা—এদেশের পরিমাণ ফল প্রায় ১৩,০০০ বর্গমাইল। দেশটিকে বলা যায় হ্রদ ও আগ্নেয়গিরির দেশ (El Salvador:- Land of Lakés and Volcanoes) এই ক্ষুদ্র দেশের জনসংখ্যাঃ— ২,৩০৭,৬৫৯। সালভাডোরের আবহাওয়া উষ্ণপ্রধান দেশের মত। অনেক নগর ও পল্লীর সমাবেশ আছে। অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি সচল রহিয়াছে। সান্তা আনা না যক আগ্নেয়গিরির উচ্চতা ৭,০০০ ফিট। এ দেশে মাত্র দুইটি



সালভাডোরের প্রাকৃতিক শোভা

ঋতুর সমাবেশ—গ্রীষ্ম নভেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত আর শীত ঋতু জুন হইতে জুলাই. ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে শীতের প্রকোপ বিকায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দেশের আদিবাসী ছিল নাহোয়া (Nahoa) তাহারা পিপিলিস্ এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। তারা ছিল কৃষকশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

গোয়াটেমালা প্রদেশ ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়রা জয় করিয়া স্পেনীয় সেনাপতি পেড্রো অলিভার ডো ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনী সহ এসে সান সালভাডোর, বিজয় করেন, তারপর



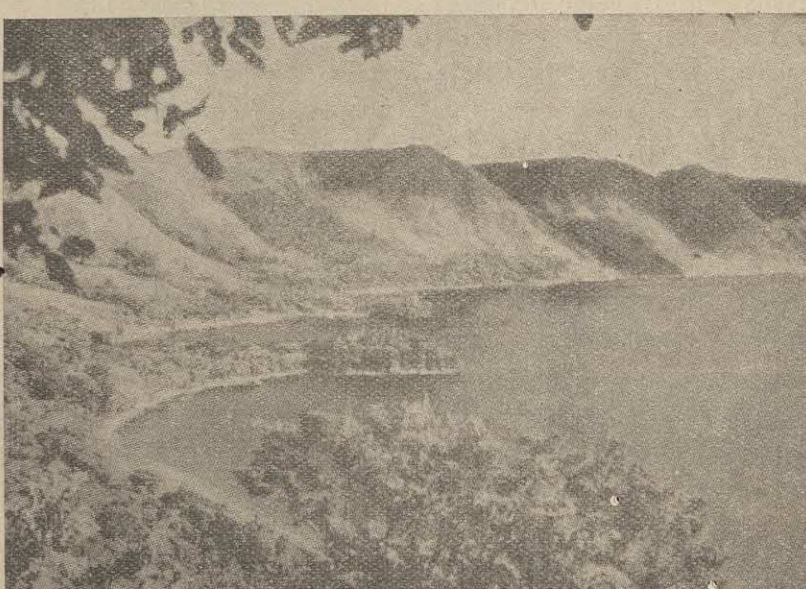
জালকো আগ্নেয়গিরি

থকে একে একে সান মিগুয়েল, মোসকোসো, সান সোলোষ প্রভৃতি স্থান কাপ্তান লুই দ্য মোস কোসো, ১৫৩০ এবং ১৫৫২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সারা-দেশ বিজিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত দেশটি ছিল স্পেনীয়দের অধীনে, কিন্তু পরে সালভাডোর দেশের স্বাধীনতা কাম্য দেশ প্রেমিকগণ, তাহাদের মধ্যে—ফাদার জোসি মাটিয়াস•দেলগাডো (Father Jose Matias Delgado) ম্যানুয়েল যোসী আর্ক, আগুলিয়ার ব্রাদার্স বা ভ্রাতৃসংঘ এবং অন্যান্য দেশ প্রেমিকগণ স্বাধীনতার জন্য নানা বাধা বিঘ্নের সহিত বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্নবান হন অবশেষে ১৮২১ সালে সালভাডোর. হোনডুরাস, নাইকারে গুয়া, এবং কোস্‌ যারিকা গণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইয়াছেন। এই দেশ গণতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে নানা দিক দিয়া দেশের উন্নতি বিধানে সমর্থ হইয়াছে।

দেশের হ্রদগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে প্রসিদ্ধ এবং সৌন্দর্য্য অনুপম, ইহাদের মধ্যে লোপানগো, কোটিপিকো, ইলোপাদো প্রভৃতির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

যানবাহনের দিক দিয়াও দেশটি ক্ষুদ্র হইলেও উল্লেখ যোগ্য, রেলপথ, আকালমান, (Airlines) সমুদ্রগামী জাহাজ, ছোট ছোট ষ্টীমার, লঞ্চের, মোটর বোট, মোটর গাড়ী ও বড় কম নয়। ষ্টর্য়িস বা কোম্পানি, ইত্যাদিও বড় কম নাই। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, ফল ও ফুলের বাগান. ইনষ্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, প্রেস, বহুবিধ মাসিক পত্রিকা, সাময়িক ও সংবাদপত্রের প্রাচুর্য্যও রহিয়াছে। খেলাধূলা, চিলড্রেনস, শিল্প সমৃদ্ধি, একটিভিটি অব ইনডাসট্রিস,—বয়ন শিল্পের প্রসিদ্ধি আছে।

সংক্ষেপে আমেরিকার একটি ছোট দেশের কথা বলিলাম।



পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত হ্রদ ওলঙ



ধনুর্দ্ধর

।। এক ।।

পুরাকালে সে কত হাজার বছর আগে, বারাণসী সহরের কাছে নিগম নামে একটি বেশ বড় গ্রাম ছিল, সে গ্রামে ছিলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁর নাম ছিল বিদ্যাধর। বিদ্যাধর কাশীধামে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁর নাম দিয়াছিল—চুল্লধনুপুত্র পন্ডিত। অর্থাৎ সর্ব্ব-শাস্ত্রবিদ পন্ডিত।

এমন মহাপন্ডিত—তাঁহার মনে হইল, তাঁর এত বিদ্যার পরিচয় দিবেন কোথায়? দরিদ্র ব্রাহ্মণ সে,—কোথায় তাঁর অর্থ, কোথায় তাঁর বিত্ত; শেষটায় মনে করিল আমাদের দেশের ধনী রাজা মহারাজার অভাব নাই, সেরূপ কোন রাজার দরবারে গিয়া নিজ গুণপনার দিবেন পরিচয়। কিন্তু তার প্রধান বাধা ছিল এই যে তিনি দেখিতে ছিলেন অতি কুৎসিত—গায়ের রং ছিল অঙ্গারের মত কালো—তাতে ছিলেন কুঁজো, আবার আকারে ছিলেন অতি খর্ব্বকায় বামন। এজন্য তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল, যদি এই কৃশকায় খর্ব্বদেহ ও পিঠের বড় কুঁজটা নিয়ে কোন রাজার দরবারে যাই, তখনই রাজা বলবেন—ওহে ঠাকুর, তোমার মত একজন বামন দিয়ে কি কাজ হবে বলতে পার? তখনই আমাকে দেবেন দরবার হতে দূর করে। তখন তাঁহার মনে হইল আমার একজন লম্বা চওড়া জোয়ান লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাকে করিব মুখপাত্র এবং তাহা হইলে জীবিকা-নির্ব্বাহের সুবিধা হইবে। সে এরূপ ভাবিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইল।

।। দুই ।।

অনেক গ্রাম, নগর, ছোট বড় বন্দর ঘুরিয়া সে তার মনের মত লোক দেখিতে পাইল না। একদিন হতাশ মনে একটি গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছে, প্রথমে একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। পল্লীপার্শ্বে তন্তুবায় পল্লী। সেখানে এক মহাবলশালী মহাকায় তন্তুবায়ের সহিত বিদ্যাধর চতুর্ধনুগ্রাহীর দেখা হইল। এই দীর্ঘ দেহ, বিশাল বাহু, বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিলঃ আমার নাম ভীমসেন। বিদ্যাধর বলিলেন— 'বাঃ বাঃ কি সুন্দর তোমার দেহ, কি তোমার শালগাছের মত বাহু,—সত্যিই তোমার নাম সার্থক, ...ভীমের মত বলশালী, আচ্ছা ভাই তুমি কি কাজ করো?

আমি তন্তুবায়, তাঁতবুনি, তাতেই আমার দিন চলে!'

সেকিগো!—তোমার মত বীরপুরুষ, তোমার

দেহ এমন সুন্দর ও বিশাল, তুমি কেন তন্তুবায়ের ব্যবসা করছো!

কি করবো মশায়—না করলে যে চলেনা, খাব কি করে, বাঁচবো কেমন করে!

বিদ্যাধর তার কুঁজনাড়িয়া, বামন দেহ উঁচু করিয়া কালোমুখে সাদা দাঁত মেলিয়া হাসিয়া বলিলঃ না—না—সে হবে না! আর তোমার একাজ করতে হবে না। জান আমি কে? এই সমস্ত জাম্বুদ্বীপের মধ্যে আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, কিন্তু রাজার নিকট গেলে তিনি

পশ্চাতে থাকবো এবং যখন যে কাজ উপস্থিত হবে তা করে দেবো।

ভীমসেন শুনিয়া হাত পা নাড়িয়া বুক ফুলাইয়া বলল—হাঁ হাঁ সে সব পারবো। হাঁ সব পারবো।—সবই পারবো!!

বিদ্যাধর বলিতে লাগিলেনঃ দেখ তোমার ছায়ায় থেকে আমারও জীবিকা-নিবর্বাহের সুবিধা হবে। আমি যেরূপ বললাম, তাহা করো তা হ'লে আমরা দু'জনেই সুখে থাকতে পারবো।

বেশ! বেশ! তাই হবে মশাই!—আনন্দে সে



.........এক মহা বলশালী তন্তুবায়ের সহিত দেখা হল

আমার ক্ষুদ্রাঙ্গ বামন দেখে মনে করবেন আমি কোন কাজের লোক নই, তখন নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে।

একথা বলিয়া ধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—এস ভাই আমার সঙ্গে চল, রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে তুমি আস্ফালন করে বলবে যে তুমি মহাধনুর্দ্ধর, তাহলে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে একটা বেতন নির্দ্দিষ্ট করে তোমায় নিযুক্ত করবেন। তারপর তোমার কি করতে হবে, তাও তিনি বলে দিবেন। আমি তোমার

বামন বীর বিদ্যাধরকে শূন্যে তুলিয়া নাচাইতে লাগিল!

ওরে ছেড়ে দেও ভীম পালোয়ান। প্রাণ যে যায়! ভীমসেন উৎকট হাসিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজবাড়ীর দিকে চলিল।

।। তিন ।।

যথাসময়ে দুজনে বারাণসীধামে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন ভীমসেন দাঁড়াইলেন

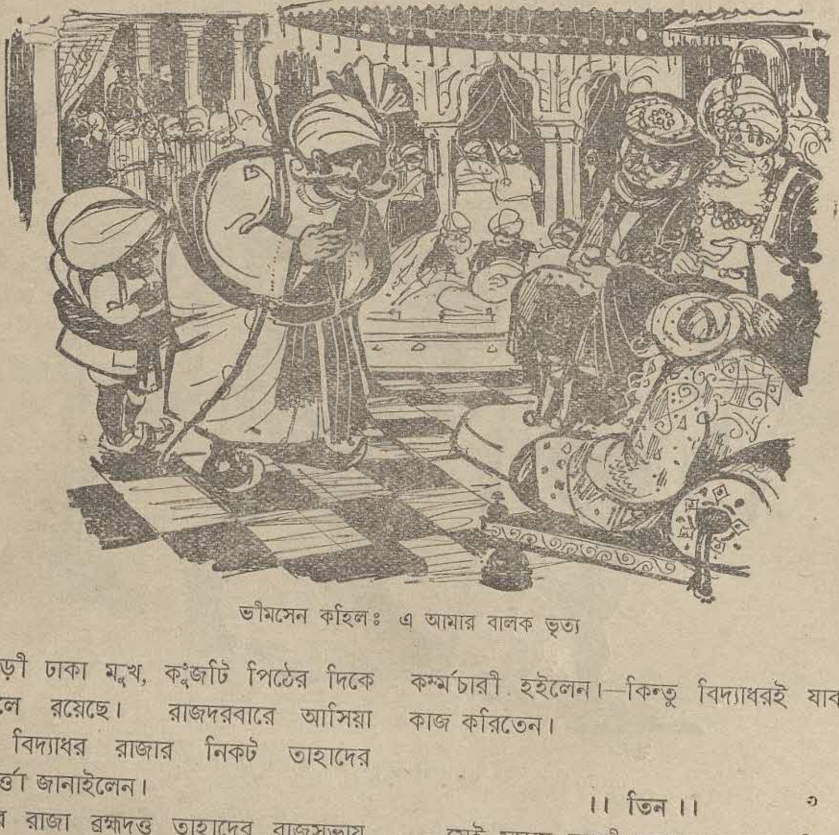
সকলের সম্মুখে। বিদ্যাধর রহিলেন তাহার পশ্চাতে। ভয়ে সে দিল তার বালক ভৃত্য নামে পরিচয়। ভীমসেনের মাথায় খড় পাগড়ী, মস্ত বড় গোঁফ, গায়ে ঢোলা জামা, পায়ে নাগরাই জুতো। হাতে তীরধনু! আর বিদ্যাধরের বেশ বালক ভৃত্যেরই মত। তেমনি তার সখা।

বল!'—জিজ্ঞাসা করলেন—রাজা! 'প্রতিপক্ষে সহস্র মুদ্রা।'

তোমার সঙ্গে এ লোকটি কে?

—এ আমার বালক ভৃত্য।—বেশ তোমার সঙ্গের এই বালকভৃত্যকেও নিযুক্ত করা গেল।

ভীমসেন ও বিদ্যাধর, দুইজনেই রাজ-



ভীমসেন কহিলঃ এ আমার বালক ভৃত্য

মস্ত পাগড়ী ঢাকা মুখ, কুঁজটি পিঠের দিকে বেশ ফুলে রয়েছে। রাজদরবারে আসিয়া বুদ্ধিমান বিদ্যাধর রাজার নিকট তাহাদের আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন।

কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত তাহাদের রাজসভায় যাইবার অনুমতি দিলেন। তারা উভয়ে সভামন্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কি জন্য এসেছ?

ভীমসেন উত্তর করিল, মহারাজ, আমি ধনুর্দ্ধর, সমস্ত জম্বুদ্বীপে ধনুর্বিদ্যায় আমার তুল্য কেউ নাই।

আমার কর্ম্মচারী হলে কি বেতন চাও?

কর্ম্মচারী হইলেন।—কিন্তু বিদ্যাধরই যাবতীয় কাজ করিতেন।

।। তিন ।।

সেই সময়ে কাশীরাজ্যের কোন গভীর বনে একটা বাঘ বড় উপদ্রব করিত, গ্রামের লোকদের, গোরুবাছুরদের যাকে পাইত তাকে করিত সংহার—লোক চলাচলের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া বাঘের ভয়ে কেহ আর চলিতে সাহস করিত না। বহু মনুষ্য প্রাণ হারাইয়াছিল। রাজার কানে কথাটা গেল। তিনি একদিন ভীমসেনকে ডাকাইয়া বলিলেন—'ওহে ধনুর্দ্ধারী,—তুমি এই বাঘটাকে ধরতে পারবে কি?' ভীমসেন হা হা করিয়া হাসিয়া, হাতের তীরধনু দেখাইয়া

বলিলঃ—মহারাজঃ যদি বাঘই ধরতে না পারি তবে ধনুর্দ্ধর নাম ধারণ করার কি ফল।

রাজা তাহাকে পাথেয় দিয়া বাঘ ধরিতে পাঠাইলেন। ভীমসেন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাধরকে সব কথা বলিল। বিদ্যাধর বলিলেন, '—বেশ কথা ভীম, তুমি বাঘ ধরতে যাও।'

ভীম বলিল, 'তুমি যাবে নাকি?'

না আমি যাব না, কিন্তু তোমাকে একটা উপায় বলে দিচ্ছি।

কি উপায় বল না?

কাছে গিয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করে বলবে—'কে বাঘ মারলো? আমি ভেবেছিলাম বাঘটাকে ধরে, এই লতা দিয়ে বেঁধে গোরুর মত টানতে টানতে রাজার কাছে নিয়ে যাব, সেই জন্য এই লতা আনতে বনের মধ্যে গিয়েছিলাম, কিন্তু লতা আনবার আগেই বাঘটাকে মেরে ফেলেছে। কে এমন কাজ করলো বল? তোমার কথা শুনে জনগণ রাজার ভয়ে ভীত হবে এবং প্রভু, একথা রাজাকে জানাবেন না বলে তোমাকে প্রচুর ধন দিবে—রাজা জানবেন তুমিই বাঘ মেরেছ, কাজেই



ভীমসেন বললোঃ মহারাজ ব্যাঘ্র নিহত হয়েছে

'দেখ তুমি সহসা একা সেই গভীর গহন বনে যেখানে ব্যাঘ্র বাস করে সেখানে প্রবেশ করবে না।' তুমি জনপদ হতে সেখানে দু-তিন হাজার তীরন্দাজ সংগ্রহ কর। তারা সমবেত হলে যখন বুঝবে যে বাঘটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন পালিয়ে ঝোপের মধ্যে যাবে এবং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে। এ-দিকে সব গ্রামের লোকেরা প্রহার করে বাঘ মেরে ফেলবে। যখন বুঝবে বাঘটা মরেছে তখন ঝোপের মধ্য হতে দাঁত দিয়ে একটা লতা কেটে নিবে এবং উহার একদিক ধরে টানতে টানতে মড়া বাঘের

তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে বহুধন পুরস্কার দেবে।

ভীমসেন বিদ্যাধরের কথা শুনিয়া বলিলঃ বা বা, এত অতি উত্তম পরীক্ষা। অনন্তর বিদ্যাধর যেরূপ বলিল সে—সেই উপায়ে ব্যাঘ্র বধ করিয়া বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিল এবং রাজার নিকট গিয়া বলিলঃ মহারাজ ব্যাঘ্র নিহত হয়েছে বনে আর পথিকদের ব্যাঘ্রের উপদ্রবের সম্ভাবনা নেই।

রাজা ব্রহ্মদত্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু ধন দান করিলেন।

।। চার ।।

কিছুকাল পরে একদিন সংবাদ আসিল একটা বন্য মহিষ বন হতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়া উপদ্রব করিতেছে। আবার রাজা ভীমসেনকে ডাকাইয়া বলিলেন মহিষ মেরে, উপদ্রব দূর কর। এবারও সে বিদ্যাধরের উপদেশ মত কৌশলে জনগণের সাহায্যে মহিষ বধ করিয়া রাজার নিকট খ্যাতিও পুরস্কার লাভ করিল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে শত্রুরা আসিয়া বারাণসীধাম অবরোধ করিল—সেই শত্রু-রাজ বিরূপাক্ষ মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হয় রাজ্য ছাড় নয় যুদ্ধ কর।'

মহারাজা ব্রহ্মদত্ত ভীমসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—বলিলেন ভীমসেন যুদ্ধে যাও আমার শত্রুসৈন্যে অদূরে এসে হানা দিয়েছে রাজধানী তারা অবরোধ করেছে—যাও সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজধানীর শত্রুদের পরাজিত ও নিহত করে এস বিজয় গর্বে—যাও যুদ্ধে যাও।

ভীমসেন রণসাজে সজ্জিত হইলেন—আপাদ-



কাঁপুনিতে জড়সড় দৃষ্টি ভূমিতলে............

মস্তক সৈনিকের সাজে সাজিলেন এক বৃহৎ রণহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং রণ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। রণদামামা বাজিল, চারিদিকের সৈন্যগণ চলিল, পদাতিক অশ্বারোহী তীরন্দাজ সৈন্যেরা সব সাজিল। অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহিত নাদে রণবাদ্য ও রণসঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। গগনে পবনে বহিতে লাগিল ধূলির ঝঞ্ঝা। সৈন্যদের জয়ধ্বনি—হর হর বম্ বম্ বম্ জয় বাবা বিশ্বেশ্বর। জয় মহারাজ ব্রহ্মদত্তের জয়!

এই ভাবে ভীমসেন দিন দিন ধন সম্পত্তি লাভ করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া হইল মহা অহঙ্কারী, ধন ঐশ্বর্য্যে সে এমনি গর্বিত হইয়া উঠিল যে সে আর কোন বিষয়ে বিদ্যাধরের কোন পরামর্শ গ্রহণ করিত না। সে মুক্তকন্ঠে বলিত,—ভারিত তুমি পন্ডিত—ভারিত তুমি ধনুর্দ্ধারী, তুমি কি ভাব তোমা ভিন্ন আর লোক বোকা, এইরূপ নানা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল—হি—হি—হি কি তার বিকট অহঙ্কারের ও বিদ্রূপের হাসি।

বুদ্ধিমান বিদ্যাধর বুঝিয়াছিলেন—এই মূর্খ ভীমসেন না জানি কি বিপদ ঘটায়। সে নানা দিক বিবেচনা করিয়া ভীমসেনের হাতীর পশ্চাতে গুপ্ত ভাবে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। এদিকে এই ভাবে রণযাত্রা করিয়া চলিতে চলিতে—সেই হস্তী যখন সেনাপরিবৃত হইয়া নগর দ্বার বাহির হইয়া শত্রু সৈন্যের পুরোভাগে উপস্থিত হইল, রণভেরী গুড়ুম্ গুড়ুম্ নাদে রণ প্রান্তর ভীষণ শব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল তখন কাঁপিতে লাগিল। বিবর্ণ হইয়া গেল তাহার মুখ।

তখন বিদ্যাধর বলিলেন—ভীমসেন, তোমার কোথায় গেল গর্ব্ব! কোথায় রইলো তোমার আস্ফালন! এখন কিনা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নিজ দেহ ও হস্তিপৃষ্ঠ করেছ দূষিত!

বিদ্যাধর এই ভাবে ভীমসেনকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেনঃ—ভয় করোনাঃ ভয় নেই ভাই, আমি থাকতে কার



ভীমসেন ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল

ভীমসেন ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সে কাঁপুনি আর থামেনা। সে চাহিতেছিল হস্তী পৃষ্ঠ হইতে নীচে ভূপৃষ্ঠে নামিতে।

বিদ্যাধর বলিলেন—সাবধান! এখন তুমি হস্তি পৃষ্ঠ হতে নামবার উদ্যোগ করোনা, তা হ'লে মারা যাবে। এজন্য যাহাতে সে পড়িয়া না যায় সেই জন্য তাহাকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কিন্তু ভীমসেন রণভূমির ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া মরণ ভয়ে এমন ভীত হইল যে—সে তাহার পরিহিত বস্ত্রাদি এবং হস্তিপৃষ্ঠ—দূষিত করিয়া ফেলিল। সে ভয়ে সাধ্য তোমার প্রাণ নাশ করে? তিনি ভীমসেনকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—তুমি স্নান করে বাড়ীতে ফিরে যাও। ভীমসেন তাহাই করিল।

এদিকে বিদ্যাধর যুদ্ধে জয়ী হবই, এই সংকল্প করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে রণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শত্রুবূহ ভেদ করিয়া শত্রু পক্ষের রাজা বিরূপাক্ষকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া সসৈন্যে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট লইয়া গেলেন। রাজা

অতি মাত্রায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দান করিলেন।

সে দিন হইতে এই চতুর্ধনুগ্রাহী ত্রিবেদী পন্ডিতের যশোগাথা চারিদিকে গীত হইতে লাগিল।

রাজা ভীমসেনকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন। খর্ব্বকায় বামন বিদ্যাধর মহাকায় ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

কত গর্ব্ব করিলে আগে বাক্যে চমৎকার,
আস্ফালন কোথা গেল বীরত্ব তোমার!
যুদ্ধ ক্ষেত্রে হস্তিপৃষ্ঠে দূষিত করিলে
কাঁপুনিতে জড়সড় দৃষ্টি ভূমিতলে।
পূর্ব্বে যাহা বলে ছিলে, পরে যা করিলে ভাই
সামঞ্জস্য তার মাঝে দেখিতে না পাই!

এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে করিতে বিদ্যাধর বন্ধু ভীমসেনকে তাহার বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিল।

রবীন্দ্র জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথের পরে আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত ছোট বড় মাঝারি যে সকল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই বঙ্কিমচন্দ্রের পরে যেমন রবীন্দ্রনাথ,—তেমনই রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁহার আসনে বসিবার মত প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। গল্প, নাটক, কবিতা, উপন্যাস রচনায় অল্পাধিক কৃতিত্বের কথা বলিতেছিনা; জাতির চৈতনমূলে দীপ্তি সঞ্চার এক সর্ব্বাশ্রয় ভাবদৃষ্টির সাহায্যে, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বজাতির মধ্যে নিজ জাতিকে স্থাপন করিয়া তাহার শক্তি ও অশক্তি, তাহার সৌভাগ্য ও দৌর্ভাগ্য গণনা, এবং তাহা হইতেই তাহার মুক্তিপথ নির্দ্দেশ; এবং সর্ব্বশেষে, যে-ভাষা জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের এক মাত্র সাধন, সেই ভাষার অক্ষরগুলিতেই যেন মন্ত্রশক্তির সঞ্চার—এ সকল গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আর কোন সাহিত্যিকের দ্বারা এমন ভাবে সাধিত হয় নাই।

—মোহিতলাল মজুমদার

নমস্কার! তারে নমস্কার।

স্বদেশ যে সর্ব্ব পূজ্য,
বিদেশে যে রাজারো অধিক,
মুখরিত যার পানে সপ্ত সিন্ধু আর দশ দিক,
বিশ্ব কবি, ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্যবন্দনীয়,
ভিতরে যে বিশ্বরোধি, বিশ্ববোধিসত্ব জগৎ প্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টিকা ভালে যার, চিত্ত চমৎকার,
নমস্কার! তারে নমস্কার!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



চন্দ্র আমাদের নিকট হইতে ২,৪০,০০০ মাইল দূরে থাকিলেও তাহার উপরিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছি এবং পূর্বে যখন আমরা শিশু-ভারতীতে চন্দ্র সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছিলাম—সে সময়ে চন্দ্রের যে অর্দ্ধেকটুকু আমরা দেখি তাহা বরাবরই অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহা সকল সময়েই এক। চন্দ্রের এই অর্দ্ধেকটুকুতেই তাহার সম্পর্কে আমাদের সমস্ত জ্ঞান আবদ্ধ থাকিলেও তাহাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় নাই। অদৃশ্য অংশ দেখিবার সুযোগ আমাদের এতদিন পর্যন্ত হয় নাই—এতদিন পরে আমাদের সে সৌভাগ্য হইয়াছে। সেকথা বলিবার আগে একথা বলিতেছি যে, অর্দ্ধচন্দ্রের এমন কোন অংশ নাই যাহার ছবি দেওয়া হয় নাই। কিংবা যাহা লইয়া কেহ না কেহ গবেষণা না করিয়াছেন। এমন কি কতকগুলি খালের নামকরণ পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। একথা বলা বাহুল্য যে, এতদিন চন্দ্র সম্পর্কে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। চন্দ্রের নৈকট্য তাহাদের একটি এবং দূরবীনের সাহায্যে সেই সুদূর অতীতে গ্যালিলিও তাহার দূরবীন দিয়া চন্দ্রের দৃশ্যমান অংশটুকু আবিষ্কারের পর হইতে আমরা দিনের পরে দিন সেই অদৃশ্যমান অংশের দিকে নানা প্রকার শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মধ্যস্থলের বৃহৎ স্থলটি যাকে বলা হয় মারেক্রিমিয়াম চান্দ্র এপেনাইনস, তারপর কোপার্নিকা গহ্বর প্রভৃতি দেখিতে পাইয়াছি। এইবার আমরা শুধু নয়, পৃথিবীর সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন।

চন্দ্রের অদৃশ্য দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের চন্দ্রের অদৃশ্য ভাগের চিত্রগুলোর সাফল্যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতেই তাঁহারা অভিনন্দিত হইয়াছেন। ২৭শে অক্টোবর (১৯৫৯ খৃঃ অঃ) চন্দ্রের অদৃশ্য দিকের প্রথম আলোক-চিত্রগুলির সহিত রাশিয়া আজ তৃতীয় লুনিকের বিশদ বর্ণনাও প্রকাশ করিয়াছে। তৃতীয় লুনিকের দ্বারাই চন্দ্রের চাঞ্চল্যকর আলোকচিত্রগুলি গৃহীত হইয়াছে। এই তৃতীয় লুনিকটি দৈর্ঘ্যে ৫২ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪৮ ইঞ্চি। এই সিলেন্ডারটির দুই দিকে গোলাকৃতি দুইটি চক্র অবস্থিত আছে এবং শিঙের ন্যায় চারিটি এরিয়েল আছে।

উপরের টুপিটির একটি ছিদ্র দিয়া চন্দ্রের চিত্রগুলি গৃহীত হইয়াছে। দুই-লেন্স ক্যামেরাটি চালু হইবার কিছুক্ষণ পূর্বে এই চিত্রটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে গৃহীত হইয়া গিয়াছিল।

৭ই অক্টোবর তারিখে গৃহীত চন্দ্রের আলোকচিত্রগুলিতে একটি বিরাট কালো গহ্বরের এবং গোটাকয়েক ছোট ছোট বিন্দু তাহাতে দেখা গিয়াছে। এই গহ্বরগুলি হইল বিভিন্ন আকারের আগ্নেয়গিরির মুখ। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই রুশ মহাকাশবিজ্ঞানীদের এবং ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিওকুরিটর নামানুসারে এই গুলির নামকরণ করিয়াছে।

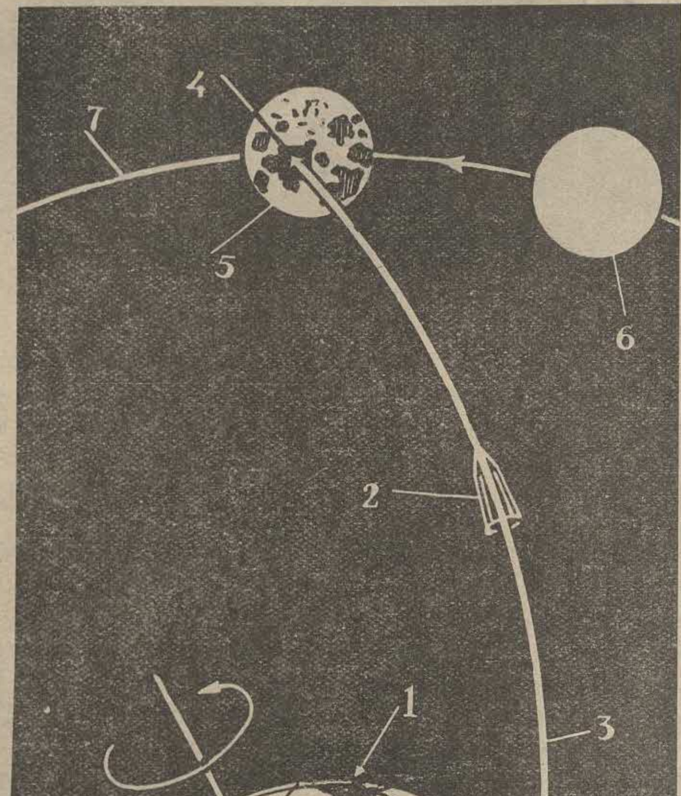
লুনিকের বেতার ও বেতার-বীক্ষণ ট্রান্সমিটার, সৌরব্যাটারি ও স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি সিলিন্ডারের মধ্যে এবং রেকর্ডিং প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যের জন্য কয়েকটি যন্ত্রপাতি ইহার উপরিভাগে ছিল।

ঐতিহাসিক কৃতিত্ব

সোভিয়েট রুশের সংবাদপত্র প্রভদায় বলা হইয়াছে, ১৬০৯ সালে গ্যালিলিরও সেই প্রথম টেলিস্কোপটির সাহায্যে চন্দ্র-সৃষ্টি সম্পর্কে যে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল, তৃতীয় লুনিকের সাফল্যে তাহার চরমোৎকর্ষ দেখা গেল।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের অদৃশ্য দিকের এই আলোকচিত্র গ্রহণকে অতিশয় আশ্চর্য এবং উল্লেখযোগ্য এবং চিত্তাকর্ষক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ ডোলোও মোঙ্গুল বলেন যে চন্দ্রের দৃষ্ট দিকের চিত্রের সহিত এই চিত্রগুলির বেশ সাদৃশ্য আছে। এই আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য প্রয়োগ-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের প্রয়োজন।

ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলি এই আলোকচিত্র-গ্রহণকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টির সেই আদি যুগ হইতে

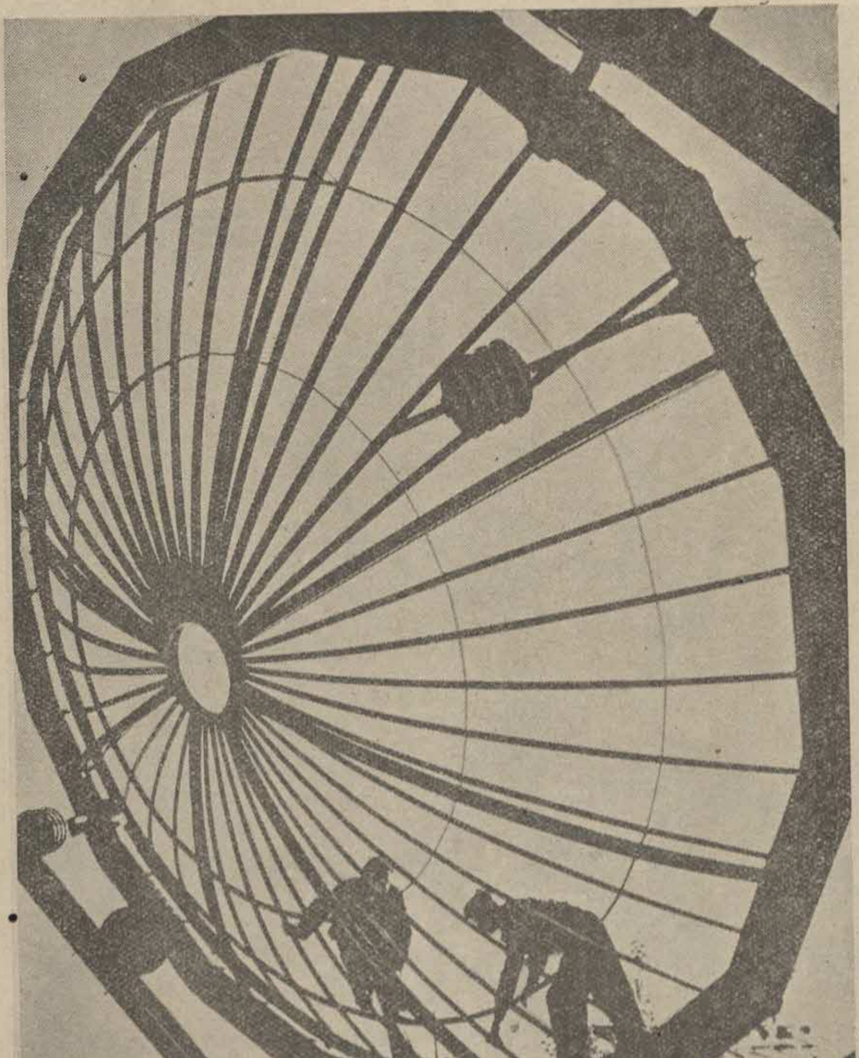


পৃথিবী হইতে চন্দ্রের লক্ষ্যপথ নির্দেশ

ঘুরিয়া চাঁদের অদৃশ্য অংশের ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

ফরাসীদেশের প্যারিস সহরে চতুঃশক্তি সম্মেলনের প্রাক্কালে সোভিয়েট চাঁদ স্পুটনিক—৪ আবির্ভূত হয়। এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, মহাশূন্যে অভিযান আর বেশী দেরী নয়।

ভবিষ্যতের মহাশূন্যযানের আদর্শে স্পুটনিক—৪ নির্ম্মিত। যাত্রীদের বসবাসের জন্য চতুর্থ স্পুটনিকের

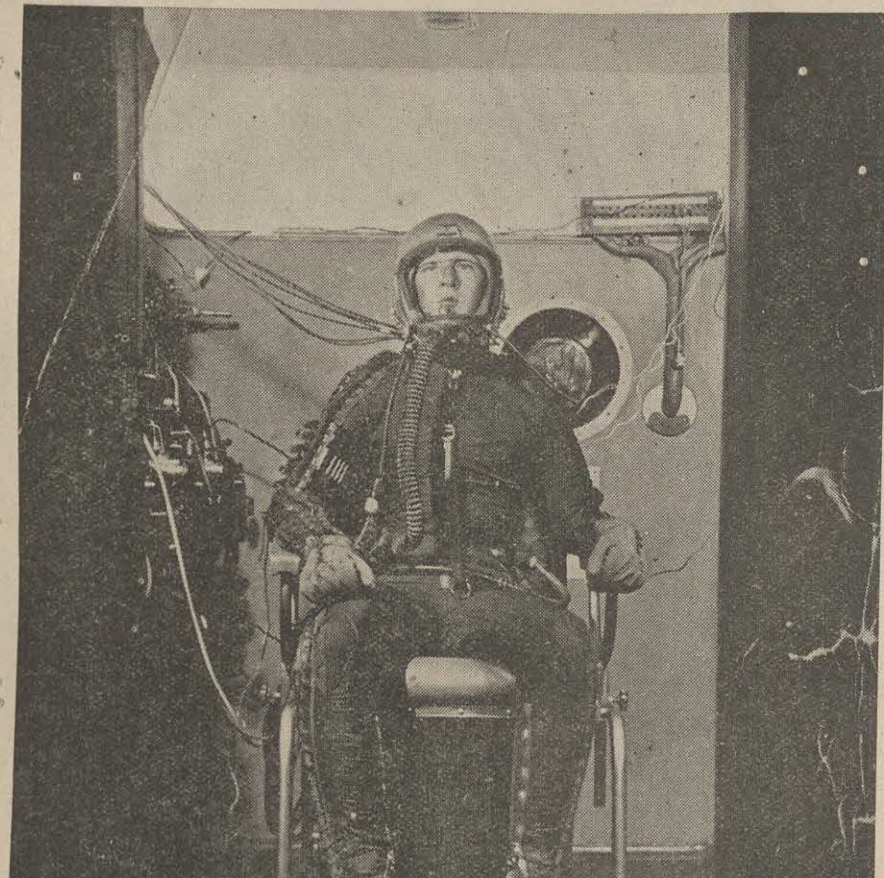


রেডিও টেলিস্কোপ। অদৃশ্য রশ্মির সাহায্যে এই যন্ত্রটি গ্রহকে ধরে ফেলে ওর সীমার ভিতরে

সাড়ে চার টন ওজনের মহাশূন্যযান কক্ষপথে স্থাপন করিতে যে প্রচন্ড শক্তিশালী রকেটের প্রয়োজন তাহাতে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হইয়াছেন। এখন অনেকের "কেবিন" বাসকক্ষ সম্পূর্ণভাবেই তাপ-নিয়ন্ত্রিত। মহাশূন্যের প্রচন্ড শীত যাতে কেবিনের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, তার জন্য যথোপযুক্ত ইনসুলেশান বা

প্রয়োজন। এই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ঐরূপ শক্তিশালী রকেট নির্ম্মাণের জন্য মনোযোগী হইলেন। এ বিষয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। রুশিয়ার স্পুটনিকের ওজনের তুলনায় ঐগুলি নগণ্য বলিলেই চলে—সর্ব্বোচ্চ ওজন ছিল ৪৫০ পাউন্ড।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ব্যতীত, মানুষের তৈরী



মহাকাশ যাত্রায় যন্ত্র সজ্জার ভূমিকা

সোভিয়েট ইউনিয়নের চারিটি স্পুটনিক উৎক্ষেপনের মধ্যবর্ত্তী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমার কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছেন। তিনটি সৌরগ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের চান্দ্র রকেট লুনিক ২ চাঁদের বুকে গিয়া পেঁছিয়াছে। আর একটি চান্দ্র রকেট লুনিক—৩ চাঁদ

মহাকাশের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মানুষকে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রথম যে মানুষদের মহাকাশে প্রেরণ করা হইবে তাহাদের ফিরিয়া আসা এবং বাঁচিয়া আসার সম্ভাবনা যে খুবই অল্প সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিতে হইবে।

চন্দ্রের বিপরীত দিকের দৃশ্য

মস্কো হইতে বেতারযোগে বিশ্বময় প্রচারিত এই চিত্রটি চন্দ্রের বিপরীত দিকের দৃশ্য। ইতিপূর্বে এই দৃশ্য কোন মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। চন্দ্র পরিবেষ্টন-কারী লুনিক আন্তগ্রহ যন্ত্রাগার কর্তৃক চিত্রটি গৃহীত হয় এবং টেলিভিশনযোগে উহা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়।

স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহ যন্ত্রাগার হইতে প্রাপ্ত কলা-গুলিতে চন্দ্রের বিপরীত দিকস্থ বিভিন্ন বস্তুর অবস্থিতি ১নং ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের বড় সমুদ্র গড়ের 'মস্কো' সমুদ্র, ২নং মস্কো সমুদ্রের অষ্ট্রনটস উপসাগর—" ৩নং চন্দ্রের বিপরীত দিকস্থ সাউথ সি সংলগ্ন, ৪নং প্রধান "জেওলো কোভস্কি" পর্ব্বত-গহ্বরের, ৫নং মধ্য মমনসভ" পর্ব্বত-গহ্বর; ৬নং জলিওটকুরি গহ্বরের, ৭নং সোভিয়েট স্কাই পর্ব্বতমালা, ৮নং ড্রিমসি" চিত্রের উপর দিয়া যে নিরবিচ্ছিন্ন রেখাটি গিয়াছে, উহা চন্দ্রের বিষুবরেখা। বিন্দুসংখ্যার দ্বারা যে রেখাটি অঙ্কিত হইয়াছে, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে চন্দ্রের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অংশের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা। নিরবচ্ছিন্ন রেখাগুলি দ্বারা যে সব বস্তু চিহ্নিত করা হইয়াছে সেইগুলি এখনও সুস্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সূক্ষ্ম বিন্দু দ্বারা বেষ্টিত বস্তুগুলির এখন শ্রেণীবিন্যাস চলিতেছে।

প্রাপ্ত চিত্রের অবশিষ্ট অংশ লইয়া এখনও গবেষণা চলিতেছে। চন্দ্রের দৃশ্য অংশের রোমান সংখ্যা দিয়া যে-সব বস্তু চিহ্নিত করা হইয়াছে সেইগুলি হইল—১নং হামবোল্যাসি, ২নং সি অফ ক্রাইসিস, ৩নং রোজিওনলে সি, ৪নং সি অফ ওয়েভস, ৫নং স্মিথ সি, ৬নং সি অফ ফরেটিনিটি, ৭নং সাউথ সি।



চন্দ্র গ্রহ—নিত্য যেমন দেখি

সোভিয়েট আন্তগ্রহ যন্ত্রাগার: স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহ চন্দ্রাগার এই শিরোনামা দিয়া মহাকাশ হইতে বেতার-যোগে চন্দ্র পরিবেষ্টনকারী এই রুশ উপগ্রহের প্রথম

চিত্রটি সমগ্র বিশ্বে প্রচার করা হয়। মহাশূন্যে অভিযানে এপর্যন্ত পৃথিবীর গতি ছাড়িয়া বিংশ শতাব্দীতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে অভিযানের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হইয়াছে—সে পরিচয় দিতেছি। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর স্পেশ মহাশূন্যে অভিযান প্রথম আরম্ভ হয়। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা

১৫ই মে তৃতীয় স্পুটনিক পৃথিবী পরিক্রমা আরম্ভ করে এবং ১৯৬০ সালের ১৫ই মে সোভিয়েট ইউনিয়ন চতুর্থ স্পুটনিক কক্ষপথে স্থাপন করেন। ইহার ওজন সাড়ে চার টন।

এই বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, বিজ্ঞানীদের এদিকে বিশেষ সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। মহাশূন্য



চন্দ্রের স্থান নির্দেশ যেখানে পড়বে স্ফুটনিক বা রকেট

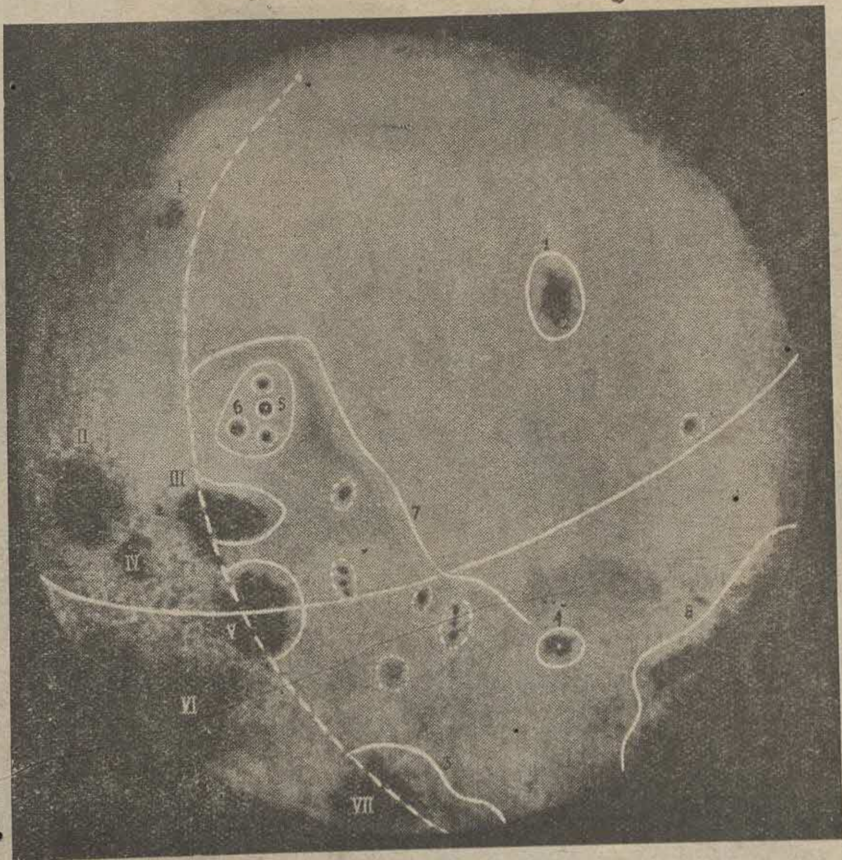
পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ১৮৪ পাউন্ড ওজনের স্পুটনিক) কক্ষপথে স্থাপন করিলেন। এই স্পুটনিকের আয়ুস্কাল ছিল মাত্র তিন মাস—১৯৫৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী স্পুটনিক পৃথিবীর ভারী বায়ুস্তরে প্রবেশ করিয়া ধ্বংস হইয়া যায়। উহার একমাস পরে রাশিয়া ১৯২০ পাউন্ড ওজনের দ্বিতীয় স্পুটনিক পৃথিবীর পরিক্রমার কক্ষপথে স্থাপন করেন। ১৯৫৮ সালের

অভিযানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন শূন্যযানটিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গন্ডী ছাড়াইয়া উর্দ্ধে প্রেরণ। যাত্রী মানুষ ও নানা যন্ত্রপাতি সমেত মহাশূন্যের ওজন নগণ্য হইবে না। এই ভারী মহাশূন্যযান উর্দ্ধাকাশে উৎক্ষেপ করিতে হইলে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গন্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে এমন গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে হইলে এমন অতিবেগসঞ্চারী শক্তিশালী রকেটের

আজ পর্যন্ত কখনো এইরূপ চিত্র গৃহীত হয় নাই। আজ সারা বিশ্ব রাশিয়াকে অভিনন্দন জানাইতেছে। মহাকাশের ক্ষেত্রে ইহা মানুষের এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি।

চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের চিত্রগ্রহণ

চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের চিত্রগ্রহণে সবর্বশেষ সোভিয়েট মহাজাগতিক রকেট ৩নং লুনিক যে রেডিও সিগন্যাল প্রেরণ করিয়াছে তাহা যখন পৃথিবীতে পৌঁছিয়াছে তাহার শক্তি হিসাব অনুযায়ী এক ওয়াটের একশত কোটি ভাগের একশত কোটি ভাগ। সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদামির বিজ্ঞানী মিঃ ব্লাদিমির সিকোরভ কিভাবে চন্দ্রের ফটো চিত্র গ্রহণ করা হয় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তখন স্টেশনের ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে দর্শন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রক্রিয়া-সাহায্যে প্রত্যক্ষ সূর্যরশ্মি এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে



মানুষ চাঁদের গোপন মুখ দেখেছে

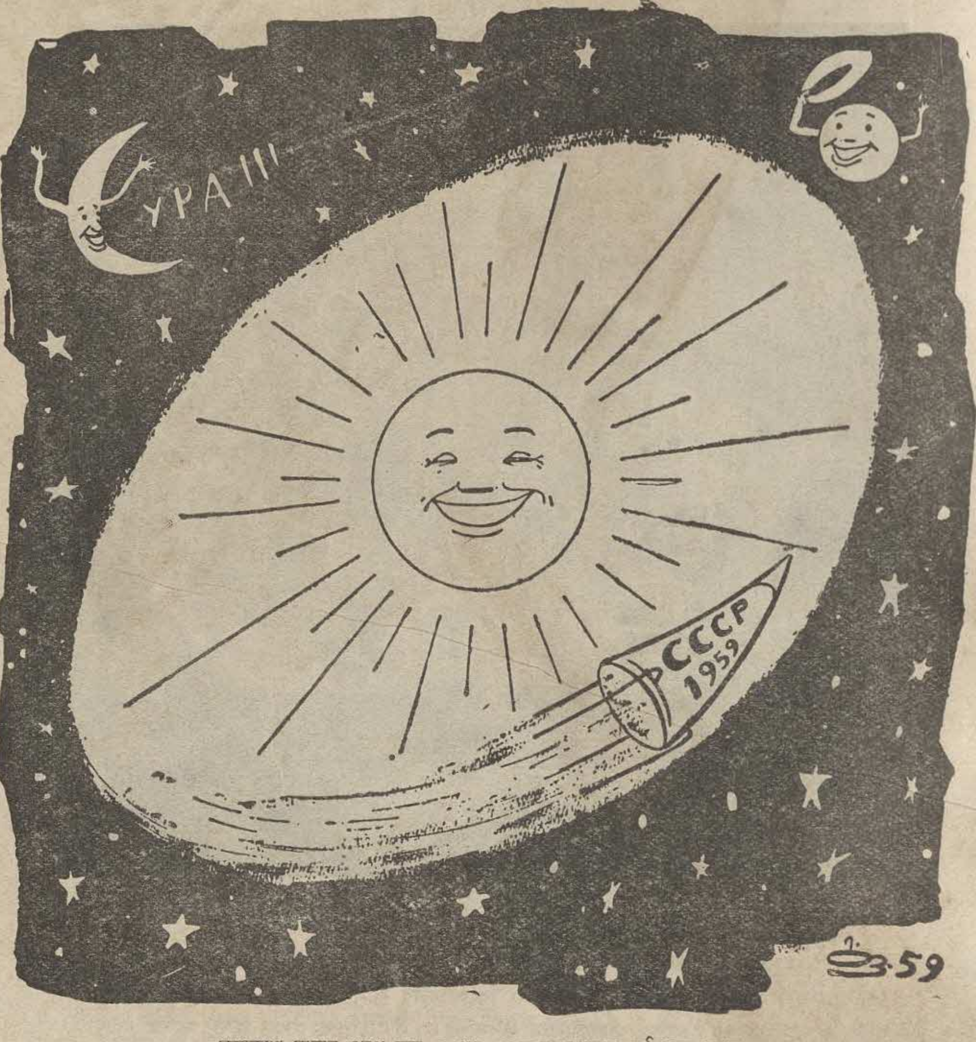
স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশন কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে প্রথম পর্যায়ে চন্দ্রের পৃথিবী হইতে অদৃষ্ট পার্শ্বের চেহারাঃ 1. ৩০০ কিলোমিটার ব্যাস পরিমাণ বিরাট গহ্বর—মস্কো সাগর। 2. মস্কো সাগরের অ্যাসট্রোনটস উপসাগর। 3. চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ পর্যন্ত ব্যাপ্ত অসট্রেল হ্রদ। 4. মধ্যভাগে শিখর সমন্বিত গহ্বর—ৎসিওলকভস্কি 5. মধ্যভাগে শিখর সমন্বিত গহ্বর—লমোনোসফ। 6. জোলিও-কুরী গহ্বর। 7. সোভিয়েতস্কি পর্বতমালা। 8. স্বপ্নসায়র। যে সাদা রেখাটি চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে উহা হইল চন্দ্রের বিষুবরেখা। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যে অংশ দেখা যায় ও যে অংশ দেখা যায় না উহার সীমানা উপর হইতে নীচে টানা রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে দৃষ্ট চন্দ্র পৃষ্ঠের রূপ: I হামবোল্ডট্ হ্রদ; III মার্গিনিস হ্রদ; IV উর্মি সাগর; V স্মিথি হ্রদ; VI ফোয়েকানডিটেটিস হ্রদ; VII অসট্রেল হ্রদ।

প্রতিফলিত রশ্মিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করা হয়। ফটো গ্রহণের পরে স্টেশন আবার ঘুরিতে থাকে। তিনি বলেন, যে গতিতে চিত্র প্রেরিত হয় উহা সাধারণ টেলিভিশনের গতির বিশ সহস্র ভাগের এক ভাগ।

চন্দ্রলোকের আগ্নেয়গিরির বর্ণালিপি

সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক কোর্জিরেভ মনে হইলেও ইহা পুনরায় প্রমাণিত হইল যে সেখানে আগ্নেয়গিরি এখনও অনির্বাপিত রহিয়াছে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক কোর্জিরেভ গত বছরেও চন্দ্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, নূতন বর্ণালিপিখানা লেলিনগ্রাদের পুলকোভা মানমন্দিরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

এক সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়াছিলেন—চন্দ্রপৃষ্ঠের

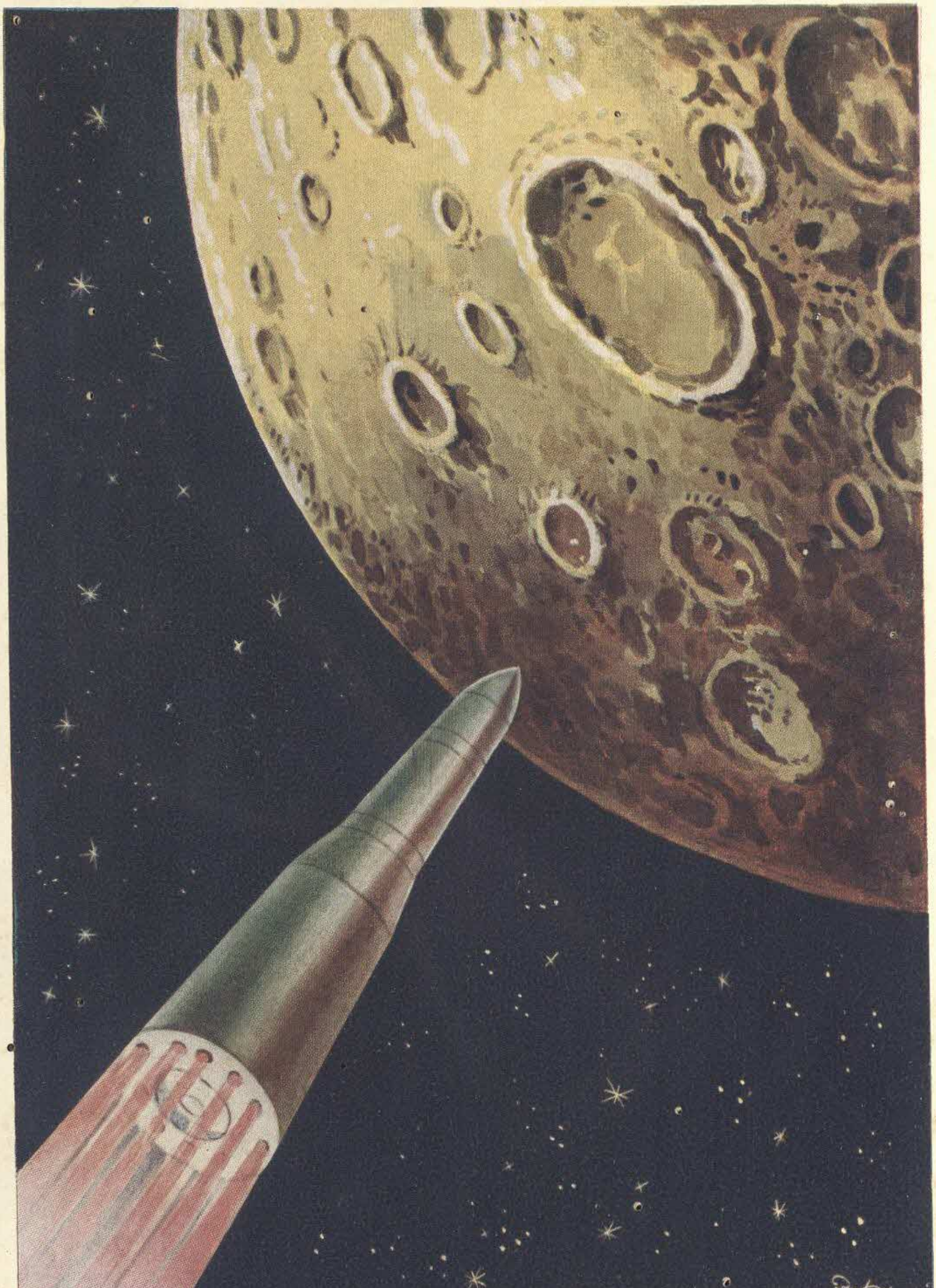


মহাকাশ যাত্রার পথে চন্দ্র ও গ্রহ ও তারকামালার কল্পিত দৃশ্য

চন্দ্রের আলফান্সো আগ্নেয়গিরি মুখের মধ্যবর্তী অংশের বর্ণালী বা স্পেক্ট্রোগ্রাফ তুলিতেও অক্ষম হইয়াছেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে ক্রিমিয়ায় এই ছবি তোলা হয়।

কোর্জিরেভ আরও বলেন আলফান্সো গিরিমুখটি সক্রিয় রহিয়াছে। চন্দ্রদেহে একধরণের ব্যাপার অস্বাভাবিক

আগে একটি দেখিবার জিনিষ তাহার দীর্ঘ খালের ন্যায় স্থানগুলি যাহা চোখে পড়ে তাহাদের মধ্যে দুই একটি দুই হাজার মাইল বিস্তৃতও আছে। এইগুলি বোধহয় চন্দ্রের আগ্নেয়গিরিগুলি যখন সজাগ ছিল তখনকার ভূমিকম্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল আগ্নেয়গিরি এখন



চন্দ্রে—রকেট

নিবর্বাপিত হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের কোন শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় না। দুই একবার চন্দ্রপৃষ্ঠে দুই একটি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মনে হইয়াছে বটে যে, চন্দ্রের দুই একটি আগ্নেয়গিরি বোধ হয় এখনও সজাগ আছে, কিন্তু এ সমস্ত তত উল্লেখযোগ্য নহে।

চন্দ্র তাহার আগেয় শক্তি হারাইয়া এখন একটি শীতল পিন্ডে পুরিণত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ তেজ নিবর্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কোর্জিরেভ পর্যাবেক্ষণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এখনও চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি অনিবর্বাপিত আছে।

চন্দ্রে মানুষ প্রেরণের রুশ পরিকল্পনা

দুইজন বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই সোভিয়েট উপগ্রহের সাহায্যে দুইজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে চন্দ্র প্রদক্ষিণে প্রেরণ করা হইবে। সোভিয়েট বিজ্ঞান



সোভিয়েট অন্তগ্রহ যন্ত্রাগার (এ্যাসেমব্লি ট্রলির উপর বসানো) চন্দ্রের গোপনদিকের ছবি তুলিয়াছে।) স্বয়ংক্রিয় অন্তগ্রহ যন্ত্রাগার মস্কো হইতে বেতার যোগে চন্দ্র পরিবেষ্টনকারী এই রুশ উপগ্রহের প্রথম চিত্রটি সমগ্র বিশ্বময় প্রচার করেছে



মৈশকা সত্তর (৭০) মাইল উপর থেকে নীচে নামছে

আকাদেমীর জনৈক মুখপাত্র ইতিপূবের্বই বলিয়াছেন যে, আস্তরণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেবিনের ভিতরে আছে যাত্রী মানবের প্রতিভূ হিসাবে যন্ত্রমানব। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা, বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণ, পৃথিবীর সঙ্গে বেতার-সংযোগ-ব্যবস্থা—এক কথায় মহাশূন্য অভিযানে যাত্রীদের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই আছে।

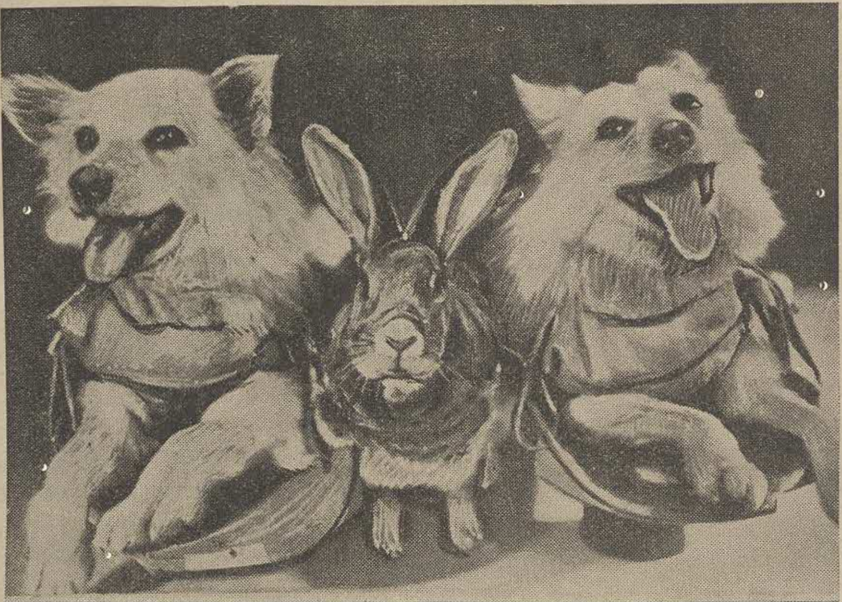
স্পুটনিক ২নং সোভিয়েট উপগ্রহ ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই উপগ্রহের ওজন—১,১২০ পাউন্ড। রকেটসহ মোট ওজন—প্রায় ৮,০০০ পাউন্ড অনুভু—১০৩ মাইল। ১৯৫৮ সালের ১৪ই এপ্রিল ধবংসপ্রাপ্ত।

মহাজাগতিক রশ্মি সূর্য্যকিরণের অতিবেগুনি রশ্মি, তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে। উপগ্রহের অভ্যন্তরস্থ কক্ষে লাইকা কুকুর পাঠান হয়। কুকুরটি এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার, সাফল্যের সহিত সর্বপ্রথম উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী এটি কক্ষপথে স্থাপিত হয়। উপগ্রহের ওজন ১৮.১৩ পাঃ, কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন ১০.৮ পাঃ। অপভূ ১২৮৪ মাইল। আয়ুস্কাল ৩ হইতে পাঁচ বৎসর। মহাজাগতিক রশ্মি অতিক্ষুদ্র উল্কাপিন্ডের সংঘাত, তাপমাত্রা পরিমাপ করে। সর্বপ্রথম ভ্যান এলেন তেজস্ক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

ভ্যানগার্ড—১ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ্চ কক্ষপথে স্থাপিত। উপগ্রহের ওজন—৩.২৫ পাঃ। কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন—৫৩.২৫ পাঃ। অপভু—২.৪৫২ মাইল। আয়ুস্কাল—

২০০ হইতে ১০০০ বৎসর। এক্সপ্লোরার—৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চ উৎক্ষিপ্ত। উপগ্রহের ওজন—১৮.৫৬ পাঃ, কক্ষপথে স্থাপিত মোট অতিক্ষুদ্র উল্কাখন্ডর সংখ্যা গণনা করে। বায়ুস্তরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে। এই ভাবে মহাশূন্য অভিযানে এইসব উপগ্রহের ক্রমিক নিদর্শন দেওয়া হইল।





লাইকা, সুস্ক নিবাস খরগোষ প্রভৃতি প্রথম নভোচারী পশু

ওজন ৩১ পাঃ, অনুভু ১২১ মাইল। অপভু ১৭৪৬ মাইল। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে ধংসপ্রাপ্ত।

টেপরেকর্ডারের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি ও

এক্সপ্লোরার—৪ঃ ১৯৫৮ সালের ২৬শে মে।

এক্সপ্লোরার—৬ঃ ১৯৫৯ সালের ৭ই আগষ্ট। উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ।

ঊক্স-রশ্মি মহাশূন্যের আবহ সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ করে।

ডিস্কোভারার—৭ঃ ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ। উপগ্রহের ওজন—৪৫০ পাঃ, কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন—১৭০০ পাঃ। অনুভূ—১০৪ মাইল। অপভূ—৫৫০ মাইল। আয়ুষ্কাল কয়েক সপ্তাহ। ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই উপগ্রহ হইতে ৩০০ পাউন্ড ওজনের ক্যাপসুল উৎক্ষিপ্ত হয় নাই।

ডিস্কোভারার—৮ঃ ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর, উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ। ওজন—৪৫০ পাঃ। কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন ১৭০০ পাঃ। অনুভূ—১২০ মাইল। অপভূ—১০০০ মাইল। আয়ুষ্কাল কয়েক সপ্তাহ। ধ্বংসপ্রাপ্ত। উপগ্রহ হইতে ৩০০ পাউন্ড ওজনের ক্যাপসুল নিক্ষিপ্ত হয়। উহা ফিরিয়া পাওয়া যায় নাই।

স্পুটনিক—৪ঃ ১৯৬০ সালের ১৫ই মে উৎক্ষিপ্ত সোভিয়েট উপগ্রহ। আনুমানিক ওজন সাড়ে চার টন। অনুভূ—১৮৮.৫ মাইল। অপভূ—২২৬ মাইল। ৯১ মিঃ ২৫ সেঃ একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে।

মহাকাশের বুকে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ইহা মানুষের অনেক কালের স্বপ্ন। চন্দ্রলোকে যাত্রা সম্পর্কে রচিত রূপকথা, প্রাচীন উপাখ্যান ও বহু কাল্পনিক কাহিনীতেই মানুষের এই স্বপ্ন নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বহু প্রাচীন লোক গাথার রচয়িতারা তাহাদের নায়ক নায়িকাকে চন্দ্রলোকে ও নক্ষত্রের দেশে পাঠাইয়াছেন। যত দিন যাইতেছে ততই প্রকৃতি বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ততোই বৃদ্ধি পায় এবং চন্দ্র ও নভোচারী অন্যান্য জ্যোতিষ্কে পাড়ি জমাইবার স্বপ্ন ও ক্রমেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফরাসী ঔপন্যাসিক জুলে ভার্ণেএর অমর গ্রন্থের নায়কগণ পূর্বের ন্যায় কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তার চাতুর্যেই নহে, কমবেশি সঠিক গাণিতিক হিসাব নিকাশের ভিত্তিকেই চন্দ্রলোক যাত্রার সঙ্কল্প উপস্থিত করিয়াছিল। গোলন্দাজ বারবিকেন ও তাহার সহযাত্রীগণ এক বিশাল কামান হইতে উৎক্ষিপ্ত গোলার খোলসের মধ্যে বসিয়া চন্দ্রে ছুট দিয়াছিল এবং চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতি নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে আমাদের এই উপগ্রহটিকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল।

জুলে ভার্ণে কী কী জানিতেন না, আজ তাহা আমাদের কাছে জ্ঞাত। যেমন তিনি জানিতেন না নয়, পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইতে যে পরিমাণ মহাজাগতিক গতির প্রয়োজন কামানের গোলার মধ্যে তাহা নিহিত করা যে কোন প্রকার বারুদের পক্ষেই সাধ্যাতীতঃ কামানটি দাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলার তলদেশের প্রচন্ড ধাক্কায় খোলসের মধ্যে অবস্থিত যাত্রীদিগকে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে হইবে; এবং উড্ডয়নের আড়াআড়ি পরিক্রমা পথের যে স্থানে পৃথিবী ও চন্দ্রের অভিকর্ষের পারস্পরিক সমতা বিরাজমান কেবল মাত্র সেখানেই নহে, সমগ্র যাত্রাপথেই উড়ন্ত খোলসটির মধ্যে ভারশূন্যতার বজায় থাকে।

এই মহান্ ঔপন্যাসিক অনেক কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না এবং চন্দ্রলোকে যাত্রা সম্পর্কে উপন্যাস লিখিবার সময়ে আরও অনেকগুলি বিষয়ে নজরে আনেন নাই। মহাকাশ যাত্রার তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা ৎসিওল কভস্কির রচনাবলী তখনও প্রকাশিত হয় নাই। আরও কিছুকাল পরে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক উপন্যাস রচয়িতা এইচ, জি, ওয়েলাস স্বকল্পিত অভিকর্ষকে বাতিল করিয়া তাঁহার নায়কদিগকে চন্দ্রলোকে প্রেরণ করেন।

কে বলিতে পারে যে কৃত্রিম অভিকর্ষক্ষেত্র ব্যবহার করিয়া একদিন প্রথম মহাকাশযান পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া মহাশূন্যে যাত্রা করিবে না? এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া সুদূর ভবিষ্যতের বিষয়। কিন্তু ঔপন্যাসিকগণ যখন বস্তুময় ও বস্তুবিহীন পর্দা-সজ্জিত আন্তর্গ্রহ গোলা আবিষ্কার করিতেছিলেন, পরিকল্পনা করিতেছিলেন আলোক অভিকর্ষ দর্পণের, বিশালকায় ফিঙ্গা ও বারুদ দ্বারা পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত যান ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক কামানের, তখন ছোট্ট শহর কালুগাতে মানুষের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মান্ড জয়ের সত্যিকারের একটি বাস্তব পরিকল্পনা, জেটচালন তত্ত্বের জন্ম হইতেছিল। স্বয়ংশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক কন্স্তান্তিন ৎসিওল কভ্স্কির প্রতিভা ও অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। আগামী দিনের মানুষ এই অসাধারণ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করিবে। কতকগুলি নিরেট মূর্খ আমলা পরিবৃত্ত ছন্নছাড়া জারের রাশিয়ায় বসিয়া অর্থ ও যন্ত্রপাতি ছাড়াই শুধুমাত্র তীক্ষ্ন বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের যুক্তিসিদ্ধতার উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি মানুষের সুমহান স্বপ্নকে নির্দিষ্ট কয়েকটি গাণিতিক সূত্রে রূপায়িত করিলেন। পৃথিবীর সীমানা ছাড়াইবার সহজতম, এবং কিয়ৎকাল পর্যন্ত একমাত্র পন্থা যে জেট্-চালন, ইহা তিনিই প্রমাণ করিয়াছিলেন। চন্দ্র ও গ্রহগ্রহান্তরে উড্ডয়নের আড়াআড়ি পথরেখা তিনিই অংকন করিয়াছেন। নভোচারী গবেষণাগার ও আন্তর্গ্রহ যাত্রাপথে মধ্যবর্তী স্টেশনরূপে মনুষ্যনির্মিত উপগ্রহের ব্যবহারের প্রসঙ্গ তিনিই প্রথম উত্থাপন করিয়াছেন। বহু-পর্যায়িক রকেট, রকেটের জ্বালানীর তত্ত্ব, মহাকাশচারী রকেটের পরিকল্পনা এবং মহাকাশ জয়ের সামগ্রিক তত্ত্ব ও অনুশীলনের বর্তমান সাফল্যসমূহ অনেকাংশেই ৎসিওল্ কভ্স্কির নিকট ঋণী।

তাই ৎসিওল্ কভ্স্কি ও অন্যান্য কয়েকজন গবেষককে (কনদ্রাৎইউক, ৎসানদের, তিখনরাভভ্) ধন্যবাদ

এক্সপ্লোরার—৭ঃ ১৯৫৯ সালের ১৩ই অক্টোবর উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ। ওজন ৯৯.৫ পাঃ।

অ্যাটলাস—স্কোরঃ ১৯৫৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহ। ওজন—১৫০ পাঃ।, কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন ৮৭৫০ পাঃ।

ভ্যানগার্ড—২ঃ ১৯৫৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ। ওজন ২০.৭৪ পাঃ।

ভ্যানগার্ড—৩ঃ ১৯৫৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ। ইহার ওজন ৫০ পাঃ কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন—১০০ পাঃ।

ডিস্কোভারার—৫ঃ ১৯৫৯ সালের ১৩ই আগষ্ট। উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ। ওজন—৪৫০ পাঃ, কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন—১৭০০ পাঃ। সেপ্টেম্বরে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ডিস্কোভারার—৬ঃ ১৯৫৯ সালের ১৯শে আগষ্ট উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ—ওজন ৪৫০ পাঃ কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন—১৭০০ পাঃ। অপভু—৩৪৪ মাইল। ১৯৫৯ সালের ২০শে অক্টোবরে ধ্বংসপ্রাপ্ত। উপগ্রহ হইতে উৎক্ষিপ্ত ৩০০ পাউন্ড ওজনের ক্যাপসুল পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা যায় নাই।

এক্সপ্লোরার—৭ঃ ১৯৫৯ ১৩ই অক্টোবর উৎক্ষিপ্ত মার্কিন উপগ্রহ। ওজন ৯৯.৫ পাঃ। অনুভু ৩১৮ মাইল। অপভু—২৩০০ মাইল। আয়ুস্কাল—৩০ হইতে ৪০ বৎসর। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত সূর্যকিরণের



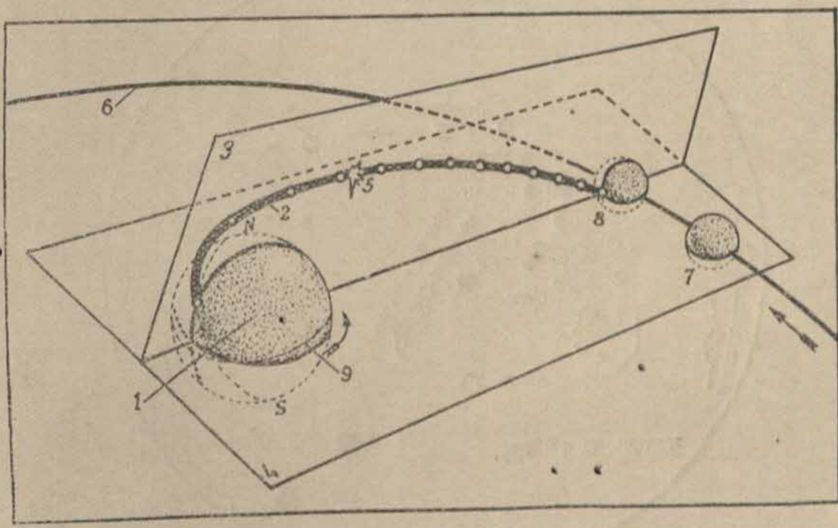
জুল ভার্ণের চন্দ্রলোকের যাত্রীদল

জানাইতে হয়। স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক সমর্থন লাভ করিল। কিন্তু ইহা তখনও স্বপ্নই রহিল। ইহার রূপায়নের জন্য বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। অপেক্ষা করিতে হইল সেই রাষ্ট্রের বিপুলাকার শিল্প ও কৃষি, অঢেল শক্তি-উৎস, অসংখ্য সুদক্ষ শ্রমিক, কারিগর ও বৈজ্ঞানিক-দের দ্বারা ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি-র সুমহান পরিকল্পনাকে অগ্রসর করিয়া নেওয়ার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টির দিন পর্যন্ত।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সমস্যার সমাধানে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে। মহাকাশ-যান নির্মাণকারীদের যে কী পরিমাণ বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে পৃথিবীর কোনও বৈজ্ঞানিক উপন্যাস রচয়িতাই তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বয়ংক্রিয়তা, সাইবারনেটিকস্‌, দ্রুতগতি ইলেকট্রনিক গণনাযন্ত্র, সঠিক ও নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ও পরি-মাপক যন্ত্র ছাড়া মহাকাশচারী রকেট নির্মাণ একেবারেই অসম্ভব ছিল; অপর্যাপ্ত উচ্চমানসম্পন্ন জ্বালানী ব্যতীত, প্রতিসরক বস্তু ব্যতীত তাহারা ছুট্‌ দিতেই পারিত না। এইসব সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, নানা বিভাগের শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন হইয়াছে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ-বিদ্যাগত উচ্চমানসম্পন্ন তত্ত্ববিদ, পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতাদের দ্বারাই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হইয়াছে। আর এবম্বিধ উচ্চমান লাভ করা শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের দেশেই সম্ভব।

চন্দ্রলোকে যাত্রা আজ বাস্তব ঘটনা। মানুষ আজ সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী একটি জ্যোতিষ্কে পেঁছাইয়াছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই মহাজাগতিক যান চন্দ্রে পদার্পণ করিবে। তখন ইহা আর বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু থাকিবে না। তৎপরিবর্তে ইহা হইবে একটি গবেষণার সামগ্রী, অনুশীলনের বস্তু। মানুষ এখন চন্দ্রের অপর পার্শ্ব দেখিতে পাইয়া, উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছে উজ্জ্বল রেখাগুলির রহস্য, এবং কতকগুলি গহ্বরের বর্ণ-পরিবর্তনের কারণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

কিন্তু মানুষের স্বপ্নের শেষ নাই। কবি ও সাহিত্যিকদের কল্পনা আরও বহু দূর পরিব্যাপ্ত, সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট সমাজে প্রসারিত। তাঁহাদের গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারা ইতিমধ্যেই সৌরজগৎ ছাড়াইয়া নানাদিকে যাত্রা করিয়াছে, পদার্পণ করিয়াছে মঙ্গল, শুক্র ও বিপুলাকার গ্রহগুলির উপগ্রহসমূহে। সম্প্রতি আমাদের একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত "আন্‌দ্রোমেদাস্‌ নেবুলা" নামে একটি চমৎকার উপন্যাসের লেখক আই, ওয়াই, ইয়েফরেমভ দেখাইয়াছেন যে মৌল পদার্থের সহিত মানুষের সংগ্রামের কোন পরিসমাপ্তি হইবে না। আত্মপ্রতিরোধের পরিবর্তে মানুষ তখন আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিবে। অসংখ্য নক্ষত্রগামী জাহাজ তখন সুদূর



লুনিক-২ রকেটের যাত্রাপথের ছক

(১) পৃথিবী, (২) রকেটের পথ, (৩) রকেট পথের কক্ষ-তল, (৪) চাঁদের কক্ষ-তল, (৫) ধূমকেতু, (৬) চাঁদের কক্ষ, (৭) রকেটটি উৎক্ষেপ করার সময় চাঁদের অবস্থান, (৮) রকেট চাঁদে পড়িবার সময় চাঁদের অবস্থান, (৯) বিষুব রেখা।

বিশ্বে পাড়ি দিবে, মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন তাহাকে অনুপ্রেরণা দিবে নিত্য নতুন বিজয়-অভিযানে, দেশ ও কালের ভৌত প্রকৃতিকে অতিক্রমে।

দ্বিতীয় সোভিয়েত মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষেপণে আমাদের প্রকৃতিদত্ত উপগ্রহ চন্দ্রে এবং মহাবিশ্ব অভিযানের নতুন সম্ভাবনা পথ উম্মুক্ত হইয়াছে।

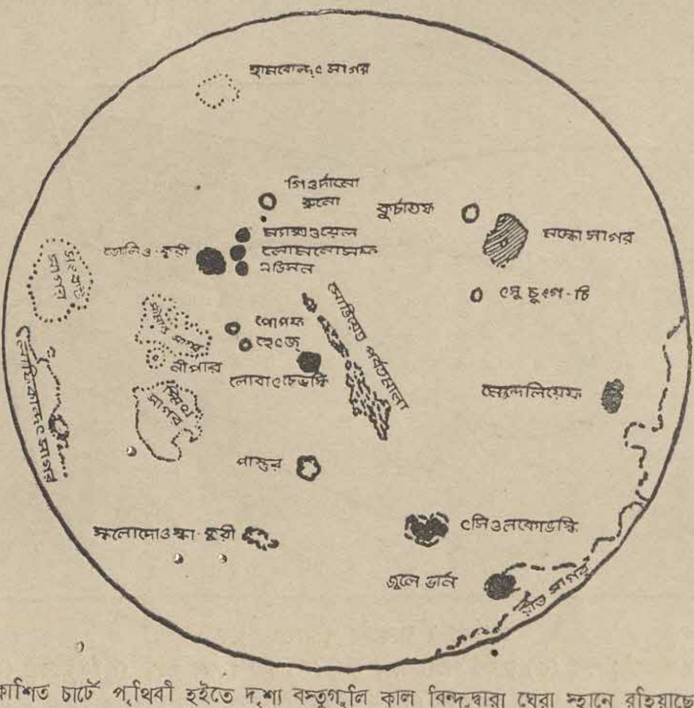
চন্দ্রের প্রতিকৃতিগুলি বিশদ পর্যালোচনায় জানা গিয়াছে যে, ইহার পৃষ্ঠদেশ আট হইতে নয় কিলোমিটার উচ্চ পর্বতমলা, অজস্র ফাটল ও বৃত্তাকার শৈলরাজিতে আচ্ছাদিত। পর্বতমালাগুলি অনেকটা ভূপৃষ্ঠস্থিত আগ্নেয়গিরি গহ্বরের ন্যায় দেখিতে, কিন্তু ইহাদের ব্যাস তুলনামূলকভাবে বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাস প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পরিব্যাপ্ত। সমতলভূমির গহ্বর ছাড়াও সুনির্দিষ্ট অর্থে "সাগর" নাম আরোপিত আরও কিছু বিশাল খাদ এখানে পরিদৃষ্ট হয়।

জনৈক চন্দ্রঅনুসন্ধিৎসু একদা বলিয়াছিলেন যে চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ হইতেছে একটি গ্রন্থসম, ইহার মাঝেই চন্দ্রের প্রকৃত ইতিহাস যে কেহ খুঁজিয়া পাইতে পারে। সত্যই ইহা একটি "গ্রন্থ" বিশেষ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চিত্রিতও বটে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অনেকগুলি "অধ্যায়"ই এখন পর্যন্ত নিরুদ্ঘাটিত রহিয়াছে। ইহার সর্বপ্রথম কারণ হইল যে "এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠাগুলির" অর্ধেকেরও বেশি আমাদের কাছে অগম্য। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ আজ পর্যন্ত কেহ দেখেই নাই। যদিও একথা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই যে অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি বিজ্ঞানের দিক হইতে এখানে অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহা ছাড়া, চন্দ্রের ঐ দিক সম্পর্কে কিছু কিছু মতবিরোধ আছে, সেগুলিও পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

উদাহরণস্বরূপ, চন্দ্রপৃষ্ঠের গঠনের প্রশ্নটি কম আগ্রহের বিষয় নয়। সোভিয়েত জ্যোতির্বিদ আচার্য বারাবাশভ্ পরিচালিত অনুসন্ধানকার্যে দেখা গিয়াছে যে চন্দ্রপৃষ্ঠে কদাচিৎ কোথাও সমতল অংশ আছে। যে বহুবিধ স্তরবিশিষ্ট শিলারাজিতে চন্দ্রপৃষ্ঠ গঠিত সেগুলিও তাপমাত্রার তারতম্য অনুযায়ী প্রভূত পরিবর্তন-সাপেক্ষ। বায়ুমন্ডল রহিত হওয়ায় চন্দ্রে দিন-রাত্রির তাপমাত্রায়ও প্রচুর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। রাত্রিকালে এখানে তাপ হিমাবস্থারও ১৫০ ডিগ্রী নিচে নামে, আবার দিন আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাড়িয়া শূন্য ডিগ্রীর উপরে ১৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া থাকে।

চন্দ্রের মানচিত্রে নূতন নাম

১৯৫৯ সালের শরৎকালে ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহাকাশচারী সোভিয়েত রকেট চন্দ্রের অদৃশ্য



প্রকাশিত চার্টে পৃথিবী হইতে দৃশ্য বস্তুগুলি কাল বিন্দুদ্বারা ঘেরা স্থানে রহিয়াছে

দিকের ফটো গ্রহণ করে। এই অপূর্ব ফটোটি পৃথিবীতে প্রেরিত হয় ও বিজ্ঞানীরা উহা অধ্যয়ন করেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে পূর্বে আদৌ যাহা দৃষ্ট হয় নাই, তাহাই এবার আবিষ্কৃত হইল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান আকাদেমীর সভাপতিমন্ডলী এইসব খাদ্য, গোলাকার পর্বতমালা প্রভৃতির অনেকগুলির নামকরণ করার সিদ্ধান্ত করেন বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নামানুসারেঃ গিওর্দানো ব্রুনো, জুলে ভার্ন, হেৎর্জ, কুর্চাতফ, লোবাচেভস্কি, ম্যাক্সওয়েল, মেন্দেলিয়েফ, পাস্তুর, পপোফ, স্ক্লোদোয়াস্কা-কুরী, ৎসু চুং-চি ও এডিসন। ইঁহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইলঃ

গিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)— মহান ইতালীয় চিন্তানায়ক, বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী, দার্শনিক মতবাদ স্কলাস্টিসিজমের তীব্র সমালোচক, বিজ্ঞানের জন্য সংগ্রামকারী।

জুলে ভার্ন (১৮২৮-১৯০৫)—বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক উপন্যাস-রচয়িতা।

হেইনরিখ্ রুদল্ফ হেৎর্জ (১৮৫৭-১৮৯৪)—বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ্যাবিদ।

ইগর ভাসিলিয়েভিচ কুর্চাতফ (১৯০৩-১৯৬০)—আমাদের এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিদ। পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ।

নিকোলাই ইভানোভিচ লোবাচেভস্কি (১৭৯২-১৮৫৬)—বিখ্যাত রুশ গণিতজ্ঞ, অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রতিষ্ঠাতা।

জেম্স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯)—প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক।

দ্মিত্রি ইভানোভিচ মেন্দেলিয়েফ (১৮৩৪-১৯০৭)—বিখ্যাত রুশ রসায়ন শাস্ত্রবিদ। বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণার ভিত্তি—রাসায়নিক মৌলপদার্থের পর্যাবৃত্ত সারণির (টেবিল) প্রতিষ্ঠাতা।

লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫)—বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখারূপে আণুবীক্ষণিক জীববিদ্যা ক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

আলেকজান্দার স্তেপানোভিচ পপোফ (১৮৫৯-১৯০৬)—বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী, রেডিওর আবিষ্কর্তা।

মারি স্ক্লোদোয়াস্কা কুরী (১৮৬৭-১৯৩৪)—জাতিতে পোলিশ, কর্মক্ষেত্র ফ্রান্স। এই রমণী তেজস্ক্রিয় মৌলপদার্থ (রেডিয়াম ও পলোনিয়াম) আবিষ্কার করিয়া খ্যাত হন। আধুনিক পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইহা বিরাট পরিবর্তন সাধন করে।

ৎসু চুং-চি—বিখ্যাত চীনা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পঞ্চম শতকের মানুষ।

টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)—বিখ্যাত মার্কিন বিদ্যুৎবিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক।

প্রকাশিত চার্টে পৃথিবী হইতে দৃশ্য বস্তুগুলি কাল বিন্দু দ্বারা ঘেরা স্থানে রহিয়াছে।

কৃত্রিম সৌরগ্রহ

লুনিক—১ঃ ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী রাশিয়া কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত সর্বপ্রথম সৌরগ্রহ। ইহার ওজন ৭৯৬.৫ পাঃ। কক্ষপথে স্থাপিত মোট ওজন—৩২৪৫ পাঃ। আয়ুস্কাল অনির্দ্দিষ্ট।

চন্দ্র হইতে ৪০০০ মাইল দূরত্বে চন্দ্রকে পাশ কাটাইয়া সূর্যের দিকে ধাবিত হয়। কৃত্রিম গ্রহ হিসাবে ১৫ মাসে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করিবে। তেজস্ক্রিয়তা, মহাশূন্যে সৌরমন্ডলে পদার্থের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ করে। বর্ত্তমানে লুনিক—১ হইতে কোন বেতারবার্ত্তা পাওয়া যাইতেছে না।

পাইয়োনীয়ার—৪ঃ ১৯৫৯ সালের ৩রা মার্চ্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত গ্রহ। এই কৃত্রিম গ্রহের ওজন ১৩.৪ পাউন্ড। আয়ুস্কাল অনির্দ্দিষ্ট। চন্দ্র হইতে ৩৭,৩০০ মাইল দূর দিয়া চন্দ্রকে পাশ কাটাইয়া সৌরকক্ষে প্রবেশ করে। পৃথিবী ও বুধ গ্রহের মধ্যে মনুষ্যসৃষ্ট দ্বিতীয় কৃত্রিম গ্রহ হিসাবে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রায় ৮২ ঘন্টা ধরিয়া সর্বাধিক দূরত্ব ৪০৭,০০০ মাইল হইতে মহাশূন্যের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ করে।

পাইয়োনীয়ার—৫ঃ ১৯৬০ সালের ১১ই মার্চ্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত মনুষ্যসৃষ্ট তৃতীয় কৃত্রিম সৌরগ্রহ। পৃথিবী ও শুক্রগ্রহের মধ্যবর্ত্তী কক্ষপথে ৩১১ দিনে সূর্য প্রদক্ষিণ করিবে। গ্রহান্তরে যাওয়ার জন্য মহাশূন্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বেতার-সংকেতে প্রেরণ করিতেছে।

চান্দ্র রকেট

লুনিক—২—সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর উৎক্ষিপ্ত। রকেটটি পরদিন ১৩ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রের বুকে আঘাত করে। তাপ, বায়ুর চাপ পৃথিবী ও চন্দ্রের চৌম্বক পরিমাপ করে

লুনিক—৩ সোভিয়েট ইউনিয়ান ১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর।



সোভিয়েতের মানুষের তৈরী তিনটি উপগ্রহ শুধু যে মহাকাশযাত্রার পথই আলোকিত করিয়াছে তাহাই নয়, সোভিয়েত বিজ্ঞান সম্পর্কে বিদেশে বহু বৎসর ধরিয়া ঔদ্ধত্যমূলক যে অপ-প্রচার চলিয়াছে, সে অপপ্রচারের মুখোসও উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

এইবার অনেক মূল্যই নূতন করিয়া যাচাই করিতে হইতেছে। সমগ্র জগৎ যখন মহাকাশে সোভিয়েতের বিরাট অগ্রগতি দেখিতে পাইল, তখন নব মূল্যায়নের গতিও বৃদ্ধি পাইল। ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী চন্দ্রের দিকে ধাবিত সোভিয়েত মহাকাশ রকেটই সর্বপ্রথম দ্বিতীয় নিষ্ক্রমণ গতিবেগ লাভ করে এবং অভিকর্ষ কাটাইয়া দেড় দিন পর চন্দ্রের উত্তর দিকে চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫ হাজার কিলোমিটার দূর দিয়া চলিয়া যায়। ইহার পর উহা সূর্যের গ্রহ—মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম কৃত্রিম গ্রহে পরিণত হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় মহাকাশ রকেট পাঠান একেবারে চন্দ্রপৃষ্ঠে। রূপকের ভাষায় বলিতে গেলে, যে চন্দ্র পৃথিবীর রাত্রির আকাশে এক জ্যোতিষ্ক, মানুষ সেই চন্দ্রের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের যোগস্থাপন করিল।

পৃথিবীর সৃষ্টির পর হইতে যুগ যুগ ধরিয়া মানবচক্ষু চন্দ্রের শুধু একটি দিকই দেখিয়া আসিয়াছে। চন্দ্রের অপর দিকে কি ঘটিতেছে মানুষ তাহা জানিত না।

১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েতের মানুষ সুদূর চন্দ্রের রহস্য উদ্ঘাটিত করে। তৃতীয় মহাকাশ রকেট একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তর্নক্ষত্র স্টেশন কক্ষপথে স্থাপিত করে এবং উহা চন্দ্রপৃষ্ঠের ৬,২০০ কিলোমিটার দূর দিয়া চলিয়া যায়। উহার ভিতর ছিল চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের চিত্র তুলিবার উপযোগী ফটো-ক্যামেরার নানা যন্ত্রপাতি ও কলকৌশল। এই ফটোগুলি টেলিভিসনের সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। সোভিয়েতের জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলি মহাকাশ হইতে প্রাপ্ত সমস্ত চিত্র অধ্যয়ন করিয়া সমগ্র বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রস্তুত করে। চান্দ্রগোলকের অপর পৃষ্ঠে নানারূপ গঠন ও বিন্যাস আবিষ্কৃত হয়। উহাদের নামকরণ করা হয় বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালের বিজ্ঞানীদের নামে। বিশ্ববিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয় এক অমূল্য সম্পদে। সে সম্পদ চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের মানচিত্র। সোভিয়েতের মহাকাশ রকেটগুলি সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করিয়াছে। সে রকেটগুলি অনন্ত কাল ধরিয়া মানব প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হইবে।

মহাকাশ বিজয়ের মহাযুগে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৬০ সালে। মহাকাশে প্রাণী বহনে সক্ষম বায়ু-নিরোধী কেবিনে সজ্জিত দুইটি বিরাট মহাকাশ যান (প্রতিটির ওজন ৪.৫ টনের অধিক) উৎক্ষিপ্ত হয়। এই মহাকাশযানগুলি ভবিষ্যতে মানুষ বহনেরই উপযোগী। দ্বিতীয় উপগ্রহ মহাকাশযান পৃথিবীতে মহাকাশযান ফিরাইয়া আনিবার অসম্ভব জটিল সমস্যাটির সমাধান করিতে সক্ষম হয়। জীবন্ত প্রাণী—কুকুর বেলকা ও স্ত্রেলকা এবং তৎসহ আরও অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ মহাকাশ পর্যটন করিয়া এই পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরিয়া আসে। এইরূপ ঘটনা বিশ্বে ইহাই প্রথম। জীববিদ্যার এই অভূতপূর্ব পরীক্ষায় মহাকাশে উড্ডয়নে রত জীবের দেহ সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

মানবের ভবিষ্যৎ মহাকাশযাত্রার প্রস্তুতিপথে এইসব তথ্য যত গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, মহাকাশ যানের নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপদ উড্ডয়ন ও ভূপৃষ্ঠে নিরাপদে

প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আরও অনেক কিছু করিবার আছে। এইসব সমস্যাবলী বরাবরই সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টির ভিতর আছে। এইসব স্পুৎনিক ক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত আমাদের বহুপর্যায়বিশিষ্ট রকেট, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ আধার এবং স্বয়ংক্রিয় আন্তর্নক্ষত্র স্টেশন—ইহা সবই উচ্চশক্তি ও নিখুঁত ব্যবস্থার জন্য খ্যাত হইয়া আছে। সমগ্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ও পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রেরণের নিখুঁত নির্ভুল ব্যবস্থা—ইহার সব কিছুই অসাধারণ। ইহা সবই সম্ভব হইয়াছে রেডিওটেকনিক্যাল এবং টেলিমেট্রিক ব্যবস্থার ফলে। যেমন রকেটে তেমনি ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত বহু জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই ব্যবস্থা আছে। যন্ত্রবিদ্যার এই বিকাশ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, টেলিমেক্যানিক্স, সাইবার্নেটিক্স ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাফল্য মহাকাশ বিজয়ের অগ্রগতি সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

আমাদের এই বিরাট ও বিস্ময়কর অভিযানের মহাকাব্য শুনিয়া অনেকেই হয়তো মনে করিবেন, আমাদের এই যাত্রাপথ বোধ হয় মসৃণ ও নিষ্কণ্টক। প্রকৃত পক্ষে এই অতিজটিল ব্যবস্থাদি, মেশিন ও গবেষণা যন্ত্রাদি নির্মাণ ও পরীক্ষা কার্যে রত বহু বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকের যৌথ প্রচেষ্টার ভিতর ছিল উদ্দীপনা ও উদ্বেগ, এক অপূর্ব মানসিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু পৃথিবী বারবার এই প্রমাণই পাইয়াছে যে সোভিয়েতের মানুষের বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহসিক সৃজনশীল চিন্তাধারা এবং বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির অসীম আকাঙ্ক্ষা প্রতিবারই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এই বৎসরের গোড়ার দিকে মহাকাশে বিজ্ঞানের নব সাফল্য দেখা দেয়। ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী একটি বহুপর্যায়বিশিষ্ট রকেট মনুষ্যসৃষ্ট একটি ভারী উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত করে। ঐ দিনই একটি নিয়ন্ত্রিত মহাকাশ রকেট উপগ্রহ হইতে বাহির হইয়া একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তর্নক্ষত্র স্টেশনকে আবক্রপথে স্থাপিত করে। এই স্টেশনটি তামাদের এই গ্রহের নিকটতম প্রতিবেশী শুক্রের পার্শ্ব দিয়া যাইবে।

মনুষ্যসৃষ্ট একটি ভারী উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত করা, উহা হইতে একটি রকেট উৎক্ষিপ্ত হওয়া, তাহার পর একটি আন্তর্নক্ষত্র স্টেশন এমন একটি গ্রহের দিকে পাঠান যে গ্রহ জটিল কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তন করে—এই সবকিছুই সম্ভব হইয়াছে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে। এই মহাকাশপরীক্ষাগারটি ২৭ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিবে। এই পরীক্ষাগার উড্ডয়ন ও নির্দিষ্ট পথে উহার গমনের ফলে ও উহা শুক্র গ্রহের নিকটবর্তী হওয়ার ফলে সূর্যের চারিধারের মহাকাশের প্রকৃতি এবং গ্রহসমূহের গঠন সম্পর্কে নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ সুগম হইবে।

বৈজ্ঞানিক কার্যসূচীর এই নির্দিষ্ট কর্তব্য ছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট উপগ্রহ হইতে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশন



৪ অক্টোবর ৩ নভেম্বর | ১৫ মে | ২ জানুয়ারী | ১২ সেপ্টেম্বর ৪ অক্টোবর | ১৫ মে ১৯ আগস্ট ১ ডিসেম্বর | ৪ ফেব্রু, ১২ ফেব্রু ৯ মার্চ, ২৫ মার্চ

উৎক্ষেপণের বিষয়টি মহাকাশ গবেষণার যুগে এক বিশেষ ঘটনা। এই ঘটনার তাৎপর্য এই যে সোভিয়েতের মানুষই বিশ্বে সর্বপ্রথম একটি স্পুৎনিককে "বাসযোগ্য" করিতে, ভবিষ্যতে নক্ষত্রলোকে উড্ডয়নের ঘাঁটিরূপে উহাকে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মহাকাশ গবেষণা ও পরীক্ষার কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে। শুক্র অভিমুখে স্টেশন উৎক্ষেপণের পরই চতুর্থ উপগ্রহ মহাকাশযান উৎক্ষেপ করা হয়। উহাতে ছিল প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং কুকুর চের্নুস্কা। চের্নুস্কা ইতিমধ্যেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে নির্দেশ অনুযায়ী মহাকাশযানটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে। উপগ্রহ মহাকাশযান ও উহার অভ্যান্তরস্থ যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি করিয়া মনুষ্য বহনোপযোগী করার গবেষণায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও গবেষকগণ পুনরায় সাফল্য লাভ করিলেন।

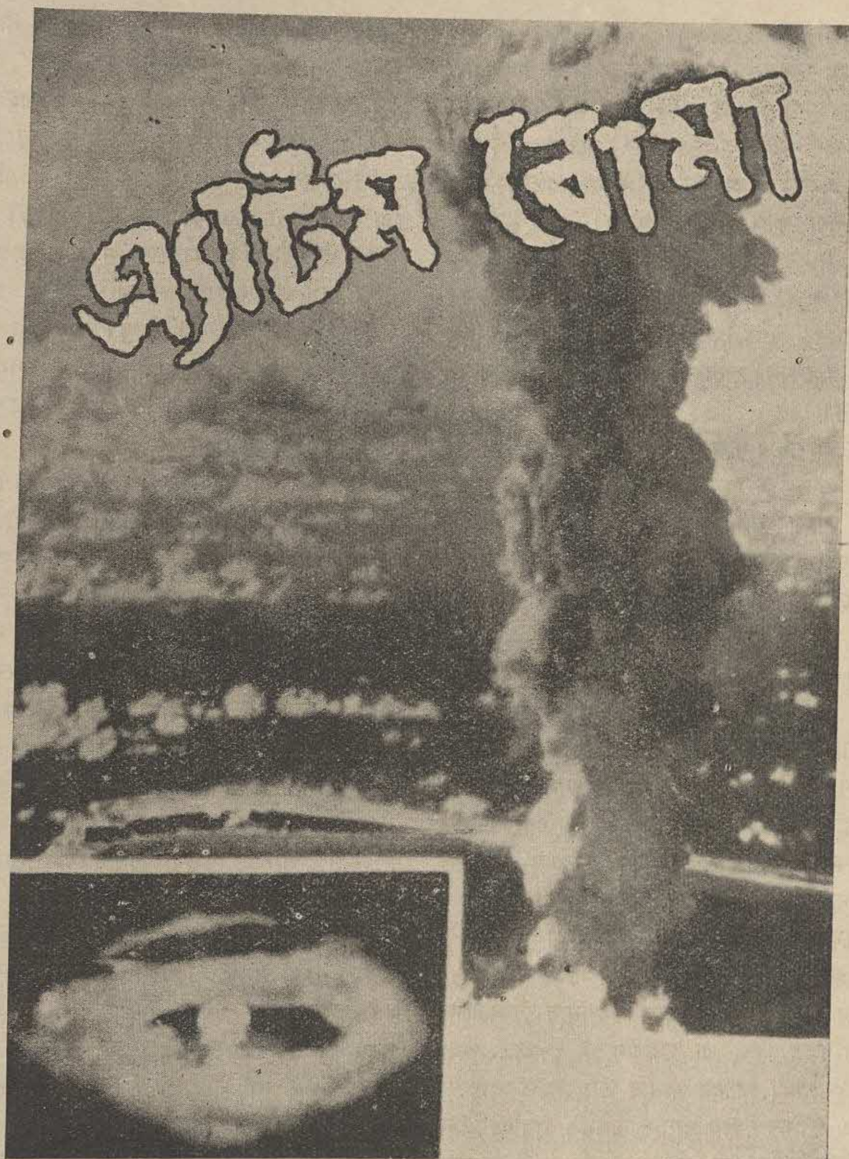
১৯৬১ সালের ২৫শে মার্চ পঞ্চম সোভিয়েত উপগ্রহ মহাকাশযান ক্ষেপণ ও কক্ষপথে স্থাপনের ভিতর দিয়া ঐ একই মহৎ লক্ষ্য অনুসৃত হইল। সমগ্র বিশ্ব আবার এক বিস্ময়কর উড্ডয়নের সংবাদ শুনিল। এক জীবন্ত মহাকাশচারী কুকুর জুভেজদোচকা ও বহু প্রাণী ও উদ্ভিদসহ এক বিরাট মহাকাশযান কক্ষপথ হইতে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল। ইহার ফলেও বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়াছে। ১১ মাসের ভিতর পাঁচটি উপগ্রহ মহাকাশযান ক্ষেপণ! ইহার পর সোভিয়েত বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্যের আর অন্য কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় না।

স্পুৎনিক, মহাকাশ রকেট ও আন্তর্নক্ষত্র স্টেশন ক্ষেপণের ফলে প্রতিবারই বহু মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে। উহা পরীক্ষার ফলে বিশ্ববিজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই এইসব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা, জীববিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের নব সাফল্য আনিয়া দিবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যাবলী, যথা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী রেডিও ও টেলিভিসন যোগাযোগ, আবহাওয়া নিরীক্ষণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের পক্ষেও এই মহাকাশ উড্ডয়নের অগ্রগতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাইবে মহাকাশ গবেষণা মানব সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অধিকতর অগ্রগতি সাধনের সহায়ক।

আমাদের মহাকাশ উড্ডয়নের কাজটি ক্রমেই সুনিশ্চিত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ইহার আরও একটি তাৎপর্য এই যে, সমগ্র বিশ্ব-পরিস্থিতির উপর ইহার কল্যাণকর প্রভাব পড়িতেছে। আমরা দেখিতেছি বিজ্ঞান সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হইয়া যাইতেছে। ক্রমেই বিশ্বের বেশীর ভাগ লোক উপলব্ধি করিতেছেন, সোভিয়েতের মানুষের মহৎ কার্যাবলীর মূল কথা হইতেছে শান্তি।

মহাকাশচারীর দৃষ্টিতে চন্দ্র—একটি ঝুলন্ত বল

মহাকাশ শূন্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনে বলিয়া এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। মহাকাশ বিজয়ী নিকি লায়েভ কাজাকস্থানের মরুভূমিতে অবতরণ করেন ও তার সঙ্গে যাপোভিচ আসিয়াছেন। মস্কোতে মহাকাশ বিজয়ীদের অপূর্ব সম্বর্ধনা করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে তাহারা বলেন গাগারিন এবং তিতোফের ন্যায় তিনি মহাকাশে একাকী ছিলেন না। সোভিয়েট মহাকাশচারীরা বলেন যে "আমরা নদীনালা, পর্বতমালা, অরণ্য, মহাসাগর ও সমুদ্র সবই দেখিয়াছি। পৃথিবী হইতে চন্দ্র যেমন চ্যাপটা দেখায় মহাশূন্যে হইতে কিন্তু চন্দ্রকে শূন্যস্থানে ঝুলন্ত বলের ন্যায় দেখায়। নিকোলাস বলেন যে, তিনি নিজেকে মুক্ত বলিয়া তিনি বার্ত্তা প্রেরণ করিতেন ও আহারাদি করিতেন। ভারশূন্য অবস্থায় জীবনধারণ ও কাজকরা সম্ভব। ১৯৬২ সালের মহাকাশযাত্রী যুগলের বিবরণ প্রদত্ত হইল।



১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট মানুষের ইতিহাসের এক চরম কলঙ্কের দিন। একটা দিনের একটা মুহূর্তে এক সঙ্গে এত বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল যে, ইতিহাসের পাতায় সে কথা চির কলঙ্ক হয়ে থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দিন এত অধিক সংখ্যক মানুষ এত অল্প সময়ের ভিতর নিহত হয়নি। হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের এই আকস্মিক অপমৃত্যুর কারণ শুধু একটি বোমা। আর সেই বোমাই এ্যাটম বোমা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান রাজ্যের হিরোশিমা শহরে একটি এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের ফলে ষাট হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছিল; হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়ে পথে বসেছিল। গোটা শহর মুহূর্তে ধ্বংস-

স্তূপে পরিণত হয়েছিল। যে হতভাগ্যের দল পঙ্গু হয়ে তখনও ধিক্ ধিক্ করছিলো তারাও কয়েক মাসের মধ্যেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে আমৃত্যু যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু তবুও অর্ধমৃত অবস্থায় অসংখ্য পঙ্গু মানুষ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলো। সেই মর্মন্তুদ ঘটনার সংবাদে বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে ভাবলো, শুধু একটা বোমা এত বড় বিধ্বংসী হতে পারে! এর আগে ধ্বংসের এত বীভৎসতা পৃথিবীর কোন সাধারণ মানুষ আর কোনদিন শোনেনি।

হিরোশিমার দুর্ঘটনার কয়েকদিন পর আবার একটি এ্যাটম বোমা পড়লো জাপানেরই আর একটি শহর নাগাসাকিতে। এখানেও ধ্বংস, মৃত্যু এবং আহতের সেই একই বীভৎস রূপ। একই বোমা দিয়ে শুধু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। এ্যাটম বোমার কথা বলার আগে এ্যাটমের কথা বলতে হয়।

এ্যাটম (Atom) এর বাংলা নাম 'পরমাণু'। যদিও আমরা অনেক সময় এ্যাটমকে পরমাণু না-ব'লে 'অণু' বলি। এবং এ্যাটম বোমাকে বলি 'পারমাণবিক বোমা' অথবা 'পরমাণু বোমা'। সে যাই-হোক, আমাদের এখন দেখতে হয়, অণু এবং পরমাণু কি। কিন্তু অণু এবং পরমাণু যে কি সে কেউ কোনদিন দেখেনি। আগামী দিনের মানুষ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে অণু বা পরমাণুকে দেখতে পাবে কিনা আগামী দিনের মানুষ তা বলতে পারবে। তবে এ যুগের কোন মানুষ এখনও পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি যা দিয়ে অণু বা পরমাণুকে চোখে দেখা যায়।

চোখে দেখা না-গেলেও বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক—পরমাণু সম্পর্কে এত বেশী গবেষণা করেছেন এবং সে সম্পর্কে এত বেশী তথ্য দিয়ে গেছেন যে পরমাণুর একটা মোটামুটি ধারণা আমরা করতে পারি। বিজ্ঞানীদের ভাষায় পরমাণু হলো কোন বস্তুর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম 'অন্তিম কণা' যা দিয়েই শুধু সেই বস্তুটি তৈরী। কোন বস্তু না-ব'লে আমরা বরং বলি কোন 'মৌলিক বস্তু'। কেন মৌলিক বস্তু বললাম একটু পরেই জানা যাবে। এক খন্ড লোহায় আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোটী কোটী অসংখ্য লোহার কণা। এই সব কণা লোহাই এক একটা পরমাণু। বাড়ী যেমন অসংখ্য ইঁট দিয়ে তৈরী, তেমনি তৈরী এক খন্ড লোহা অসংখ্য লোহার কণা বা লোহার পরমাণু দিয়ে। লোহা মৌলিক বস্তু। কেননা, লোহা তৈরী হয়েছে শুধু লোহা দিয়েই। কোন বস্তু শুধু সেই বস্তুর পরমাণু দিয়ে তৈরী হলে সেই বস্তুকে বলে মৌলিক বস্তু। সোণা, রূপো, তামা, পারদ সবই মৌলিক বস্তু। কেননা সোণার পরমাণু দিয়ে সোণা, রূপোর পরমাণু দিয়ে রূপো, তামার পরমাণু দিয়ে তামা, পারদের পরমাণু দিয়ে পারদ তৈরী হয়েছে।

কোন মৌলিক বস্তুকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পরমাণুতে আসা যাবে। কিন্তু পরমাণুকে আর ভাঙ্গা যাবে না। পরমাণু বা এ্যাটমকে ভাঙ্গা যাবে না ব'লেই এর নাম রাখা হয়েছে 'এ্যাটম' কেননা গ্রীক ভাষায় 'এ্যাটম' কথার অর্থই হচ্ছে 'যা আর ভাঙ্গা যায় না'। এই এ্যাটমের কল্পনা করেন গ্রীকপন্ডিত ডিমোক্রিটাস (Democritus)। সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। কিন্তু তারও আগে ভারতীয় মনীষী কণাদ বস্তুর অন্তিম কণা সম্পর্কে কল্পনা করেছিলেন। এই কণারই নাম কণাদ দিয়েছিলেন পরমাণু। পরমাণুর আগের অবস্থা অণু। অণু নামও কণাদের দেওয়া। অণু এবং পরমাণু সম্পর্কে এর আগে বোধ হয় আর কেউ কল্পনা করেন নি। কণাদ বলেছিলেন, পরমাণু অদৃশ্য, অবিভাজ্য, অনন্ত এবং অবিনশ্বর। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পরমাণু সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু 'মৌলিক বস্তু' সম্পর্কে গ্রীক এবং ভারতীয় পন্ডিতগণ যে কথা ব'লে গিয়েছিলেন সে-কথা মিথ্যায় পরিণত হয়েছে অনেক আগেই।

ভারতীয়রা বলেছিলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন এবং বাতাস

নিয়েই পৃথিবীর বস্তু জগৎ। এরাই আদি এবং অকৃত্রিম মৌলিক বস্তু। বস্তু জগৎ সম্পর্কে গ্রীক পন্ডিতগণও ভারতীয় মতবাদ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ল্যাভয়সিয়রের অক্সিজেন আবিষ্কারের ফলে আগুনের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া গেল। আগুন যে মৌলিক বস্তু নয় এ সবাই এখন জানে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস এবং বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়র প্রমাণ করলেন, জল কোন মৌলিক বস্তু নয়। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দু'টি গ্যাসীয় মৌলিক বস্তু দিয়েই জল তৈরী হয়েছে। একটি জলের অণুতে আছে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু। বাতাসও কোন মৌলিক বস্তু নয়। পাঁচ ভাগ বাতাসে আছে প্রায় চার ভাগ নাইট্রোজেন এবং প্রায় এক ভাগ অক্সিজেন।

এবারে মাটির কথা বলি। প্রাচীন কালে মাটিকে মৌলিক বস্তু বললেও তখনও কিন্তু জানা ছিল, সোনা, রুপো, তামা, লোহা, পারদ, সীসা প্রভৃতি মাটিতেই আছে। কিন্তু জানা ছিল না, এরাই আসলে মৌলিক বস্তু; মাটি নয়। শুধু মাটি কেন, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, মানুষ কিছুই কোন মৌলিক বস্তু নয়। একাধিক মৌলিক বস্তু দিয়ে তৈরী সব যৌগিক বস্তু। দিনের পর দিন এই সব মৌলিক বস্তুকে নিয়ে গবেষণা ক'রে বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করেছেন, মোট ৯২টি মৌলিক বস্তু আছে পৃথিবীতে। অবশ্য এখনও তিনটির সন্ধান তাঁরা কেউ পাননি, তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করেছেন মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানীদের এই অনুমান এতই নিখুঁত যে, বাকী তিনটির সন্ধান একদিন না একদিন পাওয়া যাবেই। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা একরকম নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, ৯২ টির বেশী কোন মৌলিক বস্তু এ জগতে নেই। ৯২ রকম মৌলিক বস্তুর আছে—৯২ রকম মৌলিক পরমাণু। পরমাণুগুলো এতই সূক্ষ্ম যে ওদের চোখে দেখা যায় না। অবশ্য একথা আগেও একবার বলেছি। তামার পরমাণুর কথাই ধরা যাক। এক ইঞ্চিমত লম্বা জায়গায় পাশাপাশি রাখলে দশ কোটী পরমাণু এঁটে যাবে। একটা আঙুর ফলে যে পরিমাণ পরমাণু রয়েছে তার প্রত্যেকটির ব্যাস যদি জাদুবলে এক ইঞ্চিমত করা যায়, তাহলে সেই ছোট আঙুর ফলটির আয়তন হবে বিরাট পৃথিবীর মত। পরমাণু যে কত সূক্ষ্ম তা আরো এক ভাবে কল্পনা করা যেতে পারে। একটি পিনের ক্ষুদ্র আগাতে যে পরিমাণ পরমাণু রয়েছে তারা যদি মানুষের মত বড় হতো, তাহলে সেই সব মানুষ দিয়ে গোটা পৃথিবী ভ'রে উঠতো।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় (Radio Active) কয়েকটি মৌলিক বস্তুর আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর অবিভাজ্যতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অধ্যাপক বেকারেল, ম্যাডাম কুরি, মঁসিয় কুরি প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ দেখলেন, তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে এক জাতীয় রশ্মি কণা দুরন্ত বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তেজ বিলিয়ে অন্য মৌলিক বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী যোসেফ জন টমসন পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নতুন এক তথ্য প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, পরমাণুর ভিতরে রয়েছে বিদ্যুৎধর্মী ইলেকট্রন (Electron) ও প্রোটন (Proton)। এদের বিদ্যুৎধর্ম পরস্পর বিপরীত। ইলেকট্রন পজিটিভ এবং প্রোটন নেগেটিভ বিদ্যুৎধর্মী। ইলেকট্রন নিয়ে বিজ্ঞানী টমসন এত বেশী মাথা ঘামিয়েছিলেন যে তিনি 'ইলেকট্রনের জনক' আখ্যা পেয়েছিলেন। এ হচ্ছে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

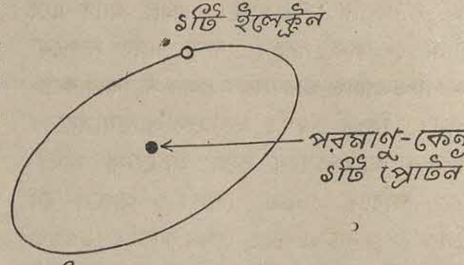
পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং বিজ্ঞানী নিল্‌স্‌ বোর আরো অনেক গবেষণা ক'রে আরো অনেক নতুন তথ্য দিয়ে গেলেন। তাঁরা দু'জনেই আজীবন বন্ধু ছিলেন। এক সঙ্গে গবেষণাও করেছিলেন দু'জনে। তাঁদের মতে একটা পরমাণুর প্রধান দু'টো অংশ। একটা ভিতরের আর একটা বাইরের। ভিতরের অংশে 'পরমাণু কেন্দ্র' বা 'পরমাণু-কেন্দ্রক' থাকে যাকে ইংরাজীতে (Nucleus) বলে। এই পরমাণু কেন্দ্রের বাইরে আছে ইলেকট্রন। একটা পরমাণুর ভিতর যেন বিরাট একটা সৌরজগৎ। পরমাণু-কেন্দ্র হচ্ছে সেই

সৌরজগতের সূর্য। আর এই সূর্য-রূপ পরমাণু-কেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে ইলেকট্রনগুলো বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে। এক একটা ইলেকট্রন যেন এক একটা গ্রহ। গ্রহগুলো যেমন সূর্য থেকে বহু দূরে আছে তেমনি ইলেকট্রনগুলোও পরমাণু-কেন্দ্র থেকে বহু দূরে দূরে ঘুরছে। সৌরজগতের মতই মাঝখানের জায়গা বিরাট ফাঁকা। সৌরজগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে যার ফলে গ্রহগুলো সৌরজগৎ থেকে পালিয়ে যেতে পারে না, তেমনি পরমাণু-কেন্দ্র ও ইলেকট্রনের মধ্যে পারস্পরিক একটা আকর্ষণ আছে। আকর্ষণ তো থাকবেই। কেন না, ইলেকট্রন নেগেটিভ বিদ্যুৎধর্মী আর পরমাণু কেন্দ্র পজিটিভ বিদ্যুৎধর্মী। বিপরীত বিদ্যুৎধর্মের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক।

একটা পরমাণু কেন্দ্রের ওজন ইলেকট্রনের ওজন অপেক্ষা ১৮৪০ গুণ বেশী। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গোটা একটা পরমাণুর অত্যন্ত কম জায়গা জুড়ে রয়েছে পরমাণু-কেন্দ্র; একশ হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ জায়গায়। কুড়ি হাজার পরমাণু-কেন্দ্র পাশাপাশি রাখলে মোট দৈর্ঘ্য হবে পরমাণুর ব্যাসের সমান। একটি পরমাণু যদি শুধু পরমাণু কেন্দ্র দিয়ে তৈরী হতো তাহলে এক নয়া পয়সার ওজন হতো প্রায় চার কোটী টন।

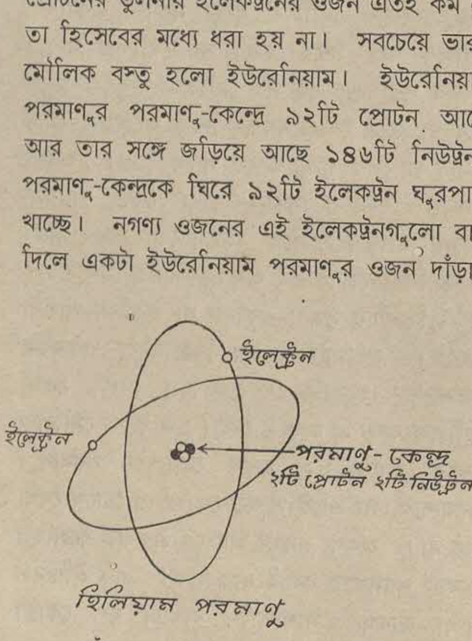
পরমাণু-কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের উপাদানকে বলে 'নিউক্লিরণ'। দু'রকম নিউক্লিরণ আছে নিউক্লিয়াসে। এক রকমের নাম 'প্রোটন' (Proton) আর এক রকমের নাম 'নিউট্রন' (Neutron)। এই নামগুলো দেওয়া বিখ্যাত পদার্থবিদ্ রাদারফোর্ডের। যখন তিনি নাম দিয়েছিলেন তখন তিনি নিউট্রন সম্পর্কে কল্পনা করেছিলেন মাত্র। নাম দেওয়ার ১২ বছর পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। প্রোটন পজিটিভ বিদ্যুৎধর্মী। নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎ-ধর্ম নেই। নিউট্রন নিউট্রাল (Neutral) বা উদাসীন।

সব চেয়ে হালকা মৌলিক বস্তু হলো হাইড্রোজেন। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর

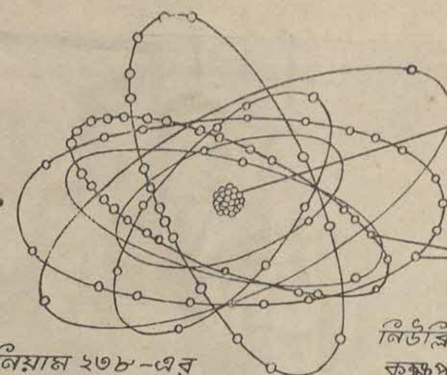


হাইড্রোজেন পরমাণু

পরমাণু-কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন আর তাকে ঘিরে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন। কোন নিউট্রন ওতে নেই। হাইড্রোজেনের পরের মৌলিক বস্তু হলো হিলিয়াম। হিলিয়াম পরমাণুর পরমাণু-কেন্দ্রে আছে দু'টি প্রোটন আর তাকে ঘিরে আছে দু'টি ইলেকট্রন। এ ছাড়া দু'টি প্রোটনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দু'টি নিউট্রন। নিউট্রনের ওজন এবং পরিমাণ প্রোটনের ওজন এবং পরিমাণের সমান। হিলিয়াম পরমাণুতে দু'টি প্রোটন এবং দু'টি নিউট্রন থাকায় ওর ওজন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন অপেক্ষা চার গুণ বেশী। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে শুধু একটি প্রোটন থাকায় ওর ওজন ধরা হয় এক। আগেই বলেছি, প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের ওজন এতই কম যে তা হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না। সবচেয়ে ভারী মৌলিক বস্তু হলো ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম পরমাণুর পরমাণু-কেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন আছে আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৪৬টি নিউট্রন। পরমাণু-কেন্দ্রকে ঘিরে ৯২টি ইলেকট্রন ঘুরপাক খাচ্ছে। নগণ্য ওজনের এই ইলেকট্রনগুলো বাদ দিলে একটা ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন দাঁড়ায়



হিলিয়াম পরমাণু



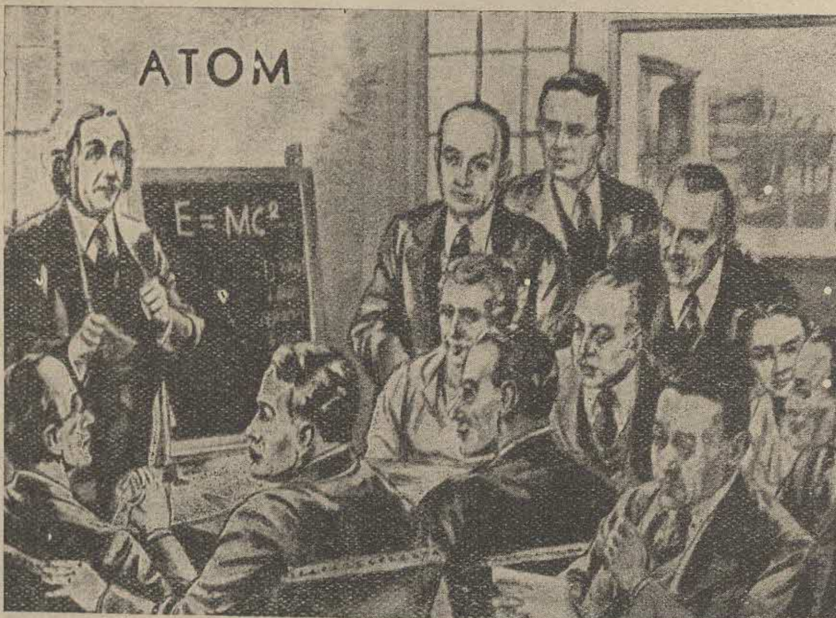
ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর
১টি পরমাণু

৯২+১৪৬=২৩৮। আরো এক জাতের ইউরেনিয়াম আছে। ওর পরমাণু-কেন্দ্রে আছে ১৪৬টির পরিবর্তে ১৪৩টি নিউট্রন। এজন্য এই জাতীয় ইউরেনিয়ামের ওজন হলো ৯২+১৪৩=২৩৫। অবশ্য এর পরিমাণ অত্যন্ত কম। অথচ এ্যাটম বোমা তৈরী করতে এই জাতীয় ইউরেনিয়ামই প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী আর কোন মৌলিক বস্তু নেই। মানুষ কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। তাই বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলিক বস্তুর পরমাণু-কেন্দ্রে আরো নিউট্রন আরো প্রোটন ঢুকিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ইউরেনিয়াম থেকেও আরো ভারী মৌলিক বস্তু তৈরী করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা থেকেই একদিন পরমাণু বোমা আবিষ্কারের সূত্র বেরিয়ে এল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে সবার আগে নাম করতে হয় বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইনের।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'শক্তি ও পদার্থ' সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করলেন তাতে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং শক্তিও পদার্থে পরিণত হতে পারে'। অথচ যুগ যুগ ধ'রে মানুষ জেনে এসেছে, শক্তি এবং পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পদার্থের আকার আছে, আয়তন আছে, ওজনও আছে। তাছাড়া অবস্থানের জন্য পদার্থের জায়গারও প্রয়োজন হয়। শক্তির না আছে আকার, না আছে আয়তন ওজনও নেই তার। শক্তি ধরা ছোঁয়া যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায়। শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ আছে। আর এই প্রকাশ পদার্থের ভিতর দিয়েই হয়। পদার্থ যেন শক্তির বাহন। শক্তির কোন বিনাশ নেই। এক শক্তি আর এক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। কিন্তু পদার্থের কোন রূপান্তর নেই। পদার্থের সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই; পদার্থ অবিনশ্বর। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা বললেন, পদার্থের রূপান্তর সম্ভব। কোন কোন তেজস্ক্রিয় বস্তু আপনা আপনিই ভেঙ্গে গিয়ে অন্য মৌলিক বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। পদার্থ যে শক্তিতে এবং শক্তি যে পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে, একথা প্রথম শুনে সবাই বিস্ময় বোধ করেছিলেন। শুধু রূপান্তরিতই নয়। পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হলে ওর খানিকটা ক্ষয়ও হয়। আরো আশ্চর্যের কথা, শক্তিরও কিছু-না-কিছু ওজন আছে। এসব কথা আমাদের অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেছেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন ব'লেই তাঁরা একদিন এ্যাটম বোমা তৈরী করবার প্রথম সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

'পদার্থ এবং শক্তি পরস্পর পরিবর্তনশীল'



এই মতবাদের প্রথম প্রবর্তক বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন—একথা স্বীকার ক'রেও বলতে হয়, এরকম একটা চিন্তাধারার প্রথম উল্লেখ ছিল জর্জ টমসনের বিজ্ঞান-বিষয়ক কাগজ-পত্রে। সে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কথা। টমসনের বয়স ছিল তখন মাত্র চব্বিশ বছর। তিনি লিখেছিলেন, 'পদার্থ এবং শক্তি একই'।

পদার্থ এবং শক্তি সম্পর্কে আইনষ্টাইনের সুবিদিত সূত্র হলো, পদার্থের মধ্যে বিপুল পরিমাণ তেজ সঞ্চিত আছে। পদার্থের ভর (mass) এর সঙ্গে আলোর গতিবেগের বর্গ গুণ করলে যত হয় তার সমান। গণিত শাস্ত্রের সাধারণ একটি অংকে দাঁড়ায়—

$$E = m \times c^2$$

অর্থাৎ শক্তি = পদার্থের ভর × (১৮৬০০০)²

= ভর × ১৮৬০০০ × ১৮৬০০০

[আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল]

এখন বোধ হয় অনুমান করা যেতে পারে, কত সামান্য পরিমাণ পদার্থের খরচে কত বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এক পাউন্ড কয়লাকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ১০ বিলিয়ান কিলোওয়াট-ঘন্টা শক্তি উৎপন্ন হবে। ১০ বিলিয়ানকে সংখ্যায় লিখলে দাঁড়ায় ১০০০০০০০০ ০০০০০। মাত্র ১০ পাউন্ড কোন পদার্থে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে তা দিয়ে গোটা একটা মাস ধ'রে সারা বিশ্বকে আলোকমালায় সাজিয়ে রাখা যাবে। বাংলা দেশকে আলো দেওয়ার জন্য এক মুঠো বালিই বোধ হয় যথেষ্ঠ। এই শক্তিরই প্রকাশ পরমাণু বোমায়। এখন সেই কথাই বলছি।

ইউরেনিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্রে বাইরে থেকে ইলেকট্রন বা নিউট্রন ঢুকিয়ে আঘাত করলে ভিতরে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হয়। ফলে ইউরেনিয়াম টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে যায়। ২৩৮ ওজনের ইউরেনিয়াম থেকে ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়ামের ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষমতা খুব বেশী। এজন্য

২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়ামই পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে ব্যবহার হয়। একথা অবশ্য আগেই বলেছি। ইউরেনিয়াম ভাঙ্গনের রহস্য জানতে পারার ফলেই পরমাণু বোমা আবিষ্কারের পথ সহজ হয়ে গেছে। ইউরেনিয়ামের দু'খন্ডে ভেঙ্গে যাওয়াকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'ফিশান' (Fission)। বাংলা ভাষায় একে 'ভাঙ্গন' বা 'বিভাজন' বলে। ফিশান বা বিভাজনের ফলে ইউরেনিয়াম দু'খন্ডে ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঙ্গা টুকরোগুলো ২০০০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের দুরন্ত বেগে ছুট দেয় এবং বিপুল শক্তির সৃষ্টি করে। ইউরেনিয়াম ভাঙ্গার এই বিপুল শক্তিই পরমাণু বোমার ভিতর আট্‌কে রাখা হয়। নানা জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে বোমার ভিতর এমন কৌশল করা থাকে যে, বোমাটি মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভিতরের ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং অপরিমিত শক্তির উদ্ভব হয়। একটি পরমাণু বোমার আঘাতে বাতাসের মধ্যে এক কোটী মণেরও বেশী চাপ এবং এক হাজার লক্ষ ডিগ্রী তাপের সৃষ্টি হতে পারে। ১০০ গ্রাম ইউরেনিয়াম ভরা একটি পরমাণু বোমা দশ লক্ষ লোকের একটি শহরকে মুহূর্তে পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

পরমাণু বোমা প্রথম ব্যবহার করে আমেরিকা। তবে জর্মাণদেশই বোধ হয় বোমা তৈরীর মূল সূত্র প্রথম খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু প্রথম পরমাণু বোমা কে তৈরী করেছিল সে-কথা এখনও জানা যায় নি। হয়তো আরো পরে একদিন জানা যাবে। পরমাণু বোমা তৈরীর রহস্য অনেক দেশের অনেক বিজ্ঞানীরই জানা আছে; কিন্তু বোমা তৈরী করা সব দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম কারণ, বিশেষ কয়টি দেশ ছাড়া সব জায়গায় ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় না। বেশী পরিমাণ পাওয়া যায় কানাডা, বেলজিয়াম, কংগো এবং চেকোশ্লেভাকিয়াতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, নরওয়ে, ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষেও কিছু কিছু পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ, ইউরেনিয়াম পাওয়া গেলেও ইউরেনিয়াম ভাঙ্গবার জন্য 'আঘাতকারী নিউট্রন' তৈরী করা সহজ নয়। তাছাড়া যে যে দেশ এই বোমা তৈরী করতে জানে, তারাও বোমা তৈরীর কার্যকরী পন্হা খুব গোপন রেখেছে। আরো একটি বড় কারণ, পরমাণু বোমা তৈরী করবার মত অর্থ সব দেশের নেই। ভারতবর্ষের তো নেই-ই।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট সেই অভিশপ্ত দিনটির কয়েকদিন আগেই জুলাই মাসের এক গভীর রাত্রে নিউ মেক্সিকোর আলমগার্ডের নির্জন প্রান্তরে খুব গোপনে প্রথম পরমাণু বোমা ফাটানো হয়। তারপর বিস্ফোরণ ঘটানো হয় হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে। এতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু আজো পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ কিছুমাত্র কমেনি। বরং পরমাণু বোমা থেকে শত শত গুণ বেশী শক্তি সম্পন্ন অন্য বোমাও তৈরী হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলো তার শক্তি নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত পরমাণু বোমার চেয়ে আটগুণ বেশী। বিজ্ঞানের ভাষায় ১৫ মেগাটন শক্তি সম্পন্ন।

পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে রাশিয়া পিছিয়ে নেই। হয়তো এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা থেকেও রাশিয়া এগিয়ে গিয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া আজ পর্যন্ত মোট ৩০ বার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। শেষবার ঘটালো ১৯৬১ সালের ৩০শে অক্‌টোবর। এর সাত দিন আগেও ২৩শে অক্‌টোবর ৩০ মেগাটন শক্তি সম্পন্ন পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে রাশিয়া। শেষবারের বোমাটি ৫০ মেগাটন অপেক্ষাও বেশী শক্তিশালী। রাশিয়ার উত্তর-মেরু অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৫০ মেগাটন ৫০ হাজার মিলিয়ান টন টি, এন, টি, শক্তির সমান। সংখ্যায় লিখলে দাঁড়ায় ৫০,০০০,০০০০০ টন টি, এন, টি। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমা বর্ষণ হয়েছিল তার থেকেও এই বোমা আড়াই হাজার গুণ বড়। এই বিস্ফোরণের আপাতঃ ফল কি হবে এবং দূর

ভবিষ্যতে এর পরিণতি কোথায় দাঁড়াবে এখন তা বলা শক্ত। হয়তো মানুষের বংশধর ক্লীবে পরিণত হবে কিংবা হয়তো তারা বিকলাঙ্গ হয়েই জন্ম গ্রহণ করবে।

এবারে বোধ হয় আমেরিকার পালা। রাশিয়া কর্তৃক ৫০ মেগাটনের বোমা ফাটানোর পরেই আমেরিকা ঘোষণা করেছে যে, তারা 'মৃত্যু রশ্মি' নিউট্রন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবে। নিউট্রন বোমাকে সংক্ষেপে বলে 'এন-বম্ব'। এন-বম্ব বিস্ফোরিত হলে মুহূর্তে অদৃশ্য ও অননুভূত নিউট্রন-কণা রশ্মির আকারে বেরিয়ে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুকে হত্যা করবে। এতে বস্তু জগতের কিছুই ধ্বংশ হবে না। সংহারলীলার এই পদ্ধতি এতই নীরবে ঘটবে যে, সব কিছুই লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকবে। হাইড্রোজেন বোমার আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে প্রস্তুতি চলছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে নিউট্রন বোমার সৃষ্টিতে। আগামী দিনে মানুষের ভাগ্যে কি আছে আগামী দিনের মানুষ জানবে।

হিরোশিমার ট্রাজেডির সেই অভিশপ্ত দিনটিকে কেউ কেউ বলেছেন 'আলবার্ট আইনষ্টাইনের কৃষ্ণ দিবস'। শোনা যায় সেদিন নাকি এই অসাধারণ মানুষটি সাধারণ মানুষের মত হতাশায় ভুরু কুঁচকে মাথার রগ চেপে ধ'রে ব'সে পড়েছিলেন। এ কাহিনী সত্য হোক বা না-হোক, কিন্তু একথা সত্য যে, পরমাণু-কেন্দ্রের উপর মানুষের জয়লাভের ইতিহাসটা বিয়োগ-ভারাক্রান্ত এবং বেদনাদায়ক। কিন্তু মানুষ আশাবাদী। পরমাণুর শক্তি সংহারের কাজে ব্যয় না হয়ে একদিন-না-একদিন সংগঠনের কাজে ব্যয় হবে, এ বিশ্বাস মানুষের আছে। জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে সে কাজ শুরুও হয়ে গেছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে পরমাণুর কাহিনী মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভরা। আজকের 'অশুভ পরমাণু' খুব শিগগির পরিণত হবে 'শুভ পরমাণুতে'। আজকের কিশোর-কিশোরী সেই শুভ পরমাণুর দৌলতে অফুরন্ত সুখ ভোগ করবে আগামী দিনে।

● ● ●

শতাধিক বছর আগে প্রাউট নামে একজন ব্রিটিশ রসায়ন বিদ ইঙ্গিত করেছিলেন যে হাইড্রোজেন এ্যাটম হ'ল একমাত্র উপাদান যা দিয়ে ভারি এ্যাটমরা গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এ্যাটম-ভার যখন সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হতে থাকল তখন দেখাগেল যে, সব ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল প্রাউটের কল্পনার সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে স্যাডুইকের আবিষ্কারের পর থেকে আমাদের ধারণার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটল। আমরা এখন জানলাম যে, অনেক প্রকার নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে পাওয়া যায় এক রকমের কণিকা, যার ভর একটি হাইড্রোজেন ভরের খুব কাছাকাছি, কিন্তু যার কোন আধার নেই। এই নতুন কণিকার নাম দেওয়া হল নিউট্রন। নিম্নলিখিত অনুমিতি দিয়ে একটা নিউক্লিয়েসের ভর ও তার অন্যান্য বৈশিষ্ঠ্যের হিসাব দেওয়া যায়—

(ক) নিউক্লিয়সে আছে একত্র পজিটিভ-আধান আর তার চারিদিকে কাছাকাছি খোলায় ইলেক্‌ট্রনরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা ও তাদের বন্টনের উপর,

(খ) প্রতিটি নিউক্লিয়স দু'রকমের কণিকা দিয়ে গঠিত, প্রোটন (ভর 1.008 আধান I) আর নিউট্রন (ভর 1.009, আধান 0) সমগ্র এ্যাটমিক ভর নিউক্লিয়সের অবস্থিত প্রোটন নিভয়নের ভরের সমষ্টি সংৎষ যে ব্যাতিক্রম দেখা যায় তারও কারণ সীমায়িত রয়েছে।

(গ) এ্যাটমের রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে নিউক্লিয়সে অবস্থিত পজিটিভ অধ্যানের পরিমাণের উপর, আর তা আসছে এতে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা হতে। ['প্রবাসী' ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ—বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিদ্যার অগ্রগতি—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৬৭ পৃষ্ঠা]



"ওই যে অনেক—অনেক দূরে, একেবারে সব চেয়ে উঁচুতে সাদামত কি একটা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে ওটা কি মা?"

উত্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে একটি পাহাড়ী শের্পা বালক তার মাকে এই প্রশ্ন করল।

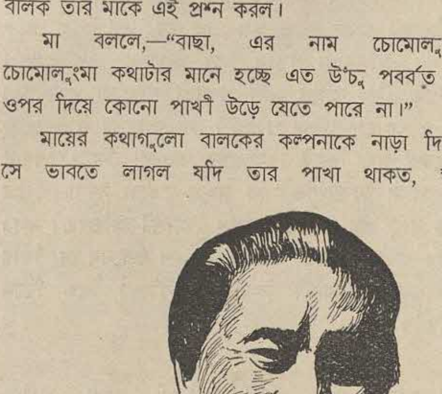
মা বললে,—"বাছা, এর নাম চোমোলুংমা। চোমোলুংমা কথাটার মানে হচ্ছে এত উঁচু পর্ব্বত যার ওপর দিয়ে কোনো পাখী উড়ে যেতে পারে না।"

মায়ের কথাগুলো বালকের কল্পনাকে নাড়া দিলে। সে ভাবতে লাগল যদি তার পাখা থাকত, আর চোমোলুংমার একেবারে মাথার ওপর সে উড়ে চলে যেতে পারত!

এই শের্পা বালকটিরই নাম তেনজিঙ্গ নোরকে। আজ তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। এভারেস্ট-বিজয়ী দুঃসাহসী অভিযাত্রীরূপে আজ তাঁর পৃথিবীজোড়া খ্যাতি।

নেপালের শোলো খুম্বুতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তেনজিঙ্গ-এর জন্ম হয়। এখানেই পাথরে তৈরী একটা দোতলা ঘরে বাপ মা আর বারোটি ভাইবোনের সঙ্গে কাটে তাঁর শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলি। ছোটবেলায় তাঁর কাজ ছিল পাহাড়ের উপর চমরী গরু চরানো। গরুর পাল নিয়ে বালক তেনজিঙ্গ রোজই চলে যেত ১৮,০০০ ফুটেরও উঁচুতে, গ্লেসিয়ার বা তুষার-প্রবাহের ধারে। গরুগুলি যখন পর্ব্বতের ঢালু জায়গায় চরে বেড়াত, এই ছোট ছেলেটি তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরমালার দিকে। মাকালু, লোৎসে, নাপৎসে, আমা দাবলাম, গৌরীশঙ্কর, চো ওইয়ু, এবং নাম-না-জানা আরো শত শত হিমাদ্রি-শিখর তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত। কিন্তু তার মনকে সব চেয়ে বেশী টানত হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ চোমোলুংমা। ইতিমধ্যে ১৯২১, '২২ এবং '২৪ সালে পাশ্চাত্ত্য থেকে পর পর এসেছে তিনটি অভিযাত্রী দল। সেগুলিতে ভারবাহী হিসেবে যোগদানকারী শের্পাদের নিকট তেনজিঙ্গ জানতে পারল, আকাশছোঁয়া যে-শিখরটির নাম চোমোলুংমা তাকে সাহেবরা বলে এভারেস্ট।

ক্রমে বালক তেনজিঙ্গ কৈশোরে পা দিলে। কয় বৎসর ধরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্রমাগত এভারেস্ট দেখতে দেখতে তার মনে একটি স্বপ্ন বাসা বাঁধল—হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু এই চূড়ায় আরোহণের



তেনজিঙ্গ

স্বপ্ন। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলে একদিন না একদিন সে গিয়ে উঠবে ঐ তুষার-চূড়ায়। শৈশবের উদ্ভট কল্পনাকে জীবনে সার্থক করে তুলতে বদ্ধপরিকর হল কিশোর শের্পা তেনজিঙ্গ।

এই এভারেস্ট অভিযানের সুযোগ তেনজিঙ্গ-এর নিকট এসে উপস্থিত হল ১৯৩৫ সালে। সে কথা পরে বলছি। তার আগে চোমোলুংমার নাম কেন হল এভারেস্ট সেকথা এবং ১৯৩৫ সালের আগে পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে যে সকল অভিযাত্রী দল পর পর এভারেস্ট অভিযানে এসেছিল তাদের সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

১৮৫২ সালের কথা। তখন হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল জরীপ করা হচ্ছে। এক দিন সকালবেলা সার্ভে ডিপার্টমেন্টের এক জন কর্ম্মচারী হন্তদন্ত হয়ে সার্ভেয়ার জেনারেলের ঘরে গিয়ে উপস্থিত, আনন্দে তিনি যেন ফেটে পড়ছেন। সার্ভেয়ার জেনারেলকে সম্বোধন করে তিনি বললেন,—"মহাশয়, আমি পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা নিরূপণ করেছি।" এই কীর্ত্তিমান্ বাঙালী গণিতজ্ঞের নাম রাধানাথ শিকদার। রাধানাথের এই গণনা নির্ভুল বলে প্রমাণিত হল এবং তখনকার সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে এই গিরিশৃঙ্গের নামকরণ হল—মাউন্ট এভারেস্ট, এর উচ্চতা ২৯০০২৮ ফুট—পৃথিবীতে এর চেয়ে উঁচু পর্ব্বতের চূড়া আর নেই।

১৯০৭ সাল থেকেই পাশ্চাত্ত্যের পর্ব্বত অভিযান-কারীদের মধ্যে এভারেস্ট অভিযানের জল্পনা কল্পনা সুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ১৯২১ সালে আরম্ভ হয় তাঁদের হিমালয় অভিযান। কিন্তু একথা অনেকেরই জানা নেই যে, এর অনেক আগে উনিশ শতকের শেষ দশকেই (১৮৯৫ খৃঃ) মামেরি নামে জনৈক জর্ম্মান নাঙ্গা পর্ব্বত অভিযান করেন। গিরিচূড়ায় আরোহণের চেষ্টা তাঁর অবশ্য সফল হয় নি।

১৯২১ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ একত্রিশ বৎসর ধরে পাশ্চাত্ত্যের অভিযাত্রীরা বারবার চেষ্টা করেছেন এভারেস্ট-শিখরে আরোহণের জন্যে। কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের উদ্যম। এভারেস্ট বিজয়ের সংকল্প তাঁদের কার্য্যে পরিণত হয় নি সত্য, কিন্তু কর্নেল হাওয়ার্ড, বেরিং, ব্রুস, রাট্‌লেজ, টিল্‌ম্যান প্রমুখ নেতাদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে গিরি-অভিযানের ইতিহাসে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মানুষের দুর্জ্জয় সাহস এবং অনমনীয় দৃঢ় সংকল্পের কাছে হার মানতে হল প্রকৃতিকে—১৯৫৩ সালে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হলেন দুই জন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী—নেপালী শের্পা তেনজিঙ্গ এবং নিউজীল্যান্ডের এড্‌মন্ড হিলারী। বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর এঁদের এই এভারেস্ট বিজয়ের কাহিনী।

১৯৩৫ সাল। জন্মপল্লী পরিত্যাগ করে তেনজিঙ্গ অবস্থান করছেন দার্জ্জিলিঙে। তখন তিনি একুশ বৎসর-বয়স্ক তরুণ, এভারেস্টের প্রতি আকর্ষণ তাঁর হয়ে উঠেছে দুর্নিবার। দার্জিলিঙে শের্পাদের আড্ডায় বিদেশীদের হিমালয় অভিযানের গল্প শুনতে শুনতে তাঁর রক্তে দোলা লাগে। শুধু একটি কথাই সকল সময়ে মনে জাগে—কবে তাঁর আবাল্যপোষিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে, কবে তিনি এভারেস্টে আরোহণ করতে, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে পৌঁছতে সমর্থ হবেন।

এমনি সময়ে ইংরেজ অভিযাত্রী এরিক শিপ্‌টন ভারতে এলেন হিমালয় অভিযানের উদ্দেশ্যে। এই অভিযানে অন্যান্য শের্পাদের মতই ভারবাহীরূপে যোগদান করবার জন্যে নির্ব্বাচিত করা হল তেনজিঙ্গকে। ষাট পাউন্ড বোঝা পিঠে নিয়ে, বুট-পায়ে এভারেস্ট-বিজয়ের পথে সেই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। এই অভিযাত্রী দলটি ২২,০০০ ফুটের কিছু উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিল, বোঝা পিঠে তেনজিঙ্গ শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন তাদের সহযাত্রী।

এই অভিযান সাফল্যমন্ডিত হল না বটে, কিন্তু তেনজিঙ্গের পরম লাভ হল এই যে, এর পর থেকে হিমালয় অভিযানে তিনি হয়ে উঠলেন অপরিহার্য্য। ব্রিটিশরা তাঁকে ভূষিত করল সরকারী 'শার্দ্দূল' পদবীতে। ১৯৩৫-এর পর থেকে পরবর্ত্তী কয় বৎসরের মধ্যে শুধু এভারেস্ট নয়, বিরাট হিমালয়ের অন্যান্য উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণের উদ্দেশ্যেও সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে বহু বার ভারতে এসেছে বিদেশী অভিযাত্রী দল। তাঁদের অনুগামী হয়ে তেনজিঙ্গ প্রমাণ করলেন যে, গিরি অভিযানের সহযোগী হিসাবে শের্পাদের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়।

সতেরো বছর পরে। ১৯৫২ সালে একদিন তেনজিঙ্গের কাছে এই অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ এসে পৌঁছল যে, সুইজারল্যান্ডের অভিযাত্রীরা এভারেস্ট অভিযানের এক নূতন পরিকল্পনা করেছেন এবং তাঁকে তাঁরা চান শের্পাদের সর্দ্দাররূপে।

তেরো জন শের্পাকে বাছাই করে নিয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে গিয়ে অভিযাত্রী দলের সঙ্গে মিলিত হলেন তেনজিঙ্গ। চীনা কম্যুনিষ্টরা তখন পাশ্চাত্ত্যের লোকদের নিকট তিব্বতের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, তাই সুইসদের এবারকার অভিযান উত্তর দিক থেকে নয়, দক্ষিণ দিক থেকে নেপালের ভেতর দিয়ে।

এই দলের নেতা ছিলেন বহু বার আল্‌পস্‌বিজয়ী রেমন্ড ল্যাম্বার্ট। দুর্গম পথের এই সহযাত্রীর সঙ্গে

তেনজিঙ্গের গড়ে উঠল বিশেষ হৃদ্যতা এবং প্রীতির সম্পর্ক।

২২শে এপ্রিল অভিযাত্রীদল ১৬,৫৭০ ফুট উঁচুতে খুম্বু গ্লেসিয়ারের উপরে শিবির সংস্থাপন করলেন। ঠিক তাঁদের মাথার উপরে, উত্তর দিকে গ্লেসিয়ারের প্রান্ত-সীমা রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে তুষার এবং বরফের বিরাট প্রাচীর। ইতিপূর্বে এখানে এসেই অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হয়ে এরিক শিপটন এভারেস্ট বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে সদলবলে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হন।

এবার এখান থেকে সুরু হল আবার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা। খানিক দূর এগোবার পর সামনেই পড়ল এক প্রকান্ড তুষার-ফাটল। এক তরুণ সুইস নেমে গেলেন ষাট ফুট নীচে একটি সমতল তুষার-স্তরের উপরে, বহুকষ্টে তিনি ওপারে গিয়ে পেঁছিলেন। তৈরী হল দড়ির পুল। তার উপর দিয়ে পশ্চিম 'সি-ডব্ল্যু-এম'-এ * এসে পেঁছিল অভিযাত্রী দল, এই দুর্গম স্থানে ইতিপূর্বে কোনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।

পশ্চিম সি-ডব্ল্যু-এম-এর ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ্বে আরোহণ করতে লাগল অভিযাত্রী দল। উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থানে তাঁবু ফেলতে ফেলতে অবশেষে তারা এসে থামল ২৭,৫০০ ফুট উঁচুতে। স্থির হল এখান থেকে আর সবাই ফিরে যাবেন, থাকবেন শুধু ল্যাম্বার্ট এবং তেনজিঙ্গ।

সেই অত্যুচ্চ স্থানে শীত এত প্রচন্ড যে, রাত্রে শিবিরে শুয়ে অভিযাত্রীদ্বয়ের মনে হল বুঝি শীতে জমে গিয়ে তাঁরা মারা যাবেন। সারা রাত তাঁরা দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। পরদিন ভোরে আবার তাঁদের যাত্রা সুরু হল। অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে তাঁরা কূর্ম্মগতিতে উপরে উঠতে লাগলেন। হঠাৎ অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে উঠল আবহাওয়া, বায়ু-তাড়িত বরফ তাঁদের সারা গায়ে প্রচন্ড আঘাত হানতে লাগল। এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তেনজিঙ্গ আর ল্যাম্বার্ট যে, তাঁরা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলেন। তার পর এক জায়গায় এসে থামলেন। আর চলবার ক্ষমতা নেই। নিশ্বাস নিতে তাঁদের কষ্ট হচ্ছিল, তার চেয়েও মারাত্মক—তাঁদের চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে।

এভারেস্টের ২৮,২৫০ ফুট উঁচুতে এসে পেঁছেছেন অভিযাত্রীদ্বয়। হিমালয়ের শীর্ষতম স্থানের এত কাছাকাছি আর কেউ কখনো আসেনি, এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীতে আর কেউ কখনো এত উচ্চ স্থানে আরোহণ করেনি। ইচ্ছা করলে, এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আরো উপরে উঠতে পারতেন তেনজিঙ্গ এবং ল্যাম্বার্ট। কিন্তু এভাবে জেনে শুনে মরণের মুখে এগিয়ে যাওয়ার চাইতে ফিরে আসা-ই সমীচীন বলে তাঁদের মনে হল।

১৯৫৩ সালের শরৎকালে তেনজিঙ্গ এবং ল্যাম্বার্ট আবার যাত্রা করলেন এভারেস্ট বিজয়ের উদ্দেশ্যে। প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠবার পর সুরু হল প্রচন্ড শীতের আক্রমণ—তাপাঙ্ক শূন্যেরও ৩০ ডিগ্রি নীচে, বাতাস বইতে লাগল ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে। অগত্যা এবারও প্রত্যাবর্ত্তন করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর রইল না।

অজানার আকর্ষণ দুর্গম পথের অভিযাত্রী তেনজিঙ্গকে বার বার বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায় তাঁর সংসারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থেকে। দার্জ্জিলিঙের তুসুং বস্তীতে স্ত্রী আংলহ্মা আর দুই কন্যা নীমা ও পেমপেম এই কয়টি মাত্র প্রাণী নিয়ে তাঁর ছোট্ট পরিবার। তা ছাড়া আছে আরো একটি পোষ্য—লাসা থেকে আনা খাঙ্গার নামে একটি প্রিয় কুকুর। তেনজিঙ্গ যখন দীর্ঘ-দিনের জন্যে ঘরছাড়া হন তখন তাঁর স্ত্রীকন্যার উদ্বেগের আর পরিসীমা থাকে না।

ল্যাম্বার্টের সঙ্গে দ্বিতীয় বার হিমালয় অভিযানের পরে তেনজিঙ্গ ফিরে এসেছেন আপন ঘরে। তাঁদের সংসারটি আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে আনন্দ-কলরবে। এমনি ভাবে দিন কাটছিল, হঠাৎ দেখা দিল বিপর্য্যয়। গুরুতর অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তেনজিঙ্গ। একই বৎসরে দুই দুইটি বড় অভিযানের ধকলই তাঁর এই অসুস্থতার কারণ। সুইস অভিযাত্রীরা এক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। তিন সপ্তাহ সেই হাসপাতালে থেকে আরোগ্যলাভ করে তিনি গৃহে ফিরে এলেন।

দেখতে দেখতে ১৯৫২ সাল কেটে গেল। এল গিরি অভিযানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ১৯৫৩ সাল।

ইতিমধ্যে দুইটি সুইস্ হিমালয় অভিযানের সুবাদে ল্যাম্বার্টের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক তুষার-শার্দ্দূল তেনজিঙ্গ-এর নামও ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। পাশ্চাত্যের নানা দেশ থেকে চিঠি আসছে তাঁর কাছে। একটি চিঠিতে ছিল কর্ণেল জন হান্টের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত এভারেস্ট অভিযানকারী দলের সঙ্গে সর্দ্দার হিসাবে হিমালয়ে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ। এই দলে ব্রিটিশ পর্ব্বতারোহীদের সঙ্গে থাকবেন নিউজীল্যান্ডের এডমন্ড হিলারী যিনি ১৯৫২ সালের চো ওইয়ু অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ছিলেন।

তেনজিঙ্গের অসুখ তখন সেরেছে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা পুরোপুরি কাটেনি। তা সত্ত্বেও এই পত্র তাঁকে চঞ্চল করে তুলল। পরপর ছয় বার ব্যর্থ হয়েছে

* গিরিপৃষ্ঠে পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উপত্যকা-ভূমিকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে বলা হয় cwm.

তাঁর এভারেস্ট-বিজয়-প্রচেষ্টা। এবার এসেছে নূতন অভিযাত্রী দলের আহবান। এ ডাকে সাড়া দিতেই হবে। এই সপ্তম প্রচেষ্টাকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবেন না তিনি। ব্রিটিশরা এভারেস্ট জয় করবে আর তিনি থাকবেন না তাদের সঙ্গে—এমনটি তো হতেই পারে না।

এবার এভারেস্ট বিজয়ের চিন্তা যেন তাঁকে পাগল করে তুলল; সব সময় থাকেন অন্যমনস্ক, রাত্রে ঘুম হয় না বললেই চলে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে তিনি অভিযাত্রী দলকে সম্মতি জানালেন।

কিন্তু বিভ্রাট উপস্থিত হল যখন তিনি কথাটা পাড়লেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। এবারকার মত তাঁকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করবার জন্যে কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন আংলুহ্মা। বললেন, "তুমি অত্যন্ত দুর্বল, যদি চলে যাও তাহলে আবার তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে অথবা বরফের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে মারা যাবে। বড্ড বেশী ঝুঁকি নাও তুমি। আমার এবং মেয়েদের জন্যে মোটেই ভাবো না। তুমি যদি মারা যাও তা হলে কি গতি হবে আমাদের?"

তেনজিঙ্গ জবাব দিলেন—"এ তোমার ভুল ধারণা। তোমার এবং মেয়েদের কথা নিশ্চয়ই আমি ভাবি। কিন্তু এভারেস্টের মাথায় চড়া এ হল আমার আসল কাজ—আমার জীবনের স্বপ্ন। তোমার ঘরগৃহস্থালির কাজে আমি তো কৈ বাধা দিই না, তেমনি এটাও আমি চাই না যে, আমার এভারেস্ট যাওয়ার ব্যাপারে কেউ বাধা দেয়। আর মরতেই যদি আমাকে হয় তা হলে আমি বরং এই ঘরের মধ্যে না মরে এভারেস্টের কোলেই মরব।"

আংলুহ্মা যখন দেখলেন যে, স্বামী তাঁর সংকল্পে অবিচলিত তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বেশ, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক্।"

এবার বাছা বাছা কুড়ি জন শের্পা নিয়ে ভারবাহী দল গঠন করলেন তেনজিঙ্গ। যাত্রার দিন ঘনিয়ে এল। বিদায়ের প্রাক্কালে এক বন্ধু দিলেন তাঁকে একটি ছোট ভারতীয় পতাকা যথাস্থানে পুঁতবার জন্যে। ছোট্ট মেয়ে নীমা তার অতি সাধের লাল-নীল পেন্সিলটি তেনজিঙ্গের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—"বাবা, এভারেস্টের চূড়োয় ওঠে এটা ওখানে বরফের নিচে পুঁতে দিয়ো। কেমন আমার কথা রাখবে তো!"

"আচ্ছা মা, নিশ্চয়ই রাখবো তোমার কথা," বলে স্ত্রী-কন্যার নিকট বিদায় নিয়ে দার্জিলিঙ্গ ছেড়ে কাঠমান্ডুর পথে পা বাড়ালেন তেনজিঙ্গ। সে দিনটি ছিল ১৯৫৩ সালের ১লা মার্চ।

এই অভিযাত্রী দলের ডাঃ চার্লস আর মিঃ গ্রেগরী লন্ডন থেকে সরাসরি বিমানে নয়াদিল্লীতে এসে পৌঁছেছিলেন এর দিনকতক আগে ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, দলের নেতা কর্নেল হান্ট আসেন আরো দিনকতক পরে।



এডমন্ড হিলারী

এভারেস্টের শীর্ষদেশে আরোহণ-প্রচেষ্টার জন্য দলের নেতা হান্ট নির্বাচিত করলেন আরো তিন জনকে। এঁরা হচ্ছেনঃ ডাঃ চার্লস ইভান্স, টম বুর্দিলোঁ এবং এন্ডমন্ড হিলারী। হিলারী বহু বার উঠেছেন নিউজীল্যান্ডের তুষারাবৃত শিখরদেশে, গিরি আরোহণে বিস্ময়কর নৈপুণ্য তাঁর। স্থির হল এভারেস্ট বিজয়ে তেনজিঙ্গ এবং হিলারী হবেন পরস্পরের সহযাত্রী।

প্রায় দু' সপ্তাহ অবিশ্রান্ত হেঁটে অভিযাত্রীরা এসে পৌঁছলেন কাঠমান্ডু থেকে ১৭০ মাইল দূরবর্ত্তী নামচে-বাজারে। আরো উপরে থায়াংবক মঠে পৌঁছবার পর কর্নেল হান্ট প্রথম তাঁবু স্থাপন করলেন। স্থির হল শেষ তাঁবু স্থাপিত হবে সাতাশ থেকে আটাশ হাজার ফুটের মধ্যবর্ত্তী কোনো এক জায়গায়।

থায়াংবক থেকে তাঁবু গুটিয়ে অভিযাত্রীরা আরো দুদিন অবিরাম চড়াই উতরাই ভেঙে যেখানে এসে পৌঁছলেন সে হল অনন্তপ্রসারিত তুষাররাজ্য। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৩,০০০ হাজার ফুট উঁচুতে নাপসে, লোৎসে আর এভারেস্ট—হিমালয়ের এই তিনটি চূড়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে আছে, বিখ্যাত পশ্চিম 'কম' বা তুষারখাত।

এবার সুরু হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী শীর্ষদেশে আরোহণ-পর্ব্ব। স্থির হল যে, বুর্দিলোঁ আর ইভান্স জনকতক শের্পা এবং কর্নেল হান্ট সহ প্রথমে যাবেন দক্ষিণ 'কল'* পর্য্যন্ত। এবং তার একদিন পরে যখন

তাঁরা এভারেস্টের চূড়োয় উঠবার জন্যে চেষ্টা করবেন তখন জর্জ্জ লো, আলফ্রেড্ গ্রেগরী আর আট জন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে তেনজিং এবং হিলারী যাবেন উক্ত 'কল'-এ। দক্ষিণ 'কল' থেকে এভারেস্টের শীর্ষদেশের দূরত্ব ৩,৩০০ ফুট। বুর্দ্দিলোঁ এবং ইভান্সের জন্যে এই ব্যবধানের মাঝখানে কোনো তাঁবু স্থাপন করা হবে না। এমতাবস্থায় একদিনের মধ্যে শীর্ষদেশে গিয়ে যদি তাঁরা ফিরে আসতে পারেন তা হলে সে হবে এক অত্যাশ্চর্য্য এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

কিন্তু যদি তাঁরা লক্ষ্যস্থলে পেঁছিতে না পারেন তখন আসবে তেনজিঙ্গ এবং হিলারীর পালা। তাঁদের জন্যে কিন্তু শিখর-পৃষ্ঠের (summit ridges) উপরে স্থাপন করা হবে নয় নম্বর শিবির। সেখান থেকে সুরু হবে তাঁদের অসাধ্যসাধনের চূড়ান্ত প্রয়াস।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ২৩শে মে বুর্দ্দিলোঁ এবং ইভান্স সি-ডব্লু-এম-এর দিকে রওনা হলেন এবং পরদিবস তাঁদের অনুগামী হলেন তেনজিঙ্গ ও হিলারী। 'কলে' পেঁছিবার অনতিকাল পরে তাঁরা দেখলেন কর্নেল হান্ট এবং শেরপা দা নামগিয়াল নেমে আসছেন গড়ানে তুষারাস্তীর্ণ গিরিগাত্রের উপর দিয়ে। কাছে এলে দেখা গেল কর্নেল এবং তাঁর সহযাত্রী ক্লান্তিতে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তেনজিঙ্গ আর হিলারীকে কর্নেল বললেন যে, তাঁরা ২৭,৩৫০ ফুট পর্য্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। সেখানে তাঁদের জন্যে খাবার এবং সাজ-সরঞ্জামাদি রেখে এসেছেন। তার মধ্যে আছে কতকগুলো 'অক্সিজেন ট্যাংক' যা তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন উপরে উঠবার সময়। অক্সিজেন ছাড়া নামার দরুনই তাঁদের অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এত কাহিল।

কর্নেলকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যে তেনজিঙ্গ তাঁকে খেতে দিলেন উষ্ণ লেমন জুস, তার পর তাঁকে শুইয়ে রাখলেন একটি তাঁবুর ভিতরে।

অতঃপর কলের সেই নিরানন্দ নিভৃত নির্জ্জনতায় বুর্দ্দিলোঁ এবং ইভান্সের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন হিলারী ও তেনজিঙ্গ।

ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হিলারী আর তেনজিঙ্গ দেখেন ঢালু তুষারগাত্রের উপর দিয়ে নেমে আসছে দুটি মূর্ত্তি। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ত্বরিতপদে এগিয়ে গেলেন হিলারী এবং তেনজিঙ্গ। বুর্দ্দিলোঁ আর ইভান্সের অবস্থা তখন শোচনীয়—তাঁরা কথা বলতে পারছেন না, এমন কি চলৎশক্তি পর্য্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে।

না, শীর্ষদেশে পেঁছিতে পারেননি তাঁরা, তবে যেখানে আজ পর্য্যন্ত যেতে পারেনি কোনো মানুষ সেই 'সাউথ সামিটে' অবশ্য উঠেছিলেন—কিঁন্তু সেই সীমা অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি. তাঁদের পক্ষে। ২৮,০০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন বুর্দ্দিলোঁ আর ইভান্স।

ব্যর্থকাম হলেন বটে এই দুই অভিযাত্রী, কিন্তু এঁদের কাছ থেকে অনুগামীদ্বয় লাভ করলেন অমূল্য উপদেশ।

এভারেস্ট অভিযানের এই সকল সহযাত্রীদের সহানুভূতি এবং সহৃদয়তার কথা স্মরণ করে, তেনজিঙ্গ বলেছিলেন—"এমনিভাবেই পর্ব্বত মানুষকে করে মহৎ। এঁদের সকলের কাজ ও ত্যাগের জন্যেই হিলারী এবং আমার পক্ষে শীর্ষস্থানে আরোহণ করবার পথ সুগম হয়েছিল।"

দশ জন অভিযাত্রী সে রাত কাটালেন কলের ওপরে তিনটি তাঁবুতে শুয়ে। পরদিন খুব ভোরে হিলারী এবং তেনজিঙ্গের যাত্রা করবার কথা। কিন্তু রাতের অন্ধকার না কাটতেই কলের উপর নিয়ত প্রবহমান ঝটিকার বেগ যেন বহুগুণ বর্দ্ধিত হল, ভোরের আলো যখন ফুটল তখন মনে হল যেন সহস্র বাঘ একসঙ্গে গর্জ্জন করছে।

এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে রওনা হওয়া সম্ভবপর হল না সেদিন।

দ্বিতীয় রাত্রিতেও সেই একই অবস্থা।

তার পরের দিন ২৮শে মে। গত বৎসর ঠিক এই তারিখেই এভারেস্ট বিজয়ের জন্যে শেষ চেষ্টা করেছিলেন তেনজিঙ্গ আর ল্যাম্বার্ট। সে চেষ্টা তাঁদের ফলবতী হয়নি সত্য, কিন্তু কে জানত যে, এই ব্যর্থতার মধ্যেই নিহিত ছিল ভাবী সার্থকতার বীজ।

বেলা আটটা নাগাদ শান্ত হল ঝড়ের বেগ। পরস্পরের পানে তাকালেন হিলারী এবং তেনজিঙ্গ। উভয়েই ঘাড় নাড়লেন সম্মতিসূচক ভাবে। অর্থাৎঃ "প্রাণতীর্থে চলো মৃত্যু করো জয় শ্রান্তিক্লান্তিহীন।"

নয়টার কিছু আগে জর্জ লো, আলফ্রেড গ্রেগরী এবং শেরপা আঙ্গনীয়িমা রওনা হলেন চল্লিশ পাউন্ড বোঝা এবং শ্বাসক্রিয়ার জন্যে অক্সিজেন সহ। তুষারে ধাপ কেটে কেটে এগিয়ে চললেন তাঁরা, আর ঘন্টাখানেক পরে ঐ পথেই পঞ্চাশ পাউন্ড বোঝা সহ তাঁদের অনুগামী হলেন তেনজিঙ্গ আর হিলারী। দুপুর নাগাদ পূর্ব্ব-গামী দলের সঙ্গে এসে তাঁরা মিলিত হলেন। বেলা দুটোর সময় একটা খাড়া পাহাড়ের পার্শ্বদেশে তাঁবু ফেলা হল। এখানে হিলারী এবং তেনজিঙ্গের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর তিন সঙ্গী নীচে নেমে গেলেন।

সেখানে, সেই ২৭,৯০০ ফুট উচ্চ স্থানে রইলেন শুধু দুইজন—তেনজিঙ্গ আর হিলারী, লক্ষ্য তাঁদের এভারেস্টের শীর্ষদেশ। এবার তাঁদের কাজ হল শিবির

* পর্ব্বতমালার মধ্যেকার নিম্নভূমিকে ইংরেজীতে বলা হয় 'কল'। 'কল' কথাটার মানে গিরিসংকটও বটে।

সংস্থাপনের জন্য পাহাড়ের ওপর একটি সমতল জায়গা তৈরি করা। অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কাজ করে তাঁবু খাটাতে সমর্থ হলেন অভিযাত্রীদ্বয়।

হিমালয়ের এত উচ্চ স্থানে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো মানুষের তৈরী শিবির সংস্থাপিত হয় নি।

২৯শে মে—এই দিনটি হিলারী এবং তেনজিঙ্গের এভারেস্ট আরোহণের শেষ দিন। সকালবেলা সাড়ে ছ'টার সময় তাঁবুর বাইরে এসে তাঁরা দেখেন—আকাশে সুনির্ম্মল প্রসন্নতা—প্রভাতের অজস্র আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত।

যাত্রা শুরু করবার আগে মুখোমুখি দাঁড়ালেন দু'জনে। প্রত্যেকের হাতে তিন তিন জোড়া করে দস্তানা, পায়ের বুটের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছেন শিকওয়ালা 'ক্রাম্পন', পিঠে ঝোলানো চল্লিশ পাউন্ড ওজনের অক্সিজেন সরবরাহের যন্ত্রপাতি। তেনজিঙ্গের কুড়ুলের গায়ে আঁট করে জড়ানো রাষ্ট্রপুঞ্জের এবং গ্রেট ব্রিটেন, নেপাল ও ভারত এই তিনটি দেশের জাতীয় পতাকা।

যেখানে তাঁবু ফেলা হয়েছিল সে জায়গা থেকে দক্ষিণপূর্ব্ব দিককার পর্ব্বতগাত্রের পথ ধরে এগিয়ে চললেন তাঁরা সাউথ সামিটের দিকে। যথাস্থানে পৌঁছে সাউথ সামিটের ঠিক নিম্নদেশে তুষার কেটে তারা একটা বসবার মত জায়গা করে নিলেন। ইতিমধ্যে প্রায়-পুরো অক্সিজেনের বোতলটি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, আছে মাত্র আর একটি পুরো বোতল। হিলারী হিসেব করে দেখলেন যে, এতে চলতে পারে আর মাত্র সাড়ে চার ঘন্টা।

এখানকার পর্ব্বতপৃষ্ঠ প্রথম যখন কুঠারের আঘাতে বিদীর্ণ হল তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন হিলারী, তুষার এখানে স্ফটিকবৎ এবং দৃঢ়। কুঠার দিয়ে দুটি কিংবা তিনটি ঘা মারলেই এত প্রকান্ড ধাপ তৈরী হয় যে, পায়ে অতিকায় বুটজুতো পরাসত্ত্বেও বেশ স্বচ্ছন্দ-ভাবে তার উপর অবস্থান করা যেতে পারে। সদ্যকর্ত্তিত ধাপগুলোর উপর দিয়ে একজন আগে একজন পেছনে—এই ভাবে তাঁরা এগোতে লাগলেন। অভিযাত্রীদ্বয় উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এই অত্যুচ্চ স্থানে প্রতি-মুহূর্ত্তে তাঁদের চরম বিপত্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান, কাজেই চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁদের ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে হবে। স্থির হ'ল, হিলারী যখন ধাপ কাটবেন তখন তেনজিঙ্গের কাজ হবে তুষারের ভিতরে একটি লোহার পেরেক * বসানো।

তার পর হিলারীর পালা। তিনি তাঁর জুতোয় লাগানো শ্যাফ্‌ট † তুষারের ভেতর বসিয়ে একটি দড়ি তার গায়ে জড়িয়ে দেবেন আর সেইটে অবলম্বন করে তেনজিঙ্গ চলে আসবেন তাঁর কাছে। তার পর আবার যখন তেনজিঙ্গ পেরেক পুঁতবেন তখন ধাপ কাটতে থাকবেন হিলারী।

এমনি ভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার পর এমন এক প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হলেন অভিযাত্রীদ্বয় যা সব চেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বলে তাঁদের নিকট প্রতীয়মান হল। ঠিক সামনেই চল্লিশ ফুট উঁচু খাড়া একটি শৈল-সোপান (rockstep)। থায়াংবক থেকে বাইনোকুলারের সাহায্যে এই শৈল-সোপানটি তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু এর একেবারে সামনাসামনি এসে উভয়েই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। দুর্গম পথ অতিক্রমণের জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার দরুন শক্তি তাঁদের নিঃশেষিত-প্রায়। এমত অবস্থায় এই বাঁধা জয় করা কি সম্ভব তাঁদের পক্ষে!

এই প্রতিবন্ধ কেমন করে অতিক্রান্ত হল হিলারীর জবানিতেই তা বলা যাক্ ঃ

"এর পূর্ব্বদিকে ছিল আর একটা প্রকান্ড তুষার-কার্নিস। এবং কার্নিসের ভিতর দিয়ে ঐ তুষার-শৈলের একেবারে পুরো চল্লিশ ফুট উঁচু অবধি ছিল একটি সংকীর্ণ ফাটল। তেনজিঙ্গকে পেরেক পুঁতবার জন্যে নীচে রেখে আমি ঢুকে পড়লাম ঐ ফাটলের মধ্যে। এবং আমার ক্র্যাম্পন-এর দ্বারা পেছন দিকে লাথি মেরে পেরেকগুলো জমাটবাঁধা তুষারের বেশ খানিকটা গভীরে বসিয়ে দিলাম। সেই শৈলের প্রত্যেকটি ছোট ফ্যাঁকড়া আঁকড়ে ধরে এবং হাঁটু, কাঁধ ও বাহুদ্বয়ের সমস্ত শক্তি সংহত করে আমি ফাটলে পেরেক বিদ্ধ করলাম আর একান্ত মনে শুধু এই প্রার্থনাই করতে লাগলাম কার্নিস যেন ধবসে না পড়ে যায়। যদিও এই দুরূহতম প্রয়াসে মারাত্মক পরিশ্রম হচ্ছিল তথাপি আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নি। অবশ্য খুব মন্থর গতিতেই আমরা এগোচ্ছিলাম। ওদিকে যথাসময়ে যথাস্থানে দড়ি চালান করে দিলে তেনজিঙ্গ আর একটু একটু করে উপরের দিকে উঠতে লাগলাম আমি এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই শৈলের একেবারে শীর্ষদেশে আরোহণ করতে সমর্থ হলাম। তারপর সেই ফাটলের ভেতর থেকে এক প্রশস্ত জায়গায়ে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে গেলাম। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আবার যাতে স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারি সেজন্যে কয়েক মুহূর্ত্ত মড়ার মত তুষার-আস্তরণের উপরে শুয়ে রইলাম। এবং সেই প্রথম আমি অনুভব করলাম যে, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে শীর্ষ-দেশে আরোহণের সংকল্প থেকে। পাহাড়ের গায়ে গ্যাঁট

---

*এই পেরেকে বাঁধা অথবা জড়ানো থাকে একটি দড়ির টুকরো। ঐ দড়ির সাহায্যে আরোহী উপরে উঠবার চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ, যেখানে পা রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে ঊর্দ্ধে আরোহণের এই হল একমাত্র পন্থা। ইংরেজীতে একে বলে belaying।

† দীর্ঘ সরল ও সূক্ষ্মাগ্র লৌহদন্ড।

হয়ে বসে তেনজিঙ্গকে উপরে আসবার জন্যে ইশারা করে আমি দড়ি নীচে ফেলে দিলাম আর তা-ই অবলম্বন করে ফাটলের উপর দিয়ে উপরে উঠতে লাগল তেনজিঙ্গ এবং শেষ পর্য্যন্ত শীর্ষদেশে এসে কিছুক্ষণ একেবারে মুমূর্ষুর মত পড়ে রইল। কোনো অতিকায় মাছকে প্রচন্ড তাড়নার পর সাগর থেকে ডাঙায় তুলে আনলে পর সে যেমন খাবি খেতে থাকে—তেনজিঙ্গের তখনকার অবস্থাও হল অনেকটা সেই রকম।"

কিন্তু একটু পরেই ধাতস্থ হলেন তেনজিঙ্গ এবং হিলারীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। হিলারী যখন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কেমন আছেন, তখন মৃদুভাবে একবার মাত্র হাসলেন।

পর্ব্বতগাত্রের রূপ যথাপূর্ব্বং—ভীষণ-রমণীয়। ডানদিকে অতিকায় কার্নিসসমূহ, আর বাঁয়ে গড়ানে শৈলগাত্র একেবারে সরাসরি নেমে গেছে বহু নিম্নে। তুষারের সংকীর্ণ ফালির ওপর দিয়ে ধাপ কেটে চলেছেন হিলারী। গিরিগাত্র বেঁকে গেছে ডান দিকে, এভারেস্টের শীর্ষদেশ যে কোথায় সে সম্বন্ধে অভিযাত্রীদের কোনো ধারণাই নেই। একটা গিরিপৃষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে হয় তো ধাপ কাটা হল, সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল সামনে তারও চাইতে উচ্চতর আর একটা পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। সময় বয়ে চলেছে, এদিকে অভিযাত্রীদ্বয়ের মনে হচ্ছে যেন এই গিরিপৃষ্ঠের কোথাও আর শেষ নেই। কিন্তু থামবার উপায় নেই, পাহাড়ের গায়ে হানো কুঠারের প্রচন্ড আঘাত, কাটো ধাপের পর ধাপ আর এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। হিলারীর মনে হয় এই সোপান-পথ তৈরির পালা চলবে বুঝি অনন্ত কাল ধরে।

হিলারী বুঝতে পারলেন এ ভাবে ধাপ কাটা পন্ডশ্রম মাত্র, তখন চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে নূতন ভাবে কাজ সুরু করবার কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে, সুমুখের গিরিপৃষ্ঠ একঘেয়ে ভাবে উপরে ওঠার পরিবর্ত্তে খাড়া ভাবে নীচের দিকে নেমে গেছে—দূরে বহু নিম্নে 'নর্থ কল' এবং রংবাক গ্লেসিয়ার দৃশ্যমান। উপরের দিকে তাকিয়ে হিলারী দেখেন একটি সংকীর্ণ তুষারময় গিরিপৃষ্ঠ গিয়ে মিশেছে পিরামিডাকৃতি একটি তুষার-শিখরের গায়ে। ঠন্ ঠন্ শব্দে কঠিন তুষারের উপর পড়ল কুঠারের আরো কয়েকটি প্রচন্ড আঘাত—তার পরেই দুই বীর এসে দাঁড়ালেন এভারেস্টের শীর্ষস্থানে। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা।

শেষ পর্য্যন্ত বিজিত হল এভারেস্ট, তার নিষ্কলঙ্ক অভ্রভেদী শুভ্র শিরে প্রথম পড়ল দুটি অসমসাহসী মানুষের পদচিহ্ন।

পৃথিবীর সেই সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করে অনাবিল আনন্দে এবং বিমল আত্মপ্রসাদে হিলারী এবং তেনজিঙ্গের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, তাঁরা পরস্পরের করমর্দ্দন করলেন, তেনজিঙ্গ তাঁর বাহুদুটি দিয়ে হিলারীর কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দের আতিশয্যে পরস্পরের পিঠে তারা ঘন ঘন এত জোরে চপেটাঘাত করতে লাগলেন যে, উভয়েরই প্রায় দমবন্ধ হবার উপক্রম।

আনন্দের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে দুজনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রজতধারায় পরিস্নাত হিমাদ্রিশীর্ষ, আকাশ ঘন নীল, এমনিতরো নিবিড় নীলিমা ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর কোনো মানুষের দৃষ্টিকে এমন ভাবে মুগ্ধ করে নি। তিব্বতের দিক থেকে ভেসে-আসা মৃদুমন্দ বাতাস অভিযাত্রীদ্বয়ের দেহে যেন অমৃতপরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। যেদিকেই তাঁকান তাঁরা সেদিকেই দৃশ্যমান হয় নেপাল এবং তিব্বতের ভেতর দিয়ে হিমালয় পর্ব্বতমালার অনন্ত প্রসার—নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করলে তবে নজরে পড়ে বিরাটকায় লোৎসে, নাপৎসে এবং মাকালুর শিখরদেশ। এই ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের তুলনা বুঝি মর্ত্ত্যলোকে নেই।

এভারেস্টের চূড়োয় দাঁড়িয়ে হিলারী তাঁর সঙ্গে করে আনা ক্যামেরায় তুললেন তেনজিঙ্গ-এর ছবি।

যে চারিটি পতাকা সঙ্গে করে এনেছিলেন সেগুলি এভারেস্টের চূড়োয় পুঁতলেন তেনজিঙ্গ। ছোট্ট মেয়ে নীমার অনুরোধও ভোলেন নি তিনি। পতাকাগুলির পাশে চিরতুষারের বুকে স্থান পেল তার সেই লাল-নীল পেন্সিলটি।

আন্দাজ মিনিট পনেরো এভারেস্টের চূড়োয় কাটিয়ে নিজেদের তৈরী পথেই আবার নীচে নামতে লাগলেন তেনজিঙ্গ আর হিলারী। চার নম্বর শিবিরে পৌঁছে অভিযানের নেতা কর্নেল হান্ট এবং দলের অন্যান্যদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন তাঁরা। লোএর মুখে প্রচারিত হল এভারেস্ট-বিজয়-বার্ত্তা। আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হয়ে অভিযাত্রীরা পরস্পরকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করতে লাগলেন। হিমালয়ের ইতিহাসে এর আগে বোধ করি আর কখনো এমন উত্তেজনাপূর্ণ অনাবিল আনন্দ-দৃশ্যের অবতারণা হয় নি। পর পর এগারো বার ব্যর্থ হয়েছে এভারেস্টের শীর্ষদেশে আরোহণ-প্রচেষ্টা—এবারকার এই দ্বাদশ অভিযান হল সাফল্যমন্ডিত। আনন্দের বান ডেকে গেল যেন হিমাদ্রিবক্ষে সংস্থাপিত শিবিরের উপর দিয়ে।

৫

এভারেস্ট-বিজয়-পর্ব্ব সম্পন্ন হল বটে, কিন্তু একমাত্র অন্নপূর্ণা (২৬,৪৯২ ফুট) ছাড়া অন্যান্য অভ্রভেদী হিমাদ্রি-শিখর তো তখনো বিজিত হয় নি। পৃথিবীর দশটি উচ্চতম গিরি-শৃঙ্গই হিমালয়ে। তন্মধ্যে একমাত্র অন্নপূর্ণার শিখরে উঠেছিল ফরাসী দল ১৯৫০ সালের জুন মাসে।

এভারেস্ট বিজয়ের পর সুরু হল হিমালয়ের অন্যান্য আটটি অবিজিত শিখরদেশে আরোহণের তোড়জোড়। ঐ

বৎসরই জুলাই মাসে জার্ম্মাণ অভিযাত্রী দল আরোহণ করল নাঙ্গা পর্ব্বতের (২৬,৬৬০) শীর্ষতম স্থানে।

পরের বছর, (১৯৫৪, জুলাই) ইটালীয় অভিযাত্রী দল কর্ত্তৃক বিজিত হল K² (গডউইন অষ্টিন, ২৮,২৫০ ফুট), আর অক্টোবর মাসে অষ্ট্রিয়ান দল আরোহণ করল চো ওইয়ুর (২৬,৭৫০) চূড়ায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার (২৮,১৪৬) শীর্ষদেশে গিয়ে উঠল ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল ১৯৫৫ সালের মে মাসে। ঠিক সমকালে ফরাসী দলের মাকালু শিখরে (২৭,৭৯০) আরোহণ-প্রয়াস সাফল্যমন্ডিত হল।

১৯৫৬ সালের মে মাসে এক সুইস পর্ব্বত-আরোহী দল এসে প্রথম জয় করল লোৎসে গিরিশৃঙ্গ (২৭,৮৯০), অতঃপর পৃথক দুটি দল উঠল এভারেস্টের চূড়ায়। ঐ বৎসর জুন মাসে জাপানীরা মানাস্‌লু শিখরে (২৬,৬৫৮) উঠে পাশ্চাত্ত্যের অভিযাত্রীদের ন্যায় গৌরবের অধিকারী হল।

হিমালয় অভিযানের ব্যাপারে ভারতবাসীও আজ পিছিয়ে নেই। হিমালয়ের বুকে গিরি আরোহণ শিক্ষাদানের জন্যে স্থাপিত হয়েছে শিক্ষণকেন্দ্র—এর ভার-প্রাপ্ত উপদেষ্টা এবং প্রধান শিক্ষাদাতা তেনজিঙ্গ। ভারতীয় দলের 'মানা' অভিযান ব্যর্থ হয়েছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে যে তাঁদের প্রয়াস সার্থক হবে সে বিষয়ে আশা পোষণ করবার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান। কেননা ইতিপূর্ব্বে তাঁরা নন্দা ঘুন্টির উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ এই চার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিযাত্রী দল কর্ত্তৃক পর পর হিমালয়ের আটটি শৃঙ্গ বিজিত হয়েছে—বাকী রয়েছে শুধু একটি ধৌলাগিরি বা ধবলাগিরি (২৬,৭৯৫ ফুট)। উচ্চতায় হিমালয়ের শৃঙ্গসমূহের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করলেও ঐটি কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম ও দুরধিগম্য। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশিখরসমূহের মধ্যে একমাত্র এটিই রয়েছে অনারূঢ়। অল্প কালের ব্যবধানে এই শৃঙ্গ প্রতিরুদ্ধ করেছে ফরাসী, সুইস এবং আর্জেন্টিনীয় অভিযান। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর এভারেস্টের মাথায় মানুষ উঠতে সক্ষম হলেও, আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ধৌলাগিরি। হিমালয়-জয়ের পালা শেষ হবে সেইদিন যেদিন মানুষের সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে ব্যর্থ হবে অভ্রভেদী ধবলাগিরির প্রতিরোধশক্তি। হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে আরো একটি অধ্যায় লিখিত হবে আগামী দিনে যখন তিব্বত থেকে উত্তর দিককার পুরনো রাস্তা ধরে অভিযাত্রীরা অগ্রসর হবে এভারেস্টের উদ্দেশে।

কোন দেশের মানুষ অপরাজেয় ধবলাগিরিকে নতি স্বীকার করাবে, কারাই বা উত্তর দিক থেকে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে তেনজিঙ্গ এবং হিলারীর ন্যায় পথিকৃতের গৌরব অর্জ্জন করবেন, আজ তা কে বলতে পারে?

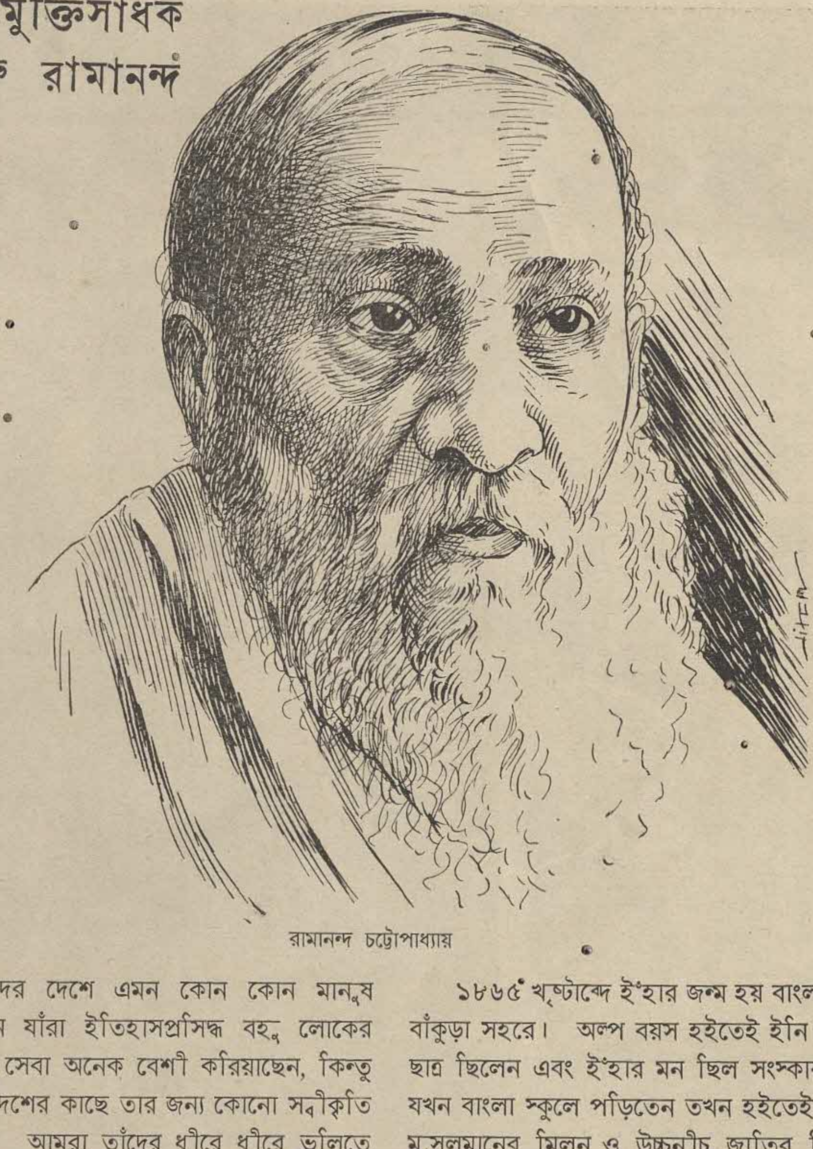
আমার বাড়ীর নিকটেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম কোথা হইতে আসিয়াছ নদী। নদী সেই পুরাতন সুরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে?" শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষার মন্ডিত গিরিশৃংগ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্ম্মাচল নামক পুরাণ দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে চলিতে চলিতে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দন্ডয়মান। দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, বহু দূর প্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্প বৃষ্টি করিতেছে। শিখর তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। নিম্নমুখে নন্দা দেবী ও ত্রিশূল এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবলোকিত হইবে।—

কুমায়ুনের উত্তরে দই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

—জগদীশ চন্দ্র বসু

ভারত মুক্তিসাধক রাষ্ট্রগুরু রামানন্দ



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে এমন কোন কোন মানুষ জন্মিয়াছেন যাঁরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহু লোকের চেয়ে দেশ সেবা অনেক বেশী করিয়াছেন, কিন্তু দেশের বা দশের কাছে তার জন্য কোনো স্বীকৃতি পান নাই। আমরা তাঁদের ধীরে ধীরে ভুলিতে বসিয়াছি।

এই রকম একজন মানুষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ ইঁহার কাছে অনেক দিকে ঋণী। কিন্তু তিনি নিজেকে যথা সম্ভব অন্তরালে রাখিয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁকে ভাল করিয়া চেনে নাই। তাঁর বিনয় গুণ তাঁর খ্যাতির অন্তরাল রচনা করিয়াছিল। তিনি নিজেকে সর্বদা পিছনে রাখিতে চাহিতেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় বাংলাদেশের বাঁকুড়া সহরে। অল্প বয়স হইতেই ইনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ইঁহার মন ছিল সংস্কারমুখী। যখন বাংলা স্কুলে পড়িতেন তখন হইতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও উচ্চনীচ জাতির মিলনের অঙ্কুর তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই কারণে বাল্যে তাঁকে মাঝে মাঝে শাস্তি ভোগ করিতে হইত। স্কুলের ক্লাশে তাঁর সহপাঠি এক ছুতোরের ছেলে তাঁর পাশে বসিত। একদিন ছুতোরের ছেলেটির পিঠটা হঠাৎ সুড় সুড় করিয়া ওঠাতে সে বন্ধুকে বলিল, 'ওহে, আমার পিঠটা একটু চুলকিয়ে দাও না।' নিরীহ ব্রাহ্মণ বালক পিঠ চুলকাইতে সুরু করিতেই সেই বন্ধু বৎসলের পিঠে মাষ্টার মশায় দিলেন সজোরে



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক চড়। "কি, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুই ছুতোরের ছেলের পিঠ চুলকোবি?"

এই বালক বাঁকুড়া জেলা স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া ২০্ টাকা বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসেন। দশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ও বৃত্তি পাইয়া পড়াশুনায় স্বাবলম্বী হন। কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও ছাত্র সমাজের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ স্থাপিত হয়। তিনি ছাত্র সমাজ বিষয়ে নিজেই বলিয়াছেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির নিকট আমাদের যৌবন কালের হৃদয় মনের জাগৃতির জন্য গভীর ভাবে ঋণী।"

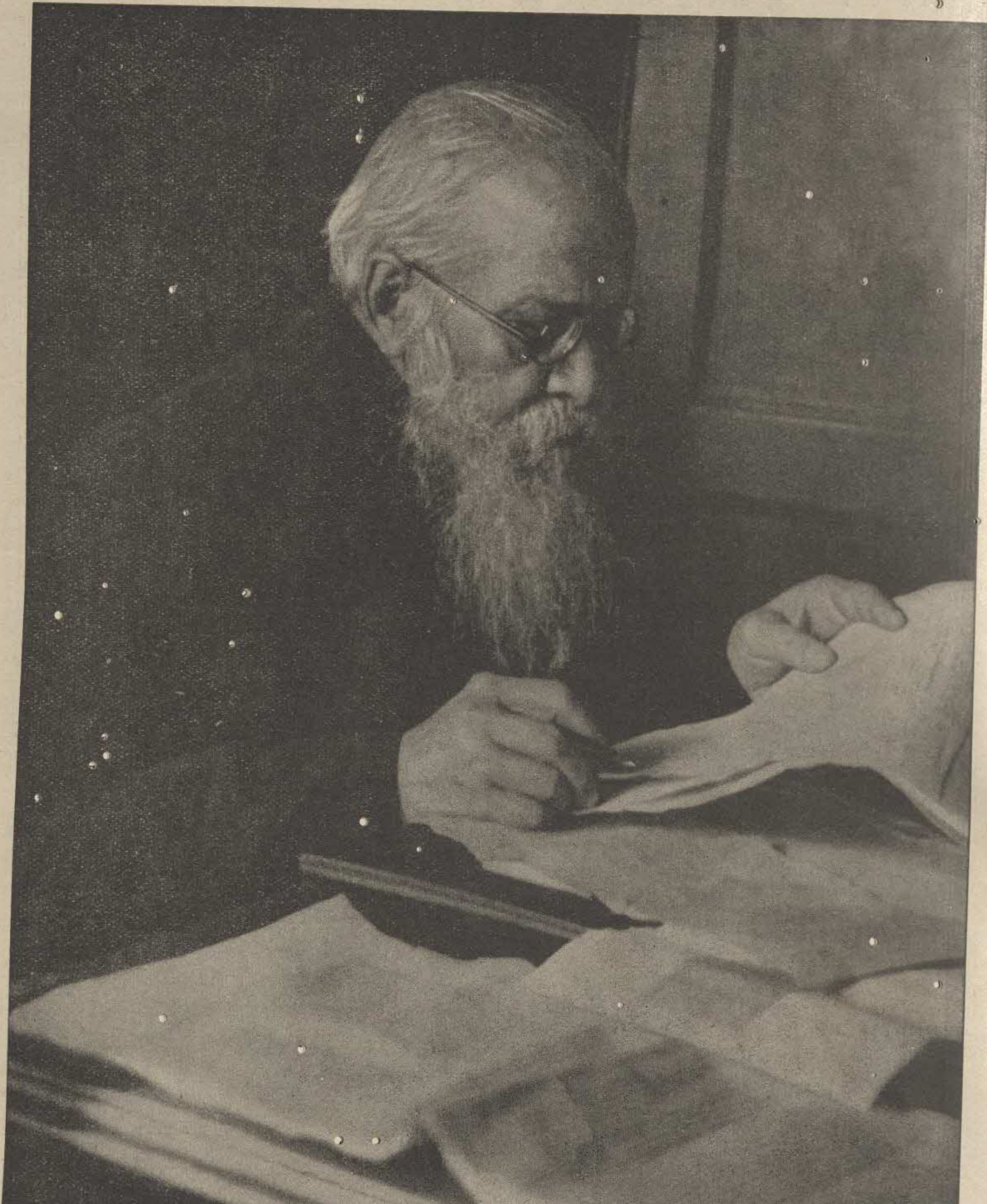
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বি· এ· পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পাশ করার পর তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক হন এবং পরে এম· এ· পাশ করেন। এই সময় হইতেই তিনি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য কাজে জড়িত হন। ক্লিষ্ট মানবের সেবার জন্য তখন ব্রাহ্ম-সমাজের কয়েকটি যুবক "দাসাশ্রম" স্থাপন করেন। পথ হইতে অসহায় রোগীদের কুড়াইয়া আনিয়া এখানে ভদ্র সন্তানেরা তাহাদের সেবা করিতেন। যাঁরা সেবা করিতেন তাঁরা নিজেদের 'দাস ও দাসী' বলিতেন। রামানন্দ দাসাশ্রমের সভাপতি হন এবং তাহার আর্থিক সাহায্যের জন্য 'দাসী' পত্রিকা পরিচালনা করেন। এই সময় তিনি আরও অনেকগুলি ইংরাজী ও বাংলা পত্রিকা সম্পাদনে সাহায্য করেন।

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অর্থ লইবেন না এবং তাহাদের চাকরী করিবেন না বলিয়া তিনি সরকারী বৃত্তি পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করেন; বিলাত যাইয়া আই· সি· এস· হইবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বৃত্তি না লওয়াতে তাঁর আত্মীয় স্বজন সকলে দুঃখিত হন।

অল্পদিন পরে তিনি এলাহাবাদ 'কায়স্থ পাঠশালা কলেজের' প্রিন্সিপ্যাল হইয়া সেখানে চলিয়া যান। তৎপূর্ব্বে বাংলা ও ইংরাজী নানা কাগজে তিনি লিখিতেন, শিশুদের জন্য 'মুকুল' কাগজ প্রকাশ করিতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি সাহায্য করেন এবং এলাহাবাদ আসার পর সচিত্র প্রদীপ পত্রিকা প্রকাশ করেন (ইং ১৮৯৭ ডিসেম্বর)। প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়া বাংলাদেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "প্রথম যখন রামানন্দ বাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগ্‌ল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয়নি।"

এই সময় তাঁহার প্রদীপ মাসিক পত্র জগতে অনেকগুলি নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেন। রামানন্দ কেবল বাংলা মাসিক 'প্রদীপ'ই প্রকাশ করেন নাই। তিনি এলাহাবাদ বাঙালী ও অবাঙালী সমাজে নবযুগ আনয়ন করেন। শিক্ষা, জনসেবা, জ্ঞান বিতরণ, রাজনৈতিক চিন্তার জাগরণ ও সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণ প্রভৃতি সকল কাজেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁর একটা বিশেষ কাজ ছিল প্রবাসী বাঙালীদের দৃষ্টি নিজ মাতৃভাষার ও দেশের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা। তিনি তাদের সংঘবদ্ধ করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেন। তাঁরই উদ্যোগে এলাহাবাদে কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীপঞ্চমীর সময় বাঙালী সম্মিলন হইয়াছিল। এই আন্দোলন বাঙালীদের মধ্যে জীবন স্পন্দনের যেরূপ সঞ্চার করিয়াছিল পরে আর তেমন দেখা যায় নাই। প্রবাসী বাঙালীদের বাৎসরিক মিলন ভারতের নানা স্থানে পরে হইত, ইহার মূলেও তিনি ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রিকায় বহু প্রবাসী বাঙালীর গৌরবময় জীবন-কথা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি না সংগ্রহ করাইলে এগুলির চিহ্ন থাকিত না। প্রবাসী বাঙালীদের ইতিহাস উদ্ধারের ইচ্ছায় এই জাতীয় প্রবন্ধের জন্য তিনি প্রবাসীতে চারিটি পদক পুরস্কার প্রথম বৎসরেই ঘোষণা করেন।

স্বদেশী শিল্পোন্নতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি বঙ্গভঙ্গের বহু পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট মিলের কাপড়ের উপর একটা ডিউটি বসান। তাহার প্রতিবাদকল্পে এলাহাবাদে কয়েকজন যুবক একটি স্বদেশী কাপড়ের দোকান



সম্পাদক রামানন্দ

খোলেন। রামানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। এই ডিউটি স্থাপনের পর তিনি কখনও বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করেন নাই। বঙ্গভঙ্গের পর নানা ভাবে স্বদেশী ও স্বদেশের সেবায় তিনি আরোও গভীর ভাবে নিযুক্ত হন।

বাংলা ১৩০৮ সালে (১৯০১ খৃঃ) তিনি সুবিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙালীকে বলশালী করা, নিজ শক্তিতে বিশ্বাসী করা ও তাহার সকল কর্ম্মে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কালে এই প্রবাসী কেবলমাত্র মাসিক পত্রিকা ছিল না বাংলা ও ভারতের চিন্তা জাগরণ চেষ্টায় সম্পাদক প্রতি মাসে স্বয়ং লিখিয়া ইহাতে যাহা প্রকাশ করিতেন তাহাকে এক একটি পুস্তিকা বলা চলে।

'প্রবাসী'-র পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার একজন গুণগ্রাহী বলেনঃ "জীবনের নানা দিকে বাঙালী গত পঁচিশ বছরের মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন তার সব চেয়ে পূর্ণ পরিচয় এক 'প্রবাসী'ই দিতে পারে। এক কথায় বাঙালীর কলেবর বা সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে আছে এক এই 'প্রবাসী'র দর্পণে।"

মাসিক পত্রিকা পরিচালনার দ্বারা তিনি দেশকে যে জ্ঞান ও চিন্তারাজ্যে উন্নীত করিয়াছিলেন তাঁহার অনুকরণে প্রকাশিত অন্য কোনো পত্রিকা পরে সেই আদর্শে পৌঁছাইতে পারে নাই। এক সময় ছিল যখন ভারতের ও বাংলার চিন্তাশীল মানুষেরা প্রতিমাসে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রকাশের আশায় উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, না জানি শিক্ষা ও রাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে কি নূতন চিন্তার ধারা তিনি এবার প্রবাহিত করিবেন। কিশোর ও যুবকেরাও 'প্রবাসী'র মুখ চাহিয়া থাকিত। তাহারা তাঁহাকে জনগুরু মনে করিত। আজকার দিনে যাঁরা খ্যাতনামা তাঁরা প্রবাসীর এই ঋণ এখনও স্বীকার করেন। জগতের জ্ঞান, চিন্তা ও শিল্পভান্ডার হইতে তিনি যে নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়া যুব সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, তখনকার দিনে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেই শিক্ষা সংগ্রহের কোনও সুযোগ সুবিধা ছেলেদের ছিল না। তাই তিনি ছিলেন সে-যুগের যুবকদের শিক্ষাগুরু। বাংলা ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে কত জিনিষ যে লেখা যাইতে পারে তা তাঁহার পত্রিকা দেখাইয়াছে। অসত্য, অন্যায় ও অধীনতার বিরুদ্ধে কত সহজ ভাষায় কি রূপ তীব্র সংগ্রাম যে করা যায় তাও দেখাইয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন ও নবীন চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তখনকার দিনে সাধারণ মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না। অজন্তা গুহা ও ভারতীয় চিত্রকলার নাম অল্প লোকেই জানিত। ভারতীয় ভাষায় 'অজন্তা গুহাচিত্রাবলী' বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ প্রথম লিখিলেন ও প্রকাশ করিলেন রামানন্দ। ইহার পর তিনি অবনীন্দ্র প্রভৃতি নূতন চিত্রশিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ দেশকে দেখাইলেন। স্বদেশের সৃজনী প্রতিভাকে এবং স্বদেশের শক্তিমানদিগকে সম্মানই স্বদেশীর সম্মান তিনি মনে করিতেন। তাই প্রবাসীর যুগে অনেক টাকা লোকসান দিয়াও অবনীন্দ্রের এবং তাঁর শিষ্যবর্গের ছবি নিয়মিত ছাপাইবার বন্দোবস্ত তিনি করেন। ইহাতে টাকা লোকসান ছাড়াও জনসাধারণের বিদ্রূপ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত।

এই সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্ক্রিয়াগুলির অসাধারণতার কথা দেশের কাগজের মধ্যে কেবল মাত্র তাঁহার কাগজই আলোচনা করিয়াছিল। শিল্প ও বিজ্ঞান উভয় দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল।

'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি প্রধানত প্রবাসীতে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়াই দেশের সেবা করিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সব্যসাচী। এবার এই দুই ভাষাতেই তাঁহার কাগজ তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা ও অপমান মোচন করিতে অগ্রসর হইল। তিনি জানিতেন ভারতব্যাপী প্রচারের জন্য ইংরাজীর প্রয়োজন। তাছাড়া তখন ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা ব্রিটিশদের কাণে অন্য ভাষা পৌঁছিতে সময় লাগিত। ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছিলেনঃ

"এই যে মানুষটি আজ বাংলাভাষায় বাংলার সুখদুঃখের কথা লইয়া ব্যস্ত আছেন এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন।" উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নানা কাগজ ও কংগ্রেসের বেদনার বাণীর ভিতর দিয়া রামানন্দের মনীষা ও চরিত্র তখনই ইংরাজভাষীদের চোখেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বারে বারে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এই সময় ১৯০৭ সালে 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্র প্রথম প্রকাশিত হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহাকে খ্যাতনামা চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিক বলিয়া ইংরাজী নবীশরাও জানেন।

দুই সংখ্যা মাত্র "মডার্ণ রিভিয়ু" প্রকাশিত হইবার পর খাঁটি বিলাতী কাগজ Light লেখেন যে ইংলন্ডেও ইহার চেয়ে ভাল এবং গুরুত্ব পূর্ণ কাগজ তাঁহারা দেখেন নাই। দেশে অনেকেই বলিলেন এই কাগজের জগৎব্যাপী খ্যাতি হইবে এবং তাঁহাদের সে ভবিষৎবাণী শীঘ্রই সফল হইল। কিন্তু খ্যাতিলাভের জন্য মডার্ণ রিভিয়ুর আবির্ভাব হয় নাই, তাহার আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা। স্বায়ত্ব শাসনের পথ রোধ করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তখন ভারতে ভেদনীতির প্রচার করিতেছেন। হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ, মডারেট এক্স্ট্রিমিষ্ট ইত্যাদি নানা ভাগে ভারতকে ভাগ করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলাই ইংরেজ বাহাদুরের উদ্দেশ্য ছিল। এ-বিষয়ে রামানন্দ সে যুগে যে সকল ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন তাহা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য রামানন্দ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি ভারত সরকারের স্বাধীনতার বিপক্ষের সকল যুক্তিজালই তাঁর তীক্ষ্ণধী ও মনীষার সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করিতেন। ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার প্রধান কাম্য। তাই ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন (১৯২৫) "আমার অনেক সময় মনে হয় যে ভারতের গত সাড়ে আঠার বৎসরের ইতিহাস সত্যই মডার্ণ রিভিয়ু এবং ভারতের বিদেশী আমলাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী মাত্র।"

কর্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গভঙ্গের পর হইতে এলাহাবাদের বাঙালীরা তাঁহার নেতৃত্বে সভা সমিতি করিয়াও সরকার বাহাদুরকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন লাট সাহেব হিউয়েট এই আন্দোলন দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। কয়েকজন বাঙালীকে দন্ড দিয়া তিনি বাঙালী সমাজে ভয় উৎপাদন করিয়া আন্দোলন থামাইবেন ঠিক করিলেন। বলা বাহুল্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হিউয়েট দন্ডনীতির প্রধান লক্ষ্য। তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে দূর না করিতে পারিলে স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া কাটা যায় না।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মডার্ণ রিভিয়ুর লেখায় কি একটা ছিদ্র পাইয়া সরকার বাহাদুর হুকুম করিলেন, "হয় মডার্ণ রিভিয়ু বন্ধ করিতে হইবে, না হয় সম্পাদককে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।" সম্পাদক স্বদেশে নির্ব্বাসন দন্ডই বরণ করিয়া লইলেন। লোকে অবশ্য সে কথা জানিল না। তাহারা মনে করিল কিছু দিন আগে তিনি যে কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাই বুঝি পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য দেশেই ফিরিয়া যাইতেছেন।

"কায়স্থ কলেজ" কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতে বনে নাই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত্তেই কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বল কিছু ছিল না, তবু তিনি এলাহাবাদে কাজ পাইয়াও গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার বিপুল জ্ঞান-ভান্ডার ও মনীষায় মুগ্ধ হইয়া এলাহাবাদ প্রেসের চিন্তামণি ঘোষ তাঁহাকে উচ্চ বেতনে প্রেসে লইতে চান। কলিকাতায় কাজ পাইয়াও তিনি লন নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে কোথাও অধীনতা সহ্য করিতে তিনি পারিতেন না। কলেজের ছাত্ররা অশ্রুজলে তাঁহাকে কলেজ হইতে বিদায় দিয়াছিল, আজ প্রবাসী বাঙালীরা তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের মত ব্যথিত চিত্তে বিদায় দিলেন।

কত বাঙালী অবাঙালীর আপনার ঘরের মত ছিল তাঁহার এই গৃহ। অতিথিবৎসল রামানন্দের সে ঘর আর সেখানে রহিল না।

রামানন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এলাহাবাদের রাজনৈতিক উত্তাপ হয়ত কিছু কমিল। কিন্তু মডার্ণ রিভিয়ুকে সরকার দমাইতে পারিলেন না। কোনো সহকারী না রাখিয়া একলাই তিনি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন। কেবল হিসাব রক্ষার কাজে সহায় ছিলেন তাঁহার পত্নী মনোরমা দেবী।

মডার্ণ রিভিয়ু তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাগজ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রাহক সংখ্যা তাহারই। তবু তখন টাকার দিকে তাহার প্রচুর লোকসান, কারণ এইরূপ উচ্চদরের কাগজ রঙীন ছবিযুক্ত করিয়া চালাইতে খরচ হইত প্রচুর।

এদিকে প্রবাসীও মডার্ণ রিভিয়ুর লেখার জন্য সরকার পক্ষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। রামানন্দের পিছনে দিবারাত্র গোয়েন্দা লাগিয়া রহিল। তিনি অতি সাবধানী লেখক ছিলেন তাই—লেখায় আইনের সীমানা ছাড়াইতেন না, কিন্তু কোপ ঠিক জায়গায় দিতেন। বন্ধুবান্ধবরা দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতেন "আপনি কবে জেলে যাইতেছেন? কিংবা কবে আপনার বাড়ী খানাতল্লাসী হইতেছে?" পুলিশের কর্ম্মচারীদের মধ্যে রামানন্দের অনুরাগী কেহ কেহ ছিলেন। তাঁহারা কিছু খবর পাইলেই তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। ইহার ফলে প্রবাসী বা Modern Review-এর অনেক ফর্ম্মা প্রকাশের পূর্ব্বেই রাতারাতি পুড়াইয়া ফেলিতে হইত। তবু থাকিয়া থাকিয়া সরকারী হুমকি আসিত।

এমন সময় ১৯০৮-এর ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকুমার মিত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বারজন দেশভক্ত সরকার কর্ত্তৃক একদিনে একসঙ্গে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই সময় হইতে রামানন্দের গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা আরও বাড়িল, কারণ বাংলাদেশে এতজন নির্ব্বাসিত হওয়ায় যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার ফলে নামকরা স্বদেশীরাও অনেকে সভা-সমিতি করিতে রাজি হইতেন না, এবং রামানন্দ প্রমুখ কয়েকজন এই সব ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করিয়া বেড়াইতেন। রামানন্দের ডাকের চিঠি ঠিক সময় আসিত না, যখন আসিত দেখা যাইত খুলিয়া জোড়া দেওয়া হইয়াছে। কোনো কোনো চিঠি বাজেয়াপ্ত হইত, পরে তাহা জানা গিয়াছে। ১৯২৯ সালে রামানন্দ ও মতিলাল নেহরুর মধ্যে কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়। মতিলাল যে সকল পত্র লিখেন তাহা রামানন্দের হস্তগত হয় নাই। তাহা পুলিশের হস্তগত হয়, এবং মতিলালের বিচারের সময় আদালতে তাহার দস্তখত প্রমাণ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চিঠিটি পুলিশের হাতে দেখিয়া মতিলাল আদালতে মুচকি হাসি হাসিয়াছিলেন। রামানন্দর বাড়ীর পাশে ভাড়াটিয়া রূপে গোয়েন্দা বাসা লইল, রাত্রে ও বাহিরে গুপ্ত পাহারা বসিল। কিন্তু তিনি রাজরোষ উপেক্ষা করিয়া বারবার নির্ভয়ে স্বাধীনতার দাবী করিয়া চলিলেন।

তিনি এই সময় হইতে "Towards Home Rule" পুস্তিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যত রকম মিথ্যাযুক্তি খাড়া করা যাইতে পারে সরকার বাহাদুর তাহা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানন্দ তীক্ষ্ন যুক্তি ও স্বচ্ছ ভাষার সাহায্যে নির্ভীক ভাবে সেগুলি খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিতেন। এই পুস্তিকা তখন হাজারে হাজারে বিক্রয় হইত। ইহা প্রধানত Modern Review-এর সম্পাদকের লেখা হইতে সংগৃহীত।

এলাহাবাদে বাস কালে রামানন্দ সেই প্রদেশের শিক্ষা সংস্কারের কাজে অগ্রণী ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। পরে ম্যাকডোনাল্ড শিক্ষা কমিটির সভ্য হন। শিক্ষা কমিটিতে তাঁহার নাম ছিল "ভয়ঙ্কর যোদ্ধা" (terrible fighter) এবং তাঁহার চেষ্টাতে সে প্রদেশের শিক্ষার্থীদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত পথ সরল হয়। তাহার পূর্ব্বে ছিল বহু বাধা; শিক্ষার প্রচার যাহাতে বহুল না হয়, তাহার জন্য ইংরেজ সরকার এই সব বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া রামানন্দকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো তীব্র যুদ্ধে নামিতে হইল। এবার শুধু ইংরেজ সরকার নয়, দেশের শিক্ষা-গুরুদের সহিতও যুদ্ধ। প্রবাসীর যুগের পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লিখিতেন। তাঁহার স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদেশ অপেক্ষা হীন না থাকেন এ-বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ ছিল। বিদ্যার মন্দিরে কোনো স্খলন কি ত্রুটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় শাসন ও পরিচালন ব্যাপারের অনেক বড় বড় ত্রুটি বিষয়ে তাঁহার পত্রিকা দুইটিতে তিনি স্বয়ং ও আরও কেহ কেহ নিয়মিত লিখিতেন। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের তিনি বিশেষ বিরাগভজন হন। কখন কখন এই জাতীয় কারণে তাঁহার নামে আদালতে নালিশ হইবার সম্ভাবনা হয়, কোন দৈনিকে তাহা মুদ্রিতও হয়, কিন্তু তবু তিনি ভীত বা বিচলিত হন নাই। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন সে সমালোচনা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। আর্থিক ক্ষতি ও অন্যান্য বড় বড় ক্ষতি সহ্য করিয়াও তিনি স্বমত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নামে মোকদ্দমা একবার হইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমা-কারী নিজেই তা প্রত্যাহার করেন। ইহাতে রামানন্দের সমালোচনার কোনো ভুল নাই প্রমাণিত হয়। তাঁহার সমালোচনার প্রতিবাদে যত কটূক্তিই থাকুক তিনি তাহা নিজের কাগজে ছাপিতেন।

সে যুগে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত সমাদর করেন নাই। অনেকেই মনে করেন বাংলায় ও সমগ্র পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রচার করিতে রামানন্দ যেমন চেষ্টা করিয়াছিলেন তেমন কেহ করেন নাই। তাঁহারই সমালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সমাদর পরে হইয়াছিল।

রামানন্দের নির্ভীক ক্ষুরধার সমালোচনায় পক্ষপাত ছিল না। তিনি যেখানে অন্যায় অসত্য বা ভুল দেখিতেন সেখানেই নিজের শাণিত সমালোচনার অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহাতে উচ্চ নীচ প্রিয় অপ্রিয় ভেদ ছিল না। ইহার ফলে তাঁহার শত্রু বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার সম্মানও বাড়িয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধীজি ভারতে খ্যাত হইবার পূর্ব্ব হইতেই রামানন্দ তাঁহার ত্যাগ ও কীর্ত্তির বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজির অনেক কাজের তীব্র সমালোচনা ও তিনি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গান্ধীজির বহু ভক্ত রামানন্দের উপর খড়গহস্ত হন। পাকিস্হান প্রতিষ্ঠাতা জিন্না মহাশয়ের সহিত গান্ধীজি যে বোঝাপড়া করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে রামানন্দ বার বার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আজ দেখা-যাইতেছে যে সেই বোঝাপড়ার ফল ভাল হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই রামানন্দ কয়েকটি বিষয়ে জগৎব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। দেশের চিন্তা-ধারার উন্নয়ন, সর্ব্ব ক্ষেত্রে সত্য ও নির্ভীক সমালোচনা, স্বাধীনতা লাভের অদম্য সাধনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার, নারী হিতৈষণা, বাঙালীর ও হিন্দুর স্বার্থরক্ষা, প্রবাসী বাঙালী ও বহির্ভারতীয়ের সেবা, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের নাম প্রচার এইগুলি ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় কার্য্য।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী কলেজের তিনি প্রিন্সিপ্যাল হন। কিন্তু পরে মতদ্বৈধের জন্য তাহা ছাড়িয়া দেন।

ভারতের বাহিরে ডাঃ জে, টি, সন্ডারল্যান্ডের মত ভারত হিতৈষী সে সময় কেহ ছিলেন না। ইনি ভারতের হিতচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ইনি বলিয়াছিলেন (১৯৩৬) "বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপেক্ষা বেশী চেষ্টা করিয়াছেন এমন মানুষ কি কেহ আছেন?" এই সন্ডারল্যান্ড সাহেব একটি বই লেখেন, তাহাতে ভারতের পরাধীনতায় ভারত, ব্রিটেন ও সমগ্র পৃথিবীর কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখান হইয়াছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামানন্দ ইহার ভারতীয় সংস্কারণ প্রকাশ করেন। অল্পদিনেই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। তাহাও কিছু বিক্রী হইবার পর মে মাসের ২৪ তারিখে অকস্মাৎ কলিকাতা পুলিশ রামানন্দের বসতবাড়ী ও

প্রবাসী কার্য্যালয় প্রেস ইত্যাদি খানাতল্লাসী করিয়া এই "ইন্ডিয়া ইন্‌ বন্ডেজের" ৪৪ কপি লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহের অপরাধে প্রকাশক ও তাঁহার মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করে। কয়েক দিন না যাইতেই ৬ই জুন পুলিশ রাজদ্রোহ অপরাধে রামানন্দকেও গ্রেপ্তার করে। তৎক্ষণাৎ সারা ভারতময় খবরের কাগজে খবর ছড়াইয়া পড়ে। খানাতল্লাসীর কথা মাত্র শুনিয়াই গান্ধীজি বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট নাটকীয় অভিনয় চায়। কোনও ভারতবর্ষীয় যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার মাথাও মাঝে মাঝে নোয়াইয়া দিতে হইবে—পাছে তিনি তাঁহার অবস্থার কথা ভুলিয়া যান।.........সিপাহী বিদ্রোহের সময় মাঝে মাঝে অবমাননার দৃশ্য দেখা যাইত। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী খানাতল্লাসী......... যেন সেই অভিনয়েরই পুনরাবৃত্তি।"

বিচারে "ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ"-এর সব বই বাজেয়াপ্ত হয় এবং দুই হাজার টাকা জরিমানাও আদালত করেন।

এই মোকদ্দমার রায় দেখাইতে রামানন্দ ও তাঁহার ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরুর নিকট যান। মতিলাল তাঁহাকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "শাস্তি পাইয়াছেন ত!" রায় পড়িয়া বলিলেন, "আইনজ্ঞ হিসাবে আপনাকে আপীল করিতে পরামর্শ দি না, কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে মনে হয় আপনি আপীল করিলে ভাল।" আপীল করা হইল এবং নামঞ্জুর হইল।

এই বইটির আমেরিকান সংস্করণ ও ফ্রেঞ্চ সংস্করণ ছাপা হয় এবং অনেক বিক্রয় হয়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ 'লীগ অব নেশ্যনস্' এর কার্য্যাবলী দেখিবার জন্য লীগ কর্ত্তৃক তাহার কার্য্য প্রণালীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে জেনিভায় নিমন্ত্রিত হন। তিনি বলেন, 'প্রধানত জানিতে চেষ্টা করিব যে, লীগের দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থার, শিল্প-বাণিজ্যের, শ্রমিকদের এবং স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে।"

লীগ তাঁহার যাতায়াতের খরচ দিতে চাহেন। কিন্তু টাকা লইয়া লীগের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিতে গেলে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পথে পাছে মনের অজ্ঞাতেও একটু সংকোচ আসে এই মনে করিয়া তিনি তাঁহাদের ৬০০০, টাকা লইতে আপত্তি করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলেন, 'লীগ নিমন্ত্রণ পত্রে আমাকে দেখাশুনার সব সুবিধা দিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই।' লীগের নিকট তিনি উমেদারি করিয়া নিমন্ত্রণ লাভ করেন নাই, তাঁহারাই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান, অথচ কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাতাদি বিষয়ে সেখানে সৌজন্যের বিশেষ অভাব দেখা যায়। তিনি বলেন, 'মানুষের সহিত দেখা করিবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া তারপর তাহাকে বলা, 'আমার এখন অবসর নাই'—এরূপ ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্ব্বে হয় নাই।"

ভারতবর্ষের মানুষ লীগের নিকট যেটুকু সৌজন্য পাইবার আশা করিতে পারিতেন, রামানন্দের মত প্রতিষ্ঠাবান মানুষও যে তাহা পান নাই, ইহা দেশকে জানাইয়া তিনি দেশের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।*

ভেদনীতিতে বিশ্বাসী ব্রিটিশ সরকার যখন মুসলমান প্রীতি দেখাইয়া হিন্দুর স্বার্থহানি করিতেছেন এবং হিন্দু নায়কদের মধ্যে একতার অভাবে হিন্দুজাতি একটা সংকটের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে সেই দুর্দিনে উপবীত ত্যাগী রামানন্দ হিন্দু সংগঠন ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দু স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুমহাসভার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার দ্বাদশ অধিবেশনে সুরাটের মহাসভায় তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন ১৯২৯এ। হিন্দুভারতের জাগৃতির কার্য্যে তিনি নিজ শক্তি ও জ্ঞানকে যে ভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা কম আছে। ডাঃ পরমানন্দ বলিয়াছিলেন

* জেনিভায় বাস কালে তিনি ভাবুক শিরোমণি রোমা র'লা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত Golden Book of Tagore সম্পাদনা করেন ও তাহার ভূমিকা লেখেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রামানন্দ এই তিনজনই হিন্দুজাতি সংগঠনের অগ্রণী।

আমাদের দেশে সচিত্র মাসিক পত্রের যুগ রামানন্দই প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলা যায়। যদিও সামান্য ২।১ টি ছোট ছবিযুক্ত কাগজ আগেও ছাপা হইয়াছে। বাংলা সচিত্র মাসিক প্রকাশ করিয়া হিন্দীতেও সচিত্র কাগজ প্রকাশ করা বিষয়ে তিনি এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়কে পরামর্শ দিতেন।



ইন্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা চিন্তামণি ঘোষ

সম্ভবতঃ সেই জন্যই চিন্তামণি বাবু "সরস্বতী" নামে হিন্দী পত্রিকা প্রকাশ করেন। হিন্দী ভাষার সাহায্যে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রচার কতটা হইতে পারে তাহা রামানন্দ বুঝিতেন বলিয়া তিনি কয়েক বৎসর পরে স্বয়ং "বিশাল ভারত" নামে একটি হিন্দী সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার জন্য বহু সহস্র টাকা তিনি লোকসান দিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া কাগজটি না দাঁড় করাইয়া ছাড়েন নাই। শ্রীযুক্ত বণারসী দাস চতুর্বেদী কয়েক বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজ হিন্দী পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়। বহির্ভারতের ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা ও তাঁহাদের সহিত স্বদেশের যোগরক্ষার জন্যই এই কাগজটি বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হয়। তিনি যে প্রবাসীর ও বহির্ভারতীয়ের চিরবন্ধু ছিলেন। ইউরোপে যাইবার পূর্ব্বে রামানন্দ সম্পাদকতার কাজ ছাড়িয়া বাহিরে বড় কোথাও যাইতেন না। কিন্তু ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর সতের আঠার বৎসর ধরিয়া এত জায়গায় নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন যে অত বড় কর্ম্মী হইয়াও একমাত্র তিনি বলিয়াই তাহার অধিকাংশ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সকল নগরে ও বহু গ্রামে তিনি সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজসেবা, নারীজাগৃতি, রাষ্ট্রীয় উন্নতি, একেশ্বরবাদ, বাংলাভাষা প্রচার, হিন্দু সংগঠন প্রভৃতি নানা কাজ করিয়া বেড়াইয়াছেন ষাট বৎসর বয়স হইবার পর হইতে। জীবনের শেষ দুই বৎসর ছাড়া এই সকল কাজে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের কথা মোটামুটি বলিলেও তিনি যে কিরকম মানুষ ছিলেন তাহা বোঝা যায় না। তাঁহার গভীর ঈশ্বরপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের উপর ছিল তাঁর কুসুম কোমল মন। নিজ পর সকলের দুঃখেই তিনি গভীর ভাবে বিচলিত হইতেন। রোগের সময় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও ভৃত্যদের "বাবা, তুমি ভাল আছ ত?" কুশল প্রশ্ন না করিয়া নিজের প্রয়োজনের কথা বলিতেন না। শীতের রাত্রে তাঁহার অসুস্থতার সময় ভৃত্যেরা জড়সড় হইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিত, রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেন। একদিন বলিলেন, "ওরা শীতে কষ্ট পায়, আমার বাক্সে দুটো গরম জামা আছে ওদের দাও।"

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর ৭৮ বৎসর বয়সে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। একজন মহিলা এই সংবাদ শুনিয়া অল্প কথায় বলিয়াছিলেন, "বাংলাদেশ আজ অভিভাবকহীন হ'ল।" তিনি ভারত সুহৃদ ও ভারতমুক্তি সাধক হইলেও তাঁহার অভাবে বাংলাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহায় হইল।



দ্বিতীয় সোভিয়েত মহাকাশযানটি পৃথিবী পরিক্রমার জন্য উপগ্রহের (স্পুৎনিক) কক্ষপথে স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালের ১৯শে আগস্ট। মানুষের মহাকাশচারণের অর্থাৎ আমাদের ভাবী মহাকাশচারী গ্রুপটির যে কোন একজনের মহাকাশযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুতে সজ্জিত ঐ যানের কেবিনটিতে ছিল দুইটি কুকুর স্ত্রেলকা ও



বেলকা। ১৮ বার পৃথিবী পরিক্রমার পর মহাকাশযানটি পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং নির্দিষ্ট স্থান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে অবতরণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম মহাকাশে কয়েকবার পৃথিবী পরিক্রমা করে জীবন্ত প্রাণী নিরাপদে ধরার বুকে ফিরে এল।

এই অপূর্ব সাফল্য প্রমাণ করে দিল, আমরা যে মহাকাশযানটি সম্পর্কে অধ্যয়ন করছিলাম এবং তার সমস্ত কল-কৌশল করায়ত্ত করছিলাম, সেটি একেবারে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। গোটা পৃথিবীর মুখেই তখন স্ত্রেলকা ও বেলকার কথা। আমাদের কাছে ওরা ছিল বিশেষভাবেই প্রিয়। প্রধান নকশাকার আমাদের যে টেলিভিশন সেটটি দেখালেন সেটিই ছিল ঐ মহাকাশযানে। ঐ টেলিভিশনেরই সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ পথিকৃৎদের আচার আচরণ নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

ঐ উড্ডয়নের একটি টেলিভিশন ফিল্ম আমরা দেখলাম। কুকুর দুটি ভয়ে মেজের দিকে তাকিয়ে আছে। অসাধারণ শব্দ শুনছে কান পেতে। পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় তারা উত্তেজিত ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু ত্বরণ বৃদ্ধি পাবার পর অভিকর্ষের বর্ধিত শক্তি তাদের মেজেতে ঠেলে বসিয়ে দিল। স্ত্রেলকা দাঁড়াবার চেষ্টা করল। তারপর ওরা দুজনে গতিহীন হয়ে পড়ল। মহাকাশযানটি তখন কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। ত্বরণের ভারের পর এল ভারহীন অবস্থা। কুকুর দুটো তখন শূন্যে ঝুলছে। ওদের মাথা ও থাবা থলথলে অবস্থায় ঝুলছে। মৃতপ্রায় মনে হচ্ছে ওদের। তারপর তারা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বেলকা ক্রোধে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। শীগগিরই ওরা অভিকর্ষবিহীন অবস্থায় অভ্যস্থ হয়ে গেল। স্বয়ংক্রিয় খাদ্যাধার থেকে তারা খেতে শুরু করল।

এ সবই ছিল খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এতে

আমরা ভরসা পেলাম। চিন্তা ও আলোচনা করবার খোরাক পেলাম। এতদিন যা ছিল কল্পনার বিষয়, তা যেন বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলাম। কথায় বলে অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। স্ত্রেলকা ও বেলকা যা সহ্য করতে পেরেছে স্বাস্থ্যবান, ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও নির্দিষ্ট অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর ব্যক্তির পক্ষে তা নিশ্চয়ই সম্ভব।

ভারশূন্য অবস্থার অনুভূতির জন্য আমরা পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। অতি দ্রুতগামী জেট বিমানে আমরা শূন্যে অভিকর্ষে পৌঁছেছিলাম। এক বিশেষ কৌশলে আমরা কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রাভিগ শক্তির সাম্য বিধান করে ভারশূন্য অবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। এই অভিকর্ষবিহীন অবস্থা যদিও ছিল মিনিট খানেকের মতো, তাতেও আমরা দেখেছি রেডিও যোগাযোগ ব্যাহত হয় নি, পড়া, দেখা, আহার ও পান করায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নি। এই পরীক্ষার ফল দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলাম দীর্ঘসময় ভারশূন্য অবস্থায় থাকলেও কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না। আমাদের এই কথা আমাদের ট্রেনিং শিক্ষককে বলা হলে তিনি বললেনঃ

"আপনারা সে কথা ভাবতে পারেন বটে, আমরা বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষার ভিতর তার প্রমাণ পেতে চাই। এবং তা হতে পারে শুধু মহাকাশে।"

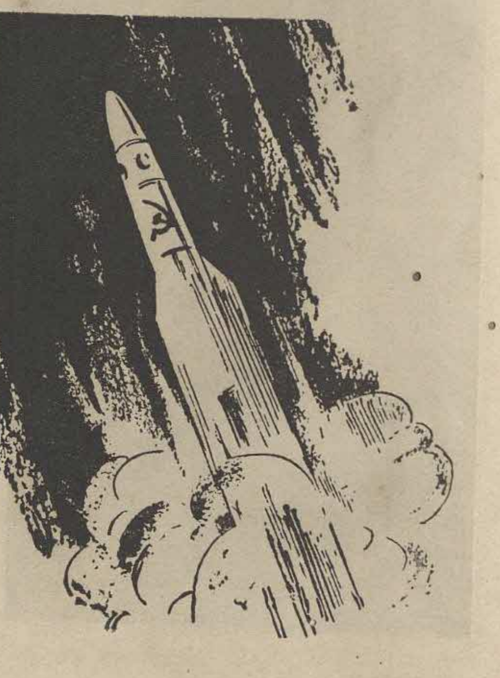
নানা রকমের ট্রেনিং-এর সময় আমাদের দেহ ও নার্ভতন্ত্রকে কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রে ঘোরপাক খাওয়ার অবস্থা থেকে বিশেষভাবে সজ্জিত শব্দরোধী কক্ষে দ্রুত উত্তরণের অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। নিঃসঙ্গ যাপনের এই শব্দরোধী কক্ষটি এমনভাবে নির্মিত ছিল যাতে, পৃথিবীর সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দিনের পর দিন এই ক্ষুদ্র কক্ষে থাকাকালে আমাদের নার্ভের ও মনের দৃঢ়তার পরীক্ষা হতে পারে। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একলা। বিন্দুমাত্র শব্দ নেই, ফিসফিস শব্দও নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও নয়। একেবারে কিছুই নয়। কথা বলবারও কেউ নেই। নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী মাঝে মাঝে রেডিওযোগে একতরফা রিপোর্ট পাঠান হত শুধু। রেডিও বার্তা পাঠাও। সে বার্তা পৌঁছুল কিনা তাও জানবার উপায় নেই। কেউ জবাব দেবে না, একটা শব্দও নয়।

তোমার কপালে যাই ঘটুক না কেন, তোমার সাহায্যে কেউ আসবে না। তুমি একলা, একেবারেই একলা। আপদ্‌কালে নিছক নিজের উপরই তোমাকে ভরসা করতে হবে।

এই "নিঃসঙ্গ বাস" অনেক সময় রীতিমত কঠিন ছিল। বিশেষ করে আমরা জানতাম না কতক্ষণ এই নিঃসঙ্গ "সেলে" কাটাতে হবে। কয়েক ঘন্টা? এক দিন এক রাত? কয়েক দিন? অবশ্য আমরা জানতাম এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাকাশে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, নিজের উপরই ভরসা করে একলা চলতে হতে পারে। মহাকাশচারীকে মনের দিক থেকে প্রস্তুত হতে হবে, যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য নার্ভতন্ত্রকে গড়ে তুলতে হবে।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ অতীতের কথা চিন্তা করে, সমগ্র অতীত জীবনটাকে দেখে। কিন্তু আমি ভাবতাম ভবিষ্যতের কথা। আমাকে যদি মহাকাশ-চারণের সুযোগ দেওয়া হয়, তা হলে আমাকে কোন্ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সে বিষয়ে আমি ভাবতাম। আমার মন ছিল সর্বদাই কল্পনাপ্রবণ। বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই কক্ষে বসে আমি মনে করতাম, আমি যেন মহাকাশযানে উড়ে চলেছি। আমি চোখ বুজে মানসনেত্রে দেখতাম নিচে মহাদেশ ও সমুদ্র, তার উপর দিয়ে আমি চলেছি। দিনের রেখা পার হয়ে এসেছে রাত্রি। তলায় দেখা যাচ্ছে নগর-নগরীর আলোকমালার দীপ্তি। বিদেশে কখন যাই নি আমি। আমি কল্পনা করতাম, চলেছি পিকিং ও লন্ডন, রোম ও প্যারিসের উপর দিয়ে, আমাদের গ্জাৎস্কের উপর দিয়ে।.........
এই কল্পনা আমার নিঃসঙ্গ অবস্থার ক্লান্তি কাটাতে সাহায্য করেছে।

এই গভীর নীরবতা বর্ণনার অতীত। কখন কখন আমি এই নিঃশব্দ অবস্থার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ



করতাম। সৃজনশীল কার্যের গভীর নীরবতা—চিন্তা ও স্মৃতির নীরবতা সর্বদাই আমি পছন্দ করতাম।

কতদিন এই শব্দরোধী কক্ষে কাটাতে হবে তা আগে থেকে আমি জানতাম না। যখন এই কক্ষ থেকে আমি বের হয়ে এলাম, তখন পরীক্ষকরা আমার মানসিক স্থৈর্য ও শান্ত অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

শব্দরোধী কক্ষে, তাপ কক্ষে, কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রে এবং কম্পন যন্ত্রে ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া হত। এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরই বাছাই করা হত। প্রথম মহাকাশচারণপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমেই কমে আসতে লাগল। আর তাছাড়া শুধু এক ব্যক্তিই তো প্রয়োজন।

মাগনিতোগোর্স্ক লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় শক্তিশালী রোলিং মিল তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। ক্রিভয় রগ্-এ বিশ্বের বৃহত্তম ব্লাস্ট ফার্নেস চালু হয়েছে। তেমির-তাউ লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় প্রথম দফার কোকচুল্লিগুলি তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বলখাশ ধাতু কারখানায় বিশ্বের প্রথম সাইক্লোন ফার্নেসে ধাতু গলানোর কাজ চালু হয়েছে।

ঐ সময় আমার বৈমানিক বন্ধুদের কাছ থেকে খানকয়েক চিঠি পেয়েছিলাম। একখানা চিঠি লিখেছিলেন বরিস ফিওদরোভিচ ভুদোভিন। তাঁরা লিখেছিলেন, আমাদের সশস্ত্রবাহিনী থেকে বহুসংখ্যক সৈন্য হ্রাস করার নূতন আইনের ফলে তাঁরাও সৈন্যবাহিনী থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন। কলকারখানা ও কৃষিক্ষেত্রের নূতন পরিবেশে কাজ কেমন লাগছে, তারই বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন চিঠিতে। ভুদোভিন পরিবার থাকেন কালুগাতে। এই শহরেই একদা কনস্তান্তিন ৎসিওলকোভাস্কি কাজ করতেন। ভুদোভিন দম্পতি এখানে শিক্ষকতার কাজ করেন। তাঁরা লিখেছেন তাঁদের ছোট্ট মেয়ে ইরিনা এখন বেশ বড় হয়েছে। আমার কথা ইরিনার বেশ মনে আছে। ভালিয়া ও আমি বললাম, আমাদের লেনাও হাঁটতে শিখেছে। আমরা আর একটি সন্তানের প্রতীক্ষায়।

১৯৬০ সালের ১লা ডিসেম্বর আমাদের তৃতীয় মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত হল। তাতে ছিল কুকুর পচোলকা ও মুশকা, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রাণী, পোকা-মাকড় ও উদ্ভিদ। মহাকাশে মনুষ্য প্রেরণের প্রস্তুতিপর্বের গবেষণাকার্য চলছিল নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী। এই উড্ডয়নের ফলে অনেক অতিরিক্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। অথচ সব কিছুই যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হল তা নয়। অবতরণকালে নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুতির ফলে মহকাশযানটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, হয়তো অবতরণের এই ব্যর্থতায় আমরা ঘাবড়ে যাব। আমরা কিন্তু বুঝেছিলাম এটাকে নিছক একটা দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। আমরা অনেক সময় যা মনে করি, জীবনটা তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। কুকুর দুটোর জন্য বেদনা বোধ করলাম। ঐ মহাকাশযানটার পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে; সেই যানটার জন্যও কষ্ট হল। অবশ্য এই বিরাট কর্মকান্ডে বিপুল প্রাথমিক ব্যয় অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের ট্রেনিং-এর কাজ এগিয়ে চলল। আমরা মহাকাশযানের কেবিনের মডেলে গঠিত কেবিনে ক্রমেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতে লাগলাম। এই কেবিনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। কোথায় কোন্ বোতাম ও সুইচ রয়েছে তা আমাদের নখদর্পণে এসে গেল। মহাকাশচারণকালে আপনা আপনিই যাতে আমাদের অঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারে তারই জন্য উড্ডয়নকালে প্রয়োজনীয় অঙ্গসঞ্চালনও আমরা আয়ত্ত করে ফেললাম। কোন্ জরুরী অবস্থায় আমাদের কি করতে হবে আমাদের হাত দুটো তা ভাল করেই জেনে নিল।

হাতে নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রচালনা, মহাকাশযানের গতিমুখ ও নিয়ন্ত্রণ ও অবতরণ ব্যবস্থা চালনা, তাপমাত্রা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালনা আমরা শিখে নিলাম। পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আমাদের শিখতে হত। আমাদের যত প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন প্রয়োজন হতে পারে বিজ্ঞানীরা তার সব কিছুই ভেবে রেখেছিলেন। বিভিন্ন পন্থায় ও বিভিন্ন উপায়ে কিভাবে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে সে বিষয়ে অনেক সময় নিয়ে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করা আমাদের শিখতে হয়েছে। আর শিখতে হয়েছে খুব অল্প সময়ে সঠিক নির্দিষ্ট কথা ও সংখ্যাটি লেখা। আমরা মনে মনে ভাবতাম সত্যিই যেন আমরা প্রকৃত মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা করছি। আমাদের ট্রেনিং-এর সময় এই সব আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

উড্ডয়নকালের নানা অবস্থার অনুরূপ অবস্থা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করার জন্য ইঞ্জিনীয়াররা এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং-স্ট্যান্ড তৈরী করেছিলেন। এতে ছিল ইলেক্‌ট্রোনিক ব্যবস্থা। কেবিনের আসনে বসলেই সামনে থাকত নানা যন্ত্রপাতির ডায়াল, নানা রঙ্গীন আলো জ্বলছে আর নিভছে, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে উড্ডয়নকালের সম্ভাব্য নানা পরিবর্তন। আমরা রেডিও যোগাযোগ রাখতাম। সেগুলোর টেপ-রেকর্ড করা হত, গবাক্ষ ও দৃষ্টি নির্ধারক ব্যবস্থা দিয়ে আমরা নিরীক্ষণ চালাতাম এবং নিরীক্ষণের ফলাফল লিখে রাখতাম লগ বইতে। যথেষ্ট কাজ ছিল আমাদের।

আমাদের কৃত্রিম কেবিনটিতে যেমন ছিল কর্মসূচী অনুযায়ী সাধারণ উড্ডয়নকালীন ব্যবস্থা, তেমনি সর্বপ্রকার আপৎকালীন ব্যবস্থাও ছিল। চাপযুক্ত শিরস্ত্রাণ ও

দস্তানা সহ মহাকাশ পোশাক পরিধান করা থেকে শুরু করে কেবিনের হ্রাসপ্রাপ্ত চাপ থেকে মহাকাশচারীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা পর্যন্ত উড্ডয়নকালে যা কিছু ঘটতে পারে এই পৃথিবীর উপরেই কৃত্রিমভাবে তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ পোশাক পরিধান করেই আমাদের পানাহারও করতে হয়েছে।

আমি ছিলাম আমাদের গ্রুপের মনিটর। আমার বন্ধুরা আমার কাছে অভিযোগ জানাতেন, "এই ট্রেনিংটি বড্ড খারাপ। এর চাইতে কেন্দ্রাতিগ যন্ত্র অনেক ভাল।"

তাঁদের ভরসা দিয়ে বলতাম, "সে কথা ঠিক। সবই হবে ধীরে ধীরে। প্রতীক্ষা করাও আমাদের শিখতে হবে।"

পুচোলকা ও মুশকার মৃত্যুতে যে অস্বস্তিকর মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল, অবশ্য আমরা সে কথা মোটেই স্বীকার করতাম না, সে মনোভাব কেটে গেল যখন সাফল্যের সংগে সাড়ে ছয় টনের ভারী স্পুৎনিক উৎক্ষেপণের সংবাদ শোনা গেল। তারই এক সপ্তাহ পরে ঐরূপ একটা মহাকাশ রকেটের স্পুৎনিক থেকে শুক্র গ্রহের দিকে স্বয়ংক্রিয় আন্তর্নক্ষত্র যান পাঠান হল। সোভিয়েত প্রতীক ফলকসহ সাফল্যের সংগে ঐ যান উৎক্ষেপণ সৌর-জগতের গ্রহ-গ্রহান্তরের পথ আলোকিত করেছে।

সে সময়টা আমার অবশ্য ভাল যাচ্ছিল না। আমার দুশ্চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল ভালিয়া। ভালিয়ার তখন সন্তান হবার কথা। আমি চাচ্ছিলাম ছেলে, সে চাচ্ছিল মেয়ে। কেমন আছে ভালিয়া? সব ভাল চলছে তো? আমার এত কাজ যে তার সংগে দেখা করবার ফুরসৎও নেই।

৭ই মার্চ ভালিয়ার মেয়ে হল। ৯ই তারিখে বন্ধুরা আমাকে বললেন ঃ

"শুনেছ য়ুরা তোমার জন্মদিনের আর একটি উপহার!"

"কি উপহার?"

"চতুর্থ মহাকাশযান কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে।"

ঐ দিনই মহাকাশযানটি পৃথিবীতে ফিরে এল কুকুর চের্নুস্কা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী এবং বৈমানিকের আসনে উপবিষ্ট একটি কৃত্রিম মহাকাশচারীকে নিয়ে। এই উৎক্ষেপণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশযানটি ও তার সমস্ত ব্যবস্থা মহাকাশে মনুষ্য প্রেরণের পক্ষে নিখুঁত



বাঁবস্থা কিনা তা পরীক্ষা করা। সব কিছু দেখে আমাদের মনে হল মানুষের মহাকাশচারণের দিন আর দূরে নয়।

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী মেজর য়ুরি গাগারিন সাংবাদিকদের নিকট তাঁর জীবন-কথা এবং ১২ই এপ্রিলের মহাকাশ অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেন।

গাগারিন বলেন, "আমি মহাকাশচারী হতে চেয়েছিলাম। মহাকাশে উড্ডয়নের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা। যখন এই কাজের ভার দেওয়া হল আমি প্রস্তুত হতে লাগলাম। দেখতেই পাচ্ছেন আমার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত।"

"উড্ডয়ন কালে আমার একটি মাত্র চিন্তা ছিল কার্য-সূচী পালন করা। সমস্ত কর্তব্য যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতেই আমি চেয়েছিলাম। অনেক কাজ করবার ছিল। সমগ্র উড্ডয়নই ছিল কার্যে পূর্ণ।"

য়ুরি গাগারিন জোর দিয়েই বলেন, মহাকাশে তিনি কখন একাকী বোধ করেন নাই। তিনি বলেন, "আমি ভালভাবেই জানতাম আমার মহাকাশ পরিক্রমা আমার বন্ধুবান্ধব ও সোভিয়েতের সমগ্র মানুষ লক্ষ্য করছেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম আমি যদি কোন কঠিন অবস্থায় পড়ি তা হলে পার্টি ও গভর্নমেন্ট আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন"।

মহাকাশ থেকে দিনের ও রাতের পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তারকাপুঞ্জ কেমন দেখায় সে সম্পর্কে য়ুরি গাগারিন বলেন:

"দিনের পৃথিবী খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জের তটরেখা, বড় বড় নদী, বিশাল জলাশয়, ভূমির সমোন্নতি রেখা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল"। সোভিয়েত ভূখন্ডের উপর উড্ডয়নকালে তিনি যৌথ-খামারের বৃহদায়তন মাঠগুলি দেখতে পেয়েছেন, কর্ষিত ভূমি ও তৃণভূমির পার্থক্যও তিনি বুঝতে পেরেছেন।

গাগারিন বলেন, "এর আগে ১৫ হাজার মিটারের চেয়ে বেশী উঁচুতে আমি উঠিনি। অবশ্য একথা ঠিক উপগ্রহ মহাকাশ-যান থেকে বিমানের মত অত স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু তবু বেশ, বেশ ভাল দেখায়"।

তিনি আরও বলেন, "উড্ডয়নকালে আমিই প্রথম স্বচক্ষে পৃথিবীর গোলকাকার রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছি। দিকচক্রবাল থেকে ঐরূপই দেখায়।

"দিগন্তের ছবিটি ছিল অপূর্ব। ভারী সুন্দর। পৃথিবীর আলোকোদ্ভাসিত দিক থেকে নিকষ কালো দিকে রূপান্তর এক অসাধারণ সুন্দর দেখায়। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছিল। রূপান্তর ছিল অতি কমনীয়। পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে ছিল যেন পাৎলা আবরণ। হাল্কা নীল থেকে নীল ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণে রূপান্তর অবিস্মরণীয় রকমের সুন্দর। এই রূপান্তরের দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। পৃথিবীর ছায়া থেকে বের হয়ে আসবার সময় দিগন্তকে দেখাচ্ছিল ভিন্ন রকমের। দিগন্তে তখন দেখা গেল উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা বেড়। সে রং ক্রমে নীল রঙে এবং তারপর ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হল।"

য়ুরি গাগারিন বলতে লাগলেন, "আমি চাঁদ দেখতে পাইনি। পৃথিবী থেকে সূর্য যেরূপ উজ্জ্বল দেখায় তা থেকে বহু গুণ উজ্জ্বল দেখায় মহাকাশ থেকে। তারাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেগুলো ছিল উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। পৃথিবী থেকে যেমন দেখায়, তা থেকে ভিন্ন রূপ ছিল মহাকাশের সম্পূর্ণ ছবিটি।"

তারপর প্রথম মহাকাশচারী বলেন, "ভারশূন্য অবস্থা যখন শুরু হল, তখন তিনি ভালই বোধ করেন। তিনি বলেন, সব কিছুই সহজতর হয়ে এল এবং এতে অবাক হবার কিছু নাই।" আমার হাত-পায়ের কোন ওজন ছিল না। আমি আর চেয়ারে বসে ছিলাম না। চেয়ারের ওপর বায়ুর মাঝে ঝুলছিলাম। ভারশূন্য অবস্থায় আমি পানাহার করেছি। পৃথিবীতে যেমন চলে ঠিক তেমনি সব চলেছে।

ভারশূন্য অবস্থায় আমি কাজও করেছি, লিখেছি, আমার মন্তব্য নোট করেছি। আমার হাতের লেখা একই রকম ছিল। যদিও আমার হাতের কোন ওজন ছিল না। নোট বইটি আমাকে ধরে রাখতে হয়েছে, নইলে ভেসে যেত। সংবাদ প্রেরণের উদ্দেশ্যে আমি সংবাদ প্রেরণের বিভিন্ন ব্যবস্থা ব্যবহার করেছি।

গাগারিন জোর দিয়েই বলেন, "আমার দৃঢ়মত ভার শূন্যতা কোনক্রমেই মানুষের কর্মদক্ষতা নষ্ট করে না। ভারশূন্য অবস্থা থেকে অভিকর্ষক্ষেত্রে রূপান্তর সহজ ভাবেই ঘটেছে। আমি আর বায়ুতে ঝুলে থাকলাম না, চেয়ারে বসে পড়লাম।"

য়ুরি গাগারিন বলেন, প্রথম সোভিয়েত স্পুৎনিক যখন উৎক্ষেপণ করা হয়, তখন তিনি ওরেনবুর্গ বিমান বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করছেন। সেই দিনটিতে মিগ বিমানে তাঁদের ট্রেনিং চলছিল। গাগারিন বলেন, "আমার সাথীদের মতই আমিও সোভিয়েতের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাফল্যে গর্ব বোধ করতাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, মানুষের মহাকাশ যাত্রার দিনটি আর দূরে নয়। এত শীঘ্রই যে সে দিনটি আসবে তা অবশ্য তখন ভাবতে পারি নি। ভেবেছিলাম হয়তো বছর দশেক লাগবে। অথচ চার বছর যেতে না যেতেই সে দিনটি এসে গেল। মহাকাশ যাত্রার কামনা তখনই আমার মনে জেগেছিল, কিন্তু উপগ্রহ মহাকাশযানে আমিই যে প্রথম যাত্রী হব, সে আশা অবশ্য তখন করতে পারি নি।"

প্রথম মহাকাশচারী সোভিয়েত নাগরিক তারপর বলেন, পাঠ্যাবস্থায় বরাবরই পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি বলেন, গুঝাৎস্কে একটি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করার পর ল্যুবের্ৎসিক বৃত্তি বিদ্যালয়ে পড়তে যান। তারপর যান সারাতোফের এক শ্রমশিল্প বিদ্যালয়ে।

গাগারিন বলেন, বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী 'মহাকাশ পর্যটনবিদ্যার পিতা' কনস্তান্তিন ৎসিওলকোভস্কির নাম তিনি প্রথম শুনতে পান বিদ্যালয়েই। "শ্রমশিল্প বিদ্যালয় ও বিমান বিদ্যালয়ে ৎসিওলকোভস্কির নাম আমাদের সকলেরই প্রিয় ছিল। আমরা সকলে তাঁর রচনাবলী পড়তাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৎসিওলকোভস্কি তাঁর **'পৃথিবীর বাইরে'** নামক বইতে যা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, উড্ডয়নকালে তা স্বচক্ষে আমি দেখেছি। মহাকাশ পরিক্রমাকারী মানুষের কাছে পৃথিবীটা কেমন দেখাবে তার সুস্পষ্ট চিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল।"

মেজর গাগারিন বলতে থাকেন, "মহাকাশযানে উঠবার আগে আমি বেশ আনন্দ বোধ করি। এই কাজের ভার আমার উপর অর্পিত হওয়ায় আমি খুশী হই ও গর্ব বোধ করতে থাকি। সেই সঙ্গে গুরুদায়িত্বের দিকটিও আমি হৃদয়ঙ্গম করি। মহাকাশের কত বিষয়ই না অজানা। সেই মহাকাশে আমি চলেছি। আমাদের দেশের মানুষ মহাকাশে মানুষকে নিয়ে যাবার মত শক্তিশালী মহাকাশযান তৈরী করেছেন, এতে আমি গর্ব বোধ করি।"

গাগারিন বলেন, "আমার সমগ্র জীবন, সমস্ত কাজ, সকল চিন্তা ভাবনা নিয়োজিত করব মহাকাশ বিজয়ের নববিজ্ঞানে। আমি যেতে চাই শুক্র গ্রহে। দেখতে চাই তার মেঘের অবগুণ্ঠনতলে কি রহস্য রয়েছে। যেতে চাই মঙ্গল গ্রহে, স্বচক্ষে দেখতে চাই সেখানে কোন খাল আছে কিনা। চাঁদতো আমাদের তেমন দূর প্রতিবেশী নয়। আমার মনে হয় চাঁদে যাত্রা করা ও সেখানে অবতরণ করার জন্য আমাদের আর বেশী দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে না।"

মেজর গাগারিন মন্তব্য করেন, মহাকাশযানে তিনি আরও অনেক বেশী সময় থাকতে পারতেন। কিন্তু উড্ডয়নের সময় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। "মহাকাশযানে আমি বেশ ভাল কাজ করতে পেরেছি, বেশ ভাল বোধ করেছি। মনটাও ভাল ছিল। পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়ে আমি আনন্দিত হলাম। আমার যান যখন নীচে নেমে আসছিল তখন আমি গাইতে লাগলাম, "দেশ আমার শোনে আমার কথা, দেশ আমার জানে সব।"

য়ুরি গাগারিন বলেন, আকাশে উড়তেই তিনি ভালবাসেন।

তিনি বলেন বিমানে প্রথম উড্ডয়নের সঙ্গে ১২ই এপ্রিলের উড্ডয়নের তুলনা করা কঠিন। একটি হল ডানাযুক্ত মেশিন, অপরটির কোন ডানা নেই। প্রথমটি উড়েছে ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিবেগে, দ্বিতীয়টি ঘন্টায় ২৮,০০০ কিলোমিটার গতিবেগে। প্রথমটি উঠেছিল ১৫ কিলোমিটার উঁচুতে, দ্বিতীয়টি উঠেছে পৃথিবী থেকে ৩০০ কিলোমিটার উঁচুতে।

য়ুরি গাগারিন বলতে থাকেন, "পৃথিবীতে ফিরে এসে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার স্বদেশবাসী সোভিয়েতের মানুষ আমাকে বিরাট সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। নিকিতা সের্গেইয়েভিচ খ্রুশ্চফের তার পেয়ে আমার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে থাকে। তাঁর উদ্বেগ, ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতায় আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। যখন আমি টেলিফোনে এন. এস. খ্রুশ্চফ ও এল. আই. ব্রেজনেফের সঙ্গে আলোচনা করি তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আমার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখার জন্য এই সুযোগে আমি নিকিতা সের্গেইয়েভিচকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে মানুষ পাঠাবার সংকল্প করেছে, এই বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি বলেন, মার্কিন মহাকাশচারী মহাকাশে উঠলে, সেই সাফল্যে আমরা খুশীই হব। তিনি বলেন, "মহাকাশে সকলের জন্যই যথেষ্ট স্থান আছে।"

আমাদের পার্টি ও গভর্নমেন্ট মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছেন। মহাকাশকে সামরিক কার্যে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ব্যবহার করা উচিৎ শান্তিপূর্ণ কার্যে। মার্কিন মহাকাশবিদ্যাবিদদের কাজ হবে আমাদের নাগাল ধরা। আমরা তাঁদের সাফল্যে অভিনন্দন জানাব, তবে আমরা সর্বদাই পুরোভাগে থাকতে চেষ্টা করব।"

গাগারিন বলেন, মহাকাশ যাত্রার পূর্বে তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা গত গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। গাগারিন বলেন, মহাকাশ যাত্রার পূর্বে সেই ছিল আমার জীবনের বৃহত্তম ও উজ্জ্বলতম ঘটনা।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, তিনি তাঁর এই উড্ডয়ন উৎসর্গ করেছেন কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত গভর্নমেন্ট, ২২তম পার্টি কংগ্রেস এবং সমগ্র মানবজাতির পুরোভাগে থেকে যাঁরা এক নব সমাজ গঠনে রত, তাঁদের প্রতি।

সাহিত্যের কোন চরিত্র তাঁর ভাল লাগে, কোন লেখক তাঁর প্রিয়—এই প্রশ্নের জবারে তিনি বলেনঃ

"সোভিয়েত লেখক ও রাশিয়ার প্রাচীন লেখকদের অনেকেই আমার প্রিয়। চেখফ, তলস্তয়, পুশকিন ও পলেভয়ের লেখা আমার ভাল লাগে। ছেলেবেলা থেকে সাহিত্যের একটি চরিত্রকে আমি ভালবেসেছি। তিনি বরিস পলেভয়ের 'একটি সাচ্চা মানুষের কাহিনী'র

নায়ক। আমার দুঃখ যে মার্সেসিয়েফের সংগে আমার কোন দিন দেখা হয় নি।

"আমি জুলে ভের্নের উপন্যাসগুলি পড়েছি, তিনি বেশ লেখেন। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি যেমনটি কল্পনা করেছেন, বাস্তব জীবনে তা ঘটে নি। 'আন্দ্রোমেদা নেবুলা' নামে সোভিয়েত উপন্যাসটি চমৎকার। বইটি আমার ভাল লেগেছে। তবে মহাকাশ-চারী মানুষের পক্ষ থেকে বলা যায় বইটিতে লিখিত সব কিছু বাস্তবসম্মত নয়। তবু বইটি বেশ কাজের।"

য়ুরি গাগারিন বলেন যে তিনি খেলাধুলা ভালবাসেন। "আমার সব চেয়ে ভাল লাগে বাস্কেট বল। স্কি, স্কেটিং ও ব্যাডমিন্টন খেলতেও আমি ভালবাসি। এটি বেশ ভাল খেলা। এতে ভাল ট্রেনিং প্রয়োজন হয়।"

মহাকাশচারী বলেন, প্রথম স্পুৎনিক উৎক্ষিপ্ত হবার পর মহাকাশ যাত্রার বাসনা জানিয়ে অনেকেই পত্র লেখেন। সে সব পত্র তিনি পড়েছেন। গাগারিন মন্তব্য করেন, "সে সব চিঠি আন্তরিকতাপূর্ণ। আমি দুঃখিত যে তাঁরা মহাকাশে উঠবার সুযোগ পেলেন না। আমি সুনিশ্চিত এমন দিন আসবে যে দিন সকলে ট্রেড ইউনিয়নের পাস নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করতে পারবেন।"

প্রথম মহাকাশচারী তাঁর আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশ-বাসীদের অভিনন্দন জানান, তাঁদের কাজে ও জীবনে শ্রেষ্ঠ সাফল্য কামনা করেন।

এই প্রথম মহাকাশচারী বৈমানিক য়ুরি গাগারিন, সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বসভার ইতিহাসে যিনি এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করলেন। মেজর য়ুরি গাগারিনের বয়স ২৭ বছর। রুশ ফেডারেশনের স্মলেনস্ক অঞ্চলের গুঝাৎস্ক জেলার যৌথ খামারের এক কৃষক পরিবারে তার জন্ম হয় ১৯৩৪ সালের ৯ই মার্চ।

১৯৪১ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পর হিটলারি আক্রমণের ফলে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

যুদ্ধের পর গাগারিন—পরিবার গুমোস্ক জেলায়



মহাকাশ যাত্রার গতি-উর্দ্ধযাত্রা-নবনির্মিত যন্ত্র

চলে যায়। য়ুরি সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। ১৯৫১ সালে মস্কোর কাছে লুবের্ত্তি সহরে এক বৃত্তি শিক্ষালয়ে থেকে তিনি সসম্মানে স্নাতক ডিগ্রি পান ও জেলাই বিদ্যায় সার্টিফিকেট লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি সান্ধ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠও শেষ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভোলগা নদীর তীরে এক শিল্পশিক্ষালয়ে শিক্ষালাভের পর সসম্মানে স্নাতক উপাধি পান। শিল্প শিক্ষালয়ে পাঠরত কালে য়ুরি গাগারিনের বৈমানিক জীবনের সুরু হয়। তিনি হরেন বুর্গে বিমানবাহিনীর শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হন। ১৯৫৭ সালে সেখানে প্রথম বিভাগের সার্টিফিকেট লাভ করার পর থেকে তিনি সোভিয়েট বিমানবাহিনীতে পাইলট হিসাবে কাজ করেন। তার আগের বছর য়ুরি গাগারিন সোভিয়েট ইউনিয়ানের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন।

তিনি বিবাহিত। তাঁর চাইতে এক বছরের ছোট তাঁর স্ত্রী—ভালেন্তিনা ওরেন বর্গ মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক হল। তাদের দুটি মেয়ে। ঠয়েলেনা ও গলিয়া। বাবা ৫৯ বৎসর বয়সে সূত্রধরের কাজ করেন। মা আনা ১৯০৮ সালে জন্ম ঘর সংসারের কাজ দেখাশুনা করেন। স্কুলে য়ুরির গণিত আর পদার্থবিদ্যা ভাল লাগত। বিমান উড্ডয়ন সম্পর্কে তার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। বিমান উড্ডয়নের কাজ বেছে নেওয়ায় তার মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন। সম্ভবত ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সাল সেই অবিস্মরণীয় দিনটিতে ক্রমে এগিয়ে যেতে লাগলো ১৪ই এপ্রিল সারা পৃথিবীর মানুষ মস্কোর সঙ্গে বেতার সংযোগ করলো। সোভিয়েত রাশিয়াও সেদিন পৃথিবী পরিক্রমকারী মহাকাশচারী বৈমানিক য়ুরি গাগারিনের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। পতাকা সজ্জিত হলো। বেলা ১২টার সময় চারইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি মসৃণ ইলেউশিন ১৮ বিমানে করে মোরিয়োক নিকিতা ক্রুশ্চেফ এসে নামলেন।

বিমান বন্দরের মঞ্চের ওপরে পার্টি ও সরকারের



শিল্পী পরিকল্পিত মহাকাশযাত্রীর গতি পথ

প্রতিনিধিদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বীর পাইলটের স্ত্রী ভালেন্তিনা গাগারিন ও স্মোলেন থেকে আগত আত্মীয় স্বজন। বাবা, মা, বোন আর ভাইরা। নিকিতা খ্রুশ্চেফ তাঁদের সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

গাগারিনের প্লেন আসছে এই উল্লাস ধ্বনিতে ১২—৩০ মিনিটে সমস্ত বিমান বন্দর মুখরিত হইয়া ওঠে। ৭ খানা জঙ্গী বিমানের পাহারায় এল ১৮ বিমান-খানি গাগারিনকে নিয়ে বিমান বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। বিমানটি সেই মানুষটিকে বয়ে নিয়ে-আসছে যে বিশ্বপ্রকৃতির অসীম বিস্তারের প্রভাবে মানবসমাজের প্রবেশের প্রথম সূচনা করল। আকাশের দিকে চেয়ে ফটো ও সিনেক্যামেরা তাক্ সাংবাদিকেরা বলেন, ওটা নামছে।" অবতরণের পর বিমানখানি একটা লাল কার্পেটের ধারে নিয়ে এল। বিমান বন্দরে পাশ দিয়ে যখন নিকিতা খ্রুশ্চেফ ও য়ুরি গাগারিন যাচ্ছিলেন তখন জনতা জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। কয়েক মিনিট পরে নিকিতা খ্রুশ্চেফ, য়ুরি গাগারিন ও তার স্ত্রী লাল গোলাপের মালায় সজ্জিত একটা নীল মোটর গাড়ীর বাহিনী মস্কো অভিমুখে রওনা হয়। চারিদিকে জনগণের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

"ভস্তোক" মহাকাশযানে চড়িয়া সোভিয়েত নাগরিক মহাকাশ বৈমানিক য়ুরি গাগারিনের কক্ষপথে মহাকাশ চারণ ও সাফল্যজনক প্রত্যাবর্ত্তনে মস্কোবাসীর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। গাগারিনের ভাষণ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর হইয়াছিল তাহাতে দেশবাসী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে য়ুরি আলেক্‌সিয়েভিচ্ গাগারিন বিশ্বের প্রথম মহাকাশ-চারীরূপে তাহার দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করিয়াছেন। ভস্তোক মহাকাশযান ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মস্কোসময়ের সকাল ৯টা ৭ মিনিটে যাত্রা সুরু করে।

এখন হইতে মানুষের মহাকাশ পর্যাটনের ব্যবস্থা হইয়া যাওয়ায় মানুষের প্রথম মহাকাশ পর্যটন মানব জাতির ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। এতদিন যাহা অলস কল্পনা বলিয়াই মনে হইত তাহাই আজ কাজে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে। পৃথিবীর বাহিরে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণাগার স্থাপন করায় চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র ও সৌরমন্ডলের অন্যান্য গ্রহে পর্যটন করা সম্ভব হবে। এই যুগ মানবজাতির জীবন ও কার্য্য ধারার গন্ডি ব্যাপক প্রসারণের যুগ—এই যুগ মানুষ কর্ত্তৃক সূর্য্যের চারিদিকের মহাকাশ বিসয়ের যুগ।

মহাশূন্যে ভ্রমণ করে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরে আসবার প্রথম অভিজ্ঞতা এবং গৌরব আমেরিকাবাসীর মধ্যে যিনি অর্জন করলেন তাঁর নাম আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই ৩৭ বছর বয়সী দুঃসাহসী মহাকাশবিজ্ঞানী বৈমানিক বীর কম্যান্ডার এ্যালান বি শেপার্ড (জুনিয়র) গত ৫ই মে (১৯৬১) কেপ ক্যানাভেরাল (ফ্লোরিডা) থেকে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পৃথিবী ছাড়িয়ে ১১৫ মাইল দূর পৌঁছুবার পর শেপার্ড আবার নীচে নেমে আসেন এবং কেপ ক্যানাভেরালের ৩০০ মাইল দূরে অতলান্তিক সমুদ্রে তাঁর ক্যাপসুল সমেত অবতরণ করেন।

ঐ ক্যাপসুলটির ওজন এক টন। প্যারাসুটের সাহায্যে ক্যাপসুলটি শেপার্ডকে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে। তাঁকে সমুদ্র থেকে তুলে নেবার জন্যে মার্কিণ নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এবং হেলিকপ্‌টার বিমান নিযুক্ত রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে কম্যান্ডার শেপার্ডকে ভাসমান ক্যাপসুল থেকে জাহাজে তুলে আনা হয়।

ওয়াশিংটনে পৌঁছুবার পর কম্যান্ডার শেপার্ডকে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান এবং একটি পদক দান করেন। পদকটি দেওয়া হয়েছে "ন্যাশনাল এরোনটিকস এন্ড স্পেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের" তরফ থেকে, এ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সম্মান।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র তার এই বীর সন্তানকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে উদ্বেগ হয়ে উঠলো। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেও আসতে লাগলো অভিনন্দন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লিখলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকেঃ "মহাশূন্য ভ্রমণে তাঁর এই সাফল্যের জন্য মিঃ শেপার্ডকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের এবং সমগ্র মানব জাতির অগ্রগতির পথে এ এক বিরাট সাফল্য। ক্রমশঃ মহাশূন্যকে এই ভাবে জয় করে মানব জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির নূতন নূতন পথ খুলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আমাদের দৃষ্টিভংগী আরও প্রসারিত হবে, যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তাকে আমাদের মন থেকে দূরে সরিয়ে নেবে এবং চিন্তায় ও কাজে শান্তি ও সহযোগিতার পথে চলাই যে এখন সমগ্র বিশ্ববাসীর পক্ষে প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো বলেই আমি আশা করি।"

সাফল্যের পশ্চাৎপটে

কম্যান্ডার শেপার্ডের মহাশূন্য জয়ের এই সাফল্য একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পিছনে রয়েছে মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনা এবং নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কম্যান্ডার শেপার্ডের মহাশূন্যে যাত্রার তোড়জোড় যদিও আরম্ভ হয় বছর দুই আগে, মহাশূন্যে যাত্রার পূর্বে শেপার্ডের সাজপোষাক টেলিভিশন-সাক্ষাৎকার প্রসংগে বলেছেন, মনুষ্যবাহিত মহাকাশ-যানকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠাবার আগে আরও কয়েকবার তাদের পরিক্রমণ-কক্ষপথের নিম্ন সীমা পর্যন্ত পাঠাবার সংকল্প যুক্তরাষ্ট্রে আছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠানোর কাজটা এ বছরের (১৯৬১) শেষ

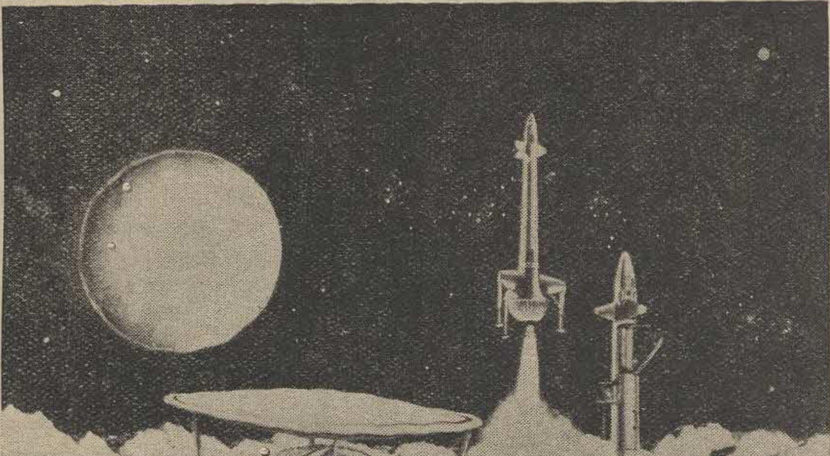
অথবা আগামী (১৯৬২) বছরের প্রথমদিকে হবে বলে তিনি আশা করছেন।

কম্যান্ডার শেপার্ডের মত, পৃথিবী পরিক্রমণ—কক্ষপথের নিম্ন সীমানা পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে উৎক্ষেপ করা হবে মাসখানেকের মধ্যেই, একথা মিঃ ওয়েব বলেন।

মহাকাশ ভ্রমণ করে কম্যান্ডার শেপার্ড যে সব মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন, সে সবের অংশীদার হতে কিন্তু মহাশূন্যে মানুষকে পাঠাবার আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সুরু হয়েছিল তার অনেক আগেই। অবশেষে ১৯৫৯ সাল নাগাদ শেপার্ড এবং আরও ছয়জন মহাকাশবিজ্ঞানী বৈমানিককে নির্বাচিত করা হলো মহাশূন্যে যাত্রা করবার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করবার জন্যে।

দু' বছর ধরে চললো প্রাণান্তকর, দুঃসহ কঠিন সাধনার ভিতর দিয়ে প্রস্তুতির আয়োজন। মহাশূন্যে যাত্রা এবং পৃথিবীতে প্রত্যাগমনের পথে বহু মারাত্মক বিঘ্ন রয়েছে। সেই সব বিঘ্ন-বিপদ থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা আর ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতা থাকা চাই।

ঘন্টায় ৫ হাজার মাইলের প্রচন্ড গতিবেগ সুরু হবার এবং সহসা হ্রাস পাবার মুখে মহাশূন্যযাত্রীর দেহের ওজন সাংঘাতিক রকম বেড়ে যায়। মহাকাশ থেকে এসে পৃথিবীর পরিমন্ডলে প্রবেশের সময় ঐ প্রচন্ড গতিবেগ থেকে মারাত্মক উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তার থেকে রক্ষা পাবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এবং মহাকাশযাত্রীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা—দুটোরই পরীক্ষা চললো বার বার। মহাকাশের প্রচন্ড শীত আর বায়ুশূন্য অবস্থার মধ্যে অক্সিজেনের সাহায্যে সুস্থ থাকা, দেহের ওজন একেবারে লুপ্ত হয়ে



মহাকাশ যাত্রা

যাওয়ার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করেছিলেন। রকেটবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক, যোগাযোগ রক্ষা, মহাশূন্যে যাত্রীবাহী ক্যাপসুল পরিচালনা ইত্যাদি বহু বিষয়ে কম্যান্ডার শেপার্ড এবং তাঁর সঙ্গের অন্য ছয়জন বৈমানিককে কড়া তালিম দেওয়া হয়। মহাকাশযাত্রী মহাযান (ক্যাপসুল)-টিকেও বার বার পরীক্ষা করা হয়েছে, সংস্কৃত করা হয়েছে, নির্দোষ নিখুঁত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহাকাশে জীবন্ত শিম্পাঞ্জী

মানুষকে মহাকাশে পাঠাবার আগে কয়েকবার কয়েকটি ক্ষুদ্রকায় জীবন্ত প্রাণীকে পাঠানো হয়েছিল এবং গত জানুয়ারী (১৯৬১) মাসে পাঠানো হয়েছিল একটি শিম্পাঞ্জীকে। মহাকাশ ভ্রমণান্তে সকলেই সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছিল পৃথিবীতে।

এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের দেখা যে মেলেনি তা নয়। তাতে অবশ্যি বিজ্ঞানীরা হতাশ হননি মোটেই। তাঁদের একাগ্র সাধনা ও নিরলস প্রচেষ্টার চরম পরিণতি ঘটলো ৫ই মে (১৯৬১) কম্যান্ডার শেপার্ডকে মহাকাশে প্রক্ষেপ করা এবং নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার সাফল্যের মধ্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল এরোনটিকস এন্ড স্পেস এন্ডমিনিস্ট্রেশন' (NASA) সংস্থার প্রধানকর্তা মিঃ জেমস ই ওয়েব কাজটি নিখুঁত হয়েছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখছেন। অন্যান্য যে সব রাষ্ট্র ইচ্ছুক তাদের ঐ তথ্যাদি সরবরাহ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুত। একটি বৈঠকে আগামী ৬ই জুন ওয়াশিংটন শহরে ঐ সব তথ্যাদির বিবরণ প্রকাশ করা হবে বলে মিঃ ওয়েব জানিয়েছেন। সাংবাদিক, বেতার এবং বেতারবীক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্যে ঐ বৈঠক অবারিত থাকবে।

মিঃ ওয়েব আরও জানান যে, পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী মনুষ্যবাহী মহাকাশ-যানকে মহাশূন্যে পাঠাবার পর যুক্তরাষ্ট্র তিনজন মানুষ সমেত এক প্রকান্ড গবেষণাগার মহাশূন্যে নিক্ষেপ করবে, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে। তারপরে চেষ্টা করা হবে চন্দ্রলোকে অভিযান পাঠাবার। কিন্তু সে সব অতি দুরূহ কাজ। আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে তার জন্যে।

আমরা এখানে মহাকাশযাত্রীদের যে বিবরণ প্রদান করিলাম তাহা হইতে তোমরা অনন্ত আকাশের রহস্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিবে।

মহাকাশের আরও সুদূরে যাইবার জন্য কাহারা প্রস্তুত? তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কি?

মহাকাশচারীদলের অন্যতম অধিনায়ক ই. পেত্রোফ এই প্রশ্নাবলী আলোচনা করিয়াছেন।

অনেকে চন্দ্র গ্রহ গমন সম্বন্ধে যে রূপ স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন এবং নানা রূপ রহস্য আবিস্কারের জন্য দিন দিন চেষ্টা যত্ন এবং বৈজ্ঞানিক রহস্য ও রকেট প্রেরণ করিতেছেন এবং অনেকের মনে মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতি গ্রহে গমনের জন্য উৎসাহি হইতেছেন। ইতিমধ্যেই মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহের দিকে শক্তিশালী রকেট প্রেরণ করিতেছেন। কোন কোন স্থলে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রত্যহ তত্ত্বজ্ঞাত হইতেছেন। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্বর্গত মেঘনাধ সাহা বহু বছর পূর্বে মঙ্গল গ্রহে জীবনিবাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক মঙ্গল গ্রহে জীবনিবাসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই আমাদের এই যে আলোচনা তাহার পরিসমাপ্তি কবে ঘটিবে তাহা বলা কঠিন।



স্বাধীনতার সংগ্রাম ও স্বাধীন ভারত

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত হ'তে বৃটিশ রাজশক্তি স্বয়ং ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকে ভারতবর্ষে একজাতিত্বের প্রাথমিক উপাদানের সৃষ্টি হয়। তখনই ভারতবাসীর দেশ প্রেমিক মাত্রেরই মনে হয় এবং সকলে এক কর্ত্তব্যের পথে চলতে অগ্রসর হন। তাহাদের মনে এক জাগরণের উদ্দীপনা জেগে উঠেঃ—

এক ধর্ম্ম এক জাতি
এক রাজ্য এক নীতি;
সকলের এক ভিত্তি, সর্ব্বভূত হিত।

'ইংরেজ রাজশক্তি সরাসরি প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করবার পর দুইটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। এক প্রতিশ্রুতি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এদেশে শাসনভার গ্রহণ-সূচক প্রচার পত্রে নিবদ্ধ ছিল দেখা ও পাওয়া যায় প্রথমতঃ এই ব্যবস্থাদ্বারা ইংরেজরা শাসনধীন সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি অখন্ড কেন্দ্রীয় শাসন-সংস্কার (Unitary administration) দ্বারা বিস্তৃত করা হয়। একভাবে একদিকে বিভিন্ন ভাষাভাষী, নানা ধর্ম্মমতাবলম্বী এবং বিবিধ আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী সকল ভারতবাসীকেই একটি অখন্ড নিখিল ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা ও প্রণালীর অধীন করে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বের ইতিহাসে কখনও এমনটা ঘটে নাই। হিন্দু রাজত্বকালে কোনও কোনও সম্রাট বা রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে ভারতের বহু বিস্তৃত অংশ কখনও কখনও এক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রণালী বা আদর্শ এমন ছিল যে, একটি অখন্ড কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠার সুযোগ ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমান আমলের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশল মূলত প্রায় একই প্রকার ছিল। ফলে ইংরেজ আমলে ক্রমশঃ এদেশে একটা অখন্ড নিখিল ভারতীয় শাসন-সংস্থা দ্বারা সমগ্র দেশকে একটি অখন্ড কেন্দ্রীয় শাসন সংস্কার (Unitary administration) দ্বারা বিস্তৃত করা হয়। এ-ভাবে এক দিকে বিভিন্ন ভাষাভাষী, নানা ধর্ম্মমতাবলম্বী এবং বিবিধ আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী সকল ভারতবাসীকেই একটি অখন্ড নিখিল ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ও প্রণালীর অধীন করে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বের ইতিহাসে কখনও এমনটা ঘটে নাই। হিন্দু রাজত্ব কালে কোনও কোনও

ভারত-রাষ্ট্র-চেতনার চিরন্তন সাধকগণ



রাজা রামমোহন রায়



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



অরবিন্দ



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



স্বামী বিবেকানন্দ



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ভারত-রাষ্ট্র-চেতনার চিরন্তন সাধকগণ


বীরেন্দ্রনাথ শাসমল


শিশিরকুমার ঘোষ


মৌলবি ফজলুল হক


যতীন্দ্রমোহন সেন (জে. এম. সেন)


অশ্বিনীকুমার দত্ত


জওহরলাল নেহরু

ভারত-রাষ্ট্র-চেতনার চিরন্তন সাধকগণ



বিপিন চন্দ্র পাল



রাষ্ট্রপতি রাধাকিষন



সুভাষ চন্দ্র বসু



মহাত্মা গান্ধী







সম্রাট বা রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে ভারতের বহু বিস্তৃত অংশ কখনও কখনও এক সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রণালী বা আদর্শ এমন ছিল যে, একটি অখন্ড কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠার সুযোগ বা ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমান আমলের সাম্রাজ্য-বিস্তারের কৌশল মূলত প্রায় একই প্রকারের ছিল। ফলে ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে এ-দেশে একটা অখন্ড নিখিল ভারতীয় শাসন সংস্থা দ্বারা সমগ্র দেশকে এক সূত্রে বিধৃত করবার কোনও উপাদান বা সুযোগ গড়ে উঠে নাই।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রথম বিষয়টির অনিবার্য্য বিশাল রূপেই এই সময় থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি মাত্র সাবর্বজনীন শাসন ব্যবস্থার (Universal rule of law) দ্বারা সংগঠিত করা হয়। এই দুটাই ব্যবস্থা পরষ্পর পরিপূরক এবং ফলে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, অবস্থা নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী আইনের নিকট সমপর্য্যায় ভুক্ত ও সমকক্ষ বলে স্বীকৃত হয়।

এ দেশের প্রধানতঃ বর্ণাশ্রম অবলম্বী সমাজে এইটি ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা।

তৃতীয়তঃ ইংরেজ রাজপুরুষের আপন প্রয়োজনক্রমে ইংরেজী ভাষা সর্ব্বভারতীয় সরকারী ভাষা হিসাবে আকস্মিক ভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে যে নূতন ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনাধীনে এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় তার একটি বিশিষ্ট ফল স্বরূপ শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই অনিবার্য্য ভাবে পরষ্পরের অনেকটা নিকটে এসে পড়েন, ও নৈকট্যের খাতিরে ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠিত এদেশের নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিশিষ্ট অবদান ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী প্রথম দশকে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু তাহার আগে আমাদের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ইতিহাস "আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের একটা নিশীথকালের দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল। কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে ছেলেই, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদিবা যায় কোথা হইতে আর এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান, মোগল, পর্টুগিজ, ফরাসি, ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখ করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা। ভারতবর্ষের সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলন মূলক।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একথাগুলি আমাদের এই স্বাধীনতা লাভের পরও ভাবিবার যোগ্য। ভারতের অন্য জাতি ও ভাষা জাগরণের আগে বাংলাতেই ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গঠন সুরু হয় রাষ্ট্র চেতনা ও ঐক্যমন্ত্রের আদিগুরু রামমোহনের যুগে (১৭৭২—১৮৩৩)। ব্রিষ্টলে তাঁর অকাল মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যে দেখি রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৬) ব্রিটিশইন্ডিয়ান এসোসিয়েসনের প্রথম সম্পাদক (১৮৫১—৫৬) এবং বাংলার প্রবীণ নেতারূপে পরামর্শ দিচ্ছেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম কংগ্রেস সভাপতি, প্রভৃতি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের। ১৮৮৫ সালে দ্বারকানাথ গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের মোট ১০০১ টাকা দান তাঁহাদের খাতায় উঠেছিল। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ২৪।২৫ বৎসর বয়সে রামপ্রসাদী সুরে স্বদেশী গান লিখেছেন কংগ্রেসের জন্য। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' যুবক রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে দ্বিতীয় বার বিলাত পরিভ্রমণ সেরে চীন, জাপান, আইরিশ জাতীয়বাদীদের অনেক খবর দেশে আনেন ও তাঁদের 'সাধনা' পত্রিকায় রাজনৈতিক সামাজিক ও সাহিত্যের প্রচার সুরু

করেছেন। দেবদুর্লভ কন্ঠে রবীন্দ্রনাথ সে-যুগে কংগ্রেসকে মাতিয়েছেন, একক কন্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮—১৮৯৪) 'বন্দেমাতরম্' (নিজসুরে) গান করেন। ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে ঋষি বঙ্কিম দেহত্যাগ করার কয়েক মাস পরে "ইংরাজ ও ভারতবাসী" শীর্ষক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে; অথচ 'আনন্দ মঠের' রচয়িতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর-সাধক যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৮৪১) সে কথা বাঙ্গালীরা প্রায় ভুলতে বসেছে ও তার শাস্তিও পেয়েছে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন, কমলাকান্ত, অনুশীলন ও প্রবন্ধমালা রবীন্দ্র গদ্যের ভূমিকা।

"বাঙ্গলা শিক্ষার মূল ভিত্তি স্হাপন করিয়াই দেশের স্হায়ী উন্নতি। ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই। আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাই যথার্থ গৌরব। অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ স্বীকারই প্রকৃত কার্য্য সিদ্ধি।"

বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি শুনে তাঁকে মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করেছিলেন। ১৮৮১ সালে তাঁর বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় দেখে। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ নরেন্দ্র দত্ত (১৮৬৩—১৯০২) পরে বলেছিলেন, চালাকি দ্বারা মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তখনও বেলুড়ে মন্দির স্হাপন তিনি করেন নি, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্ম্মে নহে, কর্ম্মেও বাঙ্গালীকে সৎ ও সচেতন হতে উপদেশ দিয়াছেন— "তুই যদি একা ঐ ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তা হলে তোর দেখা দেখি হাজার লোক ঐ রূপ করে শিখবে।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দকে গান্ধীজি এবং পন্ডিত নেহরুও স্মরণ করেছেন। ১৯ শতকের শেষ দলকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গড়ে তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতীয় কংগ্রেস এবং সেখানের ভারতীয় প্রবাসী ভারতীয়দের নির্য্যাতনের কথা কলিকাতা কংগ্রেসে (১৯০১) গান্ধীজী প্রথমে তোলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন প্রায় ৩৯ বছরেই শেষশয্যা নিয়েছেন, তাই, গান্ধীজী চেষ্টা করেও তাঁর দর্শন পাননি। সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় রিপন কলেজে বসে গান্ধীজী স্বেচ্ছাসেবক রূপে কংগ্রেসী চিঠি পত্র লিখেছেন। সে সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শিশির ঘোষ এবং ভূপেন বসু প্রমুখ বাঙ্গালী নেতারা গান্ধীজির সমর্থক ছিলেন। সে যুগেই আবার দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২—১৯৫২) আই-সি-এস ছেড়ে বরোদা রাজ্যের আশ্রয়ে শিক্ষাব্রত সুরু করেছেন। নতুন করে তাঁর মাতৃভাষা বাংলা শিখছেন, তাঁর বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার ভার নিয়েছেন শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায় নামে সে যুগের স্বনামপ্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবক। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে গভীর আলোচনা করে জাতি গঠনে মন দিয়েছেন (১৮৯৩—১৯০৩)। আইরিশ নেতা Parnell-এর প্রতি অরবিন্দের অনুরাগ প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয় নেতারা ইংরেজ নির্য্যাতিত আইরিশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্হাপনের চেষ্টা করেছেন। এর বহু পূর্ব্বেই রামমোহন, ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চেষ্টা করে গেছেন। আবেদন ও নিবেদনের ডালি নিয়ে ইংরেজ প্রভুদের বরণ করা বৃথা, কবি রবীন্দ্রনাথও সেটি স্পষ্ট করে গদ্যে ও পদ্যে বহুবার বলেছেন। মারাঠার একচ্ছত্র নেতা বালগঙ্গাধর তিলক 'নরমপন্হী ছেড়ে' গরম (Extremist) দল গড়েছেন। শাদা শাসক হত্যার পালা পুণা থেকে বারীন ঘোষের মামলা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের শহীদ প্রফুল্ল চাকীর গুরুরা বঙ্গছেদের (১৯০৫) আগে থেকেই কঠোর 'সন্ত্রাস বাদ' (Terrorism) ও গুপ্ত সমিতি সুরু করেছেন।

বড়লাট কার্জ্জন (১৮৯৯—১৯০৫) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সংকট মুহূর্ত্তে ভারত শাসন করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বদেশিকতার উত্তেজক প্রধানত বাঙ্গালীদের প্রতি বিরাগ হন। তাঁর বাঙ্গালী বিদ্বেষ উৎকট ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন বক্তৃতায় সারা জাতিকে মিথ্যাবাদী বলায় পরদিন

সকালের অমৃতবাজার পত্রিকায় লাটসাহেব দেখেন যে, তিনিও যে চীন সম্রাটের কাছে মিথ্যাচরণ করে এসেছেন সেটি কার্জ্জনের স্বরচিত বই থেকে বাংলার সাংবাদিক ছেপে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার হাত এখানে ছিল শোনা যায়। এ একেবারে অসহ্য—তাই বাঙ্গালীকে "ভাতে মেরে টিট করা চাই"। বাংলা পার্টিশানের মূল কারণ এই খানে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম এতকাল অখন্ড ভাবে যে বাংলায় অঙ্গীভূত ছিল, তাদের পার্টিশনের মূল কারণ এইখানে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কতকাল অখন্ড ভাবে যে বাঙ্গলার অঙ্গীভূত ছিল, তাদের বিচ্ছিন্ন করে প্রথম খন্ডিত-বাংলা এবং বিহার উড়িষ্যার (ক্লাইবের দেওয়ানী) শাসন চলল। রাজ্যশাসন অজুহাতে শাস্তিপড়লো একা বাঙ্গালীরই মাথায়। কত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিধিবিধান, এমন কি ছাত্র-শাসন সার্কুলার, প্রভৃতি জারি করে ইংরেজ বাঙ্গালীদের পঙ্গু করতে চেষ্টা করেছে, তার তালিকা করলে বড় গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়।

কার্জ্জন পার্টিশনের প্রায় দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ "ইংরাজ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে (১৮৯৪)। লেখেনঃ আজকাল হিন্দু মুসলমান বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে— আমরা কি গোপনে বলিনা যে, সেই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরাজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না, তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষ্যা বেশী করিয়া বপন করিয়াছে।" গান্ধী ও জিন্না অবশ্য এ প্রবন্ধ পড়েন নাই।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিশ বছরের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িকতা বিষের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ অবধি দেখে মর্ম্মাহত হয়ে গেছেন।.........কবির শেষ জীবনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award)। গৃহবিচ্ছেদ ও মহাত্মাজীর অনশন নিবারণে কবির একান্ত আগ্রহ স্মরণ করায় বাংলার স্থায়ী সঙ্কট (Crisis) গুলিকে। শ্যেণ দৃষ্টি দিয়ে দেশবরেণ্য নেতা রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সংকট ত্রাণে কত প্রবন্ধ—নিবন্ধ, গান লিখেছেন, এমনকি গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় Passive Resistance বা অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে ধনঞ্জয় বৈরাগীর রূপে তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৯০৯) গেয়েছেনঃ

"ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।"

যখন রবীন্দ্রনাথ এ গান গেয়েছেন তখন বাংলার ঘরে ঘরে আগুন লেগেছে। অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়েই একমাত্র মুক্তি, এ সত্য বাঙ্গালী তরুণরাই প্রথম বুঝে প্রাণের মূল্যে সারা দেশকে বুঝিয়েছে, আজ সে কথা কয়জন মনে রাখে? বাংলার তথা ভারতের এই অগ্নিযুগের ইতিহাস আজও (খন্ডিত আলোচনা হয়ে থাকলেও) অলিখিত। তবু মারাঠা নেতা তিলক ও পাঞ্জাবকেশরী লাজপৎ রায় বাংলার আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগ করেছেন, তাঁদের পরে অন্য প্রদেশের নেতারা সতর্কে এগিয়েছেন। বাংলার আধুনিক ইতিহাস লেখা হলে হয়ত সেটা সবাই বুঝবে।

আত্মাহুতি দিলে তবেই স্বাধীনতা আসবে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। ১৮৫৭ সালের Mutiny মৃত্যুযজ্ঞের মধ্যে কবি রঙ্গলাল লেখেনঃ

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠেছে হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত সত্যেন ঠাকুরের 'জয় ভারতের জয়' গানটিকে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনন্দিত করেন। বাঙ্গালী নেতারা গান সংযোগ ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়েছেন (১৮৬৩ সালে) হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা ক'রে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ইত্যাদি প্রকাশ করে। ১৮৭২ এ (শ্রী অরবিন্দের জন্মসন) বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে নব প্রেরণা ও নবযুগের সূচনা করেছেন। ক্রমশঃ তাঁর 'বন্দেমাতরম' ও 'আনন্দমঠ' জাতীয় শক্তিকে রূপ দিয়েছে......কেন্দ্রীভূত করেছে। সেই আদর্শে শ্রী অরবিন্দ পরে 'ভবানী—মন্দির' লেখেন।

১৮৯৩ সালে আশৈশব ইংলন্ডে লালিত ও শিক্ষিত শ্রী অরবিন্দ জাতীয় ভাব ও সাহিত্য বিকাশে নেমেছেন। সেই বছরই দেশ প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ Chicago Parliament of Religion সভায় চিরন্তন ভারতের বাণী শুনিয়েছেন ও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ দেশনেতা সন্ন্যাসী রূপে বাংলার প্রাণশক্তির উদ্বোধন এবং তরুণদের অনুপ্রাণিত করে গেছেন। নেতাদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। এ'দের বিরাট রচনা, গদ্যে ও পদ্যে যখন ভাল করে সবাই পড়বে, তখন হয়ত বুঝবে ১৯শ শতক থেকে ২০শ শতকের প্রথমার্দ্ধ প্রায় শেষ করে, এ'রা কি অমোঘ ইঙ্গিত করে গেছেন। বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রীদেরই এই ঋষি ঋণ শোধ করতে হবে।

বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৬—১৯১১) রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন ও এই পুণ্যব্রতা নারী বাগবাজার থেকে বরদা গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর অনুজ বারীন ঘোষ বহু বার যাতায়াত করে ১৯০৫ সালে দাদা অরবিন্দকে বরোদা থেকে বাংলায় আনেন। অরবিন্দ "জাতীয় শিক্ষাপরিষদের" অধ্যক্ষ রূপে কাজ সুরু করেন। জ্বলন্ত লেখা তাঁর দেখা দিতে সুরু করে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিষ্ঠিত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায়। তার দুজন সাক্ষী বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন দত্ত ও প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। ই'হারা দুই জনই কিছুদিন হইল অমরধামে মহা-প্রয়াণ করেছেন। তাঁদের সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী বলে কিছু কাল শান্তিনিকেতনে কাজ করে পরে কলকাতায় আসেন ও "সন্ধ্যা" পত্রিকায় দীপ্ত রচনার দ্বারা বাংলাকে মাতিয়ে ইংরাজের জেলেই দেহত্যাগ করেন। অন্যদিকে বিপ্লবী যুবক দল বারীন ঘোষের নেতৃত্বে "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ ও মাণিকতলা বাগানে বোমা তৈরি ও গুপ্তহত্যার আয়োজন করে ধরা পড়ে। আইরিস বিপ্লবীদের সঙ্গে রুশ বিপ্লববাদের খবর তখন এদেশে পৌছেছিল কিনা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নি। কিন্তু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে) ১৮৭৮ সালে ইউরোপ ও রাশিয়া ভ্রমণ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাদিতে রুশ চিন্তাধারা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কমুনিজমের আগে Anarchism ও Nihilism শব্দরূপে বাংলায় ঢুকতে সুরু করে। কিন্তু গান্ধী (১৮৬৯), লেনিন (১৮৭০) ও বিপ্লবী অরবিন্দ (১৮৭২) সবাই এক বিরাট বিপ্লব যুগেই জন্মান। তাঁরা নিজ নিজ পথ খুঁজে, অত্যাচারী হটিয়ে দেশের সাধারণ মানুষদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নামান। ইউরোপ ও U.S.S.R. "খোঁজপরিষদ" সে যুগের কাগজ পত্র থেকে যত ছেপেছে, আমাদের Mutiny (১৮৫৭—৫৯) বিষয়ে সম্প্রতি চর্চ্চা সুরু হলেও বাংলাভাষায় বই ধ্বংসীকৃত কিন্তু কিছু কিছু রক্ষিত। অনেক মূল্যবান দলিল-পত্র আজও প্রকাশিত হয় নি। স্বাধীন বাংলার মুখ্য মন্ত্রী এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়ে 'সংবাদপত্রে' প্রকাশের কথা (১৯০০—১৯৪৭) প্রকাশ করলে, বাংলা বিপ্লবের ইতিহাস রক্ষা পাবে। বাঙ্গালী সবর্বাগ্রে এগিয়ে অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিপিন পালের, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে শুধু চিন্তানায়কত্ব করেছে তা নয়—এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী জীবন উৎসর্গ করে "শহীদ" ও হয়েছে। স্বদেশী যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ দলিল ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা—পুস্তকাদিতে ছড়িয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের Home Minister-দের আশু কর্ত্তব্য যে সব স্বাধীনতার দলিল রক্ষা ও প্রকাশ করা। 'আনন্দ মঠের' প্রেরণায় সে যুগে অরবিন্দ যে 'ভবানী মন্দির' লেখেন সেটি বাজেয়াপ্ত হলেও Rowlatt মিত্র মশাই পড়েন ও Lord Ronaldshay-কে পড়তে দেন। এই হদিস পেয়ে ভবানীমন্দির বহু কষ্টে মৌলানা আজাদ সংগ্রহ করেন—তার টাইপ কপি বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে দিল্লীতে দেখেছি, কিন্তু আজও ছাপা হতে দেখিনি। ক্ষুদিরাম, কানাই, অরবিন্দ, উল্লাস কর, বারীন্দ্র প্রভৃতি ধরা পড়ার পর সেকালের চিঠি ও কাগজ পুলিশ নষ্ট করলেও

ভারত-রাষ্ট্র-চেতনার চিরন্তন সাধকগণ



লালা লাজপত রায়



যতীন মুখোপাধ্যায়



বালগঙ্গাধর তিলক



মতিলাল নেহরু



কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়



পেটেল

ভারত-রাষ্ট্র-চেতনার চিরন্তন সাধকগণ



দীনেশ গুপ্ত



মদনমোহন মালব্য



রাজেন্দ্রপ্রসাদ



লানা আবুল কালাম আজাদ

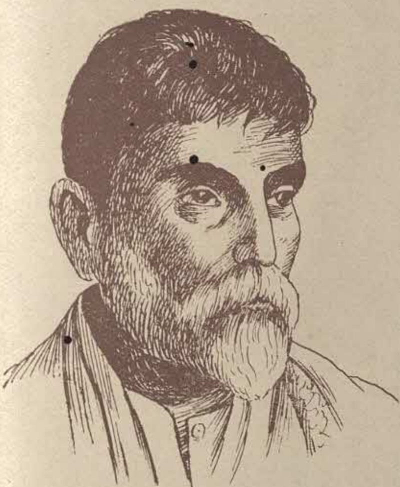


মতিলাল ঘোষ



রাসবিহারী বোস

ভারত-রাষ্ট্র-চেতনার চিরন্তন সাধকগণ



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



গোখলে



সরোজিনী নাইডু



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

এখনও বাংলা ভাষায় স্বাধীনতার ইতিহাস লেখার সবচেয়ে বেশী মাল মশল্লা মিলবে।

- স্বদেশী যুগের দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।"

এই আক্ষেপের ভাবতে দিয়ে গেছে বাঙালী তরুণ তরুণী—মাণিকতলা থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জীবন বলি দিয়ে তাদের কাহিনী প্রায় অলিখিত।

কারারুদ্ধ তরুণদের হাতে পায়ে শৃঙ্খলের কঠিন শব্দ জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের কানে পোঁছেছিল। তাই তিনি গেয়েছিলেনঃ—

"(ওরে) শিকল তোমার কোলে ক'রে
দিয়েছি ঝঙ্কার,
(তুমি) আনন্দে তাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।

রবীন্দ্রনাথই ১৯০৪ সালে বাংলার কথা সারা ভারতের National Planning প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা দেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরাধীন ভারতীয়দের স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হওয়ার দীক্ষা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব নয়, তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়তে হবে; এই নতুন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক ও বাঙালী রবীন্দ্রনাথ, মনীষী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীঅরবিন্দ; এরা যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভিত্তি পত্তন করেন সেটি সর্ব্বজনবিদিত। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ রুশ চিন্তানায়ক টলষ্টয়ের রচনা গভীর ভাবে পড়েছেন ও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। —ঐ উদ্ধৃতির জন্য বিপ্লবী চিন্তাধারার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছে এবং গান্ধীজী ও একথা বুঝে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন। আমার Tolostoy and Gandhi গ্রন্থে ভাষ্যসহ তাঁদের দু'জনের চিঠি ছেপেছি।

এই সময় আবার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য স্যার আশুতোষ সচেষ্ট হন। ১৯০৮ সনে University Jubilee থেকে সুরু করে দশ বছরের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা তিনি পান প্রসিদ্ধ দুই ব্যবহারজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের নিকট। এই দুই দানবীরের দানেই ভারতে প্রথম University College of Science গড়ে উঠে। এখানে ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু থেকে সুরু করে কত শিষ্য প্রশিষ্য আজ ভারতের নানা স্থানে বিজ্ঞান ও শিল্প বিভাগে কাজ করছে। Palit Professor সি, ভি, রমন ১৯৩০ সনে কলিকাতার অধ্যাপক রূপেই দ্বিতীয় নোবেল প্রাইজ পান। এশিয়া থেকে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩)।

এসবের মূলে আছে দু'জন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের যুগব্যাপী সাধনা। —ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮—১৯৩৮) ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁরা যে সব গবেষণা করেছেন তার সাড়া শুধু সারা ভারতে নয়, বিশ্ব বৈজ্ঞানিক মহলেও সম্বর্দ্ধনা পেয়েছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষক শিরোমণি হলেও বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষিত বাঙ্গালীদের কঠোর সমালোচনা করে গেছেন তার প্রমাণ 'বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার'। পরে তাঁরই শিষ্যেরা (রাজশেখর বসু অন্যতম B.C.P.W. সংগঠক) নানা পরীক্ষার ও সংগ্রামে জয়ী হয়ে ব্যবসায়ে বাঙ্গালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বেঙ্গল কেমিকাল থেকে বেঙ্গল ইমিউনিটি, ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি তার স্থায়ী নিদর্শন। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কিছু এগিয়ে মার খেলেও ব্যবসায়ে বাঙালী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তবু এটি আজও নিখুঁত সত্য যে, আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে অগ্রণী হলেও বাঙালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে বহু পশ্চাতে এবং বাঙালী বেকারদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। 'অর্থকরী বিদ্যাও কার্য্যকরী শিক্ষার দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাযোগ্য মনোযোগ দিলে শুধু বি-এ, এম-এ উপাধিধারী বেকার সংখ্যা না বাড়িয়ে কেবল সাংস্কৃতিক (Cultural) শিক্ষার অত্যধিক বিস্তার না করে তরুণ—তরুণীদের জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে সাহায্য করবেন। ১ লক্ষ বিশ হাজার

বিদ্যার্থী সংখ্যা কিন্তু আজ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে খপর্দ্দে, মালবীয়, বিপিন চন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, সবাই যেন অতীত ইতিহাসের ছবি। কিন্তু মোহনদাস গান্ধী ভবিষ্যতের প্রতীক। তিনি যখন বাসন্তী দেবী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অতিথি হন, তখন সে কথা গান্ধীজীকে জানাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ও তিনি আমার সাহচর্য্যে রচিত রমাঁরলার Mahatma Gandhi পড়ে সুখী হন। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৫ এই ৩০ বৎসরের কংগ্রেসের এক বিরাট ইতিহাস (এখনও অলিখিত) আছে, কিন্তু তারপর ৩০ বছরের কাহিনী একেবারে গান্ধী কেন্দ্রিক। এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বাংলা পিছিয়ে পড়ল তা সুস্পষ্ট। অর্থনীতিক সাধনার ভারতের বহু সমাজপতির পিছনে পড়েছি আমরা, সে কথা নিষ্ঠুর সত্য। তার ফল-ভোগ করছে সব চেয়ে চিন্তাশীল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তাদের মরণ—বাঁচনের উপরেই নির্ভর করছে বাঙালা ও তার সংস্কৃতি। এ নিয়ে বহু আক্ষেপ শুনেছি। কিন্তু গঠনমূলক কোন কাজের প্রারম্ভ দেখছি না।

এই সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে সুরু করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' ও পরে 'প্রবাসী', 'সবুজ পত্র', প্রভৃতি পত্রিকায়।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আবার ১৯০৭ সন থেকে ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রকাশ ক'রে নিজ পত্রে জাতীয় সংগঠন মূলক সম্পাদকীয় আলোচনা সুরু করেন ও সুচিন্তিত—প্রবন্ধ লেখকদের একত্র করেন। দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার মানের ও আর্থিক উৎকর্ষ সাধন ও সারাদেশের সাধারণ মানুষের প্রাণে রাষ্ট্রনীতিক চেতনা জাগরণে প্রবাসী সম্পাদকের দান স্মরণীয়। প্রবাসীর ৬০ বছরের বিষয়সূচী ছাপা হতে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

মিশনারী 'সমাচার-দর্পণ' ও রামমোহনের 'সংবাদ-কৌমুদী' থেকে সুরু ক'রে বাংলায় শতাব্দীকালাবধি বহু পত্রিকা উঠেছে, ডুবেছে, কিন্তু জাতির জীবনে ছাপ রেখে গেছে। গান্ধীজী অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে! এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটী ও হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় মহাত্মাজী এক বিরাট্ সাহিত্য গ'ড়ে গেছেন। বাংলা দৈনিকেরও প্রবল প্রকাশ এই গান্ধী যুগ থেকে সুরু হয়। এক্ষেত্রে কলকাতার সংবাদসেবীরা কেন্দ্রস্থানীয় হয়ে আছেন; জাপান ছাড়া বাংলার মত উচ্চমানের পত্রিকা-সাহিত্য এশিয়ার অন্যত্র দেখি নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সুরু ক'রে চাষ-আবাদ, কলকারখানা, ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণ প্রত্যহ পড়ছে ও তার ফলও শীঘ্র আমরা পাব আশা করি। মন্ত্রভেদ (Ideology-র ঝগড়া) ও মতদ্বৈধ থাকলেও শ্রমিক ও ধনিক সমস্যার সুসঙ্গত সমাধান হয়ত বাংলা দেশে হবে। কিন্তু বর্ত্তমানের 'সঙ্কট' এইখানে যে, ধনিক-শ্রমিক সম্প্রদায় অধিকাংশ অ-বাঙালী, এবং বাঙ্গালী যেন মসীজীবী ও শুধু চাকরি সম্বল। এ অবস্থার আশু প্রতিকার না হলে বিপ্লব আসবে, তার বজ্রনির্ঘোষ যেন আজ এই-খানেই শোনা যায়; কোটি কোটি টাকার লুট হচ্ছে কলকাতায়, হরিজনদের নিয়ে হরির লুট সুরু না হলে বিপ্লব অনিবার্য্য।

ক্রুদ্ধ ইংরেজ বাঙালীকে শুধু হাতে মারেনি, ভাতেও মেরেছে; তার অসংখ্য নজির আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে আত্মচৈতন্য জাগাবার ও প্রতিকার চিন্তনের চেষ্টা বাঙালীদের নেই কেন? হুইটলে কমিশন (Labour) থেকে লিনলিথ গো কমিশন (agriculture) পর্য্যন্ত ইংরেজ আমলে অনেক গবেষণা হয়েছে মানুষের খাটনি ও খাদ্য সমস্যা নিয়ে। কিন্তু তার ফল ভারতের অন্যত্র ফললেও বাঙালীর বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে অগণ্য চাষী, বাংলায় পলে পলে মরছে, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা ফলবতী হয়নি। ১৯৪১ সনে শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন 'সভ্যতার সঙ্কট' তখনই যে বাঙালী চরম পরীক্ষায় নেমেছে। ১৯৪২—৪৩ সনের সঙ্কট কালে দেশ-সেবায় প্রতীক 'মুক্তিসাধক' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শয্যা নিলেন ও কবির অনুসরণ করলেন।

ভারতছাড়ার আগে ইংরেজ শুধু বাংলাকে নয়, এতকালের অখন্ড ভারতকে খন্ডিত ক'রে

গেল। পূর্ববঙ্গ যে দেশকে আমরা বলেছি ও যেখানে অগণ্য নরনারী স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছেন—তাকে আজ বলতে হয় পূর্ব-পাকিস্তান; কিন্তু বাংলাই সেখানে রয়ে গেল রাষ্ট্রভাষা, এবং অর্থনীতিক সমস্যা এপারে ওপারে সমানই। বিরাট্ নদনদী সেই একই খাতে দুই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। কিন্তু এদের মানুষদের সখ্য, প্রীতি ও সহযোগ কি নূতন ক'রে সত্য হয়ে উঠবে না? এ প্রশ্ন স্বাধীনতার পর জেগেছে ও জাগবে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য রচনার সমজদারও ওপারে কম নয়। রবীন্দ্রশতাব্দী উৎসবে তাঁদের আসা চাই। কারণ পূর্ববঙ্গে ব'সে বহু মুসলিম ফকির ও আউল-বাউলের অলিখিত সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন (মানুষের ধর্ম্ম—দ্রষ্টব্য)।

রবির 'অন্তর্দশায়' বহু সাহিত্যিক উভয়বঙ্গে দেখা দেন। তাদের মধ্যে মনীষী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও হিন্দু-মুসলিম ভক্তদের সুরলহরী অবিভক্ত বাংলার সম্পদ্ হয়ে আছে। রেকর্ডে ও ফিল্মে এদের শিল্পসৃষ্টি জাতিধর্ম্ম-নির্বিবশেষে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকেই টানবে। এক ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়ে দুই বাংলার এক নতুন সহযোগ ও নর নব স্থান-সূচনা হয়তো অচির-ভবিষ্যতেই হবে। বিদেশী শাসকদল স'রে যাবার পর 'রাজা-প্রজা'র সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ যখন আমূল বদলেছে, তখন সাধারণ মানুষই তাদের সমস্যার সার্থক সমাধান করবে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে আর বেশী কাল্পনিক আশার কথা মনে ঠাঁই পায় না। নিরাশার মধ্যে আর দু'চারটি আশার কথা বলে আলোচনা শেষ করি।

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে আজ পড়া-শুনো শেষ করার আগে থেকেই উপার্জ্জন সচেতন হয়ে উঠছে, কারণ স্বভাবতঃ তারা মা-বাবা ভাই-বোনদের আকর্ষণে পরিশ্রম করতে রাজী, রাষ্ট্রিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এদের প্রবেশ করার বহুল সুযোগ দিতে হবে, তবে frustration—সঙ্কট দূর হবে।

নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও প্রায় বসে থাকে না, শিক্ষিকা ও সেবিকা (Nurse) রূপে মেয়েরা কাজ করতে নেমেছে। অন্যায় লজ্জা ভুলে ট্রাম-বাস যাত্রীদের (Conductor) রূপে ভদ্রবংশীয় যুবকরা পরিশ্রমী ও সন্তোষ-জনক কর্ম্মী হয়ে উঠছে।

কলকাতার বিরাট্ সওদাগরী আড়ত ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ, হোটেলাদি, অবাঙালীরই হাতে, কিন্তু মফঃস্বলে দোকানে পসারে ও যানবাহনের দৈনিক কাজ ক'রে বহু বাঙালী জীবিকা অর্জ্জন করছে ও করবে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে—সে দেশের ভাষা শিখে বাঙালীরা কাজ সুরু করছে।

রুজি রুটি ও ডাল ভাতের সন্ধান ও জীব-ধর্ম্ম; সেখানে ঘাটতি পড়ায় বাঙালী যে শাস্তি পেয়েছে, একদিন তার শেষ হবে। কিন্তু "শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি," তাকে চরম সন্তোষ দেবে না। বাঙালীর সাহিত্য ও শিল্প, তার আদর্শ ও ভাবধারা, আমাদের মহা-পুরুষ থেকে সুরু ক'রে সাধারণের প্রাণকে প্রতিনিয়ত তরঙ্গিত করে; সেই অলক্ষ্য প্রাণ-সমুদ্র, সেই বিরাট্ ঐতিহ্যই বাঙালীর চিরন্তন সম্পদ্। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ। অমোঘ ইঙ্গিত ও আশ্বাস দিয়ে গেছেন। বিংশ শতক পূর্ণ করার আগেই বাঙালী যেন তাঁদের 'উত্তর সাধক' হবার গৌরব লাভ করে।

আমাদের রাষ্ট্রচেতনার আবির্ভাবের যে সূত্রপাত ঊনবিংশ শতকের ধারা প্রবাহের মধ্য-দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে সে কথা আমরা বিশদভাবেই বলিয়াছি। কোন দেশে কোন কালে বিরাট ভারতব্যাপী বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ হয় নাই। ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় রাষ্ট্র, চিন্তায় রাজসংস্পর্শহীন ও আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হইয়াই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, লাভ করিয়াছে দেশবাসী ঐক্যমূলক স্বাধীনতা। সাম্যবাদী ভারত দেখাইয়াছে কেমন করিয়া বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে। 'সত্যমেবজয়তে।' ঐক্যবদ্ধ ভারত আজ আপনার শক্তির মন্ত্র বুঝিয়াছে। আজ সে জগৎমধ্যে পরাক্রমশালী।



ঘুম

চান করে ভাত খেয়ে
ঘুম ঘুম ঘুম,
থমকে দুপুর, যেন
রাত্রি নিঝুম
থেমে যায় ধুপ্‌ধাপ্‌
খুকুমণি চুপ্‌চাপ্‌,
দুই চোখ জুড়ে নামে
স্বপ্নের ধুম।
স্বপ্নে ময়ূর নাচে
রামধনু রং
বাজে কোথা ঘন্টায়
ঢং ঢং ঢং
দূরে কোথা কতদূর
বাঁশী বাজে মেঠোসুর
বাজে ঢাক টাক্‌ টাক্‌
ডুম্‌ ডুম্‌ ডুম্‌।

অবাক কান্ড!

বাবুই কাঁদে বাব্‌লা গাছে
তাই দেখে যে বাঁদর হাঁচে;
সেই হাঁচিরই ঝট্‌কাতে
আগুন লাগে পট্‌কাতে;
সেই আগুনে পট্‌ করে
পট্‌কা ফাটে চট্‌ করে
সেই ফাটুনির গন্ধে ভাই
দুপুর হলো সন্ধ্যে ভাই;
সন্ধ্যে বেলায় অন্ধকার,
করলে কে গো বন্ধ দুয়ার?
বন্ধ দ্বারে দেয় টোকা
বাইরে থেকে কোন খোকা
আয় রে খোকা আয় রে আয়
আদর করে ডাক্‌ছে মায়
তাইতে খোকা সব ভোলে,
অম্‌নি ছোটে মা'র কোলে।

টেকোরাম্‌

তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তাকিয়ে
টিকিওলা টেকোরাম শর্মা
মিট্‌মিটে চোখ দুটি পাকিয়ে
চটে বলে 'চলে যাবো বর্মা।'
তাই' শুনে' হনুমান বরুয়া
হেঁকে বলে, "কোথা গেলি' ছোড়দি?
হরদম বই পড়ে' পড়ুয়া,
নাকে তবু কেন হয় সর্দি?"

নন্দর কান্ড

মাঝ্‌রাতে ছাতে উঠে
হাঁক ছাড়ে নন্দ
"ইঁদুরের গায়ে কেন
বেড়ালের গন্ধ?"
তাই শুনে দূর থেকে
গঙ্গার বক্ষে
মাঝি কাঁদে নৌকায়,
জল ঝরে চক্ষে।

"প্যাঁক প্যাঁক পাতিহাঁস"

প্যাঁক প্যাঁক পাতিহাঁস ওস্তাদ সাঁতারে
কি যে খায় কি না খায় মুখে পোরে যা পারে।

গেঁড়ি গুগ্লির ভোজে চোখ বোজে আয়েসে।
হাড়ে হাড়ে শয়তানি ভয় নাহি মানে সে।

ব্যাঙ ব্যাঙাচির খোঁজে ভোর থেকে সন্ধে
হ্যাঙলার একশেষ খাবারের গন্ধে—

হয়ে পড়ে দিশেহারা মানেনা কো পথঘাট।
গলি ঘুঁজি খানা ডোবা একাকার হাট বাট।

ঝাঁটা হাতে তেড়ে আসে রেগে গিয়ে রাঁধুনী
গজ গজ বক বক থামেনা যে বকুনি।

বেলাজা সে হতভাগা কিছুই যে মানে না
প্যাঁক প্যাঁক পাতিহাঁস খাওয়া বই জানেনা।

না যদি খাও চাপাটি

না যদি খাও চাপাটি
বন্ধ খেলা কপাটি।

চাল খেলে চালে ভুল
হলে হবে মশগুল।

তার পর ভুলে পথ
বদলাবে জানি মত।

যদি খেল ফুটবল
খুব কসে খাও জল।

ক্রিকেটটা খেলে জোর
যারা খায় সাম্বর।

ভেতো বাঙালীর ছেলে
জানি মাছভাত পেলে

আরতো কিছু চায়না;
ধরলে শুধু বায়না

জুটতে পারে চাপাটি,
না খেলে দাঁতকপাটি।

শ্যাম রায়

ও পাড়ার শ্যাম রায়
কাছে পেলে কামড়ায়
এমনি সে পালোয়ান,
একদিন দুপুরে
ডেকে বলে গুপুরে
"এক্ষুনি আলো আন্।"
কী বিপদ তা হলে
আলো তার না হলে
মার খাবো আমরা?
দিলে পরে উত্তর
বলে রেগে "ধুত্তোর
যত সব দামড়া।"
কেঁদে বলি শ্রীপদে
ঘোচাও এ বিপদে
"অক্ষম আমাদের।"
হেসে বলে শ্যামদা
নিয়ে আয় রামদা
"ধুবড়ির রামাদের।"

নতুন পথিক

নতুন দিনের মানুষ তোরা
আয় শিশুরা আয়।
নতুন চোখে নতুন লোকের
নতুন ভরসায়।

*　　*

খেলার সুখে মাখ্লি তোরা
মাটীর করুণা
এই মাটীতে স্বর্গ রচিস
তোদের মহিমায়।

হাতীর শুঁড়ের মতন যদি

হাতীর শুঁড়ের মতন যদি
থাকতো দাদুর একটা শুঁড়
কলা গাছের ফলার খেতো
উজার করে সিঙ্গাপুর।

* * *

বেড়াল মাসির গোঁফের মতন
দিদার যদি থাকতো গোঁফ
ভোজের ঘটায় দুই জনাতে
ইঁদুর-বংশ করতো লোপ।

রাঙা খুকী

আমি একটা রাঙা খুকী
রাগলে কেঁদে মাথা ঠুকি
পুতুল পেলে হাসি ভারি
বৌ—বৌ—বৌ খেলতে পারি
পড়তে জানি গয়না
আদর করে মা আমাকে
বলেন পাকা ময়না।

দুটো ঘর

পাশাপাশি দুটো ঘর—রাম, হরি ভাড়াটে
দুজনেই তোলপাড় করে রাখে পাড়াতে
থাকে যে, একটুও খুন সুটি ছাড়া যে
যায় নাকো বুঝা কিছু—কেবা কার বাড়া যে
রামেদের ছেলে মেয়ে পড়া সুরু করলে,
হরিদের দেখা যায় সা-রে-গা-মা ধরলে।

মিলিয়ে চল

আমরা সবুজ, আমরা তাজা
আমরা এক এক ক্ষুদ্র রাজা,
চলার নেশায় রক্ত মোদের হয়েছে চঞ্চল—
ভাইরে পা মিলিয়ে চল্।

রবীন্দ্রনাথের হাসির কবিতা

ইস্কুলে যাওয়া নেই
সেইটে যা মঙ্গল—
পথ খুঁজি ঘুরি নেকো
গণিতের জঙ্গল।

ছেলেদের স্কুলে না যাওয়াই সব দিকে মঙ্গল—আরো ভাল অঙ্কের জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে গলদ ঘর্ম না হওয়া, উড়ো জাহাজের জন্ম-কাহিনী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে কবি রীতিমত ছেলেমানুষি করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন অদ্ভুত.........অথচ মজার নয় কি।

কোন রাক্ষসে চিলে
কী বিকট হাড় গিলে
পেড়েছিল ডিম
প্রকাণ্ড ভীম।

উল্টো রাজার দেশের কথা বলেছেন অতি চমৎকার ভাবে :

বাদশার ফরমাশে
সন্দেশ বানাতে
ছানা ছেড়ে মাখে চিনি
কুঁকড়োর ছানাতে।

ভোতন মোহন খুব মজার স্বপ্ন দেখে—যে-স্বপ্ন সাধারণ কেউ কখন দেখেনা কিন্তু ওরা দেখে ঠিকই :

ভোতন মোহন স্বপ্ন দেখেন
চড়েছেন চোঁ-ঘুড়ি
মোচার খোলার গাড়িতে তাঁর
ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি।



সম্পাদক :
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



কামিনীকুমার দে

জন্ম : ১৯০২। জন্মস্থান : মঠপাড়া, চট্টগ্রাম। ইনি ফলিত গণিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখে সুনাম অর্জন করেছেন।



হুমায়ুন কবির

জন্ম : ১৯০৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অক্সফোর্ডের এম.এ.। এঁর লেখা বইগুলো বাংলা সাহিত্যে প্রভূত যশোলাভ করেছে। ইনি ভারত সরকারের বিজ্ঞানানুশীলন এবং সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পেট্রল ও রাসয়নিক দপ্তরের মন্ত্রী।



আশাপূর্ণা দেবী

জন্ম : ১৯০৯। বাঙলা উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যে এর অবদান অসামান্য। ছোটদের গল্প লেখায় দক্ষতাও কম নয়। অগ্নি-পরীক্ষা, শশীবাবুর সংসার, দোলনা প্রভৃতি বইগুলো প্রসিদ্ধ।



হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : কলকাতায়, ১৯০৫। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দর্শনে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ সালে আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।



দেবেশ দাস

সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে ইনি সাহিত্য-চর্চা করে আসছেন। নিখিল ভারত-সাহিত্য-সম্মেলনের সংগে জড়িত রয়েছেন। এঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রোম থেকে রমনা, রাজসী, রাজোয়ারা প্রভৃতি নামকরা।



রুদেন্দ্র পাল

জন্ম : ১৯০২। ইনি ম্যাট্রিক ও আই.এস-সি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে শারীর বিদ্যায় বি.এস-সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সিতে প্রথম শ্রেণী এবং এম.বি. কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস-সি ও এম.আর.-সি.পি ডিগ্রী ও পান। ইনি একজন সুলেখক। রচিত গ্রন্থের মধ্যে শারীর বিদ্যা বইটি প্রসিদ্ধ। বর্তমানে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল।



ঊষা বিশ্বাস

জন্ম : ১৯০২, ঢাকা। ইনি কৃতিত্বের সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.-বিটি পরীক্ষা পাশ করেন। স্কুলের পরিদর্শিকা ও অধ্যাপিকার কাজ ও করেছিলেন। প্রবাসী, মর্ডান রিভিয়ু, মাসিক বসুমতীতে এঁ'র সারগর্ভ প্রবন্ধাদি গুণীজনের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে। শিক্ষার-বিষয়ে এঁ'র অবদান উল্লেখযোগ্য।

জন্ম : ১৯১৫। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে এম.এ.। ইনি ১৯৪২ থেকে জাতীয় গ্রন্হাগারের সঙ্গে যুক্ত আছেন। শীলভদ্র নামে ইনি লিখে থাকেন। এঁ'র মৌলিক গ্রন্হের মধ্যে Heroines of India সংস্কৃতি ও গ্রন্হাগার, সাহিত্য প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



হীরালাল দাশগুপ্ত

জন্ম : ১৮৯০। ইনি মিষ্টি ভ
শিকার-কাহিনী রচনায় সিদ্ধহ
এঁ'র 'বনে-জঙ্গলে' নামক বইখানা প্রসি



শ্রীসৌরীন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

ইনি প্রথমে বগুড়া কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছিলেন, পরে পাকিস্তান হওয়ায় কলকাতা চলে আসেন। বর্তমানে মুরলীধর গার্লস কলেজ এবং সিটি কলেজের দক্ষিণ কলকাতা শাখায় অধ্যাপনা করেন।



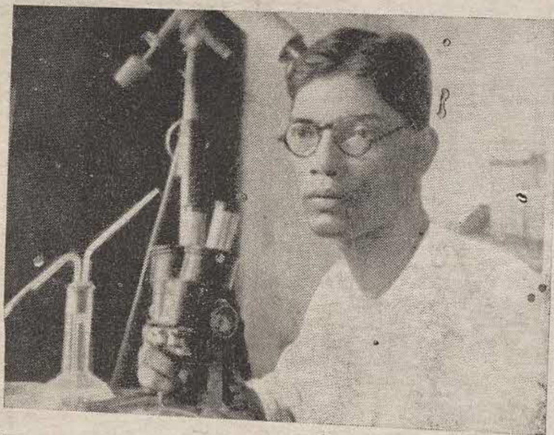
মনোজিৎ বসু

জন্ম : ১৯২০, ময়মনসিংহ, দিঘপাইত। ১৯৪৪ সালে ইনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। শিশু-সাহিত্য ও বড়দের গ্রন্হ রচনায় এঁ'র অসামান্য দখল আছে। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সহঃ প্রচার অধিকর্তা।



সুবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত

জন্ম : ১৯২৩। বরিশাল, মাহিল
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে
বিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে নোট্রেডাম বি
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ও গবেষণা ক
বিদেশী অনেক পত্রিকায় এঁ'র ধাতু
বিষয়ক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। বর্ত
দুর্গাপুর রিজিওনেল ইঞ্জিনিয়
কলেজের অধ্যাপকের পদে বৃত আ





গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

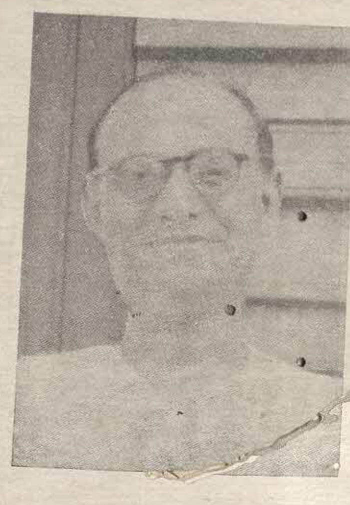
জন্ম : ১৮৯৮ সাল। ইনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহবানে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন। এ'র গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে জীব-বিজ্ঞান। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এ'র মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত।

মন্মথ রায়

জন্ম : ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম.এ. বি.এল.। নাট্যসাহিত্যে এ'র অবদান উল্লেখযোগ্য। কারাগার, চাঁদসদাগর ইত্যাদি নাটকগুলো প্রসিদ্ধ। ইনি আকাশ-বাণীর সঙ্গে কিছু দিন যুক্ত ছিলেন।







কুঞ্জবিহারী পাল

ম : ১৯২১। ইনি কলকাতা বিশ্ব-
্যালয়ের বি.এস.সি.। [illegible] কেন্দ্রীয়
কারের অধীনে পাট-শিল্প সম্বন্ধে দীর্ঘ
গবেষণা করেছিলেন [illegible] বৈজ্ঞানিক
কায় এ'র তথ্য-নির্ভর অনেক প্রবন্ধ
য়েছিল। ইনি এখন সরকারী শিল্প
বাণিজ্য, সংগ্রহশালার ভারপ্রাপ্ত
কারিক।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

জন্ম : ১৯০৫। চা-ব্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত যুক্ত আছেন। চা-শিল্পে এর অবদান অসামান্য। বর্তমানে গোপাল-প[illegible] চা-বাগানের ডিরেক্টার ও চা-কর সমিতির চেয়ারম্যান।

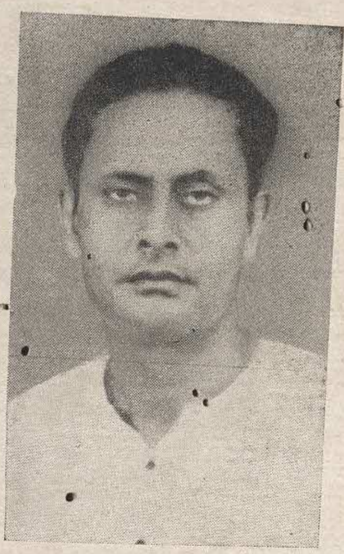
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

জন্ম : ১৯০৯। ইনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফলিত রসায়নে এম.এস-সি.। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ডাঃ হেমেন্দ্রকুমারের অধীনে রসায়নে গবেষণা করেছিলেন। শিশু-সাহিত্যের উপযোগী সহজ ভাষায় ইনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি গল্পের মতো সুখপাঠ্য করে লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' বইটি প্রসিদ্ধ। বর্তমানে অধ্যাপনা ও ছোটদের মাসিক 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক।



মঞ্জুশ্রী কর (সিংহ)

জন্ম : ১৯৩৪। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার এম.এ.। মুরলীধর গার্লস কলেজে বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা করেন।



শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

জন্ম : ১৯১৭। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিযুক্ত। ইনি একজন সুকবি। রচিত—দু'খানা কাব্যগ্রন্থ দূরান্তিক, সোহিনী।



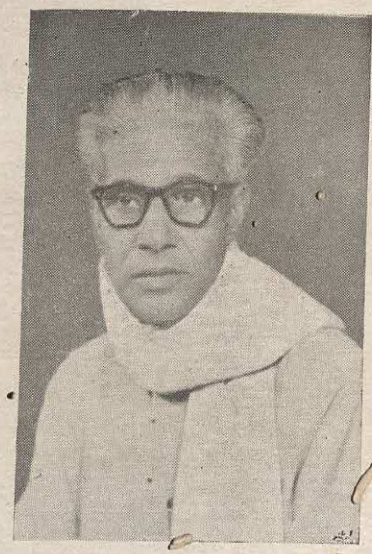
পি. সি. সরকার

জন্ম : ১৯০৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এস.-সি. পর্যন্ত পড়াশোনা করে যাদু বিদ্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেন ভারতীয় যাদু-বিদ্যার মান বিদেশে সর্বত্র এঁর অসামান্য ক্রীড়া-কৌশলে উন্নীত হয়েছে। যাদু সম্বন্ধীয় কখান বই আছে।



জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ১৩১২। ইনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার হিসেবে সুপরিচিত। বিজ্ঞানের জটিল তথ্য সরস সাহিত্যের মতো সুখপাঠ্য করে পরিবেশন করেছেন। রচিত গ্রন্থঃ দূরেক্ষণ, জন-কল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান। বর্তমানে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের পদে বৃত আছেন।



হরেন ঘটক

জন্ম : ১৯১০। ইনি স্কুল জীবন থেকে লেখা শুরু করেন। বড়দের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি এবং ছোটদের রচনায় এঁর সমান দখল। কার্টুনিষ্ট কাফিখাঁর আঁকা ছবি এবং এঁর লেখা ছড়া যুগান্তরে ছোটদের পাততাড়ির এক বৈশিষ্ট্য। ছড়া ও ছবিতে এ, বি, সি, ডি নামে একখানা বই আছে।



যামিনীকান্ত সোম

জন্ম ১৮৮২। ইনি শিশু-সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক। ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ লিখে ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মেতারলিঙ্কের নীলপাখী প্রথম অনুবাদ করেন। রচিত গ্রন্থ : ছেলেদের বিদ্যাসাগর পৃথিবীর ওপিঠে, পুরাতন কথা ইত্যাদি।



অসিতকুমার হালদার

জন্ম : ১৮৯০। চিত্রকর ও কবি। ইনি লক্ষ্মৌ আর্টস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শিশু-সাহিত্য রচনায় এঁর কম দখল ছিলনা। শিল্পকলা বিষয়ক ও ছোটদের জন্য ক' খানা বই আছে।



নলিনীকুমার ভদ্র

জন্ম : ১৯০৬। আদিবাসীদের জন্য বই লিখে ইনি সুনাম অর্জন করেন। মর্ডান রিভিয়ু এবং প্রবাসী পত্রিকার সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। এর আদিবাসীদের বিচিত্র কথা এবং নেফার মানুষ বইগুলো প্রসিদ্ধ।



অখিল নিয়োগী

ছোটবেলা থেকে হাতের লেখা পত্রিকায় সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি প্রচুর লিখেছেন। শিশু-সাহিত্য পরিষদ এঁর লেখা স্বপন-বুড়োর শৈশব বইটির জন্য ফটিক স্মৃতি পদক প্রদান করেন। 'স্বপনবুড়ো' ছদ্মনামের আড়ালে ইনি যুগান্তরের ছোটদের পাত্তাড়ির পরিচালক। ইনি একজন সুদক্ষ অভিনেতা।



ধীরেন্দ্রলাল ধর

জন্ম : কলকাতা। উনিশ বছর বয়স থেকে লিখতে আরম্ভ করেন। গল্প, নাটক, উপন্যাস রচনায় এঁর অসামান্য দক্ষতা। বিশেষ করে শিশু-সাহিত্যে এঁর দান স্মরণীয়। বর্তমানে পৌর-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।



বিশু মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ১৩১৫। শিশু-সাহিত্য ও অনুবাদে এঁর অসাধারণ দখল আছে। রবীন্দ্র সাগর-সঙ্গমে বইটি সম্পাদনা করে ইনি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে ইনি বসুমতীর ছোটদের পাতা সম্পাদনা করছেন।



মনোজ দত্ত

জন্ম : ১৯৩১। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি. বি. টি. আকাশ বাণীর বিদ্যার্থী বিভাগের নিয়মিত বক্তা। ছোটদের বিভিন্ন কাগজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।



সুকান্ত ভট্টাচার্য

জন্ম : ১৩৩৩। মাতামহের কলকাতা কালিঘাটের বাড়িতে। শৈশব থেকেই এ'র কবিতার উন্মেষ হয়েছিল। স্বল্প জীবনের মধ্যে ইনি যা রেখে গেছেন তা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে চির সম্পদ হয়ে থাকবে। 'রাণার' কবিতাটি এ'র একটি অক্ষয় অবদান। রচিত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে ছাড়পত্র, ঘুম নেই, মিঠেকড়া প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।



কাজী নজরুল ইসলাম

জন্ম : ১৮৯৯। বিদ্রোহী কবিতা রচনা করে ইনি সাহিত্য-জগতে আলোড়ন এনেছিলেন। ছোটদের কবিতা লেখায় সমান কুশলী। ইনি বাংলা গানে গজলের প্রবর্তন করেছিলেন। অগ্নিবীণা প্রলয় শিখা, বিষের বাশী, নজরুল গীতিকা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।



কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

জন্ম : ১৮৮৪। ছাত্রাবস্থা থেকে ইনি গল্প, কবিতা, নাটক লেখায় সিদ্ধহস্ত। বড়দের ও ছোটদের লেখায় সমান দক্ষতা। শিশুদের জন্য রূপকথা এ'র নিপুণ তুলিকা স্পর্শে রমণীয় হয়ে উঠেছে। সাতরাজ্যের গল্প, পাঁচমিশেলি গল্প, য়ুং ব্যাং ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।



সুনির্মল বসু

জন্ম : ১৩০৯ গিরিডি। ছড়া, কবিতা ইত্যাদি ছোটদের রচনায় এ'র জুড়ি নেই। অসংখ্য লেখার মধ্যে হররা, আজগুবি জানোয়ার, শহুরে মামা, আনন্দ নাড়ু প্রভৃতি বিখ্যাত। ১৩৬২ সনে পরলোক-গমন করেন।



নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

জন্ম : বাংলা ১৩০৭ বীরভূম জেলায়। ছয় বৎসর বয়স হতে মুখে মুখে কবিতা রচনা ও লেখায় অভ্যস্ত হন। ছবি আঁকতে ও পারেন। নানা রকমের হাসির কবিতায় এ'র অসাধারণ দখল আছে। হাসির তুবড়ি ও হাসির টেক্কা এ'র দু'খানা শ্রেষ্ঠ হাসির বই।



হেমেন্দ্রকুমার রায়

জন্ম ঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার এক বিশিষ্ট বনেদি পরিবারে। এ'র লেখা ছোটদের রহস্য ও এ্যাডভেঞ্চার মূলক উপন্যাসগুলি বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পদ। একদা 'যখের ধন' বইটি ছোটদের মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। ছোটদের জন্য এ'র লেখা অনেক বই আছে।



অজিতকৃষ্ণ বসু
(অ. কৃ. ব.)

জন্মঃ ১৯১২। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে এম.এ.। বড়দের ও ছোটদের লেখায় সিদ্ধহস্ত। অ.কৃ.ব. এই ছদ্মনামে বেশির ভাগ লিখে থাকেন। ছোটদের ও বড়দের ক'খানা বই আছে। 'খামখেয়ালী ছড়া' ছোটদের একখানা মজাদার বই।

শান্তা দেবী

জন্ম : কলকাতা। বাংলা সাহিত্যের একজন সুপরিচিতা লেখিকা। বেথুন থেকে বি.এ. পাশ করে পদ্মাবতী মেডেল পান। পিতা বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পদক লাভ করেন। এঁর রচিত বহু উপন্যাস, গল্প ও ছোটদের বই আছে।



কালিদাস নাগ

জন্মঃ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. এবং প্যারিস থেকে ডি. লিট. উপাধি পান। ইনি ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' অনুবাদ করেন। বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে Discovery of Asia এবং Greater India সুপরিচিত।



গোপাল ভৌমিক

জন্মঃ ১৯১৮। ইনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.। বড়দের ও ছোটদের লেখায় সমান পারদর্শী। এঁর বড়দের ও ছোটদের রচিত ক'য়েকখানা বই আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন-সংযোগ অধিকর্তা পদে নিযুক্ত আছেন।



বিভা সরকার

জন্মঃ ১৯৪৩। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাজুয়েট। এঁর প্রথম কবিতা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এঁর কয়েকখানা কবিতার বই আছে।



সুধাংশু গুপ্ত

ছেলেবেলা থেকেই ইনি ছোটদের জন্য লেখা শুরু করেন। কিশোর বয়সে এঁর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রাজভোগ' নামে ছোটদের একখানা মাসিক পত্রিকা বেরিয়েছিল। পরে 'কৈশোরক' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ভারতসরকার-পরিচালিত সাহিত্য কর্মশালার সহ-অধিকর্তার কাজ করেছিলেন। ছোটদের পাততাড়ি,—যুগান্তর, মৌচাক, শিশু সাথী ইত্যাদিতে নিয়মিত লিখে থাকেন।